যৌন সমস্যা

ডাঃ মদন রাণা

বি এস-সি., এম. বি. বি. এস., ডি. জি. ও.,

ডি. আর. সি. ও. জি (লণ্ডন)

বি. কে. পাবলিকেশন্‌স

৬, অন্নদা নিয়োগী লেন,

কলিকাতা-৩

অভিমানী

পিতামাতার

করকমলে

লেখকের অন্যান্য বই

যৌন প্রসঙ্গে (পঞ্চম সংস্করণ)

বিবাহিত জীবন

পুরুষত্ব এবং পুরুষত্বহীনতা

পরিবার পরিকল্পনা (তৃতীয় সংস্করণ)

বিবাহিত প্রেমকথা

জন্মনিয়ন্ত্রণ (চতুর্থ সংস্করণ)

রতিবাহিত ব্যাধি

ভূমিকা

সেক্স নিয়ে ট্রিলজি রচনার সাধ অনেক দিনের। সদ্যঃ প্রকাশিত 'সমাজ ও যৌনতা' এই ট্রিলজির দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম খণ্ড বহু পূর্বেই প্রকাশিত, যার নাম 'যৌন প্রসঙ্গে'। তৃতীয়টি এখনও সাজঘরে, আত্মপ্রকাশ করতে করতে হয়ত বৎসরাধিক কাল অতিক্রান্ত হবে।

সেক্স অর্থাৎ যৌনতাকে বাদ দিয়ে মানুষকে কল্পনা করা যায় না। তাই না যৌনতার ছাপ পড়েছে সমাজে, ধর্মে, সভ্যতায়। এসব প্রসঙ্গই বর্তমান গ্রন্থের বিষয়বস্তু। সমাজজীবনে রতিবাহিত ব্যাধি এবং কামবিকৃতির প্রভাব কম নয়। সুতরাং এদুটি বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত। অন্তর্ভুক্ত হয়েছে কতিপয় বহুদৃষ্ট যৌন সমস্যার সমাধানও।

শ্রী মদন রাণা

পি-৩৫ (১৩২) বি. কে. পাল এভেন্যু,

পোষ্ট বক্স : ১২২০৫

কলিকাতা-৭০০০০৫

বিষয়সূচী

প্রথম পর্ব ঃ রতিবাহিত ব্যাধি

প্রথম অধ্যায় গোড়ার কথা ১-২৭

ভি-ডি, ১-২। ভি-ডি বনাম এস-টি-ডি, ১। রতিবাহিত ব্যাধি: কি ও কেন? ৩। কেমনে সংক্রমিত? ৪-১০। অর্জিত এবং জন্মগত, ৪-৯। রতিবাহিত এবং অরতিক (আপতিক ও আকস্মিক), ৪-৬। পরনারী, গণিকা ও এস-টি-ডি, ৭। একটি সংসর্গে রোগসম্ভাবনা কতটুকু? ৮। রোগনির্ণয়, ১০। সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ কি সম্ভব? ১২। প্রতিষেধক ব্যবস্থা ১৩-১৯। রতিকালীন সতর্কতা, ১৩। আপতিক বীজাণুদূষণে সতর্কতা, ১৬। গর্ভকালীন সতর্কতা, ১৭। রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে কি দেখে চেনা যায়, বেছে নেওয়ার উপায় কি? ১৮। লিঙ্গত্বক্‌ছেদন কি প্রতিষেধক? ১৮। ভি-ডি ভাবনা: কি ও কেন? ১৯-২৩। বিবাহ, প্রজনন ও এস-টি-ডি, ২৩। বতিবাহিত ব্যাধি ও সতীত্ব, ২৫-২৭।

দ্বিতীয় অধ্যায় গণোরিয়া ২৮-৪০

গণোরিয়া: কি ও কেন? ২৮। ব্যাপ্তি ও শতকরা হার, ২৮। ইতিহাস, ২৯। রোগবিস্তারের উপায়, ২৯-৩১। আমদানিকারক কে? ৩০। গুপ্ত পর্যায়, ৩১। পুরুষের গণোরিয়া, ৩১-৩৩। পুরাতন গণোরিয়া, ৩২-৩৩। নারীর গণোরিয়া, ৩৩-৩৫। বালকবালিকা ও নবজাতকের গণোরিয়া, ৩৫। রোগনির্ণয়, ৩৬। চিকিৎসা, ৩৭। ফলো আপ, ৩৮। রিল্যাপ্স, ৩৯।

তৃতীয় অধ্যায় সিফিলিস ৪১-৫৮

কি ও কেন? ৩১-৪২। ইতিহাস, ৪২-৪৪। কলম্বস মতবাদ, ৪২। একত্ব মতবাদ, ৪৩-৪৪। রোগলক্ষণ, ৪৪-৫১। প্রথম দশা, ৪৫। দ্বিতীয় দশা, ৪৬। তৃতীয় দশা, ৪৮। চতুর্থ দশা, ৪৯। জন্মগত সিফিলিস, ৫০-৫১। রোগনির্ণয়, ৫১। রক্তপরীক্ষা, ৫২-৫৪। চিকিৎসা, ৫৪-৫৬। ফলো আপ, ৫৬-৫৮। সিফিলিস ও বিবাহ, ৫৭।

চতুর্থ অধ্যায় **স্যাংক্রয়েড ইত্যাদি** **৫৯-৬১**

স্যাংক্রয়েড, কি ও কেন ? ৫৯। রোগলক্ষণ, ৫৯-৬০। বাঘী, ৬০,৬৩। রোগনির্ণয়, ৬০। চিকিৎসা, ৬১।

লিম্ফোগ্র্যানিউলোমা ভেনেরিয়ম্, কি ও কেন ? ৬২। রোগলক্ষণ, ৬২-৬৩। এস্থিয়োমিনি, ৬৩। চিকিৎসা, ৬৩।

গ্র্যানিউলোমা ইঙ্গুইনাল, কি ও কেন ? ৬৪। সংক্রামতা, ৬৪। রোগলক্ষণ, ৬৪। রোগনির্ণয়, ৬৫। চিকিৎসা, ৬৫।

পঞ্চম অধ্যায় **আরও কয়েকটি রতিবাহিত ব্যাধি** **৬৬-৭৬**

সামান্য মূত্রনালীপ্রদাহ, কি ও কেন ? ৬৬। বিশেষ মূত্রনালীপ্রদাহ, ৬৬। রোগলক্ষণ, ৬৭। রাইটার'স সিনড্রোম, ৬৭। রোগনির্ণয় ও চিকিৎসা ৬৭-৬৮।

ট্রাইকোমোনাসজাত প্রদাহ, কি ও কেন ? ৬৮। গণোরিয়া ও ট্রাইকো-মোনাস, ৬৮-৬৯। সংক্রমণ ধারা, ৬৯। রোগলক্ষণ ৬৯-৭০। পুরুষ ও ট্রাইকোমোনাস, ৭০। রোগনির্ণয় ও চিকিৎসা, ৭০।

মনিলিয়াসিস, কি ও কেন ? ৭০-৭১। সংক্রমণ ধারা, ৭১। রোগলক্ষণ, ৭১। পুরুষ ও মনিলিয়াসিস, ৭১। রোগনির্ণয় ও চিকিৎসা, ৭১।

গোপনাঙ্গে স্কেবিজ ও উকুন, কি ও কেন ? ৭২। রোগলক্ষণ, সংক্রমণধারা ও চিকিৎসা, ৭২।

রতিবাহিত আঁচিল, কি ও কেন ? ৭৩। গণোরিয়া ও আঁচিল, ৭৩। সিফিলিস ও আঁচিল, ৪৮, ৭৩। অনুকূল পরিবেশ, ৭৩। সংক্রমণ ধারা, ৭৪। গোপনাঙ্গে আঁচিল ও ভাবনা, ৭৪। চিকিৎসা, ৭৫।

রতিজ হার্পিস, কি ও কেন ? ৭৫। রোগলক্ষণ, ৭৫। চিকিৎসা, ৭৫-৭৬। মলাস্কাম কন্টেজিওসাম, কি ও কেন ? ৭৬। রোগলক্ষণ ও চিকিৎসা, ৭৬।

দ্বিতীয় পর্ব ঃ যৌন সমস্যা

ষষ্ঠ অধ্যায় **সুগন্ধ দুর্গন্ধ আর যৌনতা** **৭৯-১০৭**

গন্ধ ও যৌনতা : প্রাণিজগতে, ৭৯-৮১। মানবযৌনতায় গন্ধের ভূমিকা, ৮২-৮৫। সুগন্ধ ও যৌনতা, ৮৬-৮৭। দুর্গন্ধ ও যৌনতা, ৮৭ ৮৯। দেহগন্ধ ৮৯-৯৩। কেশগন্ধ, ৯০। শ্বাসগন্ধ, ৯০। স্বেদগন্ধ, ৯১। কক্ষসুরভি, ৯৩। কামগন্ধ, ৯৪-৯৯। গোপনাঙ্গ ঘ্রাণ, ৯৫। উত্তেজনাগন্ধ, ৯৭। বীর্যগন্ধ, ৯৭। ঋতুগন্ধ, ৯৯। গন্ধ ও যৌনতা, ৯৯-১০৭।

সপ্তম অধ্যায় যৌন উপেক্ষিতা ১০৮-১১৯

রতিজড়তা : কি, শতকরা হার ও রতি-অক্ষম নারীদের অবস্থা ১০৮-১১০। কেন এই রতিজড়তা ? ১১১-১১৪। নারীজীবনে রতিপ্রাপ্তির মূল্য কতটুকু ? ১১৪। স্বামী, পরপুরুষ ও রতিজড়তা, ১১৫। সুস্থতা ও রতিজড়তা, ১১৬। রতিজড়তার চিকিৎসা, ১১৬-১১৭। যথার্থ রতিজড় নারীর সংসারের প্রতি কর্তব্য, ১১৮। প্রকৃত কামশীতল নারীর স্বামীর প্রতি কর্তব্য, ১১৯।

অষ্টম অধ্যায় ত্বরিতস্খলন ১২০-১৪৪

ত্বরিতস্খলন : কি, সংজ্ঞা ও শ্রেণীবিভাগ, ১২০-১২২। কেন এই ত্বরিতস্খলন ? ১২২-১২৭। আঙ্গিক ত্রুটিগত ত্বরিতস্খলন, ১২২। মানসিক ত্রুটিগত ত্বরিত-স্খলন, ১২৩-১২৭। ত্বরিতস্খলনের দুষ্টচক্র, ১২৭। প্রতিকারের উপায়, ১২৯-১৩৫। মৎ প্রবর্তিত বিলম্বিত লয়ে রাগসঞ্চার, ১৩০। ত্বরিতস্খলন, পুরুষত্বহীনতা ইত্যাদি পুরুষের রতিসমস্যায় নারীর কর্তব্য, ১৩৪। বীর্যস্তম্ভন, মাদকদ্রব্য ইত্যাদি চিকিৎসা, ১৩৫-১৪২। মাষ্টার্স ও জনসন প্রবর্তিত সর্বাধুনিক চিকিৎসা, ১৪০। তথাকথিত ত্বরিতস্খলন, ১৪২-১৪৪।

নবম অধ্যায় অতিবড় কাম ১৪৫-১৫৩

অতিবড় কাম বলতে কী বুঝব ? ১৪৫। সংখ্যাবিচারে কামস্বভাবিতা নির্ণীত হতে পারে না, ১৪৬। উচ্চকামযুক্ত নর ও নারী, ১৪৭-১৪৯, ১৫৩। অতিবড় কাম দুই প্রকার : স্বাভাবিক এবং নিউরোটিক, ১৪৯। কামোন্মত্ততা : কি, বৈশিষ্ট্য ও কেন ? ১৫০-১৫৩।

তৃতীয় পর্ব ঃ বিষয় কামবিকৃতি

দশম অধ্যায় কামবিকৃতি প্রসঙ্গে ১৫৭-১৭০

কামবিকৃতি : কি ও সংজ্ঞা বিচার, ১৫৭, ১৬২। স্বাভাবিক যৌনতার মাপকাঠি, ১৫৭-১৬০, ১৭১-১৭৪। কামবিকৃতির তিনটি বৈশিষ্ট্য, ১৬১। প্রকারভেদ, ১৬২-১৬৩। কামবিকৃতির যথার্থ অর্থ, ১৬৪। উৎস, ১৬৫-১৬৮। জন্মগত উৎস ১৬৫-১৬৬। অর্জিত উৎস, ১৬৬-১৬৮। পুরুষরাই কেন সংখ্যা-গরিষ্ঠ ? ১৬৮। বিকৃতকামীদের বৈশিষ্ট্য, ১৬৮-১৭০। এরাও মানুষ, ১৭০।

একাদশ অধ্যায় স্বাভাবিককাম বনাম বিকৃতকাম ১৭১-১৮৭

স্বাভাবিক কাম, ১৭১, ১৭৩। মানবযৌনতায় স্বভাবী ও অস্বভাবী বিচার ১৭২-১৭৩। অস্বভাবী কাম, ১৭২, ১৭৩। স্বাভাবিক কামের বৈশিষ্ট্য, ১৭৩। মানবযৌনতায় ধর্ষধর্ষকাম কতটুকু স্বাভাবিক ? ১৭৪-১৭৬। মানবযৌনতায় বস্তুকাম কখন বিকৃত ? ১৭৬। মানবযৌনতায় প্রদর্শনকাম ও নিরীক্ষণকাম

স্বাভাবিক, ১৭৭। সমরতিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মানুষমাত্রই কি অস্বভাবী? ১৭৭-১৭৮। আসনভঙ্গী ও স্বভাবিতা, ১৭৯। বিবাহিত জীবনে রতিবিহীন উপচার, পারস্পরিক পাণিমেহন, বহির্যোনি সুরত, মুখমেহন, পায়ুরত ইত্যাদি কামকলা কি স্বাভাবিক? ১৭৮-১৮১। রতিব্যাপারে স্বভাবিতা ও বিকৃতির মীমাংসা, ১৮২-১৮৪। বৈচিত্র্য প্রসঙ্গে দম্পতির ইতিকর্তব্য, ১৮৪-১৮৭।

দ্বাদশ অধ্যায় সমকাম ১৮৮-২০৭

কি? ১৮৮। কয়েকটি সমার্থক শব্দ, ১৮৯। প্রকারভেদ, ১৯০-১৯২। সমকামিতার সপ্তমুখী স্কেল, ১৯০। শতকরা হার, ১৯২। ইতিহাস, ১৯৩, ৩১৮, ৩২০-৩২৫। ব্যাপকতা, ১৯৩-১৯৫। প্রাণিজগতে ও আদিমজগতে, ১৯৪। সভ্যজগতে সমরতি বনাম ইতররতি, ১৯৫। সমকামীদের বৈশিষ্ট্য ১৯৬-১৯৮। উৎস সন্ধানে, ১৯৯-২০৬। জন্মগত মতবাদ, ১৯৯-২০০। হর্মোন ও সমকাম, ২০১। অর্জিত মতবাদ, ২০২-২০৬। সমকামিতা নির্ণয়, ২০৬। সমকামিতা ও বিবাহ, ২০৭।

ত্রয়োদশ অধ্যায় প্রদর্শনকাম ও নিরীক্ষণকাম ২০৮-২১২

প্রদর্শনকাম: কি? ২০৮। প্রদর্শনের ধারা, ২০৮। ব্যাপকতা ২০৯। মূলত: পুরুষেরই ব্যাপার, ২০৯। কেন? ২১০-২১১।

নিরীক্ষণকাম: কি? ২১১। নিরীক্ষণের ধারা, ২১১। ব্যাপকতা, ২১২। উৎস, ২১২।

চতুর্দশ অধ্যায় ধর্ষকাম ও মর্ষকাম ২১৩-২২৩

ধর্ষকাম: কি? ২১৩। মার্কুইস দে স্যাদে এবং ভন স্যাকার-ম্যাসো, ২১৩। ব্যাপকতা, ২১৪-২১৬। প্রকারভেদ, ২১৭-২১৮। হত্যাকাম, ২১৮। মর্ষকাম: কি? ২.৩। শ্রেণীবিন্যাস, ২২০। উৎস সন্ধানে, ২২১-২২৩।

পঞ্চদশ অধ্যায় বস্তুকাম ২২৪-২৩২

বস্তুকাম: কি? ২২৪-২২৫। প্রকারভেদ, ২২৫-২২৬। ব্যাপকতা, ২২৫। পার্শিয়্যালিজম, ২২৬। বস্তুকামের উপকরণ, ২২৭। উৎস, ২২৮-২৩০। বস্তুকামীদের বৈশিষ্ট্য, ২৩০-২৩১।

ষোড়শ অধ্যায় বসনকাম ও বিপরীতকাম ২৩৩-২৪৩

বসনকাম: কি? ২৩৩। ব্যাপকতা, ২৩৩। বসনকামীর বৈশিষ্ট্য, ২৩৪, ২৩৬। প্রকারভেদ, ২৩৫। শতকরা হার ২৩৫। ইতিহাস, ২৩৭। আদিম জগতে, ২৩৭। কতিপয় ঐতিহাসিক বসনকামী পুরুষ ও নারী ২৩৭-২৩৮। উৎস, ২৩৮-২৪০।

বিপরীতকাম: কি? ২৪০। বিপরীতকামীদের বৈশিষ্ট্য, ২৪১, ২৪২। কনভার্সান অপারেশন, ২৪১। লিঙ্গপরিবর্তন কি যথার্থই সম্ভব? ২৪২। উৎস, ২৪২-২৪৩।

সপ্তদশ অধ্যায় অল্পদৃষ্ট কয়েকটি বিকৃতি ২৪৪-২৫২

বালকামিতা: কি, প্রকারভেদ ও কেন? ২৪৪-২৪৬। কামার্থে নিয়োজিত বালকবালিকার পরিণতি, ২৪৬।

প্রৌঢ়কামিতা: কি ও কেন? ২৪৭। ঘর্ষণকাম: কি, কেন, কবে, কোথায়, ২৪৮।

শবকাম: কি? ২৪৯। ইতিহাস, ২৪৯। শর্তাধীন পুরুষত্ব, ২৪৯। যথার্থ শবকাম, ২৪৯। উৎস, ২৪৯-২৫০।

মলমূত্রকাম: কি ও কেন? ২৫০। পায়ুকাম: কি, ব্যাপকতা ও কেন? ২৫০।

পশুমেহন: কি? ২৫১। ইতিহাস, ২৫১। প্রকারভেদ, ২৫২। ব্যাপকতা, ২৫২। কেন? ২৫২।

অষ্টাদশ অধ্যায় চিকিৎসা ২৫৩-২৬৭

শাস্তিদান ও কারাদণ্ড যথার্থ চিকিৎসা নয়, ২৫৩। অণ্ডচ্ছেদন অসার্থক, ২৫৪। হর্মোন চিকিৎসা, ২৫৪। কারা চিকিৎসিত হয়, ২৫৪-২৫৫। চিকিৎসারম্ভে রোগীর ইতিহাস ও পরীক্ষা, ২৫৫-২৫৬। চিকিৎসায় সাফল্যের কয়েকটি সূত্র, ২৫৬। ঔষধাদি, ২৫৭। ব্যাখ্যা ও শিক্ষাদান, ২৫৭। পরিবেশ ও জীবিকাবদল, ২৫৮। অভিভাবন পদ্ধতি, ২৫৮। মনঃসমীক্ষণ, ২৫৮-২৬০। চেষ্টিতবাদ চিকিৎসা, ২৬০-২৬২। বিবাহ, ২৬২। কখন মিলন বিধেয়? ২৬৩। আরোগ্যসম্ভাবনা, ২৬৩। সমকামিতার চিকিৎসা, ২৬৪। বালকামিতা, বসনকামিতা ও বিপরীতকামিতার চিকিৎসা, ২৬৫। প্রতিকার, ২৬৫-২৬৭।

চতুর্থ পর্ব ঃ সমাজ ও যৌনতা

ঊনবিংশ অধ্যায় গর্ভপাত ঃ সমাধান কোন পথে ২৭০-২৮৯

গর্ভপাত: কি, প্রকারভেদ ও শতকরা হার, ২৭০। ইতিহাস, ২৭১। বিভিন্ন দেশে গর্ভপাত, ২৭২-২৭৩। গর্ভপাতের কারণ, ২৭৪-২৭৫। গর্ভঘাতিনী, ২৭৫। গর্ভপাতক, ২৭৬। গর্ভপাতের বিভিন্ন উপায় ও কুফল, ২৭৬-২৭৭। গর্ভপাত বৈধকরণের স্বপক্ষে, ২৭৮-২৮১। গর্ভপাতের বিরুদ্ধযুক্তি, ২৮১-২৮৫। গর্ভপাত ও ভারত, ২৮৫-২৮৮। উপসংহার, ২৮৮।

বিংশ অধ্যায় পিতৃপরিচয়হীন সন্তান ২৯০-৩০০

পিতৃত্ব প্রতিষ্ঠার উপায়, ২৯০, ২৯১, ৩০৪। কানীন, সহোঢ় ও জারজ পুত্র, ২৯০ ২৯১। অবৈধ সন্তান : একাল ও সেকাল, ২৯০-২৯২। শতকরা হার, ২৯২। কুমারী মাতা, ২৯৩-২৯৪। অবৈধ গর্ভের কয়েকটি কারণ, ২৯৪-২৯৯। প্রাক্‌বিবাহ সহবাস, ২৯৩। অনুষ্ঠানবর্জিত বিবাহ, ৩০১। অবৈধতার সমাধান, ২৯৯-৩০৫। অবৈধতার আদর্শ সমাধান, ৩০৬। উপসংহার ৩০৫-৩০৭।

একবিংশ অধ্যায় অপরাধী যৌনতা দিকে দিকে ৩০৮-৩১৫

যৌন অপরাধ কি? ৩০৯। দশটি প্রকারভেদ, ৩০৯-৩১১। যৌন অপরাধ ও অপরাধী সম্বন্ধে কতিপয় ভুল ধারণা, ৩১১। যৌন অপরাধীদের বৈশিষ্টা, ৩১২। চিকিৎসা, ৩১৩। যৌন অপরাধের কারণ, ৩১৪। যৌনতার নবনীতি, ৩১৫।

পঞ্চম পর্ব : সভ্যতা, ধর্ম ও যৌনতা

সভ্যতার আয়নায় যৌনতা

দ্বাবিংশ অধ্যায় এবং সমকামিতা ৩১৮-৩২৮

প্রাচীন সভ্যতা ও সমকামিতা, ৩১৮। আদিমজগতে ও প্রাণিজগতে সমকামিতা, ৩১৯। যৌনতার একটি ধর্ম, ৩১৯। যৌনতা এবং সমকামিতা : ইহুদী সভ্যতায় ৩২০-৩২১। গ্রীসীয় সভ্যতায় ৩২১-৩২৩। চীন ও জাপানে, ৩২৩। ভারতবর্ষে, ৩২৩। রোমক সভ্যতায়, ৩২৪। পুরুষ বেশ্যা, ৩২১, ৩২৩। খ্রীষ্টীয় সভ্যতায় যৌনভাবনা, ৩২৩। মধ্যযুগীয় যৌনতা ও সমকামিতা, ৩২০-৩২৫। জার্মানী ও সমকামিতা, ৩২৫। ম্যাগনাস হির্শফেল্ড, ৩২৫। সমকামিতা ও যৌনতা প্রসঙ্গে হ্যাভলক এলিস, ফ্রয়েড, বারট্রাণ্ড রাসেল, রেনে গাঁইও, ৩২৫-৩২৬। কিনসী রিপোর্ট ও সমকামিতা, ১৯০, ১৯২, ৩২৬। যৌনতার সাধারণ নীতি, ৩২৭। উপসংহার, ৩২৭-৩২৮।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় ধর্ম আর সুনীতি : যৌনতায় দুটি ছায়া ৩২৯-৩৪০

যৌনতা ও ধর্ম : পুরাকালে, একালে এবং কিনসী রিপোর্টে, ৩২৯-৩৩০। হিন্দুধর্ম ও যৌনতা, ৩৩০, ৩৩১। খ্রীষ্টধর্ম ও যৌনতা, ৩৩০। বাইবেলীয় যৌনতা, ৩৩১। মুস্লিম ধর্ম ও যৌনতা, ৩৩১। ইহুদী ধর্ম ও যৌনতা, ৩৩২। প্রতিটি ধর্মেই যৌননীতির কাঠামো প্রায় একই, ৩৩২। আমেরিকার কয়েকটি সম্প্রদায়ের যৌনতায় ধর্মের ছায়া, ৩৩৩। যৌননীতির দুটি বৈশিষ্ট্য, ৩৩৪। চলতি যৌননীতির বিচার, ৩৩৪। সম্পত্তিবিষয়ক যৌননীতি, ৩৩৪। তপশ্চর্যা-

পূর্ণ যৌননীতি, ৩৩৪। কৃত্রিম যৌননীতি, ৩৩৫। দোরোখা নীতি, ৩৩৫। যৌননীতির উৎস, ৩৩৫। অনুরাগবিহীন নবনীতি, ৩৩৬। অনুরাগযুক্ত নবনীতি, ৩৩৭। প্রাচীন নীতি বর্তমানে কেন অচল? ৩৩৮। নবনীতির বৈশিষ্ট্য, ৩৩৮। যথার্থ যৌননীতি কি হবে? ৩৩৭। উপসংহার, ৩৩৯।

চতুর্বিংশ অধ্যায় দোরোখা নীতি . ৩৪১-৩৪৭

সন্তানের পিতৃত্ব নির্ণয়: একাল ও সেকাল, ৩০৪, ৩৪১। দোরোখা নীতি, ৩৪২, ৩৩৫। বর্তমান সমাজব্যবস্থায় দোরোখা নীতির প্রভাব, ৩৪৪। বিবাহ প্রথার সার কথা, ৪৩। নববিধান, ৩৪৬। সারাংশ, ৩৪৬।

নির্বাচিত প্রমাণপঞ্জী ৩৪৯-৩৫০

প্রথম পর্ব

রতিবাহিত ব্যাধি

১। গোড়ার কথা

রতিব্যাপার যেমন সুখের তেমনি দুঃখেরও। শুধুই আনন্দলহরীর তরঙ্গ নয়, কষ্টেরও প্রলেপ দিয়ে জড়ানো বৈকি! এই দুঃখকষ্টেরই একটি নাম : রতিজ ব্যাধি কিংবা রতিবাহিত ব্যাধি। এটা হচ্ছে সেই সংক্রামক ব্যাধি যা এক ব্যক্তি থেকে অপর ব্যক্তিতে নীত এবং সচরাচর নিবিড় দৈহিক সান্নিধ্যের অতএব কামানুষ্ঠানের ফলাফল।

এযাবৎকাল প্রচলিত 'ভেনেরিয়্যাল ডিজিজ', সংক্ষেপে ভি-ডি, হচ্ছে রতিজ ব্যাধির ইংরেজী প্রতিশব্দ। ভি-ডি শব্দটি অতিশয় প্রাচীন ডাক্তারী পরিভাষা, ১৫২৭-এ জেকাস দ্য বেথারকোর্ট কর্তৃক প্রবর্তিত। এবং এখনও জনপ্রিয়। তবুও বলি, বিশ্বসভায় একদিন এই আসন লভিবে এস-টি-ডি। সংক্ষেপিত এস-টি-ডি শব্দের অর্থ সেক্স্যুয়্যালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজ, বাংলায় নাম রেখেছি রতিবাহিত ব্যাধি।

ভেনেরিয়্যাল শব্দটি এসেছে লাতিন 'ভিনাস' কিংবা 'ভিনার' থেকে আর ভিনাস হচ্ছেন ভালবাসার দেবী। সুতরাং সহবাসহেতু উৎপন্ন কতিপয় ব্যাধিকে একদা ভেনেরিয়্যাল সাজ পরানো হয়েছিল, প্রকাশভঙ্গীর শোভনতার জন্যেই। কিন্তু কালক্রমে এটাই অসুন্দর অশোভন হয়ে উঠল।

একদা যে ব্যাধি ছিল সম্মানের, রোগাক্রান্ত হলে লজ্জা পেত না কেউ, যুগভেদে সেটাই হল কলঙ্কচিহ্নিত, অগৌরবের ভার। বেশ্যাবৃত্তির সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপিত হল, ফলে রোগপ্রকাশের অর্থ দুর্নাম, ব্যভিচার দোষের, চারিত্রিক-নৈতিক অধঃপতনের। শেষে অবস্থাটা এমনই চরম হল যে ভি-ডি শুনলেই মানুষ চমকে ওঠে, রোগীর হৃৎকম্প শুরু হয়। এহেন নিদারুণ পরিস্থিতি থেকে নিষ্কৃতিলাভের উদ্দেশ্য নিয়েই ভি-ডি-র পরিবর্তে এস-টি-ডি চালু হয়েছে।

ইদানীং প্রবর্তিত এস-টি-ডি অর্থবহতায় যেমন সুন্দর তেমনি ব্যাপক। ব্যাপকতায় ভি-ডি-র মত সঙ্কীর্ণ নয়, উদার, প্রায় ডজন খানেক ব্যাধি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সুন্দর অর্থে কলঙ্কচিহ্ন নেই তার অঙ্গে অঙ্গে। রোগ-বিচারে সতীত্ব-অসতীত্ব প্রশ্নটাই বড় নয়, বড় কথাটি হল রতিবাহিত কিনা। অর্থবিচারে ভি-ডি আর এস-টি-ডি-তে বিশেষ কোন তফাৎ নেই, ডাক্তারের

কাছে তুই সমান। কিন্তু জনগণের কাছে ভি-ডি কলঙ্ক সমান, এহেতু এস-টি-ডি সমাদৃত হতে বাধ্য।

অনেকগুলি ব্যাধি রতিকালে অর্জিত হতে পারে কিন্তু ভি-ডি যোগ্যতা আছে শুধু মাত্র তিনটির। গণোরিয়া, সিফিলিস, শ্যাংক্রয়েড, এই তিনটির। এই যোগ্যতার পিছনে খুঁটির জোর আছে আইনের, ১৯১৭-এ ইংল্যাণ্ডীয় পার্লামেণ্টে ঘোষিত আইন। আর আছে বৈজ্ঞানিক স্বীকৃতি: রোগোৎপাদক বীজাণুসমূহের প্রতিষ্ঠা এবং প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই সংক্রমণের সূত্রটি রতিসহবাস। বাদ বাকী রতিবাহিত ব্যাধিসমূহের ক্ষেত্রে এতদনুরূপ বিজ্ঞানসুলভ দৃঢ় ভিত্তি নেই—কোথাও রোগোৎপাদক বীজাণু নিয়ে বিতর্কের পর বিতর্ক (ননস্পেসিফিক ইউরেথ্রাইটিস), কোথাও জিজ্ঞাসা রয়েছে ব্যাপ্তি প্রসঙ্গে, সংক্রমণ ব্যাপারে মতৈক্য নেই।

আইনতঃ সংজ্ঞায়িত ভি-ডি অতএব তিনটি। এক, গণোরিয়া। বাংলায় মেহ কিংবা প্রমেহ রোগ। দুই, সিফিলিস। বাংলায় বলা হয় গরমি রোগ, ফিরঙ্গ রোগ, উপদংশ রোগ। তিন, শ্যাংক্রয়েড। কালক্রমে আরও দুটি নাম যুক্ত হয়েছে—লিম্ফোগ্র্যানিউলোমা ভেনেরিয়ম্ এবং গ্র্যানিউলোমা ইঙ্গুইন্যাল্। পঁচিশ বছর আগে রতিজ ব্যাধির (ভি-ডি) তালিকা এখানেই শেষ হত।

কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ক্রমবর্ধমান তথ্যরাজি একথাই বলতে চাইছে আরও দুটি ব্যাধি সংসর্গজাত। এক, ননস্পেসিফিক ইউরেথ্রাইটিস, সাধারণ মূত্রনালীপ্রদাহ। দুই, ট্রাইকোমোনিয়াসিস, ট্রাইকোমোনাস ভ্যাজিন্যালিস জাত প্রদাহ। এখানেই শেষ নয়, মনিলিয়াসিস, স্কেবিজ, উকুন, আঁচিল, হার্পিস ইত্যাদি আরও কয়েকটি ব্যাধি আছে যা কিনা আক্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে শয়ন কিংবা সহবাস হেতু অর্জিত।

রতিবাহিত শুধু এই অলঙ্কারই বলে দিচ্ছে, এব্যাধি সংসর্গেরই ফলাফল। এখনই প্রশ্ন জাগবে, তবে কি সংসর্গমাত্রই রোগজনক? না, ব্যাপারটা তা নয়। কামীযুগলের উভয়ই সুস্থ, এজাতের ব্যাধি দূর অস্ত। আর দূষিত সংসর্গে, যেখানে একজন রোগাক্রান্ত, এব্যাধির সম্ভাবনা সমুজ্জ্বল।

এর পরও আরেকটি প্রশ্ন থেকে যায়, সংসর্গ বলতে কি শুধু রতিসহবাসই বুঝব? অর্থাৎ 'শুধু মাত্র পূর্ণ সহবাসেই এস-টি-ডি। আর অপূর্ণতায়, যেমন চুম্বনে, মুখমেহনে, গুহ্যগমনে এবং সমরতিতে, এস-টি-ডি-শঙ্কা নেই। কিন্তু এক্ষেত্রেও রেহাই নেই। কারণ চুলচেরা বিচারে সংসর্গের অর্থ কামানুষ্ঠানই।

যে নামেই খ্যাত হোক না কেন, দুটি কামস্থান* একত্রিত হলেই কামানুষ্ঠান পদবাচ্য হবে। প্রধানতঃ ইতররতিক কামানুষ্ঠানই রোগজনক, সমরতিক হলেও নিষ্কৃতি নেই, নিষ্কৃতি নেই আনুষঙ্গিক যৌন আচরণসমূহেও। রতিজ ব্যাধির যে কোনটি সংক্রমিত হতে পারে রতিবিহারে। এমনকি রতিবিহীন উপচারেও। যথা চুম্বনে, স্তনবৃন্তচোষণে সিফিলিস, মুখমেহনে গণোরিয়া কিংবা সিফিলিস। সমকামিতায় গণোরিয়া কিংবা সিফিলিস। বস্তুতঃ প্রতিটি কামানুষ্ঠানই রোগসম্ভাবনাময়।

ভিন্ন ভিন্ন বীজাণু প্রায় প্রতিটি রতিবাহিত ব্যাধিরই কারণস্বরূপা এবং এই বীজাণুসমূহের একমাত্র আশ্রয়স্থল মানবদেহ এবং মানবদেহের বাইরে বেঁচে বর্তে থাকতে পারে না। সুতরাং প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই দৈহিক সান্নিধ্যই রোগসংক্রমণের প্রধানতম উৎস। তাছাড়া বীজাণুসমূহ বংশবৃদ্ধি করে উষ্ণ অথচ আর্দ্র অঞ্চলেই, তাই না রতিবাহিত ব্যাধির প্রাথমিক লক্ষণাবলীর প্রাচুর্য দেখব গোপনাঙ্গ, মুখবিবর, পায়ুদেশ ঘিরেই। এতথ্যও চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে রোগসংক্রমণের প্রচলিত ধারাটির প্রতি। কেননা এতিনটি অঞ্চলের নিবিড় যোগাযোগ সাধিত হয় কামানুষ্ঠানেই।

রতিবাহিত ব্যাধির যথার্থ সংজ্ঞা অতএব এই: কামানুষ্ঠানের ফলাফল হিসেবে জাত বীজাণুদূষণ তথা প্রদাহমাত্রই রতিবাহিত ব্যাধিরূপে আখ্যাত হতে বাধ্য।

এরূপ ব্যাধিসমূহ প্রধানতঃ জননমূত্রতন্ত্রের নিম্নভাগেই দৃষ্ট, যদিচ এই তন্ত্রের উর্ধ্বভাগেও ব্যাপ্ত হতে পারে মাঝে মধ্যে। দেহের অন্যান্য অঙ্গও আক্রান্ত হতে পারে, যেমন মুখবিবর, পায়ুদেশ, যথাক্রমে মুখমেহন কিংবা পায়ুকামের পরিণতি হিসেবে। ওষ্ঠ কিংবা চক্ষুও দূষিত হতে পারে। আক্রান্তস্থান থেকে রক্তবাহিত হয়ে ঠাঁই নিতে পারে শরীরের যে কোন স্থানে, সুদূর প্রত্যন্ত অঙ্গেও। পিতা-মাতা কিংবা পরিচারক-পরিচারিকার কাছ থেকে আকস্মিক অথবা আপতিক বীজাণুদূষণের শিকার হতে পারে অবোধ শিশু কিংবা বালিকা। নবজাতকের চক্ষু গণোরিয়া আক্রান্ত হতে পারে দূষিতা মাতার যোনিপথ দিয়ে প্রসবিত হওয়ার সময়। গর্ভস্থ শিশুদেহে সিফিলিস বীজাণু প্রবেশ করতে পারে গর্ভরজ্জু মারফৎ।

রোগের কারণ হিসেবে নানা বক্তব্য শোনা যায়। কমন শৌচাগার

* কয়েকটি কামস্থান অর্থাৎ কামজাগানিয়া অঙ্গের নাম বলছি: মুখ, ওষ্ঠ, স্তন, গোপনাঙ্গ, পায়ু।

ব্যবহার, ক্রিকেটবল, প্রাণিজদংশন (যেমন উষ্ট্র দংশন) নাকি ইউরোপীয় রোগীদের দুর্দশার কারণ। আমাদের দেশে বলতে শুনেছি, অন্য খাটিয়ায় শয়ন, নোংরা পুকুরে স্নান, হঠাৎ গরম হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগা ইত্যাদি। এসবই আজগুবি, ভুলে ভরা তথ্য। ধূলাবালি, দারিদ্র্য, অপরিচ্ছন্নতা, শৌচাগারের অভাব—এসবে রতিবাহিত ব্যাধির উৎস সন্ধান বৃথা। কেননা এব্যাধি কদাচ স্বয়ং সৃষ্ট নয়, সমাজের সবচেয়ে নোংরা জায়গায় হলেও নয় এবং ততোধিক নোংরা জঘন্য লোকেদের মধ্যেও না। সত্যি কথা বলতে কি, এরোগ আপনি জন্মায় না, জন্মায় দৈহিক সান্নিধ্যেই। অবশ্য কতিপয় বিরল ক্ষেত্রে অন্য প্রকার সংসর্গ কিংবা অপ্রত্যক্ষভাবে কোন জড় অচেতন বস্তু দায়ী হতে পারে।

কী ভাবে এবং কেমন করে সংক্রমিত?

যে পথ বেয়ে এরোগ বিস্তৃত, সেটা হয় আচরণগত অর্থাৎ লব্ধ, না হয় জন্মসূত্রে প্রাপ্ত। রতিবাহিত ব্যাধি প্রধানতঃ অর্জিত, কচিৎ কখন জন্মগত। অর্জিত ব্যাধি আবার দুরকমের: রতিবাহিত এবং অরতিক।

রোগটি স্বভাবতঃই সংক্রামক এবং সংক্রমণব্যাপারে সব সময়েই দাতা-গ্রহীতা সম্পর্কটি বজায় থাকে। অর্থাৎ একজনে সংক্রমণকর্তা, অন্যজনে গ্রহীতা, এভাবে আক্রান্ত ব্যক্তি থেকে সুস্থ ব্যক্তিতে নীত। রোগোৎপাদক বীজাণুসমূহ সাধারণতঃ আক্রান্ত ব্যক্তির কামস্থানেই ব্যাপ্ত থাকে, এখান থেকে ক্ষরিত হয়ে সুস্থ ব্যক্তির কামস্থানে সঞ্চারিত। আক্রান্ত ব্যক্তির স্বভাবজ আর্দ্রতায় (রতিজন্য) এবং ক্ষরণে (রোগজন্য) মিশে থাকা বীজাণুসমূহ সঙ্গীদেহে স্থানান্তরিত হয়, জমা হয় সচরাচর গোপনাঙ্গে। কখন পায়ুদেশে, কখনবা মুখাভ্যন্তরে কিংবা ওষ্ঠে। এমনটি সম্ভব শুধু কামানুষ্ঠানেই, তখন এতিনটি অঙ্গই যে নিবিড় সান্নিধ্যে। অতএব, সংসর্গই রোগবিস্তারের সবচেয়ে প্রকৃষ্ট উপায়।

রতিজ সংক্রমণের স্বপক্ষে আরেকটি জোরদার যুক্তি এই: রোগোৎপাদক বীজাণুসমূহ শক্তিশালী নয়, অতিশয় সংবেদনশীল, দেহজ উষ্ণতা ও আর্দ্র পরিবেশের মুখাপেক্ষী। ফলে, শুষ্কতায়, তাপজ ঈষৎ পরিবর্তনে এমনকি অতিশয় মৃদু বীজাণুনাশকের (যেমন সাবান) সংস্পর্শে এলেই মৃত, অন্যদিকে

ভেজা ভেজা উষ্ণ পরিবেশে (রসসিক্ততায়; ক্ষরণে) ঘণ্টার পর ঘণ্টা বেঁচে বর্তে থাকে গোপনাঙ্গে, মুখে, গুহ্যদেশে এবং অধিকাংশক্ষেত্রেই—বলতে দ্বিধা নেই প্রায় ৯৯% ক্ষেত্রেই—এজাতীয় ব্যাধি সংসর্গজাত। এবং এটাই নিয়ম হিসেবে ধরে নিতে হবে যতক্ষণ না রোগবিস্তারের অন্য কোন পথ বা উপায় প্রমাণিত।

অন্য পথ বলতে বুঝি আপতিক কিংবা আকস্মিক বীজাণুদূষণ। অর্থাৎ সংসর্গের নামগন্ধ নেই তবুও কিনা রতিবাহিত ব্যাধি আবির্ভূত। রাম বিনা রামায়ণের মত উদ্ভট শোনালেও, রতি বিনা রতিজ ব্যাধি বাস্তবেরই ঘটনা। সুতরাং রতিজ সংক্রমণ সূত্রেরও ব্যতিক্রম আছে, কয়েকটি অতিপরিচিত এবং কয়েকটি অপেক্ষাকৃত দুর্লভ। অতিপরিচিত ব্যতিক্রমের প্রকৃষ্ট উদাহরণঃ গর্ভস্থ শিশুর সিফিলিস এবং নবজাতক শিশুর চক্ষুতে গণোরিয়া। বাদ বাকী আর সবই অপেক্ষাকৃত দুর্লভ। আরও দুর্লভ দূষিত যন্ত্রপাতি ব্যবহারে কিংবা স্পর্শ সুবাদে রতিজ ব্যাধির ঘটনা।

রতিবর্জিত সংক্রমণ, যাকে বলি আপতিক কিংবা আকস্মিক বীজাণু-দূষণ, নিঃসন্দেহে বিরলজাতীয় এবং সচরাচর শিশুরাই আক্রান্ত। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যেতে পারে, সিফিলিস এবং গণোরিয়া শিশুদেরও রেহাই দেয় না। প্রথমটি জন্মগত, এপ্রসঙ্গ কিছু পরেই আলোচিত। দ্বিতীয়টি প্রায়শঃ আকস্মিক বীজাণুদূষণের ঘটনা, একে ঘটনা নয় দুর্ঘটনা বলাই ভাল। বয়স্ক ব্যক্তির সান্নিধ্যে একত্রিত থাকার সময় কিংবা একই শয্যায় শয়ন অথবা দূষিত হস্তস্পর্শ যার ফলে দুষ্ট ক্ষরণ সরাসরি স্থাপিত হয় চক্ষুতে বা গোপনাঙ্গে। বিশেষ করে রোগাক্রান্ত পিতা-মাতা কিংবা পরিচারক-পরিচারিকা কর্তৃক স্নান কিংবা মল-মূত্রত্যাগকালীন শিশু পরিচর্যার সময়। কিন্তু বাস্তবে পা নামালেই দেখব, বহুদৃষ্ট কারণটি যৌন সংসর্গেই নিহিত। রোগমুক্তির আশায়, কামচরিতার্থতার লোভে, কামজ পরীক্ষানিরীক্ষার উদ্দেশ্যে, বালমেহন. পারস্পরিক পাণিমেহন কিংবা ধর্ষণ দুর্লভ নয়*।

ক্বচিৎ কখন বয়স্ক ব্যক্তিরাও এজাতীয় দুর্ঘটনার বলি হতে পারেন। আক্রান্ত ব্যক্তির ক্ষরণ নিজ চক্ষুতে সঞ্চারিত হয়ে অঘটন ঘটাতে পারে। অসতর্ক নার্স-ডাক্তারের আঙুলে কিংবা ডাক্তারের অবহেলায় দূষিত যন্ত্রপাতি ব্যবহারে সুস্থ রোগীর রতিজ ব্যাধির সম্ভাবনা যথেষ্ট। এক দেহ হতে অন্য

* এবংবিধ ক্ষেত্রে যে কোন রতিজ ব্যাধি শিশুকে স্পর্শ করতে পারে।

দেহে রক্ত সংবহন (ব্লাড ট্রান্সফিউশন) কিংবা উল্কিহেতু সিফিলিস দুর্লভ। আরও দুর্লভ রোগাক্রান্ত ব্যক্তির দ্রব্যসামগ্রী মারফৎ। বহুব্যবহৃত দ্রব্যসামগ্রীর মাধ্যমে সংক্রমণ ব্যাপারটা আরেকটু তলিয়ে দেখা যাক, কেননা এবিষয়ে জিজ্ঞাসা দেখি অনেকেরই এবং ভুল ধারণাও কম নেই।

দ্রব্যসামগ্রী বলতে বুঝি বিছানার চাদর, কাপড়-চোপড়, বিছানা, গামছা-তোয়ালে, রুমাল, এঁটো থালাবাসন, গ্লাস, চায়ের কাপ, হুঁকা, পাইপ, টুথ-ব্রাশ। আক্রান্ত ব্যক্তি কর্তৃক ব্যবহৃত এই সব জিনিস কি রোগজনক, বহুজিজ্ঞাসিত এপ্রশ্নের জবাব রাখিঃ সিফিলিস (শুধু মাত্র দ্বিতীয় পর্যায়ের) ক্ষতে এমনটি সম্ভব। এজাতীয় ক্ষত যদি মুখে থাকে, রোগটা প্রত্যক্ষভাবে সংক্রমিত হবে চুম্বনে কিংবা মুখমেহনে। এবং অপ্রত্যক্ষভাবে দ্রব্যসামগ্রী মারফৎ, হুঁকা, পাইপ, কাপ, গ্লাস, টুথ ব্রাশ, সন্ত ঠোঁঠের (আক্রান্ত ব্যক্তির) সংস্পর্শে লেগে যদি আরেক জনের ঠোঁঠে ওঠে, তবেই। এরূপ মণিকাঞ্চন যোগ কি সদাই ঘটে? ঘটে না বলেই এভাবে সংক্রমিত হতে বড় একটা দেখা যায় না।

অনুরূপভাবে গণোরিয়া-ক্ষরণ হস্তদ্বারা সঞ্চালিত হতে পারে চক্ষুতে, গোপনাঙ্গে। মনে রাখবেন, অন্য ব্যক্তির গোপনাঙ্গে হস্তস্পর্শ সবসময়ই রতিজ ব্যাধির আশঙ্কাজনক, সুতরাং সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলাই বুদ্ধিমানের কাজ।

জড় বস্তু কিবা অচেতন দ্রব্য মারফৎ এজাতীয় সংক্রমণ সাতিশয় দুর্লভ। পূর্বেই বলেছি, রতিজ ব্যাধির বীজাণুসমূহ দুর্বল, বেঁচে থাকার জন্যে উষ্ণতা ও আর্দ্র পরিবেশ অপরিহার্য। কাজে কাজেই কাপড়-চোপড় বিছানা-তোয়ালে-রুমাল—এসবে বীজাণু টিকে থাকতে পারে না। অবশ্য পায়খানার কমোড-আসনের পবিত্রতা যদি নষ্ট হয় এক ফোঁটা ক্ষরণে সেটা মুছে নেওয়াই সঙ্গত, এক্ষেত্রে অতিক্ষীণ সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ডাক্তারের যন্ত্রপাতি ধোয়া-মোছা হয়, রক্ত পরীক্ষা না করে রক্তসংবহন করা হয় না, সুতরাং এদুই কারণে রতিজ ব্যাধি সুদুর্লভ। অবশ্য উল্কি করার সময় সিফিলিস সংক্রমিত হতে পারে, যদি অব্যবহিত পূর্বে সিফিলিসের দ্বিতীয় দশাগ্রস্ত কোন ব্যক্তিকে উল্কি করা হয়ে থাকে।

এযাবৎ আলোচিত তথ্য থেকে এটা স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান যে দূষিত সংসর্গই রতিবাহিত ব্যাধির প্রধানতম উৎস এবং প্রায় অনিবার্যভাবেই সংসর্গদোষে জাত। দ্বিতীয়তঃ, রতি বিনা সংক্রমণ যথার্থই দুর্লভ। রতিবর্জিত

উপায়ে রোগবিস্তারে তত্ত্বীয় সম্ভাবনাই সমধিক প্রকট, বাস্তবে সহস্রাংশও সত্য নয়।

পরনারী, গণিকা ও এস-টি-ডি

দেখেছি, প্রায় অনিবার্যভাবেই রোগটি আসে সংসর্গাৎ। তবুও বলি, যৌন সংসর্গ কাউকে স্পর্শ করলেই যে রতিবাহিত ব্যাধির শিকার হতে হবে এটা ঠিক নয়। তবে কি এটাই ধরে নিতে হবে পরনারীগমনে এস-টি-ডি হয় না। হয় নিশ্চিত, তবে কিনা প্রতিটি সংসর্গে নয়। শুধু মাত্র দূষিত সংসর্গেই রোগসম্ভাবনা সমুজ্জ্বল এবং সঙ্গী (কিংবা সঙ্গিনী) রোগগ্রস্ত হলেই সংসর্গ দূষিত পদবাচ্য হবে।

রোগসম্ভাবনা বিচারে, স্ত্রী ব্যতিরেকে অন্য নারী বিপজ্জনক, আরও বিপজ্জনক, সবচেয়ে বেশী বিপজ্জনক বলাই ভাল, গণিকারাই। এমনকি নিজস্ত্রীও বিপদের কারণস্বরূপা হতে পারেন। এবং ভদ্রঘরের নারীও। এক কথায়, রোগের উৎস হতে পারে যে কোন নারী। কুমারী কিংবা বালিকা, সধবা কিংবা বিধবা, ভদ্র কিংবা অভদ্র, গৃহবধূ কিংবা বারবধূ— সকলেই। অবশ্য সংসর্গিতা নারী রোগাক্রান্তা হবে এবং রোগটি সংক্রামক অবস্থায় থাকবে।

অনেকের ধারণা শুধু মাত্র বেশ্যারাই রোগ ছড়ায়। সুতরাং পতিতালয়ে ঢুঁ মারলেই রোগাক্রান্ত হতে হবে। পতিতা নারীর কাছ থেকে রোগটি আসে ঠিকই, কিন্তু এরাই তো একমাত্র রোগবাহী নয়। কারণ, পেশাদার গণিকা অপেক্ষা অপেশাদার ব্যভিচারী ভদ্ররমণীরাও কম দায়ী নয়।

অধিকন্তু, রোগসংক্রমণব্যাপারে সব নারীই সমান। কেননা যে নারী একজনের কাছে দেহদান করে সে যে অন্যজনকে ফিরিয়ে দেবে এমন নিশ্চয়তা কই? পতিতা-ভ্রষ্টা কিংবা কোন গণিকার কাছে সুখ সন্ধান করাও যা ভদ্রনারীর কাছেও ঠিক তাই, নারী ভদ্রঘরের হতে পারে কিন্তু অব্যভিচারী একথা কে বলে দেবে? অতএব, এব্যাপারে আসল নিরাপত্তা প্রেম, বিশ্বস্ততা, আনুগত্য এবং ব্যভিচারহীনতা।

বৈধ হোক, অবৈধ হোক, কামানুষ্ঠানমাত্রই রোগসম্ভাবনাময়, যদি না কামীযুগলের মধ্যে বিশ্বস্ততা থাকে। একারণে স্বামী স্ত্রীর চির অনুগত, সেই সুখী প্রাঙ্গণে রতিবাহিত ব্যাধির প্রবেশাধিকার নেই। পক্ষান্তরে, একের বহুমুখকামিতায়, অপরে নির্দোষী নিষ্পাপ হয়েও রতিবাহিত ব্যাধি

কবলিত হতে পারে। এই একই কারণে ভদ্রবংশোদ্ভূতা রমণীর সাহচর্যও রতিজ ব্যাধির বিষে ভরা।

একটি দূষিত সংসর্গে

শুধু মাত্র একটি দূষিত সংসর্গে রোগসংক্রমণের আশঙ্কা কতটুকু? খুব বেশী নয়। অর্থাৎ নিষ্কৃতিলাভের সম্ভাবনাই সমধিক এবং বাস্তবেও দেখি কামীজন প্রায়শঃ অনাক্রান্ত। কথিত আছে শত 'ফর্নিকেসন' দিয়ে একটি এস-টি-ডি রচিত হয়, অস্যার্থ এক শত বিবাহেতর সংসর্গে একব্যাধি জাত।

একটি মিলনেই যেমন গর্ভ হতে পারে তেমনি রতিজ ব্যাধির চমক থাকতে পারে একটি প্রমোদ ব্যসনে। এব্যাপারে সংখ্যাল্পতা এবং আকস্মিকতা যতই থাক, একটি ঘটনার নজির আছে আমার কেস ডায়রীতে। পক্ষান্তরে শত রাত্রির প্রমোদে মন ঢেলে দিয়েও দেহতরী অটুট থাকার ঘটনা সমান সত্য। আবার এও সম্ভব যে একই দিনে একই সময়ে একই রমণীর সঙ্গলাভ করেছে কতিপয় পুরুষ, এঁদের মধ্যে শুধু একজন গণোরিয়া আক্রান্ত, অন্যরা পলাতক। এবং দেখেছিও স্বয়ং।

এসবই নির্ভর করছে কয়েকটি অবস্থার জন্যে। সর্বাগ্রেই উল্লেখ্য সঙ্গী বা সঙ্গিনীর সুস্থতা। পূর্বেই বলেছি, দূষিত সংসর্গে রোগসম্ভাবনা সমধিক উজ্জ্বল। সঙ্গী (বা সঙ্গিনী) ব্যাধিকবলিত না হলে সঙ্গিনী (বা সঙ্গী) কেমন করে রোগাক্রান্ত হবে বলুন?

দুই, সংক্রাম্যতা। শুধু রোগাক্রান্ত নয়, রোগটি সংক্রামক অবস্থায় থাকবে তবেই। এবং রোগটি যতই সক্রিয় থাকবে, সংক্রমণ আশঙ্কা ততই বেশী হবে। ঘন পুঁজের মত ক্ষরণ নির্গত হচ্ছে অহরহ, সেই অবস্থায় গণোরিয়া রোগটি অতীব সংক্রামক। আর ক্ষরণ পরিমাণে অতি অল্প, পুঁজের মত ঘন নয়, তরল এবং মাঝে মধ্যে নির্গত হচ্ছে কিংবা জরায়ুগ্রীবায় সীমিত, সংক্রাম্যতা তখন অল্প। তরুণ সিফিলিস রোগের (প্রথম দশা, দ্বিতীয় দশা এবং সুপ্তদশার প্রথমাবস্থা) প্রথম দুবছরের অধিকাংশ সময়ই অতীব সংক্রামক। শুধু নর বা নারীতে নয়, গর্ভবতী রমণীর ক্ষেত্রেও (এসময়ে মাতা গর্ভস্থ শিশুকে দূষিত করে)।

তিন, স্থায়িত্ব। রতিবাহিত ব্যাধির স্থায়িত্বকালেরও একটা ভূমিকা আছে। যেমন পুরাতন সিফিলিস সংক্রামক নয়। কিন্তু পুরাতন গণোরিয়া ব্যাপ্ত হতে পারে এক দেহ থেকে আরেক দেহে।

চার, সবশেষে অনাক্রম্যতা (ইমিউনিটি) প্রসঙ্গ। পিণ্টা, বিজেল, ইয়স রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের কিছুটা প্রতিরোধশক্তি জন্মে, ফলে সহজেই সিফিলিস রোগাক্রান্ত হয় না। কিছু পূর্বে উল্লেখ করা একই রমণীর নিবিড় সান্নিধ্যে আসা কতিপয় পুরুষের মধ্যে মাত্র একজনের গণোরিয়া হওয়ার মধ্যেও হয়ত অনাক্রম্যতার কোন অজ্ঞাত রহস্য লুকিয়ে আছে।

প্রসঙ্গতঃ বলে রাখা ভাল, একবার রতিবাহিত ব্যাধি কবলিত অতএব ভবিষ্যতে নিরাপদ এবং এজাতীয় ব্যাধি আর কোনদিন স্পর্শ করবে না, এরকম একটা ধারণায় যেন পেয়ে না বসে। মানুষের জীবনে হাম বসন্ত ইত্যাদি ভাইরাস রোগ একবারই হয়, পুনর্বার এই রোগ হয় না—এরকম একটা প্রতিরোধশক্তি রতিবাহিত ব্যাধির ক্ষেত্রে সম্ভব নয়।

জন্মগত

রতিবাহিত ব্যাধি জন্মসূত্রে অর্জিত হতে পারে, এটাই কনজেনিট্যাল এস-টি-ডি। এর জন্যে মাতাই (এবং অপ্রত্যক্ষভাবে পিতা) দায়ী। উদাহরণ মাত্র দুটি: নবজাতকের গণোরিয়া এবং জন্মগত সিফিলিস।

প্রথমে গণোরিয়ার কথা বলি। গণোরিয়া হচ্ছে মূলতঃ স্থানীয় বীজাণু-দূষণ, ফলে রোগাক্রান্ত মাতার স্ত্রীঅঙ্গই হচ্ছে গণোরিয়া বীজাণুসমূহের নিবাসস্থল আর প্রসবকালে এই পথ দিয়েই তো সন্তান ভূমিষ্ঠ হবে, তখন যদি স্ত্রীঅঙ্গের দুষ্ট স্রাব নবজাতকের চক্ষু স্পর্শ করে, চোখ দুটি তার পুঁজে পুঁজে ভরে উঠবেই। গণোরিয়াজাত এই ভয়ঙ্কর প্রদাহেরই পরিণতি জন্মান্ধতা, একারণে প্রসবের পরই শিশুচক্ষে বীজাণুনাশক ঔষধ প্রয়োগ করা হয়।

সিফিলিসে ব্যাপারটা কিন্তু অন্যরকম। এই বীজাণুদূষণ স্থানীয় নয়, রক্তবাহিত হয়ে সমগ্র দেহতন্ত্রে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। গর্ভাবস্থায় মায়ের রক্ত-স্রোতে ভাসমান বীজাণুসমূহ, কখন এক ফাঁকে, সাধারণতঃ গর্ভের আঠার সপ্তাহ পরে, ভ্রূণদেহে প্রবেশ করে, এভাবে গর্ভস্থ শিশু সংক্রমিত। মাতার তরুণ সিফিলিস প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই গর্ভস্থ শিশুতে সংক্রমিত হবে এবং পুরাতন সিফিলিসে সম্ভাবনা আছে এই পর্যন্ত। বীজাণুদূষণের ভয়ঙ্করতা এবং রোগের সক্রিয়তা ভেদে এগর্ভের পরিণতি চতুর্বিধ। গর্ভের ২০ সপ্তাহ পরে গর্ভস্রাব, কিংবা মাতৃজঠরেই অকালে মৃত। কখন প্রসবের কিছু পূর্বে মৃত, একেই বলা হয় ষ্টিলবার্থ। প্রথম কিংবা দ্বিতীয় পর্যায়ের সিফিলিসগ্রস্ত রমণীরা প্রায়ই মৃতবৎসা হয়। কখনবা জীবিত অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে, যার

গায়ে সিফিলিস-লক্ষণাবলীর নামাবলী, কম বা বেশী। অধিকাংশক্ষেত্রেই এরূপ শিশু জন্মে মাতার বীজাণুদূষণের প্রথম কয়েক বৎসরের মধ্যেই।

অনেকেই জানতে চান রতিবাহিত ব্যাধি কি বংশগত (হেরিডিটারী)? এরোগ কি সন্তানসন্ততিতে বর্তায়? পিতার সিফিলিস-গণোরিয়া হেতু পুত্র-কন্যাও কি ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে জন্মাবে?

না, পিতার আছে শুধু এই সুবাদে সন্তানসন্ততিতে প্রবর্তিত হবে না। কারণ, রতিবাহিত ব্যাধির কোনটাই বংশানুক্রমিক নয়। কোনমতেই বংশানুসৃত ব্যাধির (যেমন রক্তঝরা রোগ) পর্যায়ে ফেলা যায় না, এই একমাত্র কারণে, দুষ্ট বংশগতির কারসাজি নেই। দুষ্ট জিন নয়, বীজাণুদূষণই দায়ী। অতএব পিতার দোষে বংশধররা দুষ্ট হবে না। অতএব পিতার সিফিলিস-গণোরিয়া দোষে সন্তানের কিছুই হবে না। অবশ্য মাতা যদি পিতা কর্তৃক সংক্রমিত হয়, স্বতন্ত্র কথা। এক কথায়, নবজাতকের সিফিলিস এবং গণোরিয়া জন্মসূত্রে অর্জিত হতে পারে, কিন্তু কদাচ বংশানুক্রমিক নয়।

কেমন করে জানা যাবে রোগটি সেই এস-টি-ডি-ই ?

পতিতালয়ে পা বাড়ালেই কি খারাপ রোগ হবে? না প্রস্রাবে জ্বালা-যন্ত্রণা কিংবা কিছু ক্ষরিত হলেই তাকে গণোরিয়ার ওয়ারেন্ট রূপে গণ্য করতে হবে? নাকি পুরুষাঙ্গে ঘা মাত্রেই সিফিলিস? শেষের দুটি যদি সত্য হত সকল পুরুষকেই হয়ত এস-টি-ডি লেবেল লাগাতে হবে। আর প্রথমটি যে অনেকক্ষেত্রেই মিথ্যা তার প্রমাণ মিলবে বন্ধুবান্ধবের কাছে (একটি দূষিত সংসর্গে, ৮ পৃষ্ঠা দেখুন)।

প্রস্রাবের দ্বার দিয়ে দুধ রংয়ের ক্ষরণ বেরোতে পারে নিশ্চয়ই। কিন্তু বেরোলেই যে নির্ঘাৎ গণোরিয়া, এ কেমন কথা! বিনা স্মিয়ার পরীক্ষায় কেউ কি হলফ করে বলতে পারে?

গণোরিয়ার জন্যে পুঁজ পড়া চাই, স্রেফ পুঁজ—সাদা দুধের মত ক্ষরণ—বেরুবে সারাদিনমান। শুধু তাই নয়, এর মধ্যে কিলবিল করবে গণোরিয়া বীজাণু, ধরা পড়বে অনুবীক্ষণ যন্ত্রে। আবার মূত্রদ্বার দিয়ে পুঁজ ঝরছে, অথচ গণোরিয়া মহারাজের টিকিটি নেই, তখন কিন্তু গণোরিয়া বলব না, বলব সাধারণ মূত্রনালীপ্রদাহ।

মূত্রদ্বার দিয়ে ক্ষরিত বস্তুর উৎস কখন মূত্রনালীস্থিত লিটার গ্রন্থি ও

কাউপার গ্রন্থি কিংবা প্রস্টেট গ্রন্থি। কখনবা মূত্রস্থলীর ট্রাইকোমোনাস ভ্যাজিন্যালিস। তাছাড়া এই ক্ষরণ অক্সালেট কিংবা ফস্‌ফেট হতে পারে, হতে পারে শুধুই এ্যালবুমেন কিংবা পাস্‌সেল মিশ্রিত এ্যালবুমেন। এটা ধরা পড়বে মূত্রপরীক্ষায়। কাঁচের স্লাইডে ক্ষরণ সংগ্রহ এবং ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করালেই প্রথম তিনটি ধরা পড়বে।

দেখা যাচ্ছে প্রস্রাবে জ্বালা-যন্ত্রণা এবং মূত্রদ্বার দিয়ে ক্ষরণমাত্রই গণোরিয়া নয়। আরও বহুতর কারণ লুকিয়ে থাকতে পারে, যেমন, উত্তেজনাক্ষরণ, প্রস্টেটমেহ, মূত্রনালীমেহ, মূত্রস্থলীপ্রদাহ, সাধারণ মূত্রনালীপ্রদাহ এবং ট্রাইকোমোনাসজাত প্রদাহ।

পুরুষাঙ্গ ফুলে যাওয়া, গোপনাঙ্গে ঘা হওয়ার অর্থ রতিবাহিত ব্যাধি নয়। এসবের কারণ একটি নয়, বহুতর। অপরিচ্ছন্নতা, খোস-পাঁচড়া, চুলকানি থেকে এমনটি হতে পারে। হতে পারে রতিজ ব্যাধির জন্যেও, বিশেষ করে দূষিত সংসর্গে। অতএব গোপনাঙ্গে ঘামাত্রই সিফিলিস নয়।

অনুরূপভাবে যোনিস্রাব মাত্রই রতিবাহিত ব্যাধি বোঝায় না। সুতরাং শ্বেতপ্রদরযুক্তা নারীমাত্রই রোগবাহী নয়। আর ভূভারতে কটাই বা নারী আছে যার সাদা স্রাব নেই। তাই বলি, শ্বেতপ্রদরযুক্তা নারীবর্জনের অভিলাষ কি কভু পূরিত হবে? তাছাড়া শ্বেতপ্রদর নামক রোগলক্ষণটি বহুবিধ কারণে উদ্ভূত। শুধু চুলকানি ইত্যাদি উপসর্গযুক্ত সাদা স্রাবের ক্ষেত্রেই ট্রাইকো-মোনিয়াসিস কিংবা মনিলিয়াসিস-ই বহুদৃষ্ট। শেষোক্ত কারণে সাদা স্রাব আছে এমন নারীসংসর্গে এদুটি রোগ পুরুষেও সংক্রমিত হতে পারে।

গোপনাঙ্গে একটা কিছু—যেমন ফুলে যাওয়া, ঘা হওয়া, কিংবা কিছু ক্ষরিত —হলে প্রায় সকলেরই দেখি গণোরিয়া-সিফিলিসের কথা মনে পড়ে সর্বাগ্রেই। ব্যাপারটা সত্যই আশ্চর্যের। এ যেন পাপী মনের তাপিত প্রকাশ। কিন্তু এদ্বিধা কেন, যদি স্ত্রীই পুরুষের জীবনে একমাত্র নারী হয়। হয়ত নয় বলেই এপ্রশ্ন জাগে।

মানুষের আর পাঁচটা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মত গোপনাঙ্গও তো একটি অঙ্গ। অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মত এখানেও ফুস্কুড়ি হতে পারে, কেটে গিয়ে ঘা হতে পারে। খোসপাঁচড়া, চুলকানি ইত্যাদি চর্মরোগও হতে পারে, এ থেকে পুরুষাঙ্গ ফুলেও যায়। তাই যদি হয় সব ব্যাটাকে ছেড়ে দিয়ে সেই বেঁড়ে-শেয়ালকে অর্থাৎ সেই এস-টি-ডি-কেই ধরা কেন? যদি কায়মনোবাক্যে একটি নারীর প্রতি আনুগত্য দেখান, এসন্দেহ মিথ্যা প্রমাণিত হবে।

পোড়া গরু কিছু লাল দেখলেই আতঙ্কিত, এটা তো আর অসত্য নয়! এমনটি যদি আপনার জীবনেও ঘটে থাকে, একটু সচেতন হতে হবে বৈকি! সংসর্গের ইতিহাস আছে তখন চোখ দুটো বাঁধা রেখে দিতে হবে গোপনাঙ্গে, রতিবাহিত ব্যাধির লক্ষণাবলীর (যেমন মূত্রদ্বার দিয়ে পুঁজ পড়া, পুরুষাঙ্গে ঘা) জন্যে। সাধারণতঃ তিন মাস পর্যন্ত লক্ষ্য করাই সঙ্গত। তবুও মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে, এক মাস অপেক্ষা করার পরও যদি দেখা যায় লক্ষণাবলী শুরু থেকেই অপ্রকাশিত, রতিবাহিত ব্যাধি দূর অস্ত।

এবারে ফিরে আসি মূল প্রশ্নে, কেমন করে জানা যাবে এটা সেই রোগ? রোগনির্ণয়ের জন্যে তিনটি জিনিসের যোগাযোগ অপরিহার্য। এক, সংসর্গ। বিনা সংসর্গে রতিবাহিত ব্যাধি বড় একটা হয় না। দুই, রতিবাহিত ব্যাধির সুনির্দিষ্ট লক্ষণাবলীর উপস্থিতি। তিন, ল্যাবরেটরি পরীক্ষায় অবশ্যই প্রমাণিত হবে।

কাজে কাজেই যখনই সন্দেহ হবে এই ফর্দের সঙ্গে মিলিয়ে নেবেন, অবশ্যই ডাক্তারের সহায়তায়। মিলিয়ে নিতে গিয়ে যদি দেখেন এতিনটির প্রত্যেকটিই নেগেটিভ, বুঝবেন অন্য কোন রোগ, খুব সম্ভবতঃ কোন চর্মরোগ, হয়ত গোপনাঙ্গে বাসা বেঁধেছে।

সম্পুর্ণ আরোগ্যলাভ কি সম্ভব?

প্রায় প্রশ্ন করতে শুনি, গণোরিয়া-সিফিলিস কি সম্পূর্ণরূপে সারে? কেমন করে জানা যাবে আমি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করেছি? আমার একটি ভুলের জন্যে স্ত্রীপুত্র কেন কষ্টভোগ করবে?

একবার রতিবাহিত ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার অর্থই নয় সারাজীবন জের টানতে হবে। এটা আরোগ্যসাধ্য। এই উদ্দেশ্যে সৎ ও অভিজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করুন, তিনিই রোগনির্ণয়ে সহায়তাহস্ত প্রসারিত করে দেবেন, সেই সঙ্গে সুচিকিৎসার বন্দোবস্তও। আমার মতে সোজা কোন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের শরণ নেবেন, এতে আখেরে লাভই হয়, লোকসান নেই কোন। কেননা কয়েকটি ফি-র বিনিময়ে যথাযথ পথের নিশানা পাবেন এবং সেইমত চললে, ইংরেজীতে যাকে বলে র‍্যাডিক্যাল কিওর সেই পূর্ণ আরোগ্যলাভ নিশ্চিত।

সম্পূর্ণ আরোগ্যতার মাপকাঠি তিনটি এবং নিম্নোক্ত অবস্থা তিনটির পর্যালোচনাই বলে দেবে আপনার রোগমুক্তি কতটা সত্য।

এক, কোন রোগলক্ষণ নেই এবং আজীবন নিরাময় থাকবে।

দুই, সংক্রামক অবস্থা লোপ পাবে এবং এহেন স্থিতাবস্থা বজায় থাকবে পরবর্তী জীবনেও।

তিন, সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভের প্রতিশ্রুতি দিতে পারে শুধু মাত্র পুনঃপুনঃ পরীক্ষা। এরই নাম ফলো আপ এবং এটাই নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত একনাগাড়ে নেগেটিভ থাকবে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ দুটি অতিপরিচিত ব্যাধির উল্লেখ করব। গণোরিয়া দিয়েই শুরু করা যাক। বর্তমানে কয়েক দিনের মধ্যেই সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ সম্ভব। তারপর তিন মাস ফলো আপ এবং প্রত্যেক মাসে নির্দিষ্ট পরীক্ষাসমূহ করণীয়। এসকল নেগেটিভ হওয়ার অর্থ রোগসংক্রমণের কোন আশঙ্কা না রেখেই রোগী বিবাহিত হতে পারে।

এতুলনায় সিফিলিস অনেক বেশী গুরুতর এবং আরোগ্যলাভের ছাড়পত্র পাওয়াটা একটু জটিল এবং দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ। সক্রিয়ভাবে দশ দিন থেকে তিন সপ্তাহ চিকিৎসার পর দু বছর ফলো আপ। রক্তপরীক্ষা এবং মেরুজরস-পরীক্ষা একনাগাড়ে নেগেটিভ থাকলেই রোগী সম্পূর্ণরূপে বীজাণুমুক্ত অতএব নীরোগ। তখন আর বিবাহিত হতে বাধা কোথায়!

প্রতিষেধক ব্যবস্থা

রতিকালীন সতর্কতা

রতিবাহিত ব্যাধি প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে একদা 'প্রফিল্যাক্টিক কিট', বিপত্তারিণী বটুয়ার চলন ছিল খুব, এতে থাকত কনডম্, সাবান, সিলভার নাইট্রেট দ্রবণ (কখন পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট দ্রবণ), ক্যালোমেল অয়েণ্টমেণ্ট। বর্তমানে পদ্ধতিটি বিশেষ করে রাসায়নিক উপকরণগুলি বহুলাংশে পরিত্যক্ত।

একদা জনপ্রিয় স্থানীয় রাসায়নিক প্রতিষেধক ব্যবস্থা বলতে বুঝি: বীর্যপাতের অব্যবহিত পরেই সজোরে মূত্রত্যাগ এবং সাবানজল দিয়ে গোপনাঙ্গ, জঘনদেশ (পিউবিক অঞ্চল), অণ্ডকোষ, পেরিনিয়ম (মূলাধার), উরুর ঊর্ধ্বভাগ পরিষ্কৃত। পুরুষের সম্মুখমূত্রনালীতে ৩০ মিলি লিটার পরিমাণ ১০% সিলভার নাইট্রেট দ্রবণ প্রয়োগ এবং পাঁচ মিনিট কাল ধরে রাখা। সবশেষে ৩০% ক্যালোমেল অয়েণ্টমেণ্ট প্রক্ষালিত অঙ্গসমূহে প্রয়োগ। কিংবা

এসবের পরিবর্তে শুধু পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট দ্রবণ দিয়ে পূর্বোক্ত অঞ্চল-সমূহের ধৌতকরণ।

সজোরে মূত্রত্যাগ এবং সাবানজল কিংবা পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট দিয়ে পরিষ্কার, এসবে রোগপ্রতিরোধী কোন গ্যারান্টি নেই। তাছাড়া, পারদঘটিত মলম কিংবা সিলভার নাইট্রেট দ্রবণের কার্যকারিতায় গুরুতর সন্দেহ আছে। স্থানীয় বীজাণুনাশকতা যদিবা কার্যকরী হয় ফলাফলটা হবে আপাতসুন্দর। অর্থাৎ লক্ষণাবলী অদৃশ্য হলেও রোগটি ভেতরে ভেতরে থেকে যাবে। আর কে না জানে, রোগটি চিকিৎসিত না হয়ে গুপ্ত থাকার পরিণাম কী ভয়ঙ্কর! অধিকন্তু, প্রায়শঃ অব্যবহৃত থেকে যায়। কারণ, প্রয়োগ করার ঝামেলা বিস্তর, কোথায় রতিশেষে একটু প্রশান্তি উপভোগ, তা নয়, চার দফা কর্মসূচীর ঝামেলা। এতশত ঝঞ্ঝাট মেনে নিতে কজনাই বা রাজী হবে? দ্বিতীয়তঃ, প্রয়োজনের সময় এসবের নাগাল মেলে না, আর যদি বা হাতের কাছে থাকে এসব এতই অবাস্তব, এতই আনপ্র্যাকটিক্যাল যে রতিক্লান্ত ব্যক্তির অনীহাই প্রবল হয়ে ওঠে। একে গ্রহণযোগ্যতা মাত্রাতিরিক্তভাবে কম, তায় কার্যকারিতা শূন্যের কোঠায়, আজ আর তাই এপন্থার নাম করে না কেউ। আমরাও না।

আবরণীমূলক পদ্ধতিটি—অর্থাৎ কনডম্—কিন্তু মন্দের ভাল। কনডম্ হচ্ছে পুরুষাঙ্গের বর্মবিশেষ এবং সত্যি কথা বলতে কি এস-টি-ডি নামক অস্ত্রাঘাত নিবারণের উদ্দেশ্যেই প্রথম প্রবর্তিত। পুরুষের ক্ষেত্রে রোগ-সংক্রমণের আশঙ্কা (বিশেষ করে গণোরিয়ার) যৎপরোনাস্তি তিরোহিত হয় নিয়মিত কনডম্ ব্যবহারে এবং অঙ্গসংযোগের পূর্বেই। নারীর জন্যে এজাতীয় অঙ্গাবরণ হচ্ছে যোনিবর্ম (ভ্যাজিন্যাল শীথ) যার প্রতিরোধক ক্ষমতা তুলনা-রহিত তবুও কিনা অপ্রচলিত, কারণ এবর্ম আদৌ রতিগ্রাহ্য নয়, কি পুরুষ কি নারী কারুরই মন ভরে না। আর আছে ডায়াফ্রাম্, সার্ভাইক্যাল ক্যাপ, এসব দিয়ে শুধু মাত্র জরায়ুগ্রীবা রক্ষা করা যায়।

কনডম্ (কিংবা ডায়াফ্রাম্-সার্ভাইক্যাল ক্যাপ্) সহজলভ্য তথাপি এস-টি-ডি ক্রমবর্ধমান। কেননা জেনে শুনেও, কিংবা হাতের কাছে থাকলেও, কনডম্ ব্যবহৃত হয় না অনেক ক্ষেত্রেই। যেমন ধরুন, হঠাৎ মিলনে কনডম্ কোথায়? গোপন অভিসারে কনডম্ প্রায়শঃ বিস্মৃত। সংসর্গিতা নারীতে প্রবল আস্থা অর্থাৎ ঐ নারী রোগমুক্তা এই মিথ্যা আশ্বাসে কনডম্ সরিয়ে রাখে অধিকতর প্রতিভাস্বাদনের লোভে। কনডম্ অব্যবহারের কারণটি

নিহিত কখন অবহেলা ও অসতর্কমনস্কতায়, কথনবা আত্মসংযম হ্রাসের ফলাফল, যেমন মদ্যপান, অতিউত্তেজনা। তাছাড়া প্রতিটি সম্ভাব্য রোগ-সংক্রমণের বর্ম তো নয় এই আবরণী? লিঙ্গমূল, জঘনদেশ, উরুর উর্ধ্বভাগ, আঙুল, মুখাবয়ব কি দিয়ে ঢাকবেন?

ঔষধাদি সহযোগে রোগনিবারণের প্রচেষ্টা সাম্প্রতিককালের। এই উদ্দেশ্যে কোন এ্যান্টিবায়টিক, সচরাচর পেনিসিলিনই ব্যবহৃত, অতিউচ্চ মাত্রায় পেনিসিলিন ইঞ্জেকশন, ক্বচিৎ কখন পেনিসিলিন বড়ি। সংসর্গের পরই কিংবা সংসর্গের পূর্বে।

সঙ্গকামী কিংবা সংসর্গিত পুরুষে (এবং নারীতে) এজাতীয় এ্যান্টিবায়টিক প্রয়োগ কোন কোন রোগ প্রতিরোধে সমর্থ, এটা সত্য। কিন্তু অসুবিধা আছে অনেক, এও সমান সত্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে, সিফিলিস লুক্কায়িত থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা সমধিক। কতিপয় বর্ষ অতিক্রান্ত হলে রোগটি যখন প্রকাশিত হবে তখন হয়ত অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে। দ্বিতীয়তঃ, আশার ছলনায় বিভ্রান্ত হন অনেকেই। অর্থব্যয় আর সূচীপ্রয়োগের যান্ত্রণা, এসবই অকারণ কেননা প্রায়ই দেখি এপ্রতিশ্রুতি মিথ্যা প্রমাণিত। প্রতিটি রতিবাহিত ব্যাধিতে পেনিসিলিন কার্যকরী নয় যে!

নিবারণমূলক ব্যবস্থা হিসেবে আগেভাগেই এ্যান্টিবায়টিকের শরণ বিপজ্জনক, মারাত্মক। এজাতীয় চিকিৎসা সর্বত্রই নিন্দিত এবং ডাঃ এ. কিং, আর. এস. মর্টন প্রমুখ কোন বিশেষজ্ঞেরই অনুমোদন পায়নি; অতএব সর্বথা পরিত্যাজ্য। শুধু মাত্র একটি ক্ষেত্রে এনিয়ম শিথিল করা যেতে পারে, গর্ভাবস্থায় শেষের দিকে সিফিলিসের তিলমাত্র আশঙ্কায় পেনিসিলিন বিধীয়তে।

এযাবৎ আলোচিত তথ্য থেকে এটা স্পষ্টতঃই প্রতীত যে, সবচেয়ে সোজা ও সবচেয়ে ভাল প্রতিষেধক, যা প্রত্যেক পুরুষেরই রুটিনমাফিক প্রয়োগ করা উচিত সেটা হল কন্‌ডম্। এবং কন্‌ডম্ যদি ফেটে যায়, খসে যায় সাবানজল দিয়ে প্রক্ষালন এবং সজোরে মূত্রত্যাগ। নারীর জন্যে রইল বীজাণুনাশক জলের ডুশ এবং সাবানজল দিয়ে বহির্যোনি ধৌতকরণ। ডায়াফ্রাম কিংবা সার্ভাইক্যাল ক্যাপ্ প্রয়োগে শুধু মাত্র জরায়ুগ্রীবা সুরক্ষিত করা যায়।

প্রশ্ন উঠতে পারে, বিনা প্রতিরোধক ব্যবস্থায় রতিব্যাপার ঘটে গেছে, তখন? তখন বলব, যা হওয়ার তা তো ঘটেই গেছে, তাকে তো আর ফেরান যাবে না। অতএব শান্তচিত্তে অপেক্ষা করুন ত্রিশটি দিন। এই সময়ে সতর্ক দৃষ্টিপাত করুন নিজদেহে, বিশেষ করে নিম্নাঙ্গে। কোন উপসর্গ,

কোন লক্ষণ বিকশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পরীক্ষা করান। কিন্তু কোনমতেই এ্যান্টিবায়টিক নয়। প্রসঙ্গতঃ বলে রাখা ভাল, এইমাত্র উল্লেখ করা সতর্কতা পূর্বোক্ত ক্ষেত্রেও অর্থাৎ কিছু ব্যবহৃত হলেও প্রযোজ্য। রতিকালীন প্রতিষেধক ব্যবস্থা থাক চাই নাই থাক, সেই সতর্কতা, অপেক্ষা আর নিরীক্ষণ যার মূল মন্ত্র, যেন অতন্দ্র প্রহরীর মত সজাগ থাকে।

আপতিক বীজাণুদূষণে সতর্কতা

রতিজ ব্যাধি কবলিত ব্যক্তিদের দুটি ব্যাপারে সতর্ক থাকা বাঞ্ছনীয়। প্রথমেই সচেতন হতে হবে আপতিক বীজাণুদূষণ প্রতিরোধের জন্যে। এবং রোগবিস্তারে নিজের যেন সক্রিয় কোন ভূমিকা না থাকে। এসবই সম্ভব কয়েকটি নিষেধ আর কয়েকটি বিধি পালনে।

নিষিদ্ধতার উল্লেখ করতে গিয়ে প্রথমেই বলব, ডাক্তারের অনুমতি বিনা বিবাহ নৈব নৈব চ। চিকিৎসা চলাকালে এবং 'ফলো আপ'-এর সময়ও (কখন পূর্ণকাল, কখনবা খণ্ডকাল) কোন সহবাস নয়, সুরাপানও না।

এবারে বিধি প্রসঙ্গ। সাধারণ স্বাস্থ্যবিধির নিয়মকানুন অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলা উচিত। যেমন, ক্ষতস্থানের পুঁজরক্ত সাবধানে নর্দমায় ফেলে দিতে হবে। পরিধেয় অন্তর্বাস (আণ্ডারওয়্যার, জাঙ্গিয়া, শেমিজ, ব্রীফ ইত্যাদি) এবং তোয়ালে-গামছা স্বতন্ত্র করে রাখাই ভাল। কাপ-ডিস, গ্লাস, থালাবাসন, চিরুনী, বিছানা ভিন্ন করে না রাখলেও ক্ষতি নেই, যদি না ঠোঁট বা মুখাভ্যন্তরে কোন ক্ষত কিংবা দেহের সর্বত্র চর্মরোগ ব্যাপ্ত থাকে (অবশ্যই সিফিলসের দ্বিতীয় দশাভুক্ত হওয়া চাই)। চক্ষুদূষণের ভয়ঙ্করতা সম্বন্ধে সজাগ হোন, এই উদ্দেশ্যে নিজ গোপনাঙ্গ স্পর্শ করলেই হাত দুটি সাবান দিয়ে পরিষ্কার করাই ভাল। আরও ভাল হয়, কথায় বলে সাবধানের মার নেই, যদি কয়েক-দিনের জন্যে বালক-বালিকার সঙ্গে একত্র শয়ন কিংবা সান্নিধ্য বন্ধ রাখেন।

অনুরূপভাবে সতর্কতার পাঠ নেবে সুস্থ ব্যক্তিও। অন্য গোপনাঙ্গের সান্নিধ্যে এলেই হাত ধুতে হবে। অপর ব্যক্তির সঙ্গে শয়ন নয়। অপরের মুখে দেওয়া জিনিস (থালাবাসন, কাপডিস, গ্লাস) কিংবা ব্যক্তিগত দ্রব্যসমূহ (রুমাল, টুথব্রাশ, স্পঞ্জ, ডুশ, তোয়ালে, গামছা) কদাচ ব্যবহার করবেন না। লক্ষ্য রাখবেন, টয়লেট সিট কিংবা টয়লেট কমোড যেন আপনার গোপনাঙ্গ স্পর্শ না করে।

গর্ভকালীন সতর্কতা

জন্মগত সিফিলিস এবং নবজাতকের গণোরিয়া সম্পূর্ণরূপে নিবার্য ব্যাধি। গর্ভবতী হলেই প্রত্যেক রমণীর রুটিন রক্তপরীক্ষা করা হয় সিফিলিসের জন্যে, এহেতু এজাতীয় ভয়াল ব্যাধি বর্তমানে অতিশয় অল্পদৃষ্ট। অধিকন্তু, একদা সিফিলিসগ্রস্ত রমণী গর্ভবতী হলেই (এবং যতবারই গর্ভবতী হবেন) এক কোর্স পেনিসিলিন ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়। এবং সিফিলিস রোগাক্রান্ত স্বামীর দু বছর 'ফলো আপ'-এর সময় স্ত্রী গর্ভবতী হলে এই একই সতর্কতা।

প্রসবের পর নবজাতকের চোখ দুটিতে ঔষধ প্রয়োগ করাই নিয়ম, ফলে নবজাতকের গণোরিয়া সম্পূর্ণরূপে প্রতিহত করা সম্ভব হয়েছে।

প্রাক্‌বিবাহ সতর্কতা

প্রাক্‌বিবাহ সতর্কতার দুটি তরঙ্গ। এক, সেক্স এডুকেশন অর্থাৎ যৌন শিক্ষা। যৌন শিক্ষার সিলেবাস যে ধাঁচেই রচিত হোক না কেন, যে দেশেরই হোক না কেন, একটি অবশ্যপাঠ্য তালিকা: রতিবাহিত ব্যাধি। প্রতি (টিন-এজার্স) নওলকিশোর এবং প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্কদের তো বটেই, এবিষয়ে কিছু জ্ঞান থাকা উচিত। যেমন:

অবাধ যৌন সম্পর্ক সব সময়েই রতিবাহিত ব্যাধির আশঙ্কা বিজড়িত। এব্যাধি ভয়ঙ্করভাবে সংক্রামক এবং সংসর্গেরই ফলাফল। এবং এব্যাপারে কাউকে বিশ্বাস করতে নেই, নরনারীমাত্রই ব্যাধিগ্রস্ত হতে পারে। জানতে হবে, রতিবাহিত ব্যাধির প্রধান উপসর্গ কী এবং পরিণামে কী ভয়ঙ্কর হতে পারে। লক্ষণ দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ বাঞ্ছনীয়। মনে রাখবেন, ত্বরিত-চিকিৎসার মূল্য অনেক এবং একবার ব্যাধিকবলিত হলে সারাজীবনের মত অনাক্রম্যতা মেলে না।

প্রাক্‌বিবাহ প্রস্তুতি আরেকটি তরঙ্গ। প্রাক্‌বিবাহ প্রস্তুতির অঙ্গ হিসেবে রতিবাহিত ব্যাধির পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত প্রায় প্রতিটি সভ্য দেশেই। যেমন, আমেরিকার অধিকাংশ রাষ্ট্রে বিবাহেচ্ছু নরনারীকে সিফিলিসের জন্যে রক্তপরীক্ষা করাতে হয় এবং কতিপয় রাষ্ট্রে প্রয়োজনীয় গণোরিয়ার জন্যে পরীক্ষা। ফ্রান্সে 'ম্যারেজ লাইসেন্স' বিনা বিবাহ বৈধ নয়, এই উদ্দেশ্যে প্রতিটি বিবাহার্থীকে রতিবাহিত ব্যাধির ছাড়পত্র অবশ্যই দাখিল করতে হবে। হল্যাণ্ডে, অষ্ট্রিয়া, জার্মানী, বেলজিয়মে এরকম প্রস্তুতির রেওয়াজ আছে।

আমাদের দেশে এতটা হয়ত সম্ভব নয়। কিন্তু যে হারে অবাধ মেলামেশা

ক্রমবর্ধমান, কিছু সতর্কতার প্রয়োজন আছে বৈকি! বিশেষ করে দুটি ক্ষেত্রে। এক, রতিআস্বাদিত নরনারীর ক্ষেত্রে। আমরা জানি, স্বেচ্ছাচারিতার অতএব কি বহুমুখী পুরুষের, কি ব্যভিচারী নারীর প্রধান বিপদ রতিবাহিত ব্যাধি। এও জানি, নিষিদ্ধ রতিআস্বাদনের এই একই পরিণাম, সুতরাং বারেকের তরেও রতিআস্বাদিত পুরুষেরও, এবং নারীরও। কাজে কাজেই এঁদের উচিত নয় কি নিজেদেরকে পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া, বিশেষ করে গণোরিয়া এবং সিফিলিসের জন্যে। সংসর্গমাত্রেই যখন এবংবিধ রোগ-সংক্রমণের আশঙ্কা, তখন পরীক্ষায় দোষটা কোথায়! নিশ্চিন্ত হয়ে বিবাহিত হওয়াই তো সঙ্গত।

দুই, পুনর্বিবাহের ক্ষেত্রে এবংবিধ সচেতনতা অবশ্য প্রয়োজনীয়। পুরুষের দ্বিতীয় বিবাহ, বিধবা বিবাহ এবং বিবাহবিচ্ছিন্নদের বিবাহ—এরূপ পুনর্বিবাহে রতিবাহিত ব্যাধি সংক্রমিত হতে দেখেছি, স্বামী থেকে স্ত্রীতে, এমনকি স্ত্রী থেকে স্বামীতেও। তাই না সতর্ক করে দিচ্ছি আপনাদের।

কয়েকটি জিজ্ঞাসা

কি করে জানা যাবে ঐ নারী (কিংবা পুরুষ) রোগগ্রস্ত? মানুষ দেখে কি চেনা যায়? না, যায় না। জানার কোন উপায় নেই সম্মুখস্থ ঐ হাসিখুশি নারীটি গণোরিয়া রোগগ্রস্ত কিংবা ট্রামের একই আসনে বসা বিষণ্ণ পুরুষটি সিফিলিসের চিকিৎসাধীন। রতিবাহিত ব্যাধিসমূহের বাসা গোপনাঙ্গে এবং প্রকৃতিও গোপন, স্বভাবতঃই প্রতিফলিত হবে না রোগাক্রান্ত ব্যক্তির আচরণে কিংবা মুখাবয়বে।

আরেকটি জিজ্ঞাসা, কেমন করে, কি ভাবে, কি দেখে বেছে নেব রোগরহিত নারীকে? শ্বেতপ্রদরযুক্তা নারী কি ব্যাধিগ্রস্তা? এঁদের ধারণায় এমন কোন লক্ষণ আছে যা দেখেই বুঝতে পারা যাবে নারী রোগাক্রান্তা। না, তেমন কিছু নেই। বিনা ল্যাবরেটরি পরীক্ষায় ডাক্তারের পক্ষেও যেটা করায়ত্ত নয়, সেটা কি সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব? এক কথায়, অসম্ভব। এমনকি শ্বেতপ্রদরেও স্থিরনিশ্চয়তা নেই। এমনটি যদি হত যোনিস্রাব দেখলেই এস-টি-ডি উচ্চারণ করতে হবে, তাহলে তো নিজ স্ত্রীকেই বনবাসে পাঠাতে হয়!

শেষের জিজ্ঞাসাটি এ্যাকাডেমিক। লিঙ্গত্বক্‌ছেদন কি প্রতিষেধক?

অগ্রচ্ছদা আবৃত অঞ্চল উষ্ণ ও আর্দ্র, এই হেতু রতিবাহিত ব্যাধির

বীজাণুসমূহের অনুকূল পরিবেশ রচনায় সিদ্ধহস্ত। একারণে অগ্রচ্ছদাযুক্ত পুরুষের নাকি সহজেই গণোরিয়া সিফিলিস হয়। আর হয় জননাঙ্গে আঁচিল ও হার্পিস। পক্ষান্তরে অগ্রচ্ছদাবর্জিত পুরুষদের লিঙ্গাগ্র অনাবৃত থেকে থেকে লিঙ্গাগ্রচর্ম রুক্ষ, কর্কশ, মোটা হয়ে ওঠে এবং বীজাণুদূষণে প্রচণ্ড বাধা দেয়। ফলে অগ্রচ্ছদাযুক্ত পুরুষদের তুলনায় অগ্রচ্ছদাবিহীন পুরুষ রতিজ ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হয় অনেক অনেক কম। এমনকি এও বলতে শোনা গেছে ত্বকচ্ছেদনকারীদের মধ্যে সিফিলিস অজ্ঞাত বলাই ভাল। কিন্তু এসব বক্তব্যের সমর্থনে সুদৃঢ় তথ্য প্রমাণাদির অভাব বড় বেশী। তাছাড়া বাস্তবে দেখব, ত্বকচ্ছেদনকারীরা অনাক্রম্য নয়, রতিবাহিত ব্যাধি এদেরও হয়। একমাত্র যুক্তি এই যে, ত্বকচ্ছেদন করানোর অর্থ এস-টি-ডি রোগে বর্ম পরানো নয়। আর এটাই যদি সত্য হত, শিশ্নপরায়ণ পুরুষমাত্রই এই অপারেশনের আশ্রয় নিত সর্বাগ্রেই।

অতিসতর্কতা

কথায় বলে, সিঁদুরে মেঘ দেখে পোড়া গরু ডরায়। কথাটা মিথ্যে নয়। এস-টি-ডি ভাবনাই বড় সাক্ষী। দেখা গেছে, ভি-ডি ক্লিনিকে আগত ব্যক্তিদের মধ্যে শতকরা কুড়িজনের চিকিৎসা নিষ্প্রয়োজন। অর্থাৎ ক্লিনিক আগমনের একমাত্র হেতু ভি-ডি ভাবনাই।

একটা সংসর্গ ঘটে গেছে, তারপর থেকে সদাই উৎকণ্ঠিত, ঐ বুঝি আসে। তারপর গোপনাঙ্গে একটা কিছু হলেই হল, সবই কিনা রতিবাহিত ব্যাধি রূপে প্রতিভাত হবে। তখন পুরুষাঙ্গের যে কোন ঘা, যে কোন স্ফীতি, যে কোন চর্মরোগ, এমনকি সামান্য খোসপাঁচড়া দাদ চুলকানিও কাঁপন ধরিয়ে দেবে। তখন নির্দোষ জনন-পীড়কা এবং সাধারণ আঁচিলও সঙ্গদোষে এস-টি-ডি-তে রূপান্তরিত। এসবই দেখেছি স্বয়ং।

কিংবা কোন সিনেমা দেখেছে, কোন বই পড়েছে এবং সেইমত নিজের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে যায়। আসলে কোথাও একটা মিল পেলেই ভয়ে মরে। বস্তুতঃ 'পাপের পথে' (বাংলা) এবং গুপ্তজ্ঞান (হিন্দী) চিত্র প্রদর্শনকালে ভীতসন্ত্রস্ত অনেক যুবকের দেখা পেয়েছিলাম। একটা সত্য ঘটনা বলি।

"অবিবাহিত যুবক। কেরাণী। বয়স ২৭। আজ প্রায় তিন মাস হল লিঙ্গের গোড়ার দিকে একরকম জ্বালা বা যন্ত্রণা প্রায় রোজই অনুভব করছি।

এটা সাধারণতঃ বেলা ১১।১২টা থেকে আরম্ভ হয়। আর ঐ সময় থেকে ঘন ঘন প্রস্রাব পায়। প্রস্রাব করার সময়ও একটু জ্বালা করে। সন্ধ্যা ৬।৭টার পর আস্তে আস্তে এটা কমে যায়। প্রস্রাব এক ধারায় হয়। লিঙ্গে বা তার চারপাশে কোথাও ঘা নাই। লিঙ্গমুখ দিয়ে কোন পুঁজ বা স্রাব পড়ে না, তবে টেপাটেপি করলে একটা জলের মত কি যেন সাদা ক্ষরণ বেরিয়ে আসে। প্রায় ৪ মাস আগে একটি মেয়ের সান্নিধ্যে আসি, নারীর উত্তপ্ত অঙ্গের তপ্ত সৌরভ শুধু সেদিনই পেয়েছি। অঙ্গসংযোগ বাদ দিয়ে সমস্ত রকমের কাম-ক্রীড়া উপভোগে সেদিন প্রচণ্ড রকমের উত্তেজিত হয়েছিলাম। শেষে এই উত্তেজনার নিবৃত্তি করি পাণিমেহনে। তারপর আর কোনদিন মিলিত হওয়ার সুযোগ পাই নাই। মূত্র পরীক্ষা করাইয়াছি। কোন দোষ নাই। 'ইউরিথ্র্যাল স্মিয়ার' পরীক্ষাতে কিছু নাই। কিন্তু এখন রতিজ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছি কিনা বুঝতে পারছি না। জ্বালা যন্ত্রণা এবং সাদাক্ষরণ হেতু ভি-ডি ভাবনা কিছুতেই যায় না।"

এই মাত্র উল্লেখ করা ইতিহাস যদি সত্য হয়, পূর্বোক্ত যুবকের রতিবাহিত ব্যাধি যে হয়নি, এপ্রতিশ্রুতি দিতে রাজী আছি। সমর্থনে তিনটি যুক্তির উল্লেখ করব। এক, মূত্র পরীক্ষায় ও ইউরিথ্র্যাল স্মিয়ার পরীক্ষায় কোন দোষ পাওয়া যায়নি অর্থাৎ গণোরিয়া হয়নি। দুই, লিঙ্গে বা তার চারপাশে কোন ঘা হয়নি অর্থাৎ সিফিলিস বা স্যাংক্রয়েড কোনটারই মোহর পড়েনি। তিন, সবচেয়ে বড় কথা হল কোনরকমের অঙ্গসংযোগ হয়নি আর বিনা সহবাসে এসব ব্যাধি বড় একটা হয় না।

এর পরও দুটি প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে, লিঙ্গমূলে এবং প্রস্রাবকালে জ্বালা যন্ত্রণা কেন? এবং লিঙ্গপীড়নে যেটা ক্ষরিত হচ্ছে সেটা তবে কী? প্রথমটির হেতু পেলভিক কনজেসশন বা বস্তিপ্রদেশে রক্তসঞ্চয়জাত উপসর্গ*। এর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার প্রকৃষ্ট উপায় রতিসুখস্মৃতি পরিহার এবং উত্তেজনা নিবৃত্তি। দ্বিতীয়টির জন্যে স্বয়ং যুবকই দায়ী, দায়ী তার কার্যকলাপ, তার অজ্ঞতা। গণোরিয়া-ভাবনায় গ্রস্ত হয়ে পুনঃপুনঃ লিঙ্গপীড়নপূর্বক দেখতে চায় কোন কিছু ক্ষরিত হচ্ছে কিনা। এবংবিধ কার্যকলাপে মূত্রনালীস্থিত ঝিল্লী থেকে কিছু কোষরাজি খসে পড়ে, এইসব কোষরাজি স্বভাবজ আর্দ্রতার সঙ্গে মিলেমিশে একপ্রকার ধূসর ক্ষরণ সৃষ্টি করে, এটাই শেষমেষ মূত্রদ্বার দিয়ে নির্গত হয়ে ধন্দ জাগায়। এখন একে যদি গণোরিয়া ক্ষরণ—অজ্ঞতাবশতঃ ঠিক তাই ধরে নেয় অনেকেই—ভেবে বসি, সে দোষটা কার? প্রসঙ্গতঃ বলে

রাখা ভাল, স্বাভাবিক উত্তেজনাক্ষরণেও* এরূপ মতিভ্রম হতে পারে। মতিভ্রম হতে পারে প্রষ্টেট ক্ষরণে*, যা নির্গত হয় কোঁৎ দিয়ে মলত্যাগের সময়।

দেখা গেল, অতিসতর্কতার আরেক নাম অকারণ উৎকণ্ঠা—ভি-ডি ভাবনা। রোগলক্ষণ নেই, আছে শুধু হঠাৎ সংসর্গের ইতিহাস। তারপর শুরু হয় ভাবনা চিন্তা, আকাশছোঁয়া এবং বাঁধ ভাঙা জলস্রোতের মতই দুর্বার। তখন ছুটে যায় ডাক্তারের কাছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এহেন উৎকণ্ঠা, হোক অকারণ তথাপি স্বাভাবিক এবং সহজেই নিবৃত্ত করা যায়। দৈহিক পরীক্ষা, ল্যাবরেটরি পরীক্ষা (বিশেষ করে গণোরিয়া এবং সিফিলিসের) এবং সর্বোপরি আশ্বাসন, এই তিনের পরশ পেলেই রোগী শান্ত থাকে।

কতিপয় ক্ষেত্রে এসব ভয়ভাবনা আরও গভীরভাবে প্রোথিত। উৎকণ্ঠা এখানে প্যানিক-এরই উল্টো পিঠ। ভাবনা তখন আর ভাবনা নয়, ফোবিয়া অর্থাৎ ভি-ডি ভাবনা হয়েছে ভি-ডি ফোবিয়া। শত বুঝিয়ে দিলেও ভি-ডি ভাবনা কাটে না, ডাক্তারের কাছে বারবার ফিরে আসে, সামান্য কিছু অদলবদল হলেই আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরে। সামাজিক যুগযন্ত্রণায় ক্লিষ্ট বলেই হয়ত একই অভিযোগ করে বারংবার। বিশেষ করে সেই সব ক্ষেত্রে যেখানে সঠিকভাবে রোগনির্ণীত হয়নি (বিশেষ করে ল্যাবরেটরি পরীক্ষার সাহায্যে) অথচ এক বা একাধিক কোর্স চিকিৎসা হয়ে গেছে। আমার দেখা এক রোগীর ঘটনা বলি।

"একদিন আমার চেম্বারে বিষণ্ণবদন এক কৃষ্ণদেহী যুবকের আবির্ভাব, পূর্ণ নিরাময়তার জন্যে সকাতর অনুরোধ জানালেন। জিজ্ঞাসায় জানা গেল, অবিবাহিত, কেরাণী, বয়স ২৪। প্রবল কামতাড়নায় বিদ্ধ হয়ে একদা লিপ্ত হয়েছিলেন অবৈধ নারী সংসর্গে এবং সেটাই তার কাল হল। বইপত্তর কিছু পড়েছেন, কিছু কিছু শুনেছেনও, বেশ্যাগমনের বিষময় পরিণাম ভি-ডি। তাই অবসর পেলেই খতিয়ে দেখেন ভি-ডি কি তাকে ছুঁয়ে গেছে। এভাবে একদিন আবিষ্কৃত হল, লিঙ্গাগ্রের শেষভাগের উঁচু মতন জায়গায় (অর্থাৎ লিঙ্গগ্রীবায়) ছোট ছোট দানার মত কতকগুলি ফুস্কুড়ি, আর যায় কোথা, সঙ্গে সঙ্গে ধাবিত হলেন জনৈক এম-বি-বি-এস-এর ডাক্তারখানায়। তিনি এক কোর্স পেনিসিলিন ইঞ্জেকশন দিলেন, আশ্বাস দিলেন সম্পূর্ণ আরোগ্যতার। সেই ফুস্কুড়ি কিন্তু থেকেই গেল, তা দেখে আর এক চিকিৎসকের শরণাপন্ন

*মৎপ্রণীত 'যৌনপ্রসঙ্গে' গ্রন্থে বিশদ আলোচনা ছড়িয়ে আছে

হলেন, এখানেও একাধিক কোর্স ঔষধ প্রয়োগ। এতৎসত্ত্বেও রোগের উপশম হল না বলেই আমার কাছে আগমন।

পরীক্ষা করে দেখা গেল, ঘটনাটি সম্পূর্ণরূপে ভি-ডি ভাবনাই। কারণ যেটা নিয়ে মাথাব্যথা সেটা আসলে জেনিট্যাল প্যাপিলি বা জনন-পীড়কা (সচিত্র আলোচনার জন্যে আমার অন্য বই যৌনপ্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য)। অধিকন্তু, রোগের লক্ষণাবলী সংসর্গের শুরু থেকেই আশ্চর্যজনকভাবে অনুপস্থিত এবং সিফিলিস-গণোরিয়ার পরীক্ষাসমূহ সম্পূর্ণতঃ নেগেটিভ। শুধু ব্যাপারটা আদ্যোপান্ত ব্যাখ্যা করে রোগীকে সেদিন আশ্বস্ত করেছিলাম। প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলাম ভি-ডি তাকে কলুষিত করেনি।

কিন্তু এর পরেও তিন তিনবার এসেছিলেন আমার কাছে, বিয়ের আগে দুবার এবং বিয়ের পরে একবার। বিয়ের কয়েক মাস আগে আনুষঙ্গিক উপসর্গ নিয়ে আলোচনা এবং কয়েক সপ্তাহ আগে ল্যাবরেটরি পরীক্ষা পুনরষ্ঠিত হয়েছিল মানসিক নিশ্চিন্ততার জন্যে।

১৯৭৬-এ বিয়ে করেও নিস্তার নেই। পুরাতন সেই আতঙ্ক নতুন করে দেখা দিল, অগ্রচ্ছদায় ঘর্ষণজাত স্ফীতি এবং লিঙ্গাগ্রে একপ্রকার চর্মপ্রদাহ আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে। এবং পুনরায় ত্রস্তপদে আমার কাছে আগমন। কার্যকারণ ব্যাপারটা ভাল করে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম আর দিয়েছিলাম সামান্য একটা মলম। এতেই সব উপসর্গ বিদায় নিয়েছিল এবং এখন পর্যন্ত শান্ত আছে।"

ভি-ডি ভাবনা কখন মাত্রাতিরিক্ত, অবশ্যই মুষ্টিমেয় কয়েকটি ক্ষেত্রে। উৎকণ্ঠা এখানে মারাত্মক এবং লাগাতর, দিবসরজনী একই ভাবনা। আতঙ্ক শুধু যে অকারণ তা নয়, ব্যাপকতমও বটে। তীব্র লজ্জা, ভয়ঙ্কর অনুশোচনা ও মনস্তাপ, কখনবা প্রবল পাপবোধ কিংবা মারাত্মক বিবেকদংশন সকলের চেয়ে বিষ্মরূপে দেখা দেয়। ব্যাপারটা তখন 'আবেশজ ক্রিয়া'-তে পর্যবসিত, ভি-ডি অবসেসন। এথেকে মনোরোগ, বিশেষ করে বিষাদগ্রস্ততা দেখা দিতে পারে। ডাক্তারের কাছে রোগীর অকপট স্বীকৃতি (কনফেসন) এবং খোলাখুলি আলাপ আলোচনায় মনের ভার লাঘব হয় এবং রোগীও সেরে ওঠে। অন্যথায় মনোচিকিৎসার প্রয়োজন।

উপসংহারে বলি, গোপনাঙ্গ মানুষের কাছে কেবলি গোপন অঙ্গ নয়, পরম সম্পদও বটে। এহেন অঙ্গে তাই কিছু হলেই মানুষ আঁৎকে ওঠে। পক্ষান্তরে এটাই যদি দেহের অন্যত্র দেখা দেয় এতটা আতঙ্কভাব জাগ্রত হয় না। একে

অঙ্গচেতনা তায় অবৈধসংসর্গ বিজড়িত, আর যায় কোথায়, একেবারে সোনায় সোহাগা। রতিজ ব্যাধির ভাবনা তখনই দেখা দেয়।

তবুও বলি, গোপনাঙ্গ দেহের আর পাঁচটা অঙ্গের মতই একটা অঙ্গ। অতএব অন্যান্য অঙ্গের রোগও গোপনাঙ্গে প্রকাশিত হতে পারে। এই একই নিয়মে গোপনাঙ্গে চর্মরোগ—খোসপাঁচড়া, দাদ, চুলকানি, আঁচিল—হতে পারে। কিন্তু মানুষ তখন সব ছেড়ে দিয়ে রতিজ ব্যাধিকেই দোষী করে।

জেনে রাখা ভাল, গোপনাঙ্গে স্ফীতি, ছোট ছোট ফুস্কুড়ি কিংবা কোন ক্ষত অথবা কোন চর্মরোগ মাত্রই রতিজ ব্যাধি নয়। পুনর্বার স্মরণ করিয়ে দিই রতিজ ব্যাধির জন্যে তিনটি ঘটনার সমাবেশ থাকা চাই। প্রথমেই চাই সংসর্গের ইতিহাস। তারপর রতিজ ব্যাধির লক্ষণাবলীর সঙ্গে মিল থাকা আবশ্যক। সবশেষে প্যাথলজি পরীক্ষা দ্বারা অবশ্যই প্রমাণিত হবে। আর এতিনটি নেগেটিভ, বুঝবেন, অন্য কোন রোগ, খুব সম্ভবতঃ কোন চর্মরোগ, হয়ত গোপনাঙ্গে বাসা বেঁধেছে।

সব শেষে বলি, আগে রোগনির্ণয় পিছে ঔষধবিচারী। নইলে পরে বড় মুস্কিলে পড়তে হয়। রোগীর যেমন ভি-ডি ভাবনা কাটে না, ডাক্তারকেও তেমনি কম নাজেহাল হতে হয় না।

বিবাহ, প্রজনন ও এস-টি-ডি

একদা ভি-ডি কবলিত ব্যক্তির বিবাহ করা কি সাজে? বিবাহ কি দুঃস্বপ্ন হয়েই থাকবে? এবং ভবিষ্যৎ বলতে শুধু কি পুরুষত্বহীনতার গ্লানিই অপেক্ষা করছে? পুত্রকন্যার জনকজননী হওয়াটা কি সম্ভব?—এসব প্রশ্ন প্রায়শঃ জিজ্ঞাসিত।

সুদূরপ্রসারী ফলাফলের জন্যে ভি-ডি যথার্থই সমস্যা, বিবাহযোগ্যতার বিচারে। এপ্রসঙ্গ 'প্রাক্‌বিবাহ সতর্কতা' পরিচ্ছেদ (১৭ পৃষ্ঠা) আলোচিত। ভি-ডি নামক হিংস্র জন্তুর থাবা পড়লেই, বিবাহপূর্বে চিকিৎসকের পরামর্শ অবশ্য গ্রহণীয়। তখনই বিবাহ করবে যখন আরোগ্যলাভ পূর্ণ, নিদেনপক্ষে রোগসংক্রমণের ক্ষমতা লুপ্ত না হওয়া পর্যন্ত অবশ্যই অপেক্ষা করবে। এক কথায়, চিকিৎসকের পরামর্শ বিনা কেউ বিবাহিত হবে না।

বিবাহ যদি দুঃস্বপ্ন না হয়, বিবাহিত জীবন কেনই বা আপনাকে ছলনা করবে? সত্যি বলতে, দাম্পত্য জীবনে অসুখী হওয়ার মত কোন

কারণ তো দেখি না। এবং রতিক্ষমতাও অটুট থাকবে অর্থাৎ পুরুষের পুরুষত্ব এবং নারীর কামশক্তি সবই অক্ষত থাকবে। বিবাহিত জীবনের সুখশান্তি একে যেমন ভোগ করবে, অপরকেও তেমনি (স্বামীকে কিংবা স্ত্রীকে) দিতে পারবে। এক কথায় দাম্পত্যজীবনে ক্ষতির ছায়া পড়বে না কোনমতেই। কিন্তু দুটি শর্ত অবশ্যই পূরিত হবে—নীরোগ হয়ে বিবাহ এবং ভি-ডি ভাবনা সর্বতোভাবে পরিহার। অন্যথায় রাহুগ্রস্ত হতে পারে। যেমন : অচিকিৎসিত সিফিলিস।

সিফিলিস বাদ দিলে রতিবাহিত ব্যাধির সঙ্গে পুরুষত্বহীনতার তিলমাত্র সম্পর্ক নেই। প্রথম কিংবা দ্বিতীয় দশায় নয়, শেষের সেই দশায় নিউরোসিফিলিসের আবির্ভাবে পুরুষত্বহীনতা ঘনিয়ে আসবে নিশ্চিত। রতিজ ব্যাধির ভয়ে বারবনিতা কিংবা সহজলভ্যা নারীর কাছে ব্যর্থতা বিচিত্র নয় এবং এই ব্যর্থতার জের টেনে স্ত্রীর কাছেও অক্ষমতা দেখা দিতে পারে। আরেক ধরনের ব্যর্থতার মূলে আছে অহরহ ভি-ডি ভাবনা। অর্থাৎ কিনা শুধু ভি-ডি ভাবনায় (১৯ পৃষ্ঠা) অঙ্গশিথিলতা সম্ভব। এবংবিধ ভয়ভাবনা হেতু নানান সন্দেহ, জিজ্ঞাসা আর দুশ্চিন্তা—এরূপ পটভূমিকায় ইচ্ছামত অঙ্গোত্থান হবে না বলাই বাহুল্য এবং পুরুষত্ব পরীক্ষার আসরে অবতীর্ণ হলেই ব্যর্থতা অনিবার্য। এক রোগীর ঘটনা বলি :

"এরোগ কি কোনদিন সারবে না? আমি কি আর কোনদিন আর দশটা সাধারণ মানুষের মত বিবাহ করে জীবননির্বাহ করতে পারব না। কয়েকদিন থেকে একটা ভীষণ ভয় মনের মধ্যে জেগেছে আমি হয়ত ইম্পোটেণ্ট হয়ে যাব। লিঙ্গ হয়ত আর প্রয়োজনে সুদৃঢ় হবে না, হয়ত এরই দরুন বীর্যে উপযুক্ত পরিমাণে সুস্থ সবল শুক্রকীট থাকবে না, যার পরিণাম সন্তানহীনতা।"

এবারে প্রজনন প্রসঙ্গ। সিফিলিস দিয়েই শুরু করা যাক। সিফিলিস হেতু বন্ধ্যাত্ব সুদুর্লভ। এবং একটি দুটি যদি বা দেখি, অর্জিত সিফিলিস অপেক্ষা জন্মগত সিফিলিসেই দেখব।

তৃতীয় দশাগ্রস্ত প্রদাহজনিত রোগের শিকার হতে পারে পুরুষের অণ্ড, এবং দুর্ভাগ্যক্রমে দুটি অণ্ডই আক্রান্ত, বন্ধ্যাত্ব নিশ্চিত। কিন্তু বাস্তবে, খুবই দুর্লভ।

নারীর ডিম্বাশয় অনাক্রান্ত থাকে বলেই সিফিলিস রোগগ্রস্তা নারীও গর্ভবতী হতে পারে এবং সে সন্তানও বেঁচে থাকে। যাই হোক, সিফিলিস

রোগে প্রজননব্যাপারে কোন বিঘ্ন নেই, যত বাধা বিপত্তি ঐ গর্ভ নমাস পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেতে। এজাতীয় এক শত গর্ভের মধ্যে চব্বিশটির নিয়তি হয় গর্ভস্রাব, না হয় মৃত অবস্থায় প্রসব। ছিয়াশিটি গর্ভের সন্তান শেষ পর্যন্ত জীবিত অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে, এদের মধ্যে ছাপান্নটি অসুস্থ অর্থাৎ জন্মগত সিফিলিস রোগগ্রস্ত এবং বাকী কুড়িটি সুস্থ।

গণোরিয়া হেতু পুরুষের বন্ধ্যাত্ব একদা চোখে পড়ত খুবই, দুপাশের শুক্রা গুনালী কিংবা এপিডিডিমিস-এর নালীপথ রুদ্ধ হলেই এমনটি হবে। বর্তমানে চিকিৎসা বিপ্লবের সুবাদে পুরুষের বন্ধ্যাত্ব দেখি না। কিন্তু নারীর মাতৃত্বশক্তি লোপ পেতে পারে। নারীদেহে এরোগটি প্রায়ই অচিকিৎসিত থেকে যায়, যার ফলে ডিম্বাণুবাহীনালী দুটি রুদ্ধ হয়ে বন্ধ্যাত্ব ডেকে আনতে পারে।

বাদ বাকী আর যে সব রতিবাহিত ব্যাধি আছে তাদের কারুরই কোন ভূমিকা নেই প্রজনন নামক নাটকে। মানব প্রজননে অতএব সিফিলিস কিংবা গণোরিয়া আক্রান্ত পুরুষের সন্তানহীনতার কারণটি এস-টি-ডি নয়, অন্য কিছু।

মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে, রতিবাহিত ব্যাধি কবলিত ব্যক্তির প্রজনন ক্ষমতা নষ্ট হয় না, কাজে কাজেই এব্যাপারে চিন্তা অকারণ। পূর্বেই (১০ পৃষ্ঠায়) দেখেছি এব্যাধি সন্তানসন্ততিতে বর্তায় না, অতএব জনকজননী হতে বাধা কোথায়?

রতিবাহিত ব্যাধি ও সতীত্ব

পুরাতন সংজ্ঞানুসারী ভি-ডি খ্যাত প্রতিটি রোগই কুসঙ্গমজনিত কিংবা উচ্ছৃঙ্খলতার ফলাফল। নতুন সংজ্ঞায় রতিবাহিত ব্যাধি নাম দিয়ে আরও যে সব ব্যাধি সংযোজিত হল তার প্রত্যেকটি কিন্তু অবাধ কামচরিতার্থতার পরিচায়ক নয়। এই ট্রাইকোমোনাস জাত প্রদাহ কিংবা মনিলিয়াসিস-এর কথাই ধরুন না কেন, সিফিলিস-গণোরিয়া উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে যে ষ্টিগমা রোগীকে জড়িয়ে ধরে কিংবা যে নৈতিক অধঃপতনের ছবি স্পষ্ট হয়ে ওঠে সেটা কি এক্ষেত্রেও প্রযোজ্য? গোপনাঙ্গে আঁচিল, উকুন, স্কেবিজ (চুলকানি) দেখলেই কি মানুষটিকে লম্পট কিংবা ব্যভিচারিণী গোত্রভুক্ত করতে হবে? এযেন তিনের উপপাদ্য আর কি! শুধু এই রোগটি আছে, ব্যস্, আর কোন কথা নয়, অসতী হতে বাধ্য। একটি কেস বিবরণী দিই।

॥ আমি এমন এক রমণীর প্রণয়াসক্ত, যার ধারণা সে মা হতে অক্ষম এবং বিবাহিত জীবনের সুখ ও শান্তি স্বামীকে দিতে পারবে না। এব্যাপারে তার কৈফিয়ৎটা এই রকম :

"গত বৎসর এপ্রিল মাসে পরীক্ষা শেষে দিদির সঙ্গে মেদিনীপুরে গিয়েছিলাম। সেখানে তিন দিন থাকার পরই আমার জ্বর হয়। ঐ সময়ে দিদির পরনের শায়াটি পরেছিলাম। অসুস্থ অবস্থায় আমার মাসিক স্রাব হয়, তিন দিনেই শেষ। তার পর দিন জ্বর ছুটে গেল। সুস্থ হয়ে যেদিন ভাত খেলাম সেদিন কোন একটি কাজ করার জন্যে উঠতে যাব এমন সময় খুব স্রাব শুরু হল। আমি খুব ভয় পেয়ে গেলাম। পরে দেখি রক্ত নয়, সাদা স্রাব। সমানে হয়ে চলল, কিছুতেই কমে না, কাউকে কিছু বলি না। বেবি পাউডার ব্যবহার করতে লাগলাম। দুদিন পরে দেখি যন্ত্রণা, ব্যথা, জ্বালা অসহ্য। কাকে বলব? এদিকে সমানে বেড়ে চলেছে। মাকে সংক্ষেপে বললাম। জামাইবাবু ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলেন, তাঁকে সব বললাম। তিনি ওষুধ দিলেন কিন্তু কমে না। ডাক্তারবাবু রোগের নাম বললেন ভেনারাইটিস, যার এই রোগ আছে তার ব্যবহৃত দ্রব্যাদি ব্যবহার করলে এই রোগ হতে পারে।

তারপর আগষ্ট মাসে রেলওয়ে হাসপাতালে গেলাম, ভর্তি হলাম। সেখানে আর এক বিপদ, নার্স টিকিট দেখে বললেন কুমারী মেয়ের এরোগ কেন? দাদার মাথায় বজ্রাঘাত হল, আমিও কাঁদতে লাগলাম। মল মূত্র রক্ত পরীক্ষা হল সবই নির্দোষ, সাতদিন পর ছুটি হয়ে গেল। সবশেষে গেলাম কলকাতায়, এক জেনানা হাসপাতালে আর এক দফা পরীক্ষা হল। এবার প্রতিপন্ন হল আমার TRICHOMONAS VAGINALIS হয়েছে এবং সাতদিনে একুশটি বড়ি খেয়ে এরোগ সেরে গেছে।"

এখন আপনি বলুন আমি কি করবো? প্রণয়িনীর কি মাতৃত্ব শক্তি লোপ পেয়েছে। এবং এরোগ কি অসতীর লক্ষণ? ॥

ট্রাইকোমোনস জাত যোনিপ্রদাহের লক্ষণ স্ত্রীঅঙ্গে জ্বালা যন্ত্রণা, অসহ্য চুলকানি, গন্ধযুক্ত সাদা স্রাব। এসব উপসর্গ এত প্রবলভাবে দেখা দিতে পারে যে দেখে মনে হবে সাতিশয় পীড়িতা : চলতে কষ্ট, যন্ত্রণায় কাতর, ঘুম নেই। এমন রমণী ডাক্তারের কাছে ছুটে যাবে নিশ্চয়ই এবং এরোগ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা না থাকলে রোগিণীর সতীত্ব সম্বন্ধে ভুল করা স্বাভাবিক।

এটা সত্য, অধিকাংশক্ষেত্রেই সহবাসের ফলে এরোগটি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। এও সত্য, প্রায় ৫০%এর মত গণোরিয়া রোগগ্রস্তা রমণী এই একই রোগে ভোগে এবং একারণেই ভি-ডি ক্লিনিকে কোন রমণীদেহে ট্রাইকোমোনাসের অস্তিত্ব পেলেই গণোরিয়া সন্ধানে তৎপর হয়ে ওঠেন ভি-ডি ক্লিনিকের চিকিৎসকগণ। তথাপি এর অর্থ নিশ্চয়ই এই নয় যে শুধু এই রোগের সুবাদে নারী অসতী হতে বাধ্য। কেন তা বলছি।

বিবাহিত দম্পতিদের মধ্যেও, বিশেষ করে গর্ভাবস্থায় এরোগ আত্মপ্রকাশ করে এবং রতিবাহিত হয়েই। এমনকি স্বামী চরিত্রবান, স্ত্রী কায়মনো-বাক্যে সাধ্বী হলেও। অর্থাৎ কিনা শুধু মাত্র রতিবাহিত এইটুকু তথ্য সম্বল করে মানুষকে কলুষিত করা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, রোগসংক্রমণ ব্যাপারটা সবসময়ই পরিষ্কার নয়। এবং অরতিক উপায়েও অর্জিত হতে পারে। প্রকৃষ্ট উদাহরণঃ নিবৃত্তরজস্কা প্রৌঢ়া কিংবা বৃদ্ধা যার মাসিক স্রাব চিরদিনের মত থেমে গেছে, অনার্তবা কুমারী যাকে মাসিক স্রাব এখনও স্পর্শ করেনি, এবং অক্ষতযোনি রতি-অনাস্বাদিত রমণী—এদেরও এধরনের স্রাব হতে পারে। তাছাড়া এমন অনেক ঘটনা স্বচক্ষে দেখার সুযোগ ঘটেছে, যেখানে ট্রাইকোমোনাস ভ্যাজিন্যালিস নামক পরজীবী স্ত্রীঅঙ্গে লুকিয়ে আছে অথচ ঐ রমণীর কোন অসুস্থতা নেই, নেই কোন চারিত্রিক বিবর্ণতা।

এখন এটা জলের মতই স্বচ্ছ যে শুধু এই রোগের ইতিহাস যার আছে সেই রমণীর শিরে অসতীর বোঝা চাপিয়ে দেওয়া যায় না। এই একই যুক্তির জাল ছড়ানো যায় শুরুতেই উল্লিখিত অন্যান্য রতিবাহিত ব্যাধির ক্ষেত্রে—মনিলিয়াসিস, গোপনাঙ্গে আঁচিল, স্কেবিজ, উকুন।

সচরাচর ভি-ডি বলতে আমরা বুঝি 'আদি পাপ'-ই এর মূলে। অর্থাৎ কিনা কিছুকাল পূর্বে অবৈধ সংসর্গ ঘটেছে এবং তারই প্রকাশচিহ্ন ছড়িয়ে পড়েছে গোপনাঙ্গে। তার ফলে হয়েছে কি, ভি-ডি নির্ণয়ের সঙ্গে সঙ্গেই যে ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেটা নিঃসন্দেহে চরিত্রহীনতারই ছবি। সতীত্ব-অসতীত্বের প্রশ্নে জনচিত্ত আলোড়িত হয় বড় বেশী, একারণে এব্যাধির নাম বদল হয়েছে সম্প্রতিকালে। নতুন নাম রতিবাহিত ব্যাধি, অন্যার্থ রতি দ্বারা বাহিত। শুধু এই কথাটুকু মনে রাখলেই মুস্কিল আসান হবে এরকম একটি ভয়ঙ্কর প্রশ্নের।

রতিজ ব্যাধিসমূহের মধ্যে ব্যাপকতম শুধু এই যুক্তিই দ্বিতীয় অধ্যায়ে ঠাঁই করে দিয়েছে গণোরিয়াকে। এরোগ—নর ও নারী উভয়ের ক্ষেত্রেই—মূলতঃ জননমূত্রতন্ত্রের বীজাণুদূষণ (ইনফেকসন)। অর্থাৎ কিনা গণোরিয়া হচ্ছে একপ্রকার বিশেষ বীজাণুদূষণ, যা প্রথমে জননমূত্রতন্ত্রের নিম্নভাগেই সীমিত থাকে, নায়ক 'নাইসেরিয়া গণোরিয়া' নামক বীজাণু। এবীজাণু অনায়াসে অক্ষত শ্লেষ্মঝিল্লী (কলামনার এপিথিলীয়ম বা মিউকাস মেমব্রেন) ভেদ করার শক্তি ধরে, তারপর কয়েক দিনের মধ্যেই গোপনাঙ্গ থেকে পুঁজ ঝরতে থাকে এবং এটাই এরোগের বৈশিষ্ট্য।

এই মাত্র বলেছি, গণোরিয়া সর্বাধিক দুষ্ট। কারণ হিসেবে বলা যায়, রোগটি অতীব সংক্রামক, গুপ্ত অবস্থার মেয়াদও স্বল্পকালীন, সংক্রমণ সম্ভাবনাও সমধিক। এবং সবচেয়ে বড় কথা হল, মেয়েদের গণোরিয়া অনির্ণীত অতএব অচিকিৎসিত থেকে যায় প্রায়ই, যার ফলে রোগবিস্তারে বড় ভূমিকা নেয় এই সব উপসর্গবিহীন বীজাণুবাহিকারাই।

ছড়িয়ে আছে সমগ্র পৃথিবীতে। পৃথিবীব্যাপী বার্ষিক শতকরা হার দ্বিগুণিত: গত পনের বছরে গণোরিয়া রোগগ্রস্তদের সংখ্যা ৬ কোটি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০ কোটিতে দাঁড়িয়েছে। চমক থাকলেও সত্য, উন্নততম দেশগুলিতেই সর্বাধিক সংখ্যায় রোগসংক্রমণের খবর মিলবে। নর ও নারীর আনুপাতিক হার ৬ : ১ থেকে ২ : ১ ; দেশভেদে, চিকিৎসা ও রোগনির্ণয়ের মান ভেদে এই বৈষম্য। তাছাড়া, আক্রান্ত মেয়েদের সংখ্যা কম হবেই, কারণ, অধিকাংশ মহিলাই উপসর্গবিহীন।

সংক্রামক রোগবিদ্যা (এপিডেমিওলজি) বিচারে এটা হচ্ছে আঞ্চলিক রোগবিশেষ (এনডেমিক), অন্যার্থে কোন কোন অঞ্চল গণোরিয়া দ্বারা প্রায়ই অধ্যুষিত এবং এটাই মাঝে মধ্যে মহামারীর (এপিডেমিক) ব্যাপকতা পেতে পারে এবং পেয়েও থাকে। বস্তুতঃ কতিপয় দেশে এটা এপিডেমিক, আমেরিকায় প্যানডেমিক। গণোরিয়া একদা গ্রেটব্রিটেনে ডিফথিরিয়া হাম ইত্যাদি স্পর্শক্রামী রোগসমূহের মধ্যে চতুর্থ স্থানীয় ছিল (১৯৬০)। বর্তমানে হাম রোগের পরই গণোরিয়া, অর্থাৎ দ্বিতীয় স্থানীয়।

শুধু যে বহুদৃষ্ট তা নয়, প্রাচীনতমও। সিফিলিসের চেয়ে দীর্ঘতর ছায়াময় অতীত গণোরিয়ার। ১৪৯৫-এ, ইউরোপীয় বৃহৎ মহামারীরূপে যে সিফিলিসের কথা শুনি তার বহু আগে থেকেই গণোরিয়া রোগটির সঙ্গে পরিচিত। অভ্রান্ত নজির আছে চৈনিক পুঁথিপত্রে আর বাইবেলে (লেভিটিকাস পঞ্চদশ)। কতিপয় ডাক্তার-ঐতিহাসিকের ধারণা, গণোরিয়া রোগে প্রায়শঃ দৃষ্ট অগ্রচ্ছদা-প্রদাহের প্রতিষেধক ব্যবস্থা হিসেবে হিব্রুরা নাকি প্রবর্তিত করেছে লিঙ্গত্বকচ্ছেদনের প্রথা।

গ্রীক ভাষায় গণোরিয়া শব্দটির অর্থ বীর্যপ্রবাহ (ফ্লো অব সীড) এবং প্রথম ব্যবহারের কৃতিত্ব ডাঃ গ্যালেন-এরই, ১৩০-এ। পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসা শাস্ত্রের জনক হিপোক্রেটিস-এর কণ্ঠেও ধ্বনিত এতদস্বরূপ ঘটনাপ্রবাহ। পরবর্তী যুগের রোমক সাহিত্যেও উল্লেখিত।

তারপর মধ্যযুগে দেখা পেলাম সিফিলিসের (১৪৯৫), তখন গণোরিয়া আর সিফিলিস ছিল একই রোগের দুই পিঠ। অর্থাৎ কিনা সিফিলিস রোগেরই একটি প্রকাশচিহ্ন এই গণোরিয়া, ডাঃ জন হাণ্টার-এর ঐতিহাসিক ভুলই এরকম একটা বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করেছিল, যেটা চালু ছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগেও। শেষে সকল সন্দেহের অবসান ঘটে ১৮৭৯-এ, যেদিন এ্যালবার্ট নাইসার নামক জার্মান বৈজ্ঞানিক রোগোৎপাদক বীজাণুটি চিহ্নিত করলেন, আবিষ্কারকের নামেই বীজাণুর নাম 'নাইসেরিয়া গণোরিয়া', সংক্ষেপে 'গণোকক্কাস'। বিজ্ঞানসম্মত এবং কার্যকরী চিকিৎসার সূত্রপাত সালফাজাতীয় ঔষধ প্রবর্তনে (১৯৩০ দশকের শেষ দিকে) এবং ১৯৪৩-এ পেলাম চূড়ান্ত উৎকর্ষ ও নিশ্চিত সাফল্য, পেনিসিলিন আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে।

গণোরিয়া রোগের ভয়ঙ্কর বৈশিষ্ট্য: গোপনাঙ্গ থেকে পুঁজ ক্ষরণ। এক ফোঁটা পুঁজের মধ্যে আছে শতসহস্র গণোকক্কাস এবং এপুঁজ সংক্রামক। যেহেতু গোপনাঙ্গ থেকে ক্ষরিত, যেহেতু কামানুষ্ঠান হচ্ছে সেই সেতু যা দুই ব্যক্তির গোপনাঙ্গে সংযোগ ঘটায়, রোগবিস্তারের প্রকৃষ্ট উপায় অঙ্গসংযোগ। কাজে কাজেই বয়স্ক ব্যক্তিতে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই রোগটি আমদানি হয় দূষিত সংসর্গের ফলেই।

প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই বললাম এই জন্যে যে, কচিৎ কখন গণোরিয়া হতে পারে, মিলনের নামগন্ধ নেই তবুও। এঘটনা নিঃসন্দেহে অল্পসংখ্যক, আপতিক এবং আকস্মিক। প্রধানতঃ শিশুরাই এজাতীয় দুর্ঘটনার বলি হয়ে

থাকে, আপত্তিক বীজাণুদূষণের আশ্রয়স্থল চক্ষু, কখনবা শিশু বালিকা যোনি। এপ্রসঙ্গ বাদ দিলে গণোরিয়া সংক্রমণের মুখ্য উপায় সংসর্গ।

প্রশ্ন উঠতে পারে, আমদানিকারক কে? জবাবে বলব, প্রমেহরোগাক্রান্ত সংক্রামক ব্যক্তি মাত্রই এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মহিলা মারফৎ, এরা উপসর্গ-বিহীন অথচ রোগবাহিকা। কখনবা পুরুষ দায়ী। অচিকিৎসিত কিংবা অসম্পূর্ণ চিকিৎসা হেতু পুরাতন প্রমেহ রোগাক্রান্ত পুরুষ এরোগ ছড়ায়। এবং সেই সমকামী পুরুষও যে রোগবাহক হয়েও উপসর্গবিহীন।

কলামনার এপিথিলীয়ম আছে মুখবিবরে, চক্ষুবর্ত্মকলায় (কনজাংইটাইভা), মূত্রনালীতে, ভগোষ্ঠে, জরায়ুগ্রীবাতে এবং এইসব মিউকাস মেমব্রেন বা শ্লেষ্মময় ঝিল্লী—অক্ষত থাকলেও—আক্রান্ত হতে পারে গণোরিয়া বীজাণু দিয়ে। কাজে কাজেই রোগগ্রস্ত ব্যক্তির এক ফোঁটা পুঁজ যদি এইমাত্র উল্লেখ করা অঙ্গসমূহে সঞ্চারিত হয় বা স্থাপিত করা যায় (ডাইরেক্ট ইনোকিউলেসন) রোগটি দেখা দেবে। কিন্তু অন্যত্র, যেমন হাতের অক্ষত চামড়ায়, পুঁজ অচিরেই শুকিয়ে যাবে এবং তাপমাত্রারও পরিবর্তন ঘটবে, ফলে কিছুই হবে না। এখন আর বুঝতে কষ্ট নেই, কেন মুখবিবর এবং পায়ুদেশ রোগবিস্তারে সহায়তা করে, অবশ্য মুখমেহন আর পায়ুকাম, এই দুই কামের আবেগফলাফল হিসেবে। এও বোঝা গেল, বয়স্ক আক্রান্ত ব্যক্তি নিজের কিংবা শিশুদের চোখ হস্তস্পর্শ দ্বারা সংক্রমিত করতে পারে। সংক্রমিত হতে পারে নব-জাতকের চক্ষু, দূষিত মাতার প্রসবপথ দিয়ে নির্গত হওয়ার সময়।

আরও কয়েকটি উপায়ে রোগবিস্তারের কথা বলা হয়েছে। রোগাক্রান্ত পিতা-মাতা কিংবা পরিচারক-পরিচারিকা মারফৎ। নিজ হস্ত দ্বারা বালিকার গোপনাঙ্গ বিষিয়ে দিতে পারে, মলমূত্রত্যাগকালীন পরিচর্যাকালে, একত্রিত থাকার সময় কিংবা একই শয্যায় শয়নকালে। এসবই দুর্লভ। আরও দুর্লভ রোগাক্রান্ত ব্যক্তির দ্রব্যসামগ্রী (কাপড়-চোপড়, তোয়ালে, বিছানা) মারফৎ।

ঠাণ্ডা লাগা, গরম লাগা, নোংরা তোয়ালে, কমন পায়খানা বা বাথরুম ব্যবহারের কাহিনী মিথ্যা। পাবলিক শৌচাগার, দূষিত কমোড, নোংরা পুকুরে স্নান, অপরিমিত দেহকষ্ট ইত্যাদির কোন ভূমিকা নেই। সত্যি কথা বলতে কি, রতি বিনা অন্য উপায়ে রোগবিস্তারে তত্ত্বীয় সম্ভাবনাই সমধিক প্রকটিত, বাস্তবে এক সহস্রাংশও সত্য নয়।

রতি বিনা সংক্রমণ যথার্থই দুর্লভ। কারণ দুর্বল নয় গণোরিয়া বীজাণু, অতিশয় সংবেদনশীল; শুষ্কতা এবং তাপজ ঈষৎ পরিবর্তন শেল হানে।

সুতরাং দেহজ উষ্ণতা এবং আর্দ্র পরিবেশ থেকে সরিয়ে নিলেই এরা মৃত, এমনকি অতিশয় মৃদু বীজাণুনাশক (যেমন সাবান) সংস্পর্শেও। একদিকে শুধু মাত্র মানবদেহেই বেঁচে বর্তে থাকে, অন্যদিকে ভেজা ভেজা পরিবেশে, যেমন কামস্থানের রসসিক্ততায়, ক্ষতস্থানের ক্ষরণে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বেঁচে থাকে, ফলতঃ গণোরিয়া রোগের উৎসটি সচরাচর কামানুষ্ঠানেই নিহিত।

কামানুষ্ঠানের শুভ লগ্নে গণোরিয়া বীজাণুর প্রবেশ, যদিচ আত্মপ্রকাশ করে কয়েকদিনের বিলম্বে। বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় এই বিলম্বই 'ইনকিউবেসন পিরিয়ড' রূপে খ্যাত। বাংলায় নাম রেখেছি 'গুপ্ত পর্যায়'। রোগসংক্রমণ থেকে রোগপ্রকাশের মুহূর্ত পর্যন্ত যে অবকাশ সেটা গণোরিয়ার ক্ষেত্রে ২ থেকে ১০ দিন, কচিৎ কখন ২১ দিন। অধিকাংশক্ষেত্রেই দুই থেকে পাঁচ দিন।

পুরুষ

একটি দুটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে প্রায় সকল পুরুষই উপসর্গযুক্ত এবং সহবাসের ২ থেকে ৫ দিন পরেই রোগলক্ষণ দেখা দেয়। রোগলক্ষণের মধ্যে প্রথমেই নজর কাড়বে প্রস্রাবে জ্বালা, তারপর ক্রমাগত ক্ষরণ।

প্রাথমিক অভিযোগ প্রস্রাবকালে অস্বস্তি, অস্বস্তি থেকে কাটা-পোড়া-জ্বালার মত কষ্টকর অনুভূতি এবং ঘন ঘন প্রস্রাব। এর পরেই শুরু হয় জলের মত ক্ষরণ (মিউকাস), ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই ক্ষরণের পূর্ণ রূপটি উদ্ভাসিত—ক্ষরণের রঙ, পরিমাণ, ঘনত্ব বদলে যায়। শুরুতে পাতলা জলের মত অল্প অল্প ক্ষরণ, মধ্যে পাতলা দুধের মত কিঞ্চিদধিক ক্ষরণ, শেষে বিস্তর ক্ষরণ ঘন দুধের মত। তখন দেখব হলুদ-রঙা ক্ষরণ (পুঁজ) ক্ষরিত হচ্ছে অহরহ এবং মূত্রদ্বার দিয়ে। অর্থাৎ পুরুষ গণোরিয়ার প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটে সম্মুখ-মূত্রনালীর তীব্র প্রদাহ (এ্যাকিউট এ্যান্টিরিয়র ইউরেথ্রাইটিস) রূপে।

রোগটা যতই কুপিত হতে থাকবে, গণোরিয়াজাত বীজাণুদূষণ ততই উপরে উঠবে মূত্রনালী বেয়ে বেয়ে—ক্ষরণ বৃদ্ধি পাবে, ঘন পুঁজের মত, কখনবা রক্তমেশান। শেষে সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে পৌঁছে যাবে পশ্চাৎ মূত্রনালীতে, দেখা দেবে পশ্চাৎ মূত্রনালীর প্রদাহ। রোগ অর্থাৎ ক্ষরণ শুরু হওয়ার সাতদিন বা আরও কিছুদিন পরে প্রস্রাবে প্রবল জ্বালা যন্ত্রণা, ঘন ঘন কষ্টকর প্রস্রাব, সেই সঙ্গে প্রস্রাবের যাতনাদায়ক জরুরী তাগিদা।

পশ্চাৎ মূত্রনালী থেকে ছড়িয়ে পড়ে প্রস্টেটগ্রন্থিতে, বীর্যস্থলীতে, মূত্রস্থলীতে, এপিডিডিমিস-এ। ব্যাপ্তির ফলাফল হিসেবে প্রদাহ দেখা দেবে এই সব

অঙ্গে, সেই সঙ্গে তজ্জনিত কষ্টকর উপসর্গ। এসবই কিন্তু গুরুতর জটিলতা (কমপ্লিকেসন)। এদের মধ্যে পশ্চাৎমূত্রনালীপ্রদাহই বহুদৃষ্ট, এর পরেই প্রষ্টেটপ্রদাহ। এবং এপিডিডিমিস প্রদাহই (ছোট কমলা লেবুর মত স্ফীত এবং প্রবল যাতনাময়) সর্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর, কারণ, আরোগ্যলাভের পর কুণ্ডলীকৃত এপিডিডিমিস-নালী রুদ্ধ হয়ে যায়, আর এমনটি যদি দুদিকেই ঘটে বন্ধ্যাত্ব অনিবার্য। এইমাত্র উল্লেখ করা জটিলতা ছাড়াও কয়েকটি উপসর্গ কষ্ট দিতে পারে, যেমন, কষ্টকর অঙ্গোত্থান, শুধুই কিংবা নিম্নমুখী বক্রতাসহ। মুদা কিংবা উল্টা মুদা। বাঘী।

বিনা চিকিৎসায় কিংবা অসম্পূর্ণ চিকিৎসায় গণোরিয়া রোগের জটিলতাসমূহ দেখা দেয়। প্রথমে স্থানীয় জটিলতা। সরাসরি ব্যাপ্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়াই এর বৈশিষ্ট্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলতে পারি, পশ্চাৎমূত্রনালীপ্রদাহ। প্রষ্টেটপ্রদাহ। বীর্যস্থলীপ্রদাহ। মূত্রস্থলীপ্রদাহ। এপিডিডিমিসপ্রদাহ। লিঙ্গাগ্রে আঁচিল। মূত্রনালীপথের সঙ্কোচন এবং কৃত্রিম আবরণী (ষ্ট্রিকচার)। মূত্রনালী স্ফোটক (পেরিইউরেথ্র্যাল এ্যাবসেস)। পুরাতন গণোরিয়া।

ক্বচিৎ কখন জেনারেল কমপ্লিকেসন। জননমূত্রতন্ত্রের সীমানা ছাড়িয়ে রক্তবাহিত হয়ে শরীরের যে কোন প্রান্তে আছড়ে পড়তে পারে, বিশেষ করে চক্ষুতে, জানুসন্ধিতে, হৃৎপিণ্ডে, চর্মপ্রান্তে, তখন আবির্ভূত হবে মারাত্মক জটিলতাসমূহ—আইরাটিস নামক চক্ষুরোগ, আরথ্রাইটিস, এণ্ডোকার্ডাইটিস খ্যাত হৃদ্‌রোগ, বিষিয়ে যাওয়া চর্মরোগ এবং সেপ্‌টিসিমিয়া নামক ভয়ঙ্কর রক্তদুষ্টি।

বর্তমানে এণ্ডোকার্ডাইটিস এবং অন্যান্য রক্তবাহিত জটিলতা দুর্লভ, যদিচ মাঝে মধ্যে সেপ্‌টিসিমিয়ার দেখা মিলবে, তাও কিনা বিশেষ করে মেয়েদের ক্ষেত্রে। ষ্ট্রিকচার এবং পশ্চাৎমূত্রনালীপ্রদাহের ছড়াছড়ি ছিল কিছুকাল আগেও। ইদানীং জটিলতাসমূহ বড় একটা দেখা যায় না। কারণ, পুরুষরা সঙ্গে সঙ্গেই ডাক্তারের কাছে ছুটে যায় এবং আধুনিক উন্নত চিকিৎসাগুণে এসবই অন্তর্হিত। সুতরাং জটিলতা দেখা পাওয়ার অর্থই হল চিকিৎসায় বিলম্ব, অবহেলা কিংবা অসম্পূর্ণ চিকিৎসা।

আরেকটি উল্লেখযোগ্য জটিলতা: পুরাতন প্রমেহ। দুমাসের অধিক পুরাতন হলেই এ্যাকিউট দশার দাবদাহ স্তিমিত হয়ে আসে, দেখা দেয় ক্রনিক গণোরিয়া। এমনটি ঘটে অসম্পূর্ণ চিকিৎসায় (যেমন অল্পমাত্রার পেনিসিলিন প্রয়োগে) কিংবা ভুল চিকিৎসায় (যেমন, গাছগাছড়া, টোটকা)। অথবা

প্রষ্টেটপ্রদাহ, যা পুরুষকে বহুকাল সংক্রামী করে রাখে এবং পুরাতন প্রমেহের দিকে ঠেলে দেয়। তখন দেখব, ক্ষরণ প্রাচুর্য আস্তে আস্তে কমে এসেছে, তারপর মাঝে মধ্যে ক্ষরণ কিংবা শুধু সকালে ঘুম ভাঙ্গার পর ক্ষরণ। এই হল পুরাতন গণোরিয়া।

বর্তমানে পুরাতন গণোরিয়া অল্পদৃষ্ট। কোথাও কখন যদি থেকে যায়, রোগটি হঠাৎ প্রকুপিত হয়ে বীজাণুদূষণ ছড়িয়ে দেয়। প্রষ্টেট গ্রন্থি এবং লিটার গ্রন্থিতে লুকিয়ে থাকা বীজাণু ছড়িয়ে পড়ে, এরই ফলাফল নতুন করে এ্যাকিউট দশার পুনরাবির্ভাব কিংবা হঠাৎ এপিডিডিমিসপ্রদাহ। অধিকাংশ মেয়েদের মত এই সব কতিপয় পুরুষও বিপজ্জনক। কারণ এরাও রোগবাহক অথচ উপসর্গবিহীন।

চক্ষু, মুখবিবর এমনকি মলাশয়ও জড়িয়ে পড়তে পারে গণোরিয়ার সঙ্গে। স্বহস্ত সংক্রমিত হয়ে চক্ষুদেশে গণোরিয়া বীজাণু বাসা যদি বাঁধে, নেত্রবর্ত্মকলা প্রদাহ হবে। মুখমেহনের দুঃখিত পরিণাম গনোকক্কাল টনসিলাইটিস, সমকাম ও ইতরকাম উভয়তঃই।

মলাশয়জাত (রেকট্যাল) গণোরিয়া সাম্প্রতিককালের সংযোজন। প্রধানতঃ সমকামীদের মধ্যেই সীমিত। এদের অনেকেই উপসর্গবিহীন এবং এরাই গোপনে রোগ ছড়ায়। অল্প কয়েকজন অবশ্য উপসর্গযুক্ত: পায়ুঅঞ্চলে চুলকানি, সুড়সুড়ি ; পায়ুদেশে অল্প অল্প সিক্তভাব কিংবা ক্ষরণ এবং এই হেতু আঁচিল। মলত্যাগপূর্বে কষ্ট কিংবা পুঁজ মিউকাস মিশ্রিত মলত্যাগ। প্রসঙ্গতঃ বলে রাখি, মহিলাদেরও এমনটি হতে পারে, অধিকাংশক্ষেত্রেই যোনিদেশ থেকে চুঁয়ে চুঁয়ে পায়ুদেশে গড়িয়ে পড়া ক্ষরণই দায়ী, ক্বচিৎ কখন ইতরকামিতামূলক পায়ুকামের পরিণাম।

মহিলা

প্রথমেই উল্লেখ করব, মহিলাদের গণোরিয়া রোগের চারটি বৈশিষ্ট্য। এক, প্রায়শঃ উপসর্গবিহীন। দুই, মহিলারাই গণোরিয়া রোগের প্রধানতম আধার। তিন, ক্রনিক প্রবণতা বড় বেশী। চার, রোগনির্ণয় এবং সম্পূর্ণ রোগমুক্তি কঠিন কর্ম।

মহিলারা প্রায়শঃ উপসর্গবিহীন। অন্ততঃপক্ষে ৮৫% ক্ষেত্রে। রোগলক্ষণ, এমনকি প্রাথমিক এ্যাকিউট অবস্থাতেও, এত সামান্য এবং এত মৃদুগোছের যে রমণীর অজ্ঞাতসারেই রোগটি প্রবেশ করে।

তরুণ, অজটিল ক্ষেত্রে প্রধানতঃ মূত্রনালী কিংবা জরায়ুগ্রীবা কিংবা উভয় অঙ্গই আক্রান্ত, ফলে প্রস্রাবে জ্বালা, ঘন ঘন প্রস্রাব, পুঁজের মত স্রাব। গণোরিয়া রোগটি নির্ণীত হয়েছে এমন মহিলাদের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশী, শতকরা ৫০% এর কিঞ্চিদধিক ক্ষেত্রে কোন উপসর্গ নেই, না সাদা স্রাব না অন্য কিছু, মূত্রনালী-শ্রোণীদেশ-মলাশয় কোন অঙ্গই পীড়িত নয়। বাকী মহিলাদের অধিকাংশরই অভিযোগ : সাদা বা হলুদরঙা স্রাব (প্রায়শঃ ট্রাইকোমোনাস হেতু), প্রস্রাবে জ্বালা, ঘন ঘন প্রস্রাব। কখন তলপেটে বা কোমরে ব্যথা, অধিক রক্তস্রাব, মিলনে ব্যথা (শ্রোণীদেশ বিজড়িত এই হেতু), কতিপয় বিরল ক্ষেত্রে মলাশয় প্রদাহ।

প্রস্রাবে কষ্ট, একটু বেশী সাদা স্রাব—কেউ গুরুত্ব দেয়, অধিকাংশই অবহেলা করে। গুরুত্ব দিলেও রোগটি ধরা পড়ে না প্রায়ই। ফলতঃ এ্যাকিউট বা তরুণ দশা অলক্ষিতে চলে যায়, চিহ্ন তার পড়ে থাকে ক্রনিক দশায়। কারণ, বীজাণুরা বাসা বেঁধে থাকে জরায়ুগ্রীবাতে এবং মূত্রনালী সন্নিহিত নলিকাসমূহে (পেরিইউরেথ্রাল টিবিউলস), এখানে বছরের পর বছর জীবিত থেকে রোগ-বিস্তারে সহায়তা করে। কিন্তু উপসর্গ বলতে কিছুই নেই, আছে শুধু অধিকতর সাদা স্রাব যা থেকে ভগদেশে আঁচিল হতে পারে। এবংবিধ ঘটনারাজি মহিলাকে রোগবিস্তারে প্রধানতম বাহক-এর শিরোপা দিয়েছে। রতিবিহার, ঋতুস্রাব, মদ্যপান, সন্তানপ্রসব ইত্যাদি ঘটনাপ্রবাহের প্রতিক্রিয়া হিসেবে অবশ্য মাঝে মধ্যে ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে, দংশন করে রোগিণীকে, জটিলতা তথা রোগলক্ষণ দেখা দেয়।

অজ্ঞাতবাস অতএব অচিকিৎসা হেতু জটিলতা দেখা দেয় পুরুষের চেয়ে একটু বেশী হারে আর জটিলতার পরশ পেলেই ক্ষীণস্রোতা উপসর্গ ভয়ঙ্করী হয়ে উঠবে। বার্থলিন গ্রন্থি প্রদাহ স্থানীয় জটিলতার উদাহরণ। এজাতীয় আরও কয়েকটির উল্লেখ করছি : মূত্রনালী প্রদাহ। স্কিন গ্রন্থি প্রদাহ। মূত্রস্থলী প্রদাহ। মলাশয় প্রদাহ। জরায়ুগ্রীবা প্রদাহ।

মেয়েদের গণোরিয়া প্রধানতঃ মূত্রনালী, জরায়ুগ্রীবা, বার্থলিন গ্রন্থি এবং স্কিন গ্রন্থিতেই সীমিত। এখান থেকে ব্যাপ্ত হয়ে অভ্যন্তরে প্রবেশ করে শ্রোণীপ্রদাহ (পেলভিক ইনফ্লামেসন) ঘটায়। এটা অভ্যন্তরীণ জটিলতা এবং ভয়ঙ্কর। আরও ভয়ঙ্কর জেনারেল কমপ্লিকেসন। ক্বচিৎ কখন মুখবিবর, নেত্রবর্ত্মকলা, মল্যাশয় বিজড়িত, এ প্রসঙ্গ পূর্বেই ৩৩ পৃষ্ঠায় আলোচিত।

শ্রোণীপ্রদাহ বলতে বুঝি শ্রোণীদেশে অবস্থিত ডিম্বাণুনালী, ডিম্বাশয় ইত্যাদি অঙ্গের প্রদাহ, এদের মধ্যে ডিম্বাণুনালী প্রদাহ, সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। পূর্বে কোনদিন উপসর্গ নেই, হঠাৎ ভয়ঙ্কর অসুস্থতা, তলপেটের দুদিকে বা একদিকে অসহ্য যাতনা, বমি, জ্বর। এ্যাকিউট অবস্থায়, এ্যাপেণ্ডিসাইটিস বা (এক্টোপিক) 'অস্থানিক গর্ভ'-এর মত জরুরী অবস্থার সৃষ্টি। ক্রনিক বা সাব-এ্যাকিউট দশায় কয়েক সপ্তাহ থেকে কয়েক মাস ব্যাপী মাসিক স্রাবের গোলযোগ, অল্প ব্যবধানে ঘন ঘন স্রাব কিংবা অতিরিক্ত রক্তস্রাব। অথবা কোমরে ব্যথা, মিলনে ব্যথা। এপ্রদাহ স্তিমিত হলে নালীপথ রুদ্ধ হতে পারে আর এমনটি যদি দুদিকেই ঘটে বন্ধ্যাত্ব অনিবার্য।

জেনারেল কমপ্লিকেসন মেয়েদেরই হয় বেশী। গর্ভপাত, সন্তানপ্রসব, জরায়ুতে ছোটখাট অপারেশন ইত্যাদি ঘটনার ফলে সেপটিসিমিয়া হতে পারে; হতে পারে রক্তবাহিত অন্যান্য উপসর্গ।

বালক-বালিকা

গণোরিয়া শিশুদেরও রেহাই দেয় না। আদ্যঋতু হয়নি এমন বালিকার ভগদেশে বা যোনিতে এরোগ হতে পারে যার উপসর্গ প্রস্রাবে জ্বালা বা কষ্ট। হলুদ-রঙা যোনিস্রাব, ভগদেশে ব্যথা। আক্রান্ত হতে পারে বালকবালিকার চক্ষু, এমনকি পায়ুদেশও।

কারণ হিসেবে সরাসরি সংযোগ বা নিক্ষেপের (ডাইরেক্ট ইনঅকিউলেসন) কথা বলা হয়েছে। দূষিত হস্ত, কাপড়চোপড় মারফৎ, বিশেষ করে অল্পবয়স্কদের ক্ষেত্রে। সাধারণত: এরকম একটা ইতিহাস মিলবে বয়স্ক আক্রান্ত ব্যক্তির তোয়ালে বিছানা ব্যবহার করেছে কিংবা সান্নিধ্যে এসেছে।

সচরাচর আপতিক বীজাণুদূষণের শিকার শিশুরাই, যদিচ ধর্ষণ, পারস্পরিক পাণিমেহন কিংবা রতিজ পরীক্ষা-নিরীক্ষা উঁকি দিতে পারে কখন সখন। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা বলে উল্টোটাই সত্য। আপতিক নয়, রতিবাহিত বীজাণু-দূষণই বহুদৃষ্ট। অর্থাৎ কিনা বাস্তবে দেখব যৌনসংসর্গই কারণস্বরূপা। মনে রাখবেন, অন্ধ কামাবেগের তাড়নায় কিংবা রোগমুক্তির উদ্দেশ্যে বালমেহন বিচিত্র নয়।

নবজাতক

নবজাতকদের গণোরিয়া প্রধানত: চোখেই এবং মাতা কর্তৃক সংক্রমিত।

প্রসবকালে জরায়ুগ্রীবা দিয়ে নির্গত হওয়ার সময় শিশুর চোখ দুটি বিষিয়ে যায়। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে চোখ দিয়ে অহরহ পুঁজ পড়তে শুরু করে। অচিকিৎসিত থাকলে অন্ধত্বর অভিশাপ নেমে আসতে বাধ্য। একারণে জন্মের পরই শিশুর চোখ দুটি তুলো দিয়ে মুছে দেওয়া হয় এবং এক ফোঁটা সিলভার নাইট্রেট (১%) দ্রবণ কিংবা পেনিসিলিন দ্রবণ দেওয়া হয়। একদা জন্মান্ধতার হেতু ছিল এই গণোরিয়া কিন্তু বর্তমানে লুপ্ত। কারণ, এই মাত্র উল্লেখিত চক্ষুবিষয়ক প্রতিষেধক ব্যবস্থা প্রতিটি প্রসবকেন্দ্রেই অবশ্য পালনীয়।

রোগনির্ণয়

সন্থ মিলনের ইতিহাস আছে, সেই সঙ্গে মূত্রদ্বার দিয়ে কিছু ক্ষরিত, আর হলুদরঙা ক্ষরণ হলে তো কথাই নেই, ব্যাস্ গণোরিয়া না হয়ে যায় কোথা! এরকম একটা ধরে নিলে ভুলই হবে। ইতিহাস এবং লক্ষণ নির্ভর রোগনির্ণয় সবসময়ই অসম্পূর্ণ, প্রায়ই ভুলের মাশুল দিতে হয়, কখনবা আরও ভয়ঙ্কর পরিণতি—সমাজতঃ, বিবাহতঃ এবং আইনতঃ। স্থির মীমাংসায় উপনীত হওয়ার একমাত্র উপায় উপযুক্ত ল্যাবরেটরি পরীক্ষা। এপরীক্ষা তিন প্রকার। স্মিয়ার পরীক্ষা। কালচার পরীক্ষা। রক্তপরীক্ষা।

গণোরিয়া নির্ণয়ের মৌলিক পদ্ধতিটি হল স্মিয়ার পরীক্ষা। কাঁচের স্লাইডে এক ফোঁটা পূজ কিংবা মূত্রনালী-জরায়ুগ্রীবা-মলনালী ক্ষরণ নিয়ে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষা করতে হয়। কোষমধ্যস্থ জোড়া জোড়া গণোকক্কাই চোখে পড়লেই হেঁকে বলতে পারব রোগটি গণোরিয়া।

রোগনির্ণয়ের আরেকটি সুন্দর হাতিয়ার: কালচার। এইমাত্র উল্লেখ করা ক্ষরণরাজির কালচার পরীক্ষায় রোগবীজাণু নিশ্চিতরূপে ধরা পড়ে বলেই এটা নির্ভরযোগ্য।

পুরাতন গণোরিয়ায় মাঝে সাঝে ব্যবহৃত হলেও রক্তপরীক্ষার ফলাফল (কমপ্লিমেণ্ট ফিক্সেসন টেষ্ট) সুনিশ্চিত নয়। আদৌ নির্ভরযোগ্য নয় বলেই অপ্রচলিত। পুরুষদের পুরাতন গণোরিয়া ধরা পড়বে প্রাতঃকালীন নিদ্রাভঙ্গের পর প্রথম মূত্র পরীক্ষায় এবং প্রষ্টেটগ্রন্থিমর্দন পূর্বক ক্ষরিত রসপরীক্ষায়।

রোগসংক্রমণের প্রথম কয়েকদিন বাদ দিলে, মেয়েদের রোগনির্ণয় দুরূহ, আরও দুরূহ পুরাতন অবস্থায়। স্মিয়ার পরীক্ষা এবং মূত্রনালী-জরায়ুগ্রীবাক্ষরণ কালচার করা সত্ত্বেও ৫০% এর অধিক ক্ষেত্রে রোগটি অজ্ঞাত থেকে যায়। পুনঃপুনঃ পরীক্ষায় কিছু না মিললেই নিশ্চিন্ততার ছাড়পত্র দেওয়া যায় না।

অর্থাৎ কিনা জিজ্ঞাসিত কোন নারী যে গণোরিয়া রোগগ্রস্ত নয় একথা হলফ করে বলা অসম্ভব।

প্রতিটি গণোরিয়া রোগীর ক্ষেত্রে রতিবাহিত অন্যান্য ব্যাধিসমূহের কথা ভাবতেই হবে। মেয়েদের ক্ষেত্রে ট্রাইকোমোনাস জাত প্রদাহ প্রায়শঃ দৃষ্ট। পুরুষরা একই সঙ্গে সিফিলিস, কখন স্যাংক্রয়েড, কখনবা সাধারণ মূত্রনালীপ্রদাহ দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। তাই গণোরিয়া সেরে গেলেও ক্ষরণরাজির পুনরাবির্ভাব বিচিত্র নয়, বিচিত্র নয় স্যাংক্রয়েড বর্ণিত কষ্টকর উপসর্গ। আর তিন মাস পরে সিফিলিসের রক্তপরীক্ষা তো অবশ্যকরণীয় বিশেষ।

চিকিৎসা

আদর্শ চিকিৎসার লক্ষ্য ১০০% আরোগ্যলাভ। বড়ি নয়, ইঞ্জেকশন। তাও বেশী দিন ধরে নয়, শুধু একদিনই। কারণ ঔষধের বৃথা অপচয় নেই, ঔষধটি কার্যকরী না হলে অচিরেই ধরা পড়বে এবং সবচেয়ে বড় কথা হল, অন্যান্য রতিবাহিত রোগ, যেমন সিফিলিস, আঁধারে মুখ লুকাবে না।

অদ্যাবধি বহুবিধ ঔষধ প্রয়োগ করা হয়েছে। যেমন: সালফাজাতীয় ঔষধ, স্ট্রেপটোমাইসিন, পেনিসিলিন, টেট্রাসাইক্লিন, ক্লোরামফেনিকল ইত্যাদি। কালের দরবারে পেনিসিলিনই টিঁকে গেল। বর্তমানে কতিপয় সংগ্রামী গনোকক্কাস কিছুতেই সালফাজাতীয় ঔষধে প্রভাবিত হয় না অর্থাৎ পুরোপুরি রেজিষ্ট্যান্ট ; স্ট্রেপটোমাইসিন ৫০% ক্ষেত্রে ব্যর্থ এবং অল্পমাত্রার যেমন চার লাখ ডোজে পেনিসিলিন অংশতঃ কার্যকরী।

কাজে কাজেই প্রথমেই যে ঔষধটি নির্বাচিত হবে তার নাম পেনিসিলিন। এবং সমগ্র পৃথিবীতেই। অপব্যবহার নেই, ট্যাবলেট ভুলে যাওয়া নেই, অসতর্কতা নেই, কিন্তু কম ডোজে কাজ হয় না অধিকাংশক্ষেত্রেই। একই সময়ে অতি অধিক মাত্রায় প্রোকেন কিংবা জলীয় পেনিসিলিন (এই বার থেকে চব্বিশ কিংবা পঞ্চাশ লাখের মত) ইঞ্জেকশন। আধুনিক চিকিৎসার আরেকটি বৈশিষ্ট্য ইঞ্জেকশনের সাথে সাথে এমন একটি ট্যাবলেট (প্রোবেনেসিড) সেবনীয় যা পেনিসিলিন নির্গমনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে পেনিসিলিন-লেভেল উচ্চহারে বজায় রাখতে সহায়তা করবে। সাফল্যহার ৯৯.৫%।

একদা জনপ্রিয় সালফাজাতীয় ঔষধের কোন ভূমিকা নেই আজ (অবশ্য ট্রাইমিথোপ্রিম নামক অন্য একটি ঔষধের সঙ্গে যুক্ত হয়ে হৃতগৌরব ফিরে পেয়েছে)। কিছুদিন আগে পর্যন্ত দ্বিতীয় স্থলাভিষিক্ত স্ট্রেপটোমাইসিন হীনবল

হয়ে পড়েছে। এই ইঞ্জেকশনের সবচেয়ে বড় সুবিধা ছিল সিফিলিস প্রভাবিত হয় না, তাই প্রমেহ রোগীর সিফিলিস সন্দেহে এটাই বেছে নেওয়া হত। এজাতীয় আরেকটি ঔষধ ক্যানামাইসিন।

ইঞ্জেকশন নিতে চায় না, এমন রোগীকে এ্যাম্পিসিলিন বড়ি দেওয়াই শ্রেয়ঃ। একই দিনে একই সঙ্গে কিংবা কয়েক ঘণ্টা বাদে বেশ কয়েকটি বড়ি দেওয়া হয়, সেই সঙ্গে কয়েকটি প্রোবেনেসিড বড়ি।

তৃতীয় নির্বাচিত ঔষধ: টেট্রাসাইক্লিন বড়ি। ছ ঘণ্টা পর পর পাঁচ দিন সেবনীয়। অসুবিধা দুটি, রোগী যদি ঠিকমত সময়ে বড়ি না খায় এবং সিফিলিস গুপ্ত হতে পারে আংশিকভাবে।

শুরুতেই যাতনাদায়ক অবস্থার মুখোমুখি, পুরুষ তাই ডাক্তারের কাছে ছুটে যায় সঙ্গে সঙ্গেই। কিন্তু নারীর বর্ষ মাস কেটে যায় ডাক্তারের কাছে আসার আগে। অধিকাংশ রমণীই অবহেলা করে যদি না সঙ্গী বা স্বামী আক্রান্ত এই সুবাদে চিকিৎসা করায় কিংবা নিজেই উপসর্গ দ্বারা পীড়িত। তরুণ অঙ্গনের ক্ষেত্রে উচ্চমাত্রায় পেনিসিলিন সাত দিন ইঞ্জেকশন। এবং অন্যান্য চিকিৎসা।

পুরুষের পুরাতন প্রমেহের চিকিৎসা কষ্টসাধ্য। পর পর সাত দিন ইঞ্জেকশন। এবং অন্যান্য চিকিৎসা। পূর্বেই বলেছি, অচিকিৎসায় কিংবা অসম্পূর্ণ চিকিৎসার ফলাফল: পুরাতন গণোরিয়া। অর্থাৎ আধুনিক চিকিৎসার কল্যাণে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ সুনিশ্চিত এবং এহেন ফললাভ আপনারও করায়ত্ত হবে যদি উপযুক্ত দক্ষ চিকিৎসকের শরণ নেন। এবং কালবিলম্ব না করেই।

ফলো আপ

আরম্ভের যেমন আরম্ভ আছে, শেষেরও তেমনি আছে শেষ। চিকিৎসাশাস্ত্রে এরই নাম ফলো আপ। বাংলায় বলা যেতে পারে পর্যবেক্ষণ কিংবা তদারকি।

মনে হতে পারে, ৯৯.৫% ক্ষেত্রেই সফল ঐ ইঞ্জেকশন আর বড়িই বুঝি সব। না, মোটেই তা নয়। আরোগ্যলাভের পরও চিকিৎসকের শরণ নিতে হবে, সেই সঙ্গে কতকগুলি পরীক্ষাও, যতক্ষণ না সবুজ সঙ্কেত মিলবে সম্পূর্ণ রোগমুক্তির। এই পর্যায়ভুক্ত কৃত্যসমূহের আরেক নাম ফলো আপ। রতি-বাহিত রোগাক্রান্ত প্রত্যেক ব্যক্তিরই এটা যে অবশ্যকরণীয় তা বলাই বাহুল্য।

পেনিসিলিন (কিংবা অন্য ঔষধ) যদি কার্যকরী হয়, ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই উন্নতির লক্ষণ সুপরিস্ফুট দেখতে পাবেন—ক্ষরণ শুকিয়ে যাবে, উপসর্গ বিদায় নেবে। অন্যথায় বুঝতে হবে ঔষধটি ব্যর্থ।

আবার এমনও হতে পারে, রোগমুক্তির আস্বাদন স্বল্পকালের, এই এক সপ্তাহ, বড় জোর দু সপ্তাহ। আনন্দিত প্রহর শুনতে না শুনতেই, প্রধানতঃ এক সপ্তাহ কাল মধ্যেই, সেই ভয়ঙ্করী পুনরাবির্ভূত। এটা হচ্ছে চিকিৎসাগত ব্যর্থতা, অর্থাৎ কিনা গণোরিয়া রোগটি রিল্যাপ্স করেছে, আংশিক আরোগ্য-লাভের পর পুনরায় নতুন করে দেখা দিয়েছে। স্মিয়ার পরীক্ষায় গণোরিয়া বীজাণু ধরা পড়বে। অল্পমাত্রায় পেনিসিলিন একটি কারণ, আরেকটি কারণ রেজিষ্ট্যাণ্ট বীজাণু। কিংবা একই সঙ্গে সংক্রমিত গণোরিয়া এবং সাধারণ মূত্রনালীপ্রদাহ-এর প্রথমটি সেরে গেছে কিন্তু দ্বিতীয়টি আত্মপ্রকাশ করেছে, এক সপ্তাহ কি তার কিছু পরে। এক্ষেত্রে অবশ্য গণোরিয়া বীজাণু অনুপস্থিত।

চিকিৎসার পর একপক্ষকাল উপসর্গরহিত থেকেও ক্ষরণ দেখা দিতে পারে, ব্যাপারটা তখন অঙ্গুলি নির্দেশ করবে পুনঃসংক্রমণের দিকেই। একই সঙ্গী কিংবা ভিন্ন সঙ্গীর পরশে। ক্ষরণ পরীক্ষায় গণোরিয়া প্রমাণিত হবে এবং নতুন করে চিকিৎসা শুরু করতে হবে।

চিকিৎসার পর কোন কষ্ট নেই, নেই কোন লক্ষণ অতএব গণোরিয়ার হিংস্র নখরাঘাত থেকে আরোগ্যলাভ সম্পূর্ণ এবং নিশ্চিত, এটা ধরে নেন অনেকেই। না, সম্পূর্ণ রোগমুক্তির গ্যারাণ্টি নয় এটা। এই উদ্দেশ্যে প্রথম দু সপ্তাহে সাত দিন অন্তর একবার এবং পরবর্তী তিন মাসে প্রতি মাসে একদিন করে হাজিরা দিতে হবে ডাক্তারের কাছে।

প্রত্যেক মাসে প্রাতঃকালীন প্রথম মূত্র এবং প্রষ্টেট ক্ষরণ পরীক্ষা। এদুটি পরীক্ষায় গণোকক্কাস কিংবা অধিকসংখ্যক পুঁজকোষ না থাকার ছাড়পত্র থাকা চাই। শেষ বারে অর্থাৎ তিন মাস পরে সিফিলিসের জন্যে রক্তপরীক্ষা।

আদি রোগের (গণোরিয়ার) চিকিৎসা করতে গিয়ে সিফিলিস রোগটি অংশতঃ প্রভাবিত হতে পারে, একারণে রক্তপরীক্ষা অপরিহার্যরূপে প্রয়োজনীয়। এভাবে প্রত্যেকটি পরীক্ষার ফলাফল নেগেটিভ হলেই সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভের অভিজ্ঞানপত্র মিলবে।

মেয়েদের ফলো আপ পুরুষদের মতই। জরায়ুগ্রীবা-মূত্রনালী ক্ষরণ দিয়ে স্মিয়ার ও কালচার পরীক্ষা এবং মাসিক স্রাবের অব্যবহিত পরেই। আর শেষমেশ রক্তপরীক্ষা তো আছেই।

এই তিন মাস আরও কয়েকটি নির্দেশের অধীন থাকা বাঞ্ছনীয়। সুরাপান এবং রতিবিহার নিষিদ্ধ। স্বয়ং-পরীক্ষা নৈব নৈব চ। এতে মূত্রনালীস্থিত

শ্লেমঝিল্লী আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে বীজাণুদূষণের পথটি সুগম করে দেয় এবং সত্য সত্যই মূত্রনালীপ্রদাহ দেখা দিতে পারে।

চিকিৎসা যন্ত্র তন্ত্র এবং চিকিৎসার নামে যা-তা যা-খুশি প্রয়োগ করা অনুচিত। আরও অনুচিত মিলনের পূর্বে বা পরে এক ডোজ পেনিসিলিন। সতর্কতার পদক্ষেপ হতে পারে কিন্তু শাস্ত্রানুমোদিত নয়, অহিতের সম্ভাবনা যে প্রবল!

সিফিলিস রোগটি সদাই সসম্ভ্রমে কিংবা সভয়ে উচ্চারিত। সহবাসজাত ব্যাধিসমূহের মধ্যে এটাই যে রাজার রাজা। হতে পারে গণোরিয়া স্যাংক্রয়েডের তুলনায় অল্পদৃষ্ট কিন্তু সামগ্রিক ভয়ঙ্করতায় এর জুড়ি নেই।

সিফিলিস একপ্রকার বিশেষ রতিবাহিত ব্যাধি, দীর্ঘস্থায়ী এবং সক্রামক। একদা পৃথিবীর এক গোলার্ধে সীমিত ব্যাধি আজ নিখিল নীল বিশ্বের প্রতিটি নীলিমায় ব্যাপ্ত। নারী অপেক্ষা পুরুষদের মধ্যেই অধিক দৃষ্ট। আক্রান্ত পুরুষদের একটি বড় অংশ সমকামী এবং নাবিকরাই। অনেক ক্ষেত্রে গণোরিয়া কিংবা অন্য কোন ব্যাধি হেতু পেনিসিলিন ইঞ্জেকশনের ফলে সিফিলিস রোগটি গুপ্ত থেকে যায়। অধিকন্তু গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অনেক মানুষের, বিশেষ করে ইয়স, পিণ্টা, বিজেল রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের কিঞ্চিৎ অনাক্রম্যতা জন্মে সিফিলিস রোগে।

রোগোৎপাদক বীজাণুর নাম ট্রিপোনিমা প্যালিডাম, ১৯০৫-এ আবিষ্কৃত। নামেই রূপ বর্ণনা, অর্থাৎ গাত্রবর্ণ সাদা এবং দেহ সর্পিল, ছয় থেকে চব্বিশটি পর্যন্ত, সাধারণতঃ কমের দিকেই, কুণ্ডলী থাকে। দেখতে অনেকটা কর্ক-স্ক্রুর মত। এবীজাণু দুর্বল। জীবনধারণের জন্যে ভেজা ভেজা উষ্ণ পরিবেশ অপরিহার্য, নতুবা দু এক ঘণ্টার মধ্যেই মৃত্যুর কোলে ঢ'লে পড়বে, ফলে অযোনি-সম্ভূত সিফিলিস অতি অল্পই দৃষ্ট।

এইমাত্র উল্লেখ করেছি সিফিলিস বীজাণু শক্তিশালী নয় এবং আর্দ্র অথচ উষ্ণ পরিবেশের আনুকূল্য চাইই। এর ফলে হয়েছে কি, শুষ্কতা, নিজদেহ অপেক্ষা উষ্ণতাপ কিংবা তাপমাত্রার সামান্য হেরফের, মৃদু বীজাণুনাশক, সাবানজল, এসবই এদের কাছে মৃত্যুবাণ। এবীজাণু তাই বেঁচে বর্তে থাকে গোপনাঙ্গে, মুখে, গুহ্যদেশে। এসব জায়গায় সিফিলিস ক্ষত (প্রথম এবং দ্বিতীয় দশাজাত) প্রবলভাবে স্পর্শসংক্রামক। আর এতিনটি অঙ্গই কামানুষ্ঠানের সময় নিবিড় সান্নিধ্যে আসে। তাই না বীজাণু সহজেই ছড়িয়ে পড়ে দেহ থেকে দেহান্তরে।

সংক্রমণ ব্যাপারটা কাজে কাজেই সঙ্গ-পরশ-যুক্ত। ক্বচিৎ কখন রতিবর্জিত, যেমন আপতিক বীজাণুদূষণ, জন্মগত সিফিলিস। রোগসংক্রমণের ধারা অতএব দুটি প্রধান খাতে প্রবাহিত—অর্জিত কিংবা জন্মগত। কালেভদ্রে সিফিলিস

জন্মলগ্নে প্রাপ্ত, মাতৃগর্ভে বসবাসের সময় অবোধ নিষ্পাপ শিশু সিফিলিস-কীট দষ্ট হতে পারে। একেই বলি জন্মগত সিফিলিস। বাদ বাকী প্রতিটি ক্ষেত্রেই এরোগ অর্জিত এবং সচরাচর রতিবাহিত, ফলতঃ যে আত্মক্ষত জন্মে সেটা সীমিত থাকে গোপনাঙ্গে। কখনবা ঠোঁঠে, মুখাভ্যন্তরে, পায়ুদেশে, এটাই অযোনিসম্ভূত সিফিলিস। মুখমধ্যে দ্বিতীয় পর্যায়ের সিফিলিস ক্ষত লুকিয়ে আছে সেই ব্যক্তির চুম্বনে সিফিলিস ছড়ায়, ছড়ায় মুখমেহনে এবং স্তনবৃন্ত চোষণেও। এহেন ব্যক্তির কাছ থেকে দন্তচিকিৎসক, গলা-নাক-কান বিশেষজ্ঞেরও আপতিক সিফিলিস হতে পারে। অর্থাৎ কিনা, আশ্চর্য কাণ্ড, রতিবিহীন সিফিলিসও সম্ভব। সাতিশয় দুর্লভ হলেও বাস্তবায়িত হতে পারে উল্কি করাতে গিয়ে, সিফিলিসদুষ্ট রক্ত-সংবহনে, কিংবা অসতর্ক ডাক্তার-নার্সের আঙ্গুলে, এসবই আপতিক বীজাণুদূষণের দুঃখিত ঘটনা। কিংবা মাতার স্তনবৃন্তে ক্ষত বা চর্মরোগ থেকে স্তন্যপানকারী শিশুর আঁখিপল্লবে সংক্রমিত হতে পারে।

ইতিহাস

সিফিলিস শব্দটির জন্ম ১৫৩০-এ রচিত একটি জনপ্রিয় লাতিন কবিতায়, কবির নাম ফ্রাকাষ্টোরিয়াস নামধেয় জনৈক চিকিৎসক, ইনি আদর করে নায়ক-মেষপালকের নাম রেখেছিলেন সিফিলিস এবং এর সেই রোগ ছিল যা কিনা সেই যুগে 'গ্রেট পক্স' রূপে কথিত। এই একই রোগ পরবর্তীকালে সিফিলিস বলে খ্যাত।

. রতিবাহিত ব্যাধিসমূহের মধ্যে সিফিলিসের ইতিহাসই সর্বাপেক্ষা চমকপ্রদ। এসম্বন্ধে প্রথম খবর—প্রামাণ্য এবং সর্বজনস্বীকৃত—মেলে ১৪৯৫-এ। অর্থাৎ পূর্বোক্ত কবিতার রচনাকাল থেকে ৩৫ বৎসর পূর্বে, সমগ্র ইউরোপে জননেন্দ্রিয়ের এক সংক্রামক ব্যাধি আগুনের মত ছড়িয়ে পড়ে, এটাই ইতিহাসে বৃহৎ ইউরোপীয় মহামারী রূপে খ্যাত।

উৎপত্তিবিষয়ক চিন্তাধারা দুটি শিবিরে বিভক্ত। কলম্বসবাদ আর একত্ববাদ। কোনটি যথার্থ এনিয়ে মতবিরোধ আছে। তবে একটি ব্যাপারে প্রতিটি ঐতিহাসিকই একমত যে পঞ্চদশ শতাব্দীর অন্তিমকাল থেকে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ জুড়ে যে রোগটি ইউরোপে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছিল সেটা আর কিছু নয়, এই সিফিলিসই। এবং দেখা দিয়েছিল কলম্বসের ঐতিহাসিক সমুদ্রযাত্রার পরবর্তী কালেই।

আবির্ভাবকালের এই যোগাযোগ নিছক কাকতালীয় নয়। অন্ততঃ কলম্বসপন্থীরা তো তাই বলেন। ১৪৯৩-এ কলম্বস তাঁর দলবল নিয়ে ফিরে না আসা পর্যন্ত সিফিলিস অজ্ঞাতকুলশীল ছিল ইউরোপে। এবং প্রাচ্যেও। অর্থাৎ কিনা এই রোগটির আদি নিবাস আমেরিকা। সেখান থেকেই রতিবাহিত হয়ে এসেছে স্পেনে, এখান থেকে ছড়িয়ে পড়ল নেপলস অবরোধকারী অষ্টম চার্লস-এর সৈন্যসামন্তদের মধ্যে, তারপর সৈন্যদের পশ্চাৎ অপসরণ কালে সমগ্র ইউরোপে ব্যাপ্ত।

ভারতবর্ষেও সিফিলিস আগন্তুক ব্যাধি। ভাস্কো ডা গামা এবং অন্যান্য পর্তুগীজ নাবিকগণ কর্তৃক আনীত, একারণে একদা ফিরঙ্গ রোগ নামে অভিহিত হত, নামান্তর ছিল গন্ধরোগ (তিন শত বৎসর পূর্বে আকবর বাদশাহের আমলে আচার্য ভাবমিশ্র রচিত সঙ্কলন গ্রন্থে সর্বপ্রথম উল্লেখিত)। এভাবে বিস্তৃত হয়েছে ইউরোপ থেকে ভারতে, তারপর একে একে আরও সুদূর প্রাচ্যে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, জাপানীরা সিফিলিসকে এখনও বলে পর্তুগীজ ব্যাধি।

একত্ববাদীদের ধারণা করতে আনন্দ, পৃথিবীতে এমন কিছু কিছু ব্যাধি আছে যা কিনা আসলে একটিই ব্যাধি, সামাজিক অবস্থা, ব্যক্তিগত অভ্যাস এবং জলবায়ুর প্রভাবে ভিন্নতর ব্যাধিতে পরিবর্তিত। যেমন ট্রিপোনিম্যাটোসিস একটি আদি ব্যাধি, সিফিলিস এরই একটি প্রকারভেদ। এই মতামতের প্রাণ-পুরুষ ও প্রধান প্রবক্তার নাম : ই. এইচ. হাডসন।

কয়েক লক্ষ বর্ষ আগে, নিরক্ষরেখা সংলগ্ন মধ্য আফ্রিকায় আদিবাসীদের মধ্যে ট্রিপোনিম্যাটোসিস রোগটি ছিল। দাসত্ব ব্যবসা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মধ্য আফ্রিকা থেকে উত্তরে ও পূর্বে রোগটি ছড়িয়ে পড়ল, তবে কিনা পরিবর্তিত রূপে। কেননা এরোগের ছবিটি সর্বত্রই এক নয়, জাতিবৈশিষ্ট্য, জলবায়ু প্রভাব, স্থান-মাহাত্ম্যভেদে এক এক স্থানে এক এক রূপ। যেমন দক্ষিণ আমেরিকায় পিন্টা, পৃথিবীর শুষ্ক অথচ আর্দ্র অঞ্চলে ইয়স এবং তাপিত মরুভূমি অঞ্চলে বিজেল।

ট্রিপোনিম্যাটোসিস রোগটি গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ও অর্ধ-গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলেই সমধিক দৃষ্ট এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ও গরীব শিশুদের মধ্যেই। এবং প্রধানতঃ সামাজিক কারণেই বিস্তৃত। অধিকন্তু, রতিজ সিফিলিসের মত জন্মগত বীজাণুদূষণের সম্ভাবনা তিরোহিত এবং রোগাক্রান্ত মানুষের আয়ু হরণ করে না।

এক কথায়, একত্ববাদী দৃষ্টিতে, ট্রিপোনিম্যাটোসিসই সিফিলিসের আদিপুরুষ এবং আমেরিকা নয়, আফ্রিকাই সিফিলিসের জন্মভূমি।

প্রমাণতঃ কয়েকটি তথ্যের উল্লেখ করা যেতে পারে। এক, সিফিলিস পুরোপুরি রতিবাহিত নয়, পৃথিবীর অনেক প্রান্তে ছড়িয়ে আছে অরতিক সিফিলিস, যেমন এনডেমিক সিফিলিস। দ্বিতীয়তঃ, যে ট্রিপোনিমা থেকে সিফিলিস উৎপন্ন এবং যে ট্রিপোনিমা থেকে জন্ম হয়েছে ইয়স-এর, এদুয়ের মধ্যে গুণগত কোন পার্থক্য নেই। অতএব এরা একই প্রজাতির সদস্য এবং ট্রিপোনিম্যাটোসিস নামক এক এবং একটি রোগেরই কারক। তৃতীয়তঃ, ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক তথ্য এবং সংক্রামকরোগবিদ্যা বিষয়ক গবেষণা একথাই বলে ট্রিপোনিম্যাটোসিস প্রথম আবির্ভূত মধ্য আফ্রিকায়, তখন তার অঙ্গে ছিল ইয়স রোগের নামাবলী। কালক্রমে এরোগ শুষ্ক শীতল অঞ্চলে বিস্তৃত, জনগণ প্রবসিত, ফলে এরোগ এনডেমিক সিফিলিসে পরিবর্তিত। এরই রূপবদল হল শহুরে সভ্যতায়, রতিজ সিফিলিসে। অর্থাৎ কিনা ইয়স, অরতিক (এনডেমিক) সিফিলিস এবং রতিজ সিফিলিস, এসবই একই রোগের ভিন্ন দশা। সহস্র সহস্র বর্ষব্যাপী প্রতিটি মহাদেশেই, কোন না কোন রূপে ট্রিপোনিম্যাটোসিস-এর দেখা পাব বলেই কলম্বস আর সিফিলিস সম্পর্কিত নয়। চতুর্থতঃ, অতিপ্রাচীনত্বের নিদর্শন হিসেবে বাইবেলীয় ঘটনার (মোয়ার কন্যা-গণের সঙ্গে ব্যভিচার হেতু 'Baal Peor'-এর চব্বিশ হাজার ব্যক্তির মৃত্যু) উল্লেখ করেছেন কেউ কেউ। পঞ্চমতঃ, পশ্চিম থেকে পর্তুগাল দিয়ে ইউরোপে প্রবিষ্ট এবং এটাই পরিবর্তিত হয়ে অতিশয় নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছিল মধ্যযুগীয় ইউরোপীয়দের কাছে। এদের কোন প্রতিরোধশক্তি বা অনাক্রম্যতা ছিল না, এই হেতু রোগটি প্রথম সাক্ষাতেই ভয়ঙ্করী করালবদনা।

ইউরোপীয় বৃহৎ মহামারীর প্রায় শতবর্ষকাল জুড়ে লক্ষ লক্ষ ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে। তখন চিকিৎসা বলতে ছিল পারদঘটিত মলম, টিঁকে ছিল প্রায় চারশ বছর ধরে। ১৯০৫-এ রোগোৎপাদক বীজাণু আবিষ্কৃত। রোগনির্ণয়ের উদ্দেশ্যে রক্তপরীক্ষার চলন শুরু ১৯০৬-এ। আর্সেনিক চিকিৎসার চলন দেখি ১৯০৯-এ। ১৯৪৩-এ চিকিৎসার মোড় ঘুরিয়ে দিল পেনিসিলিন। নবযুগের সূচনা হল, নবজীবন দিল রোগাক্রান্তকে।

রোগলক্ষণ

সিফিলিস রোগের তিন অবস্থা, আর্লি, লেটেন্ট আর লেট। বীজাণুদূষণের শুরু

থেকে প্রথম দু বৎসর কাল পর্যন্ত আর্লি সিফিলিস। প্রথম অবস্থায় ভয়ঙ্কর-ভাবে সংক্রামক, দেহের প্রতিটি তন্ত্র ছুঁয়ে যায়। তরুণ সিফিলিস আবার দুই পর্যায়ে বিভক্ত, প্রাইমারি ষ্টেজ বা প্রথম দশা আর সেকেণ্ডারী ষ্টেজ বা দ্বিতীয় দশা। প্রাথমিক বীজাণুদুষণের দুবৎসর পর স্থিতাবস্থা দেখা দেয়, একেই বলা হয় লেটেন্ট সিফিলিস, এবং এই মধ্যবর্তী কালটুকুর নাম সুপ্ত দশা (লেটেন্ট ফেজ)। সবশেষে আবির্ভূত হবে পুরাতন সিফিলিস বা লেট সিফিলিস, এই অন্ত্য অবস্থায় শেষের সে ভয়ঙ্কর রূপটি প্রকটিত। অর্জিত সিফিলিস অতএব চার পর্যায়ে বিভক্ত : প্রথম দশা। দ্বিতীয় দশা। তৃতীয় (সুপ্ত) দশা। চতুর্থ দশা। এখন একে একে দশাগুলির আলোচনা করব।

প্রথম দশা

প্রথম দশার আবির্ভাব ঘটে সাধারণতঃ মিলনের তিন সপ্তাহ কাল পরেই, যদিচ আবির্ভাবকালের সময়-সীমা ৯ থেকে ৯০ দিন পর্যন্ত স্বীকৃত। বিলম্বিত প্রকাশের কারণট প্রায়শঃ পেনিসিলিন চিকিৎসা, যেমন গণোরিয়ায় অধিককাল ব্যাপী ইঞ্জেকশন।

একপ্রকার বিশেষ ক্ষত, ডাক্তারীশাস্ত্রে যার নাম হার্ড শ্যাঙ্কার কিংবা প্রাইমারি শ্যাঙ্কার, বাংলায় বলব আদ্যক্ষত, দিয়ে প্রাথমিক পর্যায় চিহ্নিত। যেখান দিয়ে বীজাণু দেহমধ্যে প্রবিষ্ট সেখানেই আদ্যক্ষত সৃষ্ট হয়। প্রধানতঃ, অর্থাৎ ৯৫% ক্ষেত্রে, গোপনাঙ্গেই দেখা দেয় এবং কামানুষ্ঠানের ২১ থেকে ২২ দিনের মধ্যেই। পুরুষদের লিঙ্গগ্রীবার খাঁজে, লিঙ্গাগ্রে, পুরুষাঙ্গদেহে, অগ্রচ্ছদায়, মূত্রদ্বারে, অণ্ডকোষে। মেয়েদের রতিশৈলে, বৃহদোষ্ঠে, ক্ষুদ্রোষ্ঠে, ভগাঙ্কুরে, ফুরশেটে, যোনিগাত্রে, জরায়ুগ্রীবায়। আক্রান্ত রমণীদের এক চতুর্থাংশ আদ্যক্ষত জরায়ুগ্রীবায়, এক্ষেত্রে রোগটি প্রায়ই অজ্ঞাত থেকে যায়। মলদেশে সিফিলিস ক্ষত আরেকটি দৃষ্টান্ত। অর্থাৎ কিনা এমন অজ্ঞাতবাস ঘটতে পারে সমকামীদের ক্ষেত্রেও।

গোপনাঙ্গ বাদ দিয়েও আদ্যক্ষত দেখা দিতে পারে অন্যত্র, বস্তুতঃ দেহের যে কোন এপিথিলীয় টিশুতে, বিশেষ করে মুখাভ্যন্তরে, ওষ্ঠদ্বয়ের কোন একটিতে, নারীস্তনে, ডাক্তার-নার্সের আঙ্গুলে, গুহ্যদ্বারে বা মলনালীতে। এবং এজাতীয় গোপনাঙ্গ-বহির্ভূত সিফিলিসের ঘটনা ৫% এর বেশী নয়।

আদর্শ আদ্যক্ষতর বর্ণনা এই রকম : ব্যথাহীন, শক্ত, সমপ্রান্ত এবং গোলাকার। একটি ক্ষত এবং সেই সঙ্গে প্রায়শঃ গ্রন্থিস্ফীতি। প্রথমে ছোট্ট

একটি লালচে গোটা, সেটা ভেঙে গিয়ে একটা 'ইরোসান', এভাবেই শুরু হয়। অচিরেই শক্ত ভূমিযুক্ত (এই হেতু টিপলে শক্ত ঠেকে) একটা ক্ষত সৃষ্ট হয়। এথেকে কোন পূঁজ নির্গত হয় না, একপ্রকার ক্ষরণ হেতু আর্দ্র। এক্ষত সংখ্যায় সাধারণতঃ একটাই, কখনবা একাধিক, দশটির মধ্যে একটি ক্ষেত্রে। দেখতে গোলাকার এবং সমপ্রান্ত। আয়তনে সওয়া ইঞ্চি থেকে আধ ইঞ্চির (অর্ধ থেকে দুই সেন্টিমিটার ব্যাস যুক্ত) চেয়ে ছোট, ব্যথাময় নয়, চুলকায় না, কোন কষ্ট নেই এর জন্যে। এই ব্যথাহীনতা এবং সামান্যতাই এর বৈশিষ্ট্য।

আরেকটি বৈশিষ্ট্য গ্রন্থিস্ফীতি। প্রায়শঃ দৃষ্ট, শতকরা ৭৫% ক্ষেত্রেই, এবং প্রধানতঃ একদিকেই। বীজাণুদূষণের ছ সপ্তাহ পরে এবং আদ্যক্ষত আবির্ভাবের দু এক সপ্তাহ পরেই স্থানীয় লসিকাগ্রন্থির কতকগুলি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। সাধারণতঃ উরুসন্ধির একদিকেই, কালেভদ্রে উভয়দিকেই। ব্যতিক্রম শুধু জরায়ুগ্রীবায়, এক্ষেত্রে গ্রন্থিস্ফীতি নেই। প্রসঙ্গতঃ বলে রাখি, গোপনাঙ্গ-বহির্ভূত সিফিলিসেও, যেমন ওষ্ঠ কিংবা বক্ষ আক্রান্ত হলেও স্থানীয় লসিকাগ্রন্থি (গলায় কিংবা বগলে) বৃদ্ধি পাবে।

এস্ফীতি প্রদাহযুক্ত নয় অতএব ব্যথাহীন। কিন্তু টিপলে শক্ত ঠেকবে, অন্যান্য গ্রন্থির সঙ্গে জড়িয়ে গিয়ে বৃহদ্গ্রন্থিতে পরিণত হয় না, ছোট ছোট দ্বীপপুঞ্জের মত দেখায়। এবং পাক ধরে না বললেই চলে।

আদ্যক্ষত প্রতিটি ক্ষেত্রেই স্বয়ং-সীমিত। অর্থাৎ প্রতিটি ক্ষেত্রেই, চিকিৎসা হোক আর নাই হোক, এক্ষত আস্তে আস্তে শুকিয়ে যাবে, শেষে অন্তর্হিত। কয়েক সপ্তাহ থেকে কয়েক মাসের মধ্যেই, তবে ৩।৪ সপ্তাহের আগে নয় এবং ৬ থেকে ১২ সপ্তাহের মধ্যেই। যদিচ এই কাল মারাত্মকভাবে পরিবর্তনশীল, সচরাচর ৪ থেকে ৬ সপ্তাহের মধ্যেই আদ্যক্ষত সেরে যায়।

দ্বিতীয় দশা

রোগটি যদি ধরা না পড়ে, অসম্পূর্ণ কিংবা বিনা চিকিৎসায়, দ্বিতীয় দশার আবির্ভাব ঘটবে অচিরেই। প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায় সাধারণতঃ একটা পরিবর্তনশীল সময়ের ব্যবধান দ্বারা পৃথকীকৃত। দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত লক্ষণাবলী সচরাচর আবির্ভূত হয় আদ্যক্ষত পুরোপুরি শুকিয়ে যাওয়ার পর, কখনবা মিলিয়ে যাওয়ার আগেই। সাধারণতঃ ৪ থেকে ৬ সপ্তাহের মধ্যেই আদ্যক্ষত সেরে যায়, কখনবা তিন মাস পর্যন্ত সময় নেয়। এর কিছুদিন পরেই প্রকাশিত হতে থাকে দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত লক্ষণাবলী অর্থাৎ প্রথম বীজাণুদূষণের দুই কিংবা তিন থেকে ছ মাসের মধ্যেই

আবির্ভূত। আবার আত্মক্ষত প্রকাশের ছ সপ্তাহ পরে দেখা দিতে পারে দ্বিতীয় পর্যায়, তখনও হয়ত প্রাথমিক পর্যায়ের ক্ষতচিহ্ন পড়ে আছে এমনটি অসম্ভব নয়। অর্থাৎ কিনা শেষোক্ত ক্ষেত্রে প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের মধ্যে ব্যবধান বলতে কিছুই নেই।

জানি, সিফিলিসের প্রথম প্রকাশ আত্মক্ষত, তখন সিফিলিস বীজাণুসমূহ মোটামুটিভাবে সীমিত থাকে স্থানীয় অঙ্গে, যেমন গোপনাঙ্গ কিংবা লসিকা-গ্রন্থিতে, অবশ্য প্রাথমিক অবস্থার প্রথম দিকেই বীজাণুসমূহ টিশু থেকে রক্তে ছড়িয়ে পড়ে, তবে কিনা অল্পস্বল্প পরিমাণে। দেহের প্রথম বাধা আত্মক্ষত, দ্বিতীয় বাধা লসিকাগ্রন্থি সেটাও যখন ভেঙ্গে পড়ে, সমগ্র শরীরে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে অনায়াসেই এবং অতিশয় সংখ্যাভারে বীজাণুসমূহের সর্বাত্মক বিপুল বিস্তৃতি ঘটে, সচরাচর দশ সপ্তাহ পরে। যেন সিসটেমিক বীজাণুদূষণ ঘটেছে। তারপর মূল আশ্রয়স্থল (রক্ত) ত্যাগ করে দেহের বিভিন্ন টিশুতে থিতু হয়—এই হল দ্বিতীয় পর্যায়।

এবংবিধ সর্বাত্মক ব্যাপক বিস্তৃতি হেতু লক্ষণাবলী দেখা দেয় এবং দেহস্থ টিশুসমূহের, বিশেষ করে চর্ম ও শ্লেষ্মঝিল্লীর প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া বোঝায়। এভাবে জাত ক্ষতসমূহে বহুল পরিমাণে বীজাণু থাকে, অতএব দ্বিতীয় পর্যায়ের ক্ষতমাত্রই প্রবলভাবে সংক্রামক।

দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত লক্ষণাবলী ভয়ঙ্করভাবে পরিবর্তনশীল, কী না হতে পারে। মোটামুটিভাবে পাঁচটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা যেতে পারে মৌলিক লক্ষণাবলী :

এক, দৈহিক উপসর্গ। পূর্বেই বলেছি সমগ্র রক্তসংবহনতন্ত্রে বীজাণুসমূহ সঞ্চালিত, যেন সিসটেমিক বীজাণুদূষণ ঘটেছে। কাজে কাজেই দৈহিক উপসর্গ দেখা দিতে পারে : গা ম্যাজ ম্যাজ করা। অল্প অল্প অনিয়মিত জ্বর। মাথা ধরা। অরুচি, ক্ষুধামান্দ্য। হাড়ে বা গাঁটে ব্যথা। অবসাদ।

দুই, চর্মরোগ। হামের মত র‍্যাশ। কিংবা চক্কর চক্কর। দেখা দেয় দূষিত মিলনের দুমাস পরে। দেহের যে কোন অঙ্গে কিংবা সর্বত্র ব্যাপ্ত। অণ্ডকোষে কিংবা অন্যত্র, গোলাকার, ডিম্বাকার, শল্কযুক্ত, তামা-লাল। অচিকিৎসিত থাকলে কয়েক সপ্তাহ থেকে দু তিন মাস পরে আপনাআপনি মিলিয়ে যায়, চিকিৎসায় ১০ থেকে ২০ দিনের মধ্যে। আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য : দেহের উভয়পার্শ্বে সমানভাবে ছন্দোবদ্ধভাবে বিন্যস্ত। হাতের চেটোয় এবং

পায়ের তলাতেও আবির্ভূত। ব্যথাহীন এবং কখনও চুলকায় না। ভয়ঙ্কর ছোঁয়াচে।

তিন, মিউকাস প্যাচ। মুখে, ওষ্ঠে, জিহ্বায়, অণ্ডকোষে, পায়ুদেশে, বহির্যোনিতে দেখা দেবে 'ইরোসান' নামক একপ্রকার অগভীর ছোঁয়াচে ক্ষত, ব্যথাহীন এবং একাধিক। এটাই যখন পাতলা ধূসর পর্দা দিয়ে ঢাকা, এরই নাম হবে মিউকাস প্যাচ। মুখমধ্যে ফ্যারিংক্স বা ল্যারিংক্স, গলবিল, বাগ্‌যন্ত্র আক্রান্ত হলে গলাব্যথা হবে, স্বরভঙ্গ হবে।

চার, বিশেষ আঁচিল। কনডাইলোমেটা ল্যাটা। উষ্ণ আর্দ্র অঞ্চলে, যেমন, পেরিনিয়মে, বহির্যোনিতে, অণ্ডকোষে, পায়ুদেশের চারপাশে, উঁচু উঁচু চ্যাপ্টা ধরনের আঁচিল দেখা দিতে পারে। এটা সংক্রামক।

পাঁচ, বিবিধ। সমগ্র দেহব্যাপী লসিকাগ্রন্থি, যেমন ঘাড়ে, বগলে, চিবুকের নীচে, ব্যথাহীন স্ফীতি। কেশপতন—এক খাবলা মাথার চুল পড়ে যেতে পারে; ক্বচিৎ কখন ভ্রূকেশ কিংবা আঁখিপল্লব ঝরে যায়। কদাচিৎ চক্ষুপ্রদাহ, ন্যাবা (লিভার প্রদাহ)। কখন রক্তোৎপাদক গ্রন্থি আক্রান্ত, রক্তহীনতা যার পরিণাম।

এটাই নিয়ম যে উপরিউক্ত লক্ষণাবলী ধ্বংস করে না কিছু, স্কার টিশু বা ফাইব্রাস টিশু সৃষ্টি না করেই শুকিয়ে যায়, কিছুকালের মধ্যেই এবং চিকিৎসা না করালেও। সচরাচর কয়েক সপ্তাহ থেকে কয়েক মাস, ক্বচিৎ কখন একবছরের মত টিঁকে থাকতে পারে। আবির্ভাবের কয়েক মাস পরেই দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত লক্ষণাবলী ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হবে। এমনকি অচিকিৎসিত থাকলেও। শেষোক্ত ক্ষেত্রে অবশ্য পুনরাবির্ভূত হতে পারে, যদিচ প্রকাশভঙ্গীর তীব্রতায় রকমফের থাকে। এভাবে ৪।৫ বছর পর্যন্ত (আর্লি লেটেণ্ট দশায়) সংক্রামক থাকলেও থাকতে পারে।

তৃতীয় দশা

দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত লক্ষণাবলী আপনাআপনি মিলিয়ে যাবে। তারপর শুরু হবে আরেকটি অধ্যায়—সুপ্ত অবস্থা। কারণ, সিফিলিস নামক আগ্নেয়গিরি এই দশা কালে ঘুমিয়ে থাকে। দেখে মনে হবে রোগী বুঝি সুস্থ কিন্তু তা নয়, রোগটি ফল্গুনদীর মতই অন্তঃসলিলা থাকে। অবস্থাটা এতই স্বাভাবিক হয়ে আসে যে রোগীর কোন অভিযোগ বা কষ্ট থাকে না এবং চিকিৎসকের পরীক্ষার ফলাফলও

নেগেটিভ। শুধু মাত্র ধরা পড়ে ইতিহাসে এবং এক বা একাধিকবার রক্তপরীক্ষায়।

দেখা গেল, তরুণ সিফিলিস রোগের (প্রাইমারি এবং সেকেণ্ডারি ষ্টেজ) অসম্পূর্ণ কিংবা বিনা চিকিৎসার ফলাফল লেটেন্ট সিফিলিস। প্রাথমিক বীজাণুদূষণের দু বৎসর পরে যে স্থিতাবস্থা দেখা দেয় সেটাই সিফিলিসের তৃতীয় দশা। এই দশার প্রথম দু থেকে চার বছর হল আর্লি লেটেন্ট সিফিলিস এবং চার বছরের পর লেট লেটেন্ট সিফিলিস। এই সুপ্ত অবস্থার মেয়াদ এক রোগী থেকে অন্য রোগীতে ভিন্ন, তবে সকল ক্ষেত্রেই বৎসর গুণে, মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে এক দশকের কম নয়।

এক বছর, বড় জোর চার পাঁচ বছর কমবেশী সংক্রামক থাকার পর সম্পূর্ণরূপে লক্ষণবিহীন (কচিৎ কখন আর্লি লেটেন্ট অবস্থায় লক্ষণযুক্ত হয়ে সংক্রাম্যতা পেতে পারে)। এই সময়ে সংক্রাম্যতা থাকে না, যদিচ মাতা কর্তৃক জঠরস্থ শিশু স্পৃষ্ট হতে পারে।

চতুর্থ দশা

সুপ্ত অবস্থারও যদি চিকিৎসা না হয়, অঙ্কের নিয়মে যেমন তিনের পর চার আসে, তেমনি আসবে চতুর্থ দশা। এদশা দীর্ঘস্থায়ী, মানুষকে দুর্বল পঙ্গু করে দেয় এবং অনেকের কাছেই প্রাণঘাতী ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে।

লেট সিফিলিস-এর স্পষ্টতঃ প্রকাশ যখন দেখব তখন গড় হিসেবে প্রাথমিক বীজাণুদূষণের পর প্রায় দশ থেকে তের বছরের মত কেটে গেছে। কখন এর চেয়েও অধিককাল, এমনকি ৩০ বছর পর্যন্ত বিলম্বিত হতে পারে। আত্মপ্রকাশ করতে পারে দেহের যে কোন অংশে, শরীরের যে কোন তন্ত্রে। তবে কিনা অধিকাংশক্ষেত্রেই আক্রান্ত হয় চর্ম, মুখবিবর, কণ্ঠ, জিহ্বা, অস্থি আর অস্থিসন্ধি, কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্র, হৃদ্‌সংবহনতন্ত্র (রক্তবাহী শিরাধমনী এবং হৃৎপিণ্ড), অণ্ড, লিভার।

বিলম্বিত সিফিলিসের দুই মূর্তি। অপেক্ষাকৃত শান্তমূর্তি আর সংহারমূর্তি। প্রথমটিতে চর্ম, অধস্তক্ টিস্যু এবং অস্থি আক্রান্ত। দ্বিতীয়টিতে সিফিলিস অনবরত আঘাত হানছে দুই অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গে, নার্ভতন্ত্রে আর হৃদ্‌সংবহনতন্ত্রে।

বিলম্বিত সিফিলিস-এর একটি উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য : গামা। এটা হচ্ছে সিফিলিসজাত টিউমার। দেখা দিতে পারে দেহের যে কোন অংশে, তবে কিনা চর্ম এবং শ্লেষ্মঝিল্লীই প্রধানতঃ আক্রান্ত। ব্যথাহীন ধ্বংসকারী স্ফীতি, যা

কিছুকাল পরে ফেটে গিয়ে একটি ক্ষত সৃষ্টি করবে এবং এক্ষত সংক্রামক নয়। গামা যেখানে হবে সেখানকার টিশু ধ্বংস করে দেবে এবং পরে ভরাট হবে স্কার টিশু দিয়ে। ফলতঃ অঙ্গবিকৃতি অনিবার্য, নাকের গামা রোগে থ্যাবড়া নাক (স্যাডল নোস) অবশ্যম্ভাবী। জিহ্বায়, মুখবিবরে, কণ্ঠনালীতে গামার রূপটি হল ব্যথাহীন ক্ষত।

বিলম্বিত সিফিলিস দেহের যে কোন তন্ত্রে প্রকাশিত তথাপি সবচেয়ে বেশী আঘাত সইতে হয় নার্ভতন্ত্র আর রক্তসংবহনতন্ত্রকে। নার্ভতন্ত্রের সিফিলিসকে বলা হয় নিউরোসিফিলিস। প্রধানতঃ দু রকমের। এক, বহুদৃষ্ট টেবিস ডর্সালিস। এরোগের কয়েকটি ভয়াবহ পরিণাম: পুরুষত্বহীনতা, অন্ধত্ব, পায়ের পক্ষাঘাত। দুই, জেনারেল প্যারেসিস অব ইনসেন (সংক্ষেপে জি. পি. আই)। বাক্‌শক্তিরহিত ও শ্রবণশক্তিরহিত অবস্থা, অন্ধত্ব, পক্ষাঘাত, মানসিক গোলযোগ ইত্যাদি এরোগের ফলাফল।

হৃদ্‌সংবহনতন্ত্রের সিফিলিস কার্ডিয়োভ্যাস্‌কুলার সিফিলিস নামে খ্যাত। সিফিলিসজাত হৃদ্‌রোগে (ইনকম্পিটেন্স এ্যানজাইনা) আবির্ভূত হয় আত্মক্ষত প্রকাশের ২০ বছর পরে। আরেকটি মারাত্মক রোগ এ্যাওর্টা নামক মহা-ধমনীতে এ্যানিউরিজম। এরোগে ধমনীগাত্র দুর্বল ও স্ফীত, তারপর একদিন ফেটে গিয়ে মৃত্যু ঘটায়।

জন্মগত

শিশুর যে সিফিলিস তা সরাসরি আসে মায়ের কাছ থেকে, পিতার প্রত্যক্ষ কোন দায়িত্ব নেই। শিশু যখন মায়ের গর্ভে সংক্রমণব্যাপারটা তখনই ঘটে যায় এবং সব সময়ই ১৮ থেকে ২০ সপ্তাহ পরে। কারণ, সিফিলিস বীজাণু গর্ভরজ্জু দিয়ে ফুল (প্ল্যাসেন্টা) মারফৎ শিশুদেহে চালান যায় এবং ১৬ সপ্তাহের আগে এই ফুল পূর্ণ পরিণতি পায় না বলেই এই বিলম্ব।

মায়ের সিফিলিস যত নবীন হবে শিশুর রোগসম্ভাবনা ততই সমধিক হবে, লক্ষণাবলীও ততই প্রকট হবে। অর্থাৎ আর্লি সিফিলিসে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই শিশু আক্রান্ত—গর্ভপাত (২০ সপ্তাহ পরে) কিংবা মৃতসন্তান প্রসব। লেট সিফিলিসে সংক্রমণ-সম্ভাবনা আছে এই পর্যন্ত। তাছাড়া সম্ভাবনা যেমন কম তেমনি লক্ষণাবলী মৃদুগোছের। বিলম্বে আক্রান্ত হবে এবং পূর্ণ নমাসে জন্ম-গ্রহণ করে ব্যাধিত অবস্থায়, কখনবা মৃত অবস্থায়। এক কথায়, সিফিলিস রোগগ্রস্তা গর্ভবতী রমণীর হয় গর্ভপাত হবে, না হয় জন্ম দেবে মৃত সন্তানের কিংবা রোগগ্রস্ত শিশুর।

সিফিলিস রোগ নিয়ে জন্মেছে এমন শিশুদের ছবি প্রতিটি ক্ষেত্রেই এক নয়। কখন বৎসর বা দশক অতিক্রান্ত ধরা দেওয়ার আগে। কখনবা জন্মের পরই লক্ষণাবলী সুপরিস্ফুট।

২ বছর পর্যন্ত জন্মগত সিফিলিসের আর্লি অবস্থা। এই সময়ের মধ্যে, সচরাচর ২ থেকে ৬ সপ্তাহের মধ্যে, শিশুদেহে র‍্যাশ আবির্ভূত। নাক দিয়ে জল ঝরে, দীর্ঘ অস্থিসমূহে ব্যথাময় স্ফীতি, মুখে ও গুহ্যদেশে চর্মরোগ। প্রায়শঃ দেখা যায়, শিশুর বাড়বাড়ন্ত নেই।

শিশুর পরমায়ু ২ বছর পেরিয়ে গেলে, লেট অবস্থার লক্ষণাবলী একে একে প্রস্ফুটিত হবে। উপরের পাটিতে সামনের কৃন্তক (ইনসিসর) দাঁত গর্তযুক্ত, 'হাচিনসন'স টিথ' নামে অতিখ্যাত। মধ্যে নীচু থ্যাবড়া নাক। নাকের পর্দা বা তালু ছিদ্রযুক্ত। চক্ষুরোগ। চর্মরোগ। বিলম্বিত অবস্থা সচরাচর ধরা পড়ে চক্ষুপ্রদাহ, কর্ণপ্রদাহ এবং ব্যথাময় অস্থিস্ফীতির মাধ্যমে। কিডনি, লিভার, নার্ভতন্ত্র আক্রান্ত হতে পারে।

কখনবা শৈশব পেরিয়ে নবযৌবনে প্রকটিত, তখন দন্ত চক্ষু অস্থির বিকলতা (আংশিক অন্ধত্ব, বধিরতা, অস্থিবক্রতা ইত্যাদি), পক্ষাঘাত (নিউরো-সিফিলিস)।

রোগনির্ণয়

সাধারণতঃ সিফিলিসের আত্মক্ষতে সেপটিক লক্ষণাবলী অল্পতম বা নেই বললেই হয়, ব্যথা নেই কোন, অনেক রোগীরা তাই ধরে নেয় এটা হয়ত সামান্য একটা গোটা, ছড়ে গেছে, রতিঘর্ষণে কেটে গেছে কিংবা কোন পোকায় দাঁত বসিয়েছে। কোন রকম অসুবিধা হয় না বলেই উপেক্ষা করে, ডাক্তারের কাছে যায় না, বড় জোর নিজে নিজেই একটা মলম—এই কোন এ্যান্টিসেপটিক মলম —বেছে নেয়। এটা ঠিক নয়।

বস্তুতঃ গোপনাঙ্গে কোন ঘা হলেই ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত। বিশেষ করে অবৈধ সংসর্গের ইতিহাস আছে, তিন সপ্তাহ পরে ক্ষতটি আবির্ভূত এবং এক্ষত ব্যথাহীন, এটা তো অবশ্যকর্তব্য বিশেষ। সেই সঙ্গে কুঁচকিগ্রন্থি স্ফীত এবং ব্যথাহীন, এটা একরকম নিশ্চিত।

দীর্ঘ গুপ্ত (পর্যায়) অবস্থা, আত্মক্ষতর সামান্যতা, নিস্তরঙ্গ পুকুরের মত শান্ত নিরীহ কোর্স, শক্ত শক্ত অনুভূতি এবং স্থানীয় অর্থাৎ মলম চিকিৎসায় ব্যর্থতা—এবংবিধ লক্ষণাক্রান্ত ক্ষত দৃষ্ট হলে সিফিলিসের জন্যে পরীক্ষা করাই নিয়ম। অধিকন্তু, এইমাত্র উল্লেখ করা আদর্শ ছবিটি অনুপস্থিত থাকতে

পারে। একারণে, অধিকাংশ বিশেষজ্ঞই গোপনাঙ্গের ক্ষতমাত্রই সন্দেহের চোখে দেখেন, নির্দোষী প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত সিফিলিসই ধরে নেন।

রোগনির্ণয়ের উদ্দেশ্যে প্রধানতঃ দুটি পরীক্ষাই বহুল দৃষ্ট। এক, ক্ষতরস-পরীক্ষা। ক্ষতস্থান ক্রেপ করলে অর্থাৎ আদ্যক্ষত, মুখক্ষত, চর্মক্ষত এবং আঁচিল চেঁচে চেঁচে একপ্রকার রসক্ষরণ মিলবে, এটাই পরীক্ষিত হয় অণুবীক্ষণ যন্ত্রে, বীজাণুর দেখা পেলেই সিফিলিস রোগটি প্রমাণিত। একেই বলে ডার্ক ফিল্ড মাইক্রোসকপি।

দুই, রক্তপরীক্ষা। আমাদের দেশে W. R., Kahn, V. D. R. L. নামে যেসব রক্তপরীক্ষার কথা শোনেন সেটা আর কিছু নয় সিফিলিসের জন্যেই নিবেদিত। প্রয়োজনবোধে আরও তিনটি পরীক্ষা—বায়প্সি পরীক্ষা, এক্স-রে পরীক্ষা এবং মেরুজরস পরীক্ষা।

সিফিলিসের প্রথম দশা বলে দেবে ক্ষতরস পরীক্ষাই। রক্তপরীক্ষা অসার্থক, কারণ পজিটিভ হতে শুরু করে আদ্যক্ষত আবির্ভাবের ২/৩ সপ্তাহ পর থেকে। সুতরাং ডার্ক ফিল্ড মাইক্রোসকপিই একমাত্র আশ্রয়স্থল। একবার পরীক্ষায় ব্যর্থ হলেই হাল ছেড়ে দিতে নেই, পর পর কয়েকটি, কম করেও তিনটি, পরীক্ষা করাই নিয়ম। ক্ষতস্থানে মলম দিলেই ফলাফল নেগেটিভ হবে।

দ্বিতীয় দশায় রক্তপরীক্ষা সকল সময়ই পজিটিভ এবং প্রবলভাবেই পজি-টিভ। মুখক্ষত, চর্মক্ষত, আঁচিলজাত রসক্ষরণ পরীক্ষিত হলেই সিফিলিস বীজাণুর দেখা মিলবে।

সুপ্তদশা শুধু মাত্র রক্তপরীক্ষায় ধরা পড়ে, কখন একবার, কখনবা একাধিকবার পরীক্ষায়। অনেক সময় রুটিন রক্তপরীক্ষা করতে গিয়ে, যেমন গর্ভবতী রমণীর কিংবা রক্তদাতার পরীক্ষায় সুপ্ত সিফিলিসের সঙ্গে মোকাবিলা হতে পারে।

চতুর্থ বা অন্ত্যদশায় রক্তপরীক্ষা করাই নিয়ম। এবং বায়প্সি পরীক্ষা, যদি কোথাও গামা থেকে থাকে। জন্মগত সিফিলিস নির্ণীত হয় রক্তপরীক্ষায় আর অস্থিজ এক্সরে পরীক্ষায়।

রক্তপরীক্ষা

সিফিলিস রোগ নির্ণয়ে রক্তপরীক্ষার ভূমিকা অপরিহার্য, অপরিহার্য চিকিৎসার অঙ্গ হিসেবেও। রক্তপরীক্ষার মূল সূত্রটি এই: সিফিলিস বীজাণু শরীরে প্রবিষ্ট হয়ে এ্যান্টিজেন হিসেবে কাজ করে এবং এরই প্রতিক্রিয়াস্বরূপ

দেহ সৃষ্টি করে এ্যান্টিবডি। রক্তপরীক্ষা এই এ্যান্টিবডিই খুঁজে ফিরে মরে এবং রক্তরসে এর চিহ্ন পেলেই ফলাফল পজিটিভ অর্থাৎ কিনা একদা রোগীদেহে সিফিলিস বীজাণু প্রবিষ্ট।

এ্যান্টিবডির আবির্ভাবকাল আদ্যক্ষত প্রকাশের কয়েক দিন থেকে কয়েক সপ্তাহ পরে, তখন রক্তপরীক্ষা পজিটিভ হবে। এবং দ্বিতীয় দশায় অনিবার্য-ভাবেই পজিটিভ।

সুতরাং বীজাণুদূষণের প্রথম চার সপ্তাহে, যখন এ্যান্টিবডি তৈরী হতে শুরু করে, রক্তপরীক্ষা অসার্থক। ছ থেকে আট সপ্তাহ সময় নেয় পজিটিভ হতে এবং আদ্যক্ষত আবির্ভাবের ৯০ দিন পরে প্রবলভাবে পজিটিভ হবেই।

আমাদের দেশে W. R. এবং Kahn নামক পরীক্ষা দুটি খুবই জনপ্রিয় এবং অনেকেই হয়ত এদের সঙ্গে পরিচিত। ইদানীং পেয়েছি V. D. R. L. পরীক্ষাটি এবং বর্তমানে খুবই ব্যাপকভাবে দৃষ্ট।

Kahn, W. R. কিংবা V. D. R. L. পজিটিভ হলেই সিফিলিস হয় না। কখন থাকে পরীক্ষাগত ত্রুটি, কখনবা অন্য কোন কারণ অর্থাৎ কিনা এ পরীক্ষা তিনটি স্পেসিফিক নয়, ফলাফল সুনিশ্চিত ধরে নিলে ভুল করা হবে। কারণ যাকে বলি 'ফল্স পজিটিভ' সেই মারাত্মক ভুল ফলাফল দেখা দিতে পারে রতিসম্পর্কিত নয় এমন সব ব্যাধিতে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিই: ভাইরাস নিউমোনিয়া, কোলাজেন ব্যাধি, ডায়াবিটিস, যক্ষ্মা, গ্ল্যাণ্ডিউলার ফিভার, ম্যালেরিয়া ইত্যাদি কতিপয় ট্রপিক্যাল ব্যাধি, কলেরা-বসন্ত টিকা নেওয়ার পর রক্তপরীক্ষা পজিটিভ হতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, ফলাফল নেগেটিভ অতএব সিফিলিস কোনদিন রোগীকে স্পর্শ করেনি একথা হলফ করে বলা অসম্ভব।

এবংবিধ ক্ষেত্রে পুনরায় পরীক্ষা করাই নিয়ম। বিশেষ করে স্পেসিফিক রক্ত পরীক্ষাসমূহের যে কোন একটি। T. P. I. এবং Reiter Test সমধিক প্রচলিত এবং T. P. I. পরীক্ষাই সর্বাধিক ফলপ্রদ। এপরীক্ষা সুনিশ্চিত, কারণ পজিটিভ ফলাফল অব্যর্থ প্রমাণ হিসেবে স্বীকৃত এবং নেগেটিভ রিপোর্টের ভিত্তিতে রোগীকে বিশ্বাস করা যায়। দুঃখের বিষয়, এজাতীয় পরীক্ষার চলন নেই আমাদের দেশে।

সম্প্রতি আমাদের দেশে যা চলে তার নাম W. R. এবং V. D. R. L.। পজিটিভ ফলাফল সিফিলিসের প্রায় নিশ্চিত প্রমাণ, যদি রোগের লক্ষণাবলী প্রকাশিত, পরিষ্কারভাবে এবং স্পষ্টভাবে। লক্ষণাবলীর অভাবে পজিটিভ রিপোর্ট অসার্থক, কারণ 'মিথ্যা পজিটিভ' হতে পারে। এটা পজিটিভ থাকে

তিন মাসের মত, বড় জোর ছ মাস, অতএব পুনরায় পরীক্ষা বিধেয়তে। তিন মাস কিংবা ছ মাস পরের পরীক্ষায় প্রায়ই দেখব ফলাফল নেগেটিভ কিংবা টাইটার কমে এসেছে। একটা সত্য ঘটনা বলি :

"এক গর্ভবতী রমণীর বেসরকারী হাসপাতালের রুটিন রক্তপরীক্ষায় W. R. প্রবলভাবে পজিটিভ এবং দশ দিনের জন্যে পেনিসিলিন ইঞ্জেকশনের নির্দেশ। তারপর সংসারে ঘোর অশান্তি, তুমুল দাম্পত্যকলহ। স্বামী অবশ্য স্ত্রীকে সন্দেহ করেননি, দোষারোপ করলেন স্ত্রীর পিতাকে। অর্থাৎ শ্বশুরমশাই থেকে সিফিলিস পেয়েছে তার কন্যা। শেষমেশ আমার কাছে আগমন। অন্য একটি ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করে দেখা গেল W. R. ও Kahn সম্পূর্ণরূপে নেগেটিভ।"

শুধু ইতিহাস আছে কিংবা একটি রক্তপরীক্ষার ফলাফল যথেষ্ট নয়। পজিটিভ হলেই যেমন স্বীকৃতি দিতে বাধে, তেমনি নেগেটিভ হলেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এর সঙ্গে যুক্ত হবে রোগলক্ষণ, কিংবা পুনঃপুনঃ রক্তপরীক্ষা, তবেই না রোগটি প্রমাণিত হবে।

চিকিৎসা

রোগনির্ণয় ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে প্রথমেই। অনুবীক্ষণ যন্ত্রে ডার্ক ফিল্ড পরীক্ষায় কিংবা রক্তপরীক্ষায় অবশ্য প্রমাণিত হবে। তারপর চিকিৎসা। এই উদ্দেশ্যে পেনিসিলিনই শ্রেষ্ঠ এবং আদর্শস্থানীয়।

সর্বপ্রকার সিফিলিস রোগে—প্রতিটি দশায় এবং জন্মগত সিফিলিসেও—পেনিসিলিন নির্বাচিত হবে প্রথমেই। উজ্জ্বল ব্যতিক্রম পেনিসিলিন এ্যালার্জি, তখন অগতির গতি টেট্রাসাইক্লিন কিংবা এরিথ্রোমাইসিন জাতীয় ঔষধ।

এই পেনিসিলিন কদাচ সেবনীয় নয়, ইঞ্জেকশন নিতে হবে। এবং তরুণ সিফিলিসে একাদিক্রমে দশ দিনের বেশী নয়। ১৪ থেকে ২১ দিন একনাগাড়ে ইঞ্জেকশন দেওয়া হয় পুরাতন সিফিলিসে।

সিফিলিসের চিকিৎসায় আর্সেনিক এবং পারদঘটিত ঔষধের কোন ঠাঁই নেই। বিসমথ-এর ভূমিকা থাকলেও, সেটা ক্ষীণ, সামান্য, সর্বোপরি বিতর্কিত এবং সর্বজনগ্রাহ্য নয়।

তরুণ সিফিলিস

সাধারণতঃ, ছ লাখ পরিমিত প্রোকেন পেনিসিলিন (কখনবা পি. এ. এম) ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়। প্রত্যহ একবার, এভাবে মোট দশ দিন; কেউ কেউ পছন্দ করেন বার দিন, এপন্থায় ৯৭% সাফল্যলাভ। কোন কোন বিশেষজ্ঞ

একাধিক কোর্স ইঞ্জেকশন দেন ১০০% আরোগ্যলাভের আশায়। আরোগ্য-লাভের পর দু বৎসরকাল চিকিৎসকের পর্যবেক্ষণে থাকতে হয়, এই সময় রোগটি রিল্যাপ্স করতে পারে, রক্তগত কিংবা অঙ্গগত পরীক্ষায়। তখন এই একই ইঞ্জেকশন ২৪ দিন ধরে একনাগাড়ে দেওয়াই নিয়ম।

কোন কোন বিশেষজ্ঞের পক্ষপাত বেঞ্জাথিন পেনিসিলিনে, ২৪ লাখ পরিমাণে একই সময় একই দিনে দুই কিংবা এক পাছায় ইঞ্জেকশন, কারণ রোগী যদি ফিরে না আসে এদের সংক্রাম্যতা থাকবে না। এবং আরোগ্যসম্ভাবনাও অতি উজ্জ্বল। আমরা জানি, আরোগ্যলাভের জন্যে রক্তের প্রতি মিলিলিটারে ০.০৩ ইউনিট পেনিসিলিন মাত্রা কার্যকরী থাকা চাই, দশ দিন ব্যাপী এবং একনাগাড়ে। এমনটি সম্ভব শুধু একটি বেঞ্জাথিন ইঞ্জেকশনে। কার্যতঃ, এটাই অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহৃত, বিশেষ করে হাসপাতালের চিকিৎসায়। প্রসঙ্গতঃ বলে রাখি, কেউ পছন্দ করেন একটির পরিবর্তে দুটি ইঞ্জেকশন, অর্থাৎ প্রতি সাত দিনে একবার ইঞ্জেকশন।

পেনিসিলিন যদি সহ্য না হয়, এ্যালার্জিগত (অতিসংবেদনশীল প্রতিক্রিয়া) কাতরতায় কিংবা ইঞ্জেকশন বিভীষিকায়, সেবনীয় ঔষধ ছাড়া উপায় কী! কয়েকটি ঔষধের নাম বলছি: ক্লোরটেট্রাসাইক্লিন, অক্সিটেট্রাসাইক্লিন, টেট্রা-সাইক্লিন, ক্লোরামফেনিকল, এরিথ্রোমাইসিন। ৫০০ মিলিগ্রাম পরিমাণে ছ ঘণ্টা অন্তর সেবনীয়, একাদিক্রমে পনের দিন। ছমাস পরে আরেকটি পনের দিনের কোর্স।

পুরাতন সিফিলিস

বর্তমানে ফিভার থেরাপি অসার্থক। মূল্যহীন বিসমথ চিকিৎসা লোপ পেতে বসেছে। টিঁকে আছে শুধু পেনিসিলিনই। অর্থাৎ কিনা এক্ষেত্রেও পেনিসিলিন নির্বাচিত হবে, তবে কিনা অনেকদিন ধরে, আক্রান্ত অঙ্গ ভেদে ১৪ থেকে ২১ দিন। প্রোকেন পেনিসিলিন প্রত্যহ ছ লাখ কিংবা এই একই পরিমাণে একদিন অন্তর পি. এ. এম ইঞ্জেকশন। কেউ পছন্দ করেন ৩০ লাখ বেঞ্জাথিন পেনিসিলিন, প্রত্যেক সপ্তাহে একটি করে মোট তিনটি ইঞ্জেকশন তিন সপ্তাহে।

রোগীকে এই মর্মে সচেতন করে দেওয়া ভাল, যে প্রথম দিন পেনিসিলিন ইঞ্জেকশনের সময় বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। যেমন, জ্বর। মাথাধরা। গা ম্যাজ ম্যাজ করা। মুখে উষ্ণতা বোধ এবং ঘেমে নেয়ে ওঠা। তবে সকল ক্ষেত্রে নয়, ইঞ্জেকশনের কয়েক (৬-১২) ঘণ্টার মধ্যে দেখা দেয় এবং কিছুক্ষণের

মধ্যেই মিলিয়ে যায়। সুখের কথা, এটা মারাত্মক নয় এবং ভয়েরও কিছু নেই। আর এটাই যদি ভাবনা হয়ে ওঠে, প্রথম তুদিন ইঞ্জেকশনের পূর্বে ষ্টেরয়েড বড়ি খান, এদের হাত থেকে রেহাই পাবেন।

জন্মগত সিফিলিস

বর্তমানে গর্ভবতী রমণীর রুটিন রক্তপরীক্ষা করা হয়, কাজে কাজেই জন্মগত সিফিলিসের হার খুবই কম। তথাপি চোখে যদি পড়ে, গর্ভবতী রমণীকে দশ দিন ব্যাপী পেনিসিলিন ইঞ্জেকশনই শ্রেয়ঃ।

রুটিন রক্তপরীক্ষার ফলাফল যদি পজিটিভ হয়, প্রোকেন পেনিসিলিন ইঞ্জেকশন দিতে হয়, প্রত্যহ ছ লাখ করে, দশ দিন। গর্ভাবস্থার প্রথমদিকে, এমনকি প্রসবের চার মাস পূর্বেও, ইঞ্জেকশন যদি পড়ে শিশু রক্ষা পাবে। একারণে সন্দেহের অবকাশ থাকলেই এক কোর্স পেনিসিলিন বাঞ্ছনীয়। যেমন কোন রমণী একদা রোগগ্রস্ত শুধু এই সুবাদে যতবারই গর্ভবতী হবেন ততবারই গর্ভারম্ভে ইঞ্জেকশন নেওয়া ভাল। আরও ভাল নবজাতকের রক্তপরীক্ষা করিয়ে নেওয়া। স্বামীর তু বছর ফলো আপের সময় স্ত্রী গর্ভবতী, এক্ষেত্রেও এই একই সতর্কতা প্রযোজ্য। রক্তপরীক্ষা পজিটিভ হলে শিশুকেও দশ দিন ইঞ্জেকশন দিতে হবে, মনে রাখবেন জন্মান্ধতা ও বধিরতার একটি প্রধান কারণ সিফিলিস।

ফলো আপ

ফলো আপ অর্থাৎ পর্যবেক্ষণ চিকিৎসারই অপরিহার্য অঙ্গ। ভুলবেন না, পর্যবেক্ষণ বিনা চিকিৎসা অসম্পূর্ণ এবং সম্পূর্ণ আরোগ্যতা সম্বন্ধে ছাড়পত্রও মিলবে না রোগীর। এক কথায়, রোগীর সুস্থতা এবং সমাজের সুস্থতা উভয় বিচারেই ফলো আপ প্রয়োজনীয়। সম্পূর্ণরূপে সুস্থ না হলে রোগটি একদিন ভয়ঙ্কররূপে আত্মপ্রকাশ করবে, তখন রোগীদেহে ভাঙ্গন ধরবে নিশ্চিত, পঙ্গু তুর্বল করে রেখে দেবে। অধিকন্তু, রিল্যাপ্স হেতু রোগী যদি সংক্রামক হয়ে ওঠে আরও পাঁচজনকে সংক্রমিত করবে, এতে সমাজেরই ক্ষতি।

তরুণ সিফিলিস

তরুণ সিফিলিসে তু বছর চিকিৎসকের পর্যবেক্ষণে থাকাই নিয়ম। সেবনীয় ঔষধ দ্বারা চিকিৎসিত হলে আরও অধিককাল ব্যাপী পর্যবেক্ষণে থাকাই বাঞ্ছনীয়। এই সময়ে রোগীর রক্তপরীক্ষা করা হয় এবং সেই সঙ্গে দেহগত পরীক্ষাও (বিশেষ করে চর্ম, মুখবিবর, অণ্ডকোষ, পেরিনিয়ম, গুহ্যদেশের পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা)।

চিকিৎসার পর 'প্রথম তিন মাসে তিন বার, প্রতি মাসে এক বার করে,

তারপর তিন মাস অন্তর অন্তর তিনবার রক্তপরীক্ষা করাই নিয়ম। প্রথমবর্ষ-শেষে মেরুজরসপরীক্ষা (স্পাইনাল ফ্লুইড) করাতে হয়, ফলাফল নেগেটিভ হলে এপরীক্ষা আর নয়। অন্যথায় দ্বিতীয় বর্ষের মেয়াদ শেষ হলেই পুনরাবৃত্ত হবে। দ্বিতীয় বর্ষে রক্তপরীক্ষা দুবার করালেই যথেষ্ট, প্রতি ছ মাসে একবার।

রক্তপরীক্ষার ফলাফল চিকিৎসার কয়েক সপ্তাহের, এই ন থেকে ষোল সপ্তাহের মধ্যেই নেগেটিভ হয়ে পড়ে। কখন কখন পজিটিভ থাকলেও থাকতে পারে, ৪ থেকে ৬ মাস পর্যন্ত। থাকুক, টাইটার যদি ক্রমশঃ ক্ষীয়মান থাকে উদ্বেগের কারণ নেই।

কতিপয় ব্যক্তি পুনরায় নতুন করে সিফিলিস কবলিত হতে পারে। এবং অল্পসংখ্যক (৩%-৫%) রোগীদেহে রোগটি পুনরাবির্ভূত হবে অর্থাৎ রোগটি রিল্যাপ্স করবে, চিকিৎসা সত্ত্বেও। এটা ধরা পড়বে রক্তপরীক্ষায়, তখন হঠাৎ প্রবলভাবে পজিটিভ হবে কিংবা টাইটার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাবে। প্রসঙ্গতঃ বলি, রিল্যাপ্স-এর আশঙ্কা প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রথম বৎসরে সীমিত এবং ফলো আপের প্রথম ছ মাসে সবচেয়ে বেশী। কাজে কাজেই, প্রথম ছ মাস স্ত্রীসংসর্গ বন্ধ রাখাই ভাল আর এটা যদি একান্তই অসম্ভব হয়ে পড়ে কন্‌ডম্ ছাড়া উপায় কী!

পুরাতন সিফিলিস

পুরাতন সিফিলিসে ফলো আপ ব্যাপারটা আরও জটিল। কোন নির্দিষ্ট সময় সীমা নেই, আজীবন চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ রাখাই বাঞ্ছনীয়।

গামা হলে বৎসরে একবার এবং হৃদ্‌সংবহনতন্ত্রের সিফিলিসে তিন থেকে ছ মাস অন্তর একবার করে নিয়মিতভাবে রক্তপরীক্ষা করাই নিয়ম। রক্তপরীক্ষার ফলাফল নিম্ন টাইটারে কিংবা একই টাইটারে থাকতে পারে, মাভৈঃ, পুনরায় ইঞ্জেকশন নিষ্প্রয়োজন।

নার্ভতন্ত্রের সিফিলিসে রক্তপরীক্ষার ফলাফল বৎসরের পর বৎসর পজিটিভ থাকতে পারে, তথাপি কোন চিকিৎসা নয়, অবশ্য মেরুজরস পরীক্ষার ফলাফল, বিশেষ করে সেল-সংখ্যার স্বভাবিতা থাকা চাই। চিকিৎসাশেষে মেরুজরস পরীক্ষা করাতে হয় দুবার, ছ সপ্তাহ পর পর। তারপর প্রথম বর্ষ অতিক্রান্ত হলে একবার এবং দ্বিতীয়বর্ষ শেষে আর একবার।

বিবাহ

সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভের পরই বিবাহ সঙ্গত। এখনই হয়ত আপনি শুধাবেন : সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ কারে কয়? এপ্রশ্নের জবাব রাখি, দু বছর ফলো আপ

অন্তে যদি দেখি রোগী সুস্থ, কোন রকম লক্ষণাবলী দ্বারা আক্রান্ত নয়, রক্ত-পরীক্ষার ফলাফল নেগেটিভ এবং মেরুজরসপরীক্ষাও স্বাভাবিক, আক্রান্ত ব্যক্তিকে সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত বলব।

পুরাতন সিফিলিসের ক্ষেত্রে এদুটি প্রশ্নের সমাধান স্বভাবতঃই জটিল এবং দুরূহ। আপাততঃ বিশেষজ্ঞদের জন্যেই তোলা থাক এবং যদি কখন প্রয়োজন পড়ে এ দের কাছেই প্রশ্ন দুটি ছুঁড়ে দেবেন।

স্যাংক্রয়েড হচ্ছে পুরুষাঙ্গ কিংবা ভগদেশের রোগবিশেষ, রতিসহবাসে প্রাপ্ত এবং অতীব সংক্রামক। এরোগের বৈশিষ্ট্য সংক্রমিত স্থানে ব্যথাময় সপুঁজ ক্ষত এবং বাঘী।

হিমোফাইলাস ডুক্রে, সংক্ষেপে ডুক্রে ব্যাসিলাস নামক বীজাণু দ্বারা সৃষ্ট ব্যাধির নাম স্যাংক্রয়েড। আইনতঃ সংজ্ঞায়িত ভি-ডি-ত্রয়ের অন্যতম, যদিচ অন্য দুটির—সিফিলিস আর গণোরিয়া—মত এক পর্যায়ভুক্ত নয় এবং ভয়ঙ্কর পরিণতিও নেই কোন।

ডাক্তার-নার্সদের আঙ্গুলে আপতিক বীজাণুদূষণের বিরল ঘটনা ইতস্ততঃ ছড়িয়ে থাকলেও, এরোগ মূলতঃ সহবাসজাত, যার ফলে ক্ষত সৃষ্ট হয় পুরুষাঙ্গে বা ভগদেশে। এই ক্ষত নরম নরম, হার্ড শ্যাঙ্কার অর্থাৎ সিফিলিসের মত শক্ত নয়, একারণে সফট শ্যাঙ্কার নামেও পরিচিত।

এমন এক প্রকার রতিবাহিত ব্যাধি যার প্রকাশভঙ্গী এ্যাকিউট, বীজাণুদূষণ ব্যাপারটা পুরোপুরি স্থানীয় এবং স্বয়ং-সংক্রমিত (অটো-ইনঅকিউলেবল) অর্থাৎ বীজাণুদূষণের ফলে আবির্ভূত আদি ক্ষত থেকে একাধিক ক্ষত সৃষ্ট হয় স্বয়ং-সংক্রমণের ফলেই।

এই ব্যাধি সচরাচর পরিলক্ষিত হয় গ্রীষ্মপ্রধান এবং অর্ধগ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলসমূহেই। এবং নারী অপেক্ষা পুরুষরাই অধিক আক্রান্ত।

স্যাংক্রয়েডের ইতিহাস একটিই: একদা সিফিলিসের প্রকারভেদ রূপে বিবেচিত। ১৮৮৯-এ রোগোৎপাদক বীজাণু আবিষ্কৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এভ্রান্ত ধারণার নিরসন ঘটে।

এরোগের গুপ্ত পর্যায় দু থেকে পাঁচ দিন। মিলনের দু পাঁচ দিন পরে রোগলক্ষণ দেখা দেবে, তখন চোখে পড়বে গোপনাঙ্গে একটা ছোট্ট গোটা, ফুস্কুড়ি বা ফোস্কা, এবং এটাই গলে গিয়ে সৃষ্টি করবে একটা ক্ষত (আলসার), অসমপ্রান্ত, ব্যথাপ্রদ এবং সপুঁজ। এথেকে প্রচুর পুঁজ ঝরবে এবং ব্যথাও হবে।

পুরুষের ক্ষেত্রে ক্ষতস্থানটি সাধারণতঃ লিঙ্গগ্রীবায়, অগ্রচ্ছদায়, বিশেষ করে অভ্যন্তরগাত্রে ও অগ্রচ্ছদাসংযোজকে, এবং পুরুষাঙ্গ-দেহে। নারীর বৃহদোষ্ঠে, ক্ষুদ্রোষ্ঠে, ভগাঙ্কুরে, ভগচত্বরে, ক্ষুরশেটে, যোনিমুখে। একটি ক্ষত থেকে

একাধিক ক্ষত সৃষ্ট হতে পারে এবং হয়েও থাকে, স্বয়ং-সংক্রমণ হেতু সাক্ষাৎ সংস্পর্শের ফলে ছড়িয়ে পড়তে পারে পুরুষাঙ্গের কিংবা ভগদেশের লাগোয়া অংশে কিংবা পায়ুদেশে, জঘনদেশে, উরুতে, তলপেটে।

এক তৃতীয়াংশ থেকে অর্ধেকের কিছু অধিক ক্ষেত্রে কুঁচকিস্থিত গ্রন্থি জড়িয়ে পড়ে—সাধারণতঃ একদিকেই, কচিৎ কখন দুদিকে। এরই ফলাফল হিসেবে প্রথমে গ্রন্থিপ্রদাহ, পরে দূষিত স্ফোটক। কুঁচকিতে উৎপন্ন এই স্ফোটক কিংবা কুঁচকিফোলা এই রোগবিশেষেরই নাম বাঘী (বিউবো)।

কুঁচকিতে এক বা একাধিক গ্রন্থি স্ফীত, সেই সঙ্গে ব্যথা। ক্রমশঃ স্ফীত হতে থাকে, উপরিভাগের চামড়া লাল হয়ে ওঠে, হাত দিলে ব্যথা, এমনকি চলতে ফিরতেও। তারপর পাতলা হতে হতে ফেটে গিয়ে পুঁজ পড়তে থাকে। একাধিক স্ফীত গ্রন্থির ক্ষেত্রে জোড়া লেগে গিয়ে বৃহৎ গ্রন্থিতে পরিণত এবং পূর্ববৎ একই অবস্থা প্রাপ্ত হয়। প্রদাহযুক্ত গ্রন্থি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, ব্যথাময় এবং প্রায়ই পেকে যায়, এবংবিধ ঘটনরাজীই চলতি কথায় বাঘী।

চিকিৎসার অভাবে কিংবা অসম্পূর্ণ বা ভুল চিকিৎসায় গোপনাঙ্গের ঘা আস্তে আস্তে শুকিয়ে যেতে পারে কিংবা স্বয়ং-সংক্রমণের ফলে একাধিক ক্ষত। আর কুঁচকি যদি ফুলে থাকে, সেটা পেকে যাবে। ফলে যে ক্ষত উৎপন্ন হবে, সেটা কুঁচকি বরাবর উপর নীচ বাড়তে থাকে।

তুলির এক আঁচড়ে রোগলক্ষণের ছবিটি এই: গোপনাঙ্গের বীজাণুদূষণ, এ্যাকিউট এবং স্থানীয়। এরোগ ছড়ায় না এবং ভয়ঙ্কর কোন সিসটেমিক জটিলতা নেই। অর্থাৎ সমগ্র শরীরে ব্যাপ্ত হয় না কখন। জটিলতা যদি কিছু থাকে সেটা পুরোপুরি স্থানীয়—বহুদৃষ্ট জটিলতা বাঘী। কচিৎ কখন, মুদা, উল্টামুদা, লিঙ্গাগ্র-প্রদাহ।

স্যাংক্রয়েডের সঙ্গে অন্যান্য রতিবাহিত ব্যাধির সহাবস্থান সম্ভব। বিশেষ করে গণোরিয়া এবং সিফিলিস। একারণে রোগমুক্তির ১০ দিন পরে রক্তপরীক্ষা করণীয়।

রোগনির্ণয়ের তিনটি উপায় : স্মিয়ার পরীক্ষা এবং কালচার পরীক্ষা এবং চর্মপরীক্ষা (আই-টি-ও টেষ্ট)। স্মিয়ার পরীক্ষার উপকরণ দুটি, গোপনাঙ্গের ক্ষতস্থান থেকে নিঃসৃত ক্ষরণ কিংবা বাঘীর পুঁজ এবং পরীক্ষায় ডুক্রে ব্যাসিলাস পাওয়াটাই নিশ্চিত প্রমাণ। এপরীক্ষা সহজসাধ্য এবং সর্বাধিক প্রচলিত। কালচার পরীক্ষা কষ্টসাধ্য, কালেভদ্রে আশ্রিত। আর সন্দেহজনক ক্ষেত্রে ডুক্রে ভ্যাকসিন দিয়ে চর্ম পরীক্ষা করাই বিধি।

শ্যাংক্রয়েড চিকিৎসায় সালফাজাতীয় ঔষধই প্রথম নির্বাচিত এবং অশেষ ফলপ্রদ। আরও কয়েকটি কার্যকরী ঔষধের নাম বলছি: ষ্ট্রেপটোমাইসিন ইঞ্জেকশন, টেট্রাসাইক্লিন বড়ি। কমপক্ষে সাত দিন ঔষধ সেবনীয়, অন্যথায় রিল্যাপ্স অর্থাৎ কিছুকাল পরে পুনরাবির্ভূত। তিন মাস পরে সিফিলিসের জন্যে রক্ত-পরীক্ষা অবশ্যকরণীয়।

সুচিকিৎসায়, ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই ব্যথা কমতে থাকে, তারপর দেখা দেয় ক্ষতস্থানে পুঁজের অভাব অর্থাৎ শুকোতে আরম্ভ করে। এই মত বাঘীও ধীরে ধীরে আরোগ্যলাভের দিকে এগিয়ে চলে: প্রথমে ব্যথার উপশম তারপর কমতে থাকে স্ফীতিভাব। আর দুর্ভাগ্যবশতঃ যদি কখন পেকেই যায় সার্জারী নৈব নৈব চ। অর্থাৎ অন্যান্য স্ফোটকের মত চিরে দেওয়া কখনই নয়। পরিবর্তে সিরিঞ্জ দিয়ে পুঁজ টেনে নেওয়া আর কিছু ঔষধ প্রবেশ করিয়ে দেওয়া।

১৭।

রাত্মক-

বিঘ্ন সৃষ্টি

তিরূপ

শ।

লিম্‌ফোগ্র্যানিউলোমা ভেনেরিয়ম্‌

ভাইরাসঘটিত একপ্রকার বিশেষ রতিবাহিত ব্যাধি। গোপনাঙ্গে ক্ষণস্থায়ী ক্ষত, বাঘী এবং পরবর্তীকালে কুঁচকিতে, গোপনাঙ্গে, পায়ুদেশে কতিপয় জটিলতা দিয়ে বিশেষভাবে চিহ্নিত।

চতুর্থ ভি-ডি রূপেও খ্যাত। কিন্তু প্রথম তিনটির—গণোরিয়া, সিফিলিস, স্যাংক্রয়েড—তুলনায় দুর্লভ বলাই ভাল। রোগটি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সমগ্র পৃথিবীতে, যদিচ গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলেই দাপট বেশী এবং নিগ্রোসমাজেই সমধিক দৃষ্ট। স্যাংক্রয়েডের মত রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের অনেকেই নাবিক। কাজেই, ⁻াতসমুদ্র পাড়ি দিতে দিতে জাহাজ যেখানে ভিড়বে সেই বন্দর লাগোয়া 'ঙ্গনাদের মধ্যেই দেখতে পাব এবং এই সব নাবিকরাই স্বদেশে আমদানি

আস্তে

:রোগটি। ইউরোপে দুর্লভ হলেও মাঝে মধ্যে যে উঁকি দেয় তার কারণ

আর

.াত্র উল্লেখ করা জাহাজী লোকেরাই এবং প্রবসিত নিগ্রোরাই।

সেটা

রোগটি রতিবাহিত এবং সংক্রামক—ততদিন পর্যন্ত সংক্রাম্যতা বজায় থাকবে যতদিন পর্যন্ত ক্ষতস্থান (গোপনাঙ্গ, কুঁচকি, মলাশয়, মূত্রনালী) থেকে ক্ষরণ নিঃস্যন্দিত হবে।

রোগোৎপাদক বীজাণুটি হচ্ছে ভাইরাস। ক্ল্যামিডিয়া খ্যাত স্পর্শসংক্রামক রোগবীজাণুগোষ্ঠীর অন্যতম সদস্য। রোগলক্ষণ দেখা দিতে দিতে কয়েকদিন কেটে যায়। অর্থাৎ কিনা এরোগের গুপ্ত পর্যায় কয়েক দিন থেকে কয়েক সপ্তাহ—সাধারণতঃ পাঁচ দিন থেকে একুশ দিন। রোগলক্ষণ তিনটি স্তরে বিভক্ত। প্রাথমিক পর্যায়ে গোপনাঙ্গে ক্ষণস্থায়ী ক্ষত। দ্বিতীয় স্তরে, কুঁচকিগ্রন্থি আক্রান্ত। তৃতীয় স্তরে, গ্রন্থিসমূহের আশেপাশে ফাইব্রাস টিশুজাত পরিবর্তনসমূহ এবং তজ্জনিত স্ফীতদশা।

সচরাচর মিলনের এক সপ্তাহ পরে প্রথম আদ্যক্ষত সূচিত হয় গোপনাঙ্গে—পুরুষের লিঙ্গাগ্রে, লিঙ্গগ্রীবায়, অগ্রচ্ছদায়; মেয়েদের ভগদেশে, যোনিগাত্রে, জরায়ুগ্রীবায়। এমনকি পায়ুদেশেও সম্ভব, ক্বচিৎ কখন মূত্রনালীতে। দেখা দেয় ছোট্ট একটি ফোস্কা বা ফুস্কুড়ি যা অচিরেই গলে গিয়ে ক্ষত সৃষ্টি করে—সচরাচর ব্যথাযুক্ত নয়, ক্ষুদ্র, অগভীর, সমপ্রান্ত এবং ক্ষতচিহ্ন না রেখেই তাড়া-

তাড়ি শুকিয়ে যায়। এক্ষত বুদবুদের মতই ক্ষণস্থায়ী, এতই নগণ্য, এতই ক্ষুদ্র যে নজরেই পড়ে না, প্রায়শঃ অজ্ঞাত থেকে যায়।

গোপনাঙ্গের ঘা শুকিয়ে যায়, তথাপি বীজাণুদূষণের চিহ্ন পড়ে থাকে লসিকা-গ্রন্থিসমূহে (লিম্ফ গ্ল্যাণ্ড)। এখন দ্বিতীয় পর্যায় শুরু। মিলনের ২।৩ সপ্তাহ পরে গ্রন্থিপ্রদাহ—কুঁচকিফোলা, কুঁচকিতে ব্যথা। এবং প্রায়শঃ প্রথম অভিযোগ এটাই। একাধিক গ্রন্থি স্ফীত হতে থাকে, তারপর একসঙ্গে জুড়ে গিয়ে একটা বড় বাঘীতে পরিণত। গ্রন্থিপ্রদাহ এখানেই থেমে থাকে না, সাধারণতঃ এগিয়ে যায় দীর্ঘস্থায়ী পুরাতন প্রদাহের দিকে—অধিকাংশই পেকে ফেটে যায়, পুঁজ পড়ে, সৃষ্ট হয় একাধিক নালী ঘা।

অচিকিৎসিত থাকলে বীজাণুদূষণ ছড়িয়ে পড়তে পারে মলনালীতে (কখন-বা সরাসরি আক্রান্ত হতে পারে)। বিশেষ করে মেয়েদের ক্ষেত্রেই এমনটি সম্ভব। প্রথমে পাতলা দাস্ত এবং পায়ুদেশে রক্তমিশ্রিত ক্ষরণ। পরে অর্থাৎ মলনালীপ্রদাহজাত ক্ষত শুকিয়ে যাওয়ার পরে, মলদেশে সঙ্কোচন কিংবা কৃত্রিম আবরণী (ষ্ট্রিকচার)।

কুঁচকিতে উৎপন্ন দূষিত স্ফোটক শুকিয়ে যাবে একদিন কিন্তু এমনই মারাত্মক-ভাবে ক্ষতচিহ্ন দিয়ে সঙ্কুচিত হবে যে লসিকানালীপথের চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি করবে। ক্রমপরিণতিস্বরূপ দেখা দেবে 'এস্থিয়োমিনি' নামক স্ফীতিরূপ ব্যাধিবিশেষঃ মেয়েদের ভগোষ্ঠ কিংবা ভগাঙ্কুর অশোভনভাবে অতিস্থূল। পুরুষের অণ্ডকোষ কিংবা পুরুষাঙ্গ শ্লীপদরোগীদের মত স্ফীত।

অচিকিৎসার ফলাফল অতএব আর কিছুই নয় তৃতীয় স্তরের রোগলক্ষণই। এবং এসবেরই মূলে রয়েছে সেই ফাইব্রাস টিশু যা ক্ষতস্থানে সঙ্কোচন ঘটায় এবং লসিকানালীপথে স্থায়ী প্রতিবন্ধকতা হেতু স্ফীতদশা।

প্রথমাবস্থায় লক্ষণাবলীই সহায়তাহস্ত প্রসারিত করে দেবে রোগনির্ণয়ে। এই সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠাকল্পে এবং জটিল অবস্থায় রোগনির্ণয়ের উদ্দেশ্যে 'ফ্রি টেষ্ট' নামক একপ্রকার বিশেষ চর্মপরীক্ষা বিধীয়তে।

চিকিৎসাপর্বে দেখব, অধিকাংশক্ষেত্রেই সালফাজাতীয় ঔষধ কিংবা টেট্রা-সাইক্লিন ব্যবহৃত। কখনবা ক্লোরামফেনিকল। একনাগাড়ে দশ থেকে চোদ্দ দিন দেওয়া হয়।

গ্র্যানিউলোমা ইঙ্গুইন্যাল

গোপনাঙ্গ অঞ্চলের একটা বড় অংশ জুড়ে লাল টকটকে ক্ষত, যা ক্রনিক (অর্থাৎ দীর্ঘস্থায়ী) এবং ক্রমবর্ধমান, এক কথায় এই হল গ্র্যানিউলোমা ইঙ্গুইন্যাল। 'ডোনোভানিয়া গ্র্যানিউলোমেটিস' সংক্ষেপে 'ডোনোভান বডি' নামক রোগবীজাণু দ্বারা সৃষ্ট একপ্রকার বিশেষ ব্যাধি, দীর্ঘস্থায়ী এবং সংক্রামক। এবং প্রধানতঃ রতিসহবাসেই অর্জিত।

মূলতঃ গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ব্যাধি এবং নিগ্রোসমাজেই দৃষ্ট। কেননা অধিকাংশ সংক্রমণের ঘটনা খুঁজে পাব নতুন পৃথিবী আমেরিকাতে, বিশেষ করে উত্তর আমেরিকায় বসবাসকারী কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যেই। তথাপি বলা যেতে পারে রোগটি দুর্লভ, পৃথিবীর যে কোন প্রান্তেই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। এবং সাতিশয় দুর্লভ শীতপ্রধান দেশে, যেমন ইউরোপে, সমুদ্রতীরবর্তী বন্দরে একটি দুটি উঁকি দেওয়া ঘটনা অবশ্য ব্যতিক্রম।

কেউ কেউ বলেন রোগটা নাকি আদৌ সংক্রামক নয়। আর হলেও অতিশয় মৃদু কারণ রোগগ্রস্ত ব্যক্তির স্ত্রী বা স্বামী কদাচ আক্রান্ত হয় না। এমনকি রোগের উৎস নিয়েও দ্বিধা আছে। উৎস বা সংক্রাম্যতা যতই বিতর্কিত হোক, সচরাচর রতিবাহিত ব্যাধি রূপেই গণ্য। এবং এটা সত্য যে এরোগ স্বয়ং-সংক্রমণের অধিকারী এবং প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যে (ডাইরেক্ট এক্সটেনসন) ছড়িয়ে পড়ে, যার ফলে ক্ষত ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত আর উপসর্গ এবং জটিলতা যদি কিছু থাকে তা মূলতঃ স্থানীয়, কদাচ সিসটেমিক নয়।

মিলনের ৮ থেকে ১২ সপ্তাহ পরে প্রকাশিত হতে থাকে রোগলক্ষণ। প্রথমেই দেখা দেবে একটি ছোট্ট ফোস্কা বা ফুস্কুড়ি—গোপনাঙ্গে (পুরুষাঙ্গে কিংবা ভগদেশে) কিংবা কুঁচকিতে কিংবা মূলাধারে। তারপর এটা গলে গিয়ে দেখা দেবে একটি ক্ষত—লাল টকটকে, ব্যথাহীন, একটুআধটু রস কাটে এবং চুপিসাড়ে বেড়ে চলে অর্থাৎ ধীরে ধীরে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। প্রত্যক্ষ সান্নিধ্য-এর প্রভাবে ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়বে গোপনাঙ্গ থেকে কুঁচকিতে। কুঁচকির খাঁজ দিয়ে নীচে নামবে মূলাধারে, সেখান থেকে পায়ুদেশের চতুষ্পার্শ্বে।

কুঁচকিগ্রন্থি প্রায়শঃ অনাক্রান্ত—এরোগের উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য, অতএব

রোগনির্ণয় সহায়কও বটে। ক্বচিৎ কখন গ্রন্থিবিজড়িত—স্ফীত কিন্তু পাক ধরে না কখন।

অচিকিৎসিত থাকলে এই ক্ষত ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাবে, কয়েক মাস পরে দেখব গোপনাঙ্গের একটা বিরাট অংশে বিস্তৃত—ক্যানভাসটা ছড়িয়ে আছে কুঁচকিতে, মূলাধারে, পুরুষাঙ্গদেহে কিংবা ভগোষ্ঠদ্বয়ে, ভগদেশে। এবং দেখতে কী ভয়ঙ্কর : টকটকে লাল, ভেলভেট মসৃণ, অসমতলগাত্র অর্থাৎ উঁচুনীচু, গ্র্যানিউলেসন টিশু, স্পৃষ্ট হলে রক্ত ঝরে।

এব্যাধি টিশু নষ্ট করে, নষ্ট-টিশুর দখল নিতে আসে ফাইব্রাস টিশু। ফলে কিছু স্থানীয় জটিলতা সম্ভব। যেমন পুরুষাঙ্গে যথার্থ বক্রতা। কিংবা পুরুষাঙ্গ-অণ্ডকোষ, ভগাঙ্কুর-ভগদেশ শ্লীপদরোগীদের মত স্ফীত।

রোগনির্ণয় লক্ষ্যভেদে দুটি তীর অব্যর্থ : স্মিয়ার পরীক্ষা এবং বায়প্সি পরীক্ষা। ক্ষতস্থান থেকে চেঁচে নেওয়া দ্রব্য স্মিয়ার পরীক্ষায় ডোনোভান বডি পাওয়া যায়। সন্দেহজনক ক্ষেত্রে কর্তিত গ্র্যানিউলেশন টিশু পরীক্ষা।

চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে ষ্ট্রেপটোমাইসিন ইঞ্জেকশন। কিংবা অক্সিটেট্রাসাইক্লিন, ক্লোরটেট্রাসাইক্লিন, টেট্রাসাইক্লিন, ক্লোরামফেনিকল, এরিথ্রোমাইসিন ইত্যাদি বড়ি। এসবই তিন সপ্তাহ কাল ধরে। ঔষধটি কার্যকরী হলে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই ক্ষতস্থান থেকে রস ঝরা বন্ধ হয়, শুকিয়ে যায়, তারপর শুরু হয় সুস্থ গ্র্যানিউলেশন টিশুর আবির্ভাব এবং এক পক্ষকালের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ। অল্পবিস্তর একটা ক্ষতচিহ্ন অবশ্য থেকে যাবে।

সামান্য মূত্রনালীপ্রদাহ

মূত্রনালীপ্রদাহের লক্ষণাবলী সুপরিস্ফুট অথচ উৎস সন্ধান করতে গিয়ে নির্দিষ্ট কোন কারণ ধরা পড়বে না, এই যে রোগ এরই নাম ননস্পেসিফিক ইউরেথ্রাইটিস। সংক্ষেপে বলা হয় এন-এস-ইউ। রোগটি মহাজ্বালাতনকারী। লক্ষণাবলী মৃদু কিন্তু অধিকতর দীর্ঘস্থায়ী।

মূত্রনালীপ্রদাহ দুরকমের। বিশেষ অর্থাৎ স্পেসিফিক, যেমন গণোরিয়া। সামান্য অর্থাৎ নন-স্পেসিফিক। এটা ননস্পেসিফিক এই অর্থে কোন স্পেসিফিক কারণ নেই। আরও পরিষ্কার করে বলি, ভাইরাস, প্রোটোজোয়া, এ্যালার্জি, রাসায়নিক কোন নির্দিষ্ট কার্যকারণ চোখে পড়বে না যা দিয়ে এটা ব্যাখ্যা করা সম্ভব।

পুরুষের মূত্রনালীপ্রদাহ ঘটায় গণোরিয়াই, অর্ধেকেরও বেশী ক্ষেত্রে, সম্ভবতঃ তিন চতুর্থাংশ ক্ষেত্রে। অঙ্কের হিসেবে কিছু পড়ে রইল, অর্থাৎ গণোরিয়া নয় এমন মূত্রনালীপ্রদাহও সম্ভব এবং বর্তমানে এটাই বেশী দেখি, যা কিনা পূর্বে গণোরিয়ারূপে গণ্য হত। এরূপ প্রদাহের দশ শতাংশের জন্যে দায়ী ট্রাইকো-মোনাস এবং নিম্নগামী বীজাণুদূষণ (২-৩%)। বাদ বাকী ৯০% প্রদাহে সুনির্দিষ্ট কারণ অনুপস্থিত, এটাই এন-এস-ইউ।

পুরুষের সামান্য মূত্রনালীপ্রদাহ সম্পূর্ণ রহস্যময়, অর্থাৎ শেষ কথাটি এখনও বলা হয়নি। তথাপি এটা রতিবাহিত ব্যাধি রূপেই গণ্য। তাই যদি হয়, মেয়েদেরও এমনটি হতে পারে এবং হয়েও থাকে যদিচ হাতে গোণা যায় এদেরকে।

রোগোৎপাদক বীজাণু এখনও অনিশ্চিত, অজ্ঞাত, তথাপি গবেষণালব্ধ তথ্যাবলী এই ইঙ্গিত দিচ্ছে এরোগ ভাইরাসঘটিত কিংবা মাইকোপ্লাজমা গোত্র-ভুক্ত ব্যাক্‌টেরিয়াজাত এবং সাধারণতঃ রতিকালেই অর্জিত।

এরোগের গুপ্ত অবস্থা কিছুটা দীর্ঘ, প্রায়শঃ তিন সপ্তাহ, কি আরও অধিক-কাল। সাধারণতঃ মিলনের কয়েক দিন থেকে কয়েক সপ্তাহ পরে আবির্ভূত। অর্ধেকেরও অধিকক্ষেত্রে দশ দিনের বেশী সময় কেটে যায়।

পুরুষরাই সচরাচর আক্রান্ত, নারী ব্যাধিকবলিত হয় কদাচিৎ। এবং লক্ষণাবলীও পুরুষদের ক্ষেত্রেই প্রকট। মেয়েদের ক্ষেত্রে অতটা নয়, প্রায়শঃ উপসর্গবিহীন। সকালে প্রস্রাবের পূর্বে অল্পক্ষরণ, প্রস্তাসে মেঘডম্বরুর মতই। কখন প্রচুর পরিমাণে স্বচ্ছ জলীয় ক্ষরণ, কখনবা মিউকাস ও পুঁজ মেশান ক্ষরণ অল্প পরিমাণে। অর্থাৎ লক্ষণাবলী মৃদু, কখনবা উপসর্গবিহীন। কখন হলুদ রঙা প্রচুর ক্ষরণ, মনে হবে যেন সত্যি সত্যি গণোরিয়া হয়েছে।

যথার্থই মাঝে মধ্যে গণোরিয়ার চেহারা নিয়ে আবির্ভূত। কিন্তু অধিকাংশক্ষেত্রেই মৃদুগোছের মূত্রনালীপ্রদাহ। ক্ষত সাধারণতঃ সম্মুখমূত্র-নালীতেই সীমিত। স্থানীয় এবং পেলভিক জটিলতা বিশেষ করে প্রষ্টেটপ্রদাহ দেখা দিতে পারে—এসবই গণোরিয়া সমান, তবে ততটা তীব্র, মারাত্মক নয় এবং পুনরাবির্ভাবের (রিল্যাপ্স) আশঙ্কাও সমধিক, পাঁচ বছরের মধ্যে শতকরা দশজন পুরুষকে এদুর্ভোগ সইতে হবে।

কোন কোন মানুষ একই সঙ্গে বিশেষ (অর্থাৎ গণোরিয়া) এবং সামান্য মূত্রনালীপ্রদাহ রোগাক্রান্ত হতে পারে। এক্ষেত্রে গণোরিয়া সেরে গিয়ে পুনরায় ক্ষরণ দেখা দিতে পারে চিকিৎসার এক সপ্তাহ পরে, মনে হবে যেন গণোরিয়া পুনরাবির্ভূত। কিংবা বিশেষ মূত্রনালীপ্রদাহের সকল চিহ্ন মিলিয়ে যাওয়ার পর, চিকিৎসা অন্তে এক সপ্তাহেরও অধিককাল পরে।

কতিপয় ক্ষেত্রে, এই তিন শতাংশের মত ক্ষেত্রে, সামান্য মূত্রনালীপ্রদাহের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে আরও একটি কি দুটি বিশেষ উপসর্গ, নেত্রবর্ত্মকলাপ্রদাহ এবং ব্যথাপ্রদ অস্থিসন্ধি। এহেন সমাবেশের এক বিশেষ নাম আছে, রাইটার'স ব্যাধি বা সিনড্রোম। এই ব্যাধিকবলিত ব্যক্তিদের প্রায় প্রত্যেকেই পুরুষ, নারীও আক্রান্ত হয়েছেন কদাচিৎ, এমন ঘটনার প্রামাণ্য নজির আছে। প্রথমে দেখা দেয় মূত্রনালীপ্রদাহের লক্ষণাবলী, এর দশ দিন পরে গাঁটে ব্যথা, চক্ষুপ্রদাহ ইত্যাদি। রতিসহবাস থেকে ২।৩ সপ্তাহের ব্যবধানে গাঁটে ব্যথা হয়, এক বা একাধিক অস্থিসন্ধি যাতনাদায়ক হয়ে ওঠে, অবশ্য পাক ধরে না কোনদিন। কষ্টকর এই ব্যাধির মেয়াদ এক থেকে পাঁচ মাস। চিকিৎসার জন্যে বিশেষজ্ঞের শরণ অপরিহার্য। সুচিকিৎসা সত্বেও এরোগের পুনরাবির্ভাব ঘটে প্রায়শঃ।

রোগনির্ণয়ের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে জননেন্দ্রিয় পরীক্ষা এবং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রতিটি ল্যাবরেটরি পরীক্ষা বাঞ্ছনীয়। ইউরেথ্র্যাল স্মিয়ার, কালচার পরীক্ষা, প্রষ্টেটস্মিয়ার পরীক্ষা, মূত্রপরীক্ষা, এভাবে পরীক্ষা করতে করতে মূত্রনালীপ্রদাহের

সম্ভাব্য কারণগুলি—গণোরিয়া, ট্রাইকোমোনাস নামক প্রোটোজোয়া, ক্যানডিডা নামক ফাঙ্গাস, রাসায়নিক দ্রব্য, অবাঞ্ছিত বিদেশী দ্রব্য (ফরেন বডি)—একে একে বর্জিত হলেই, ননস্পেসিফিক ইউরেথ্রাইটিস উঁকি দেবে।

অক্সিটেট্রাসাইক্লিন, ক্লোরটেট্রাসাইক্লিন, টেট্রাসাইক্লিন জাতীয় ঔষধ সেবনে অধিকাংশ রোগীই সাফল্যর মুখ দেখে। কোন কোন বিশেষজ্ঞের পছন্দ ষ্ট্রেপটোমাইসিন ইঞ্জেকশনের সঙ্গে সালফাজাতীয় ঔষধ।

গণোরিয়ার মতই ফলো আপ প্রয়োজনীয়। তিন মাস পরে প্রষ্টেটস্মিয়ার অবশ্য করণীয়।

ট্রাইকোমোনাসজাত প্রদাহ

ট্রাইকোমোনাসজাত প্রদাহ (ট্রাইকোমোনিয়াসিস) ইদানীং রতিবাহিত ব্যাধিসমূহের অন্তর্ভুক্ত। তবুও বলে রাখি, গণোরিয়া সিফিলিস উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে যে ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেটা এই রোগের প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়। অর্থাৎ কিনা শুধু এই রোগের ইতিহাস যার আছে সেই রমণীর (কিংবা পুরুষের) শিরে কলঙ্কের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া যায় না (২৫-২৭ পৃষ্ঠা দেখুন)।

এই রোগের মূলে রয়েছে ট্রাইকোমোনাস ভ্যাজিন্যালিস। এটা হচ্ছে একপ্রকার সূক্ষ্ম জীব যা শুধু মাইক্রসকোপ দিয়েই দেখা যায়। এবং পরজীবী, আশ্রয়স্থল মনুষ্যদেহের বিভিন্ন অঙ্গ (যেমন, যোনিদেশ, মূত্রস্থলী)। এক-কোষী ক্ষুদ্রপ্রাণী, লেজযুক্ত, চলচ্ছক্তিসম্পন্ন প্রোটোজোয়া।

এরোগের আনাগোণা পৃথিবীব্যাপী এবং নারীদেহেই বাসা বাঁধে, কখনবা পুরুষদেহে। প্রায় প্রতি চার পাঁচজন রমণীর মধ্যে একজনের যোনি ট্রাইকোমোনাস অধ্যুষিত। ভি-ডি ক্লিনিকে ২১.৩% মহিলা, স্ত্রীরোগবিভাগে ১২.৮% মহিলা এবং গর্ভবতী মহিলারা প্রায়শঃ আক্রান্ত। এতুলনায় পুরুষের সংখ্যা মাত্র ২%।

এরোগের শিকার প্রধানতঃ মহিলারাই এবং কোন বয়সই অনাক্রম্য নয়। বয়ঃসন্ধির (আদ্যঋতুর) পূর্বে এবং চিরতরে ঋতুবন্ধের পরে বড় একটা দেখা মেলে না। অধিকাংশক্ষেত্রেই রোগাক্রান্তা রমণীরা রতিব্যাপারে সক্রিয় অর্থাৎ বয়ঃসন্ধি থেকে প্রৌঢ়সন্ধি এই বয়ঃসীমার মধ্যেই। অনেকেই সমাজ-অর্থনীতিক বিচারে নিম্নপর্যায়ভুক্ত এবং অসতী, বহুবল্লভা।

এটা প্রায়শঃ দৃষ্ট, এরোগ গণোরিয়ার সঙ্গে যুক্ত। গণোরিয়া রোগগ্রস্ত রমণীসমূহের মধ্যে কম করেও শতকরা পঞ্চাশজনের ট্রাইকোমোনাসজাত

প্রদাহের কিছু না কিছু স্বাক্ষর থাকবেই। বস্তুতঃ এদুটিরোগের সম্পর্ক এতই নিবিড় যে একটির দেখা পেলে আরেকটির খোঁজ করাই নিয়ম। এবং ট্রাইকো-মোনাসের উপস্থিতি অধিকাংশ ভি-ডি বিশেষজ্ঞকে উদ্বুদ্ধ করে গণোরিয়া সন্ধানে।

সংক্রমণ ব্যাপারটা সবসময়ই পরিষ্কার নয়। সত্য, অধিকাংশ ঘটনাই সদ্যঃমিলনের স্মৃতিভারে নত। কিন্তু কামগন্ধ বিনা রোগভোগের ঘটনাও তো মিথ্যা নয়। অর্থাৎ কিনা অপ্রত্যক্ষ উপায়ে—রতিসংসর্গ বিনা অন্য উপায়েও সংক্রমিত হতে পারে। অরতিক উপায়ে বিস্তৃতির দৃষ্টান্ত: অক্ষতযোনি কুমারী ও নিবৃত্তরজস্কা রমণীর ট্রাইকোমোনাসজাত কষ্টভোগ। নবজাতক শিশুকন্যায় ট্রাইকোমোনাস আসতে পারে মায়ের কাছ থেকে, এলেও কিছুদিনের মধ্যেই সুপ্ত হবে এই পরজীবী। তারপর ঘুম ভাঙবে আর্তবারম্ভের সঙ্গে সঙ্গে কিংবা প্রথম মিলনের পর। সদ্যঃ বিবাহিতা নারীর প্রস্রাবে কষ্ট হয় প্রায়ই, 'হনিমুন সিষ্টাইটিস' রূপে খ্যাত এই রোগটির মূলে রয়েছে সেই ট্রাইকোমোনাস যা কিনা ঘুমঘোরে ছিল এতদিন এবং সবে আত্মপ্রকাশ করেছে কুম্ভকর্ণের মত। আপতিক বীজাণুদূষণও সম্ভব। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিই। মাতা কর্তৃক কন্যা দূষিতা। অন্যজনের কাপড় কিংবা গামছা-তোয়ালে ব্যবহার। স্ত্রীঅঙ্গ পরীক্ষায় ব্যবহৃত যন্ত্রপাতিতে কিংবা গ্লাভসে যথাযথ শাস্ত্রীয় শুদ্ধির অভাব।

অরতিক এবং আপতিক বীজাণুদূষণের আশ্রয়ে কতিপয় ঘটনার ব্যাখ্যা সম্ভব হলেও অধিকাংশ নারীই এবং সম্ভবতঃ প্রতিটি পুরুষই এই প্রোটোজোয়া দ্বারা আক্রান্ত হয় রতিসহবাসের ফলেই। ১৯৫৭ এবং ১৯৫৯-এ অনুষ্ঠিত দুই আন্তর্জাতিক অধিবেশনের প্রকাশ্য মতামতও তো এই। ট্রাইকোমোনাসযুক্ত নারীর স্বামীরা আক্রান্ত হয় ৫০% ক্ষেত্রে এবং আক্রান্ত পুরুষের সংসর্গে আসা প্রতিটি নারীর স্ত্রীঅঙ্গ ট্রাইকোমোনাস অধ্যুষিত হবে, এদুটি তথ্য নিঃসন্দেহে প্রমাণিত করছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একদেহ থেকে আরেকদেহে সংক্রমণ ঘটে সংসর্গদোষেই।

ট্রাইকোমোনিয়াসিস এক ধরনের যোনিপ্রদাহ। কিন্তু ট্রাইকোমোনাস স্ত্রীঅঙ্গে বাসা বাঁধলেই অসুস্থতা দেখা দেয় না। কেন তা বলছি। পূর্বেই বলেছি, ২০-২৫% রমণীর স্ত্রীঅঙ্গে ট্রাইকোমোনাস ভ্যাজিন্যালিস লুকিয়ে আছে, কই তারা তো উপসর্গকাতর নয়! এখন বলব, এই পরজীবী বছরের পর বছর উপসর্গবিহীন অবস্থায় বেঁচে বর্তে থাকতে পারে স্ত্রীঅঙ্গে। কিন্তু যোনি-পথের সুস্থতা কোন কারণে ব্যাহত হলেই উপসর্গ দেখা দেবে। যোনিজ সুস্থতা

ব্যাহত হওয়ার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কারণ: মাসিক স্রাব (স্ত্রীঅঙ্গের স্বাভাবিক অম্লীয় প্রতিরোধশক্তি মুছে যায়)। রতিসহবাস (অঙ্গচালনা হেতু স্ত্রীঅঙ্গে অদৃশ্য ক্ষত)। গর্ভাবস্থা (পূর্বোক্ত প্রতিরোধশক্তি ব্যাহত হয়) এবং রোগভোগ (সমগ্র দেহের প্রতিরোধশক্তি কমে যায়)।

উপসর্গ দেখা দিলে প্রচুর পরিমাণে যোনিস্রাব নির্গত হয়, এটা পুঁজের মত, দুর্গন্ধযুক্ত, ফেনিল, সবুজ সবুজ রংয়ের। অসহ্য তীব্র চুলকানি, ভগদেশে এবং যোনি-অভ্যন্তরেও। ব্যথায় টাটিয়ে ওঠে ভগদেশ, প্রদাহ হেতু যোনিতে ব্যথা, অস্বস্তি, জ্বালা যন্ত্রণা এবং মিলনে ব্যথা। এসব উপসর্গ এত প্রবলভাবে দেখা দিতে পারে যে দেখে মনে হবে রোগিণী সাতিশয় পীড়িতা, চলতে কষ্ট, যন্ত্রণায় কাতর, ঘুম নেই। কখনবা প্রস্রাববিষয়ক উপসর্গ যেমন প্রস্রাবে জ্বালা, কষ্ট, কেননা ২০% ক্ষেত্রে মূত্রস্থলীও জড়িয়ে পড়ে। এই স্রাব সংক্রামক, যার ফলে সংসর্গিত পুরুষে ট্রাইকোমোনাস ছড়িয়ে পড়তে পারে।

ক্বচিৎ কখন পুরুষ ট্রাইকোমোনিয়াসিসের রোগী। এই মাত্র উল্লেখ করেছি, স্ত্রীঅঙ্গে স্থিত ট্রাইকোমোনাস পুরুষদেহেও প্রবেশ করবে, কমসে কম শতকরা ৫০টি ক্ষেত্রে। এতৎসত্ত্বেও অধিকাংশ স্বামী উপসর্গবিহীন। অবশ্য এদেরই কয়েকজনের মূত্রনালীপ্রদাহ হতে পারে। এই এক ধরনের সংক্রমণ।

আরেক ধরনের সংক্রমণ পুরুষের ক্ষেত্রে সম্ভব, অবৈধ সংসর্গদোষের ফলাফল। গণোরিয়াবিহীন মূত্রনালীপ্রদাহের মধ্যে ৫% এর মত ট্রাইকোমোনাস জাত। মিলনের এক থেকে তিন সপ্তাহ পরে লিঙ্গমুখ দিয়ে একপ্রকার ক্ষরণ, মূত্রনালীতে অস্বস্তি, সুড়সুড়িবোধ। অচিকিৎসিত থাকলে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আপনাআপনি অদৃশ্য হয়ে যায়।

রোগনির্ণয়ের উদ্দেশ্যে ক্ষরণ পরীক্ষাই নিয়ম। এই ক্ষরণ দিয়ে 'হ্যাঙ্গিং ড্রপ' পরীক্ষা এবং স্মিয়ার পরীক্ষাই যথেষ্ট, কখনবা কালচার পরীক্ষা। চিকিৎসার জন্যে মেট্রোনিডাজোল বড়ি সেবনীয়। প্রত্যহ তিনটি বড়ি, এভাবে মোট সাতদিন। কিংবা দুবেলা দুটো বড়ি, মোট পাঁচ দিন।

মনিলিয়াসিস

'ক্যানডিডা এ্যালবিক্যানস' নামক একপ্রকার ছত্রাক (ফাঙ্গাস) জাত যোনিপ্রদাহের নাম মনিলিয়াসিস। সম্প্রতি রতিবাহিত ব্যাধিসমূহের অন্তর্ভুক্ত। কারণ, এরোগ অধিকাংশক্ষেত্রেই সংসর্গজাত। কিন্তু ভুললে চলবে না বিবাহিত জীবনেও এর দাপট কম নয়। যথার্থতঃ এমন স্ত্রী খুঁজে পাওয়াই দায়, বারেকের তরেও যাঁর এজাতীয় স্রাব হয়নি। তখন স্ত্রী স্বামীকে সংক্রমিত

করতে পারে। এবং ক্ষেত্রবিশেষে, সৎ স্বামীও স্ত্রীকে। কাজে কাজেই, মনিলিয়াসিস মাত্রই চরিত্রদোষের ঘটনা নয়।

সংক্রমণ ব্যাপারটা প্রতিটি ক্ষেত্রেই জলবৎ তরলং নয়। অধিকাংশক্ষেত্রেই সন্দেহ নেই সংসর্গদোষই নিমিত্তের ভাগী, যদিচ অরতিক এবং আপতিক উপায়ে ছত্রাকদূষণ সম্ভব। রুটিন পরীক্ষায়, ক্যানডিডা নামক ফাঙ্গাস অনেক রমণীদেহেই খুঁজে পাব, পরজীবী হিসেবে আশ্রিত থাকতে পারে মানবযোনিতে, কমপক্ষে ২০% রমণীদেহে তো বটেই এবং উপসর্গবিহীন অবস্থায়, বলা যেতে পারে যোনিদেশের ঘরের লোক, স্বাভাবিক বাসিন্দা। কিন্তু এই ঘরের লোকই উপসর্গ ডেকে আনবে যোনিজ পরিবেশের প্রতিকূলতায় (৭০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। মেয়েরা তাই কষ্ট পায় মাসিকের আগে ও পরে এবং বিশেষ করে গর্ভাবস্থায়। আরও কয়েকটি রোগজনক অবস্থা আছে—সেবনীয় জন্মরোধক বড়ি, ডায়াবিটিস, এ্যান্টিবায়টিক চিকিৎসা, ট্রাইকোমোনাস চিকিৎসা এবং ষ্টেরয়েড চিকিৎসা—যখন মনিলিয়াসিস প্রায়শঃ দৃষ্ট।

ট্রাইকোমোনাসের মতই যোনিস্রাবের বহুদৃষ্ট কারণ। এস্রাব ছানাকাটা কিংবা সরের মতন, রংটা সাদা, পরিমাণে অনেক এবং চুলকানিযুক্ত। ভগদেশে, ভগৌষ্ঠে, যোনিমুখে চুলকায়, চুলকায় যোনিমধ্যেও, কখনবা পায়ুদেশে। মিলনে ব্যথা এবং ট্রাইকোমোনাস সদৃশ অন্যান্য লক্ষণাবলীর আবির্ভাব আশ্চর্য নয়।

পুরুষেরও এমনটি হতে পারে। এরই ফলাফল মূত্রনালীপ্রদাহ, পুরুষাঙ্গদেহে বা অগ্রভাগে বা অগ্রচ্ছদায় প্রদাহ, কুঁচকিতে, উরুতে, অণ্ডকোষে প্রদাহ। অধিকাংশক্ষেত্রেই স্ত্রী কর্তৃক স্বামী সংক্রমিত, বিশেষ করে গর্ভাবস্থায়, তখন স্বামীর লিঙ্গাগ্রে বা অগ্রচ্ছদায় প্রদাহ অনিবার্য। কখনবা স্বামী নিজেই দায়ী, অর্থাৎ কিনা স্বামীর ডায়াবিটিস রোগ আছে কিংবা পরনারীগমনের দোষ আছে, এবংবিধ ক্ষেত্রে স্বামী যে স্ত্রীকে দূষিত করবে তা বলাই বাহুল্য।

রোগনির্ণয়ের জন্যে একটি স্মিয়ার পরীক্ষাই যথেষ্ট। ক্ষেত্রবিশেষে কালচার। চিকিৎসার্থে ৪।৫ দিন জেনশিয়ান ভায়লেট (১-২%) দ্রবণ প্রয়োগই যথেষ্ট। নাইষ্টেটিন কিংবা এ্যাম্ফোটেরিসিন মলম বহির্যোনিতে ও গোপনাঙ্গে এবং ট্যাবলেট যোনিমধ্যে প্রয়োগ করা যেতে পারে। একই সঙ্গে রোগজনক সহকারী কারণগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত বাঞ্ছনীয়।

গোপনাঙ্গে স্কেবিজ এবং উকুন

দেহের অন্যান্য অঙ্গে চর্মরোগ হতে পারে এবং গোপনাঙ্গ দেহেরই একটি

অঙ্গ। কাজে কাজেই গোপনাঙ্গে সেই সব চর্মরোগের আবির্ভাবে চমকের কিছুই নেই। এখন এই চর্মরোগের জাতটা যদি হয় স্পর্শক্রামী, রোগটা কি আরেক গোপনাঙ্গে বিস্তৃত হবে না? নিশ্চয়ই হবে, 'জেনিট্যাল স্কেবিজ ও লাইস' নামক চর্মরোগ দুটি এরই সুন্দর দৃষ্টান্ত।

'সার্কোপ্টিস স্কেবি,' জাত চর্মরোগই স্কেবিজ নামে খ্যাত। সার্কোপ্টিস স্কেবি হচ্ছে একপ্রকার পরজীবী, আশ্রয়স্থল মানবচর্ম। রোগটি ভয়ঙ্কর ছোঁয়াচে। সুতরাং বাড়ীতে একজনের যদি হয়, সকলকেই স্পর্শ করবে অচিরেই, এমনকি নাবালক শিশুদেরও রেহাই নেই। তাই যদি হয়, রতিসহবাসে সংক্রমিত হবে এটা আর এমন আশ্চর্য কি!

সচরাচর নিবিড় সান্নিধ্য হেতু এক ব্যক্তি থেকে আরেক ব্যক্তিতে সংক্রমিত। সংক্রমণ ধারাটি তাই কখন দেহমিলন, কখন একই শয্যায় শয়ন, কখনবা একই কম্বল-বস্ত্র-চাদর ব্যবহার।

এরোগের প্রধানতম উপসর্গ তীব্র চুলকানি, বিশেষ করে রাত্রে, শয্যায় এলায়িত দেহ উত্তপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। এচুলকানি কখন শুধুই গোপনাঙ্গ—পুরুষের লিঙ্গে ও অণ্ডকোষে এবং নারীর ভগদেশে। কখনবা গোপনাঙ্গ পেরিয়ে দেহের অন্যত্রও ছড়িয়ে পড়তে পারে।

স্ত্রী-পরজীবী কিংবা ডিম, রোগের অন্যান্য চিহ্ন এবং পরিবারে আর পাঁচ-জনের একই সঙ্গে চুলকানি, এই সব নিদর্শন রোগনির্ণয়ে সহায়তা করে। ২৫% বেনজিল বেনজোয়েট দ্রবণ কিংবা লোরেক্সন ব্যবহারে আরোগ্যলাভ নিশ্চিত।

গোপনাঙ্গে উকুন

পেডিকিউলাস পিউবিস, চলতি কথায় কাঁকড়া উকুন, নামক একপ্রকার বিশেষ পরজীবী মানুষের যৌন অঞ্চলের কেশরাজিতে বাসা বাঁধলেই 'জেনিট্যাল লাইস' নামক রোগটির সাক্ষাৎ মিলবে।

সচরাচর যৌন সাহচর্যেই সংক্রমিত, এভাবে একজনের যৌনকেশ থেকে অন্যজনের যৌনকেশে। রোগাক্রান্ত ব্যক্তির শয্যায় শয়ন আরেকটি অল্পদৃষ্ট কারণ।

যৌনকেশরাজির মধ্যেই বংশবৃদ্ধি করে, ডিম পাড়ে। রোগীর প্রধান অভিযোগ চুলকানি এবং সুড়সুড়িবোধ। রোগ নির্ণীত হয় উকুন বা ডিম দেখেই।

চিকিৎসার অঙ্গ কেশকর্তন আর ডি-ডি-টি কিংবা গ্যামাক্সিন প্রয়োগ

(বেনজিল বেনজোয়েট দ্রবণও কার্যকরী)। রোগাক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে আসা অন্যান্যদেরও চিকিৎসা বাঞ্ছনীয়।

রতিবাহিত আঁচিল

মানুষের দেহে আঁচিল হতে পারে এবং জননেন্দ্রিয় মানুষেরই একটি অঙ্গ। অতএব এখানেও আঁচিল হতে পারে। দেহের অন্যত্রস্থিত আঁচিল যে কারণে উদ্ভূত, সেই একই কারণ এখানেও প্রযোজ্য। অর্থাৎ কিনা গোপনাঙ্গের আঁচিলও ভাইরাসজাত। কিন্তু কয়েকটি বিশেষত্ব আছে। যেমন এই ভাইরাস-দূষণ প্রধানতঃ রতিবাহিত। দ্বিতীয়তঃ, গোপনাঙ্গের আঁচিল একটু স্বতন্ত্র ধরনের, কেননা, গোপনাঙ্গ থেকে দেহের অন্যত্র বিস্তৃত হয় না, গোপনাঙ্গেই সীমিত থাকে।

গোপনাঙ্গে আঁচিল পূর্বাপেক্ষা অধিকতর দৃষ্ট, ভি-ডি ক্লিনিকে শতকরা পাঁচ জনের এমনটি দেখব। বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় একে বলা হয় 'কনডাইলোমেটা এ্যাকুমিনেটা'। একদা ভুল করে বলা হত গণোরিয়াজাত আঁচিল, গণোরিয়ায় অনবরত ক্ষরণ হয় এই হেতু গোপনাঙ্গ সিক্ত থাকায় আঁচিল সহজেই জন্মে ও বৃদ্ধি পায়। প্রসঙ্গতঃ বলে রাখি, গোপনাঙ্গে আরেক প্রকার আঁচিল হতে পারে, এটা সিফিলিসজাত, একে বলা হয় 'কনডাইলোমেটা লেটা', এসম্বন্ধে ৪৮ পৃষ্ঠায় আলোচনা করেছি।

গোপনাঙ্গের আঁচিল এক প্রকার বিশেষ ধরনের 'প্যাপিলোমা', সোজা কথায় চর্ম টিউমার, নির্দোষ চর্মস্ফীতি। ক্লিষ্ট ব্যক্তির গোপনাঙ্গে লাল, বাদামী কিংবা গোলাপী রংয়ের, ছোট বড় নানা মাপের কতকগুলি স্ফীত অংশ নজরে পড়বে। আরও বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে দেখব একটি বোঁটায় দৃঢ়সংলগ্ন থেকে শতধা বিভক্ত, গুচ্ছিত আকারে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, বাঁধাকপির মত ছড়ান, সমতলগাত্র নয়, উঁচুনীচু। শুরুতে একটি এবং ছোট আলপিনের মাথা, এটাই বৃদ্ধি পেতে পেতে ছোটখাট টিউমারসদৃশ বিপুলকায় হতে পারে। সাধারণতঃ একটিমাত্র আঁচিল চোখে পড়ে না, কেননা এদের প্রবণতা হচ্ছে ছড়িয়ে পড়ার, তাই এক থেকে বহু আঁচিল জন্মে।

এই আঁচিল দুটি বিশেষ অবস্থার সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। এক, অনবরত ক্ষরণ (এবং প্রায়শঃ পুরাতন বীজাণুদূষণ)। আর্দ্র অথচ উষ্ণ অঞ্চল অনবরত ক্ষরণ দ্বারা সিক্ত হলেই এক সুন্দর অনুকূল পরিবেশ সৃষ্ট হবে যেখানে আঁচিল সহজেই জন্মে।

দুই, মাঝে মধ্যে রোগীর হাতে এবং দেহের অন্য কোন অঙ্গে আঁচিল

থাকতে পারে, যেখান থেকে আঁচিল নেমে এসেছে গোপনাঙ্গে। স্বভাবতঃই এটা অরতিক এবং আপতিক সংক্রমণের সুন্দর দৃষ্টান্ত।

এই আঁচিল ভাইরাসজাত অতএব সংক্রামক। এবং অধিকাংশ সংক্রমণের ঘটনা রতিবাহিত।

গোপনাঙ্গে আঁচিলের গুপ্ত অবস্থা একটু দীর্ঘ, সচরাচর মিলনের তিন মাসের মধ্যে দেখা দেয়। প্রায়শঃ সংক্রমিত হয় অন্য কোন রতিবাহিত ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সময়। আঁচিল আবির্ভূত হয় শেষোক্ত ব্যাধি, যেমন গণোরিয়া, অদৃশ্য হওয়ার কয়েক সপ্তাহ থেকে কয়েক মাস পরে, এমনকি ন মাস পর্যন্তও বিলম্বিত হতে পারে। অধিকন্তু একই সঙ্গে আবির্ভাব সম্ভব, আঁচিলের সহাবস্থান দেখেছি গণোরিয়া চিকিৎসার সময়।

পূর্বেই বলেছি, দেহের উষ্ণ আর্দ্র অঞ্চলে সহজেই আঁচিল জন্মে। কাজে কাজেই পুরুষের আঁচিল দেখব অগ্রচ্ছদার নীচে, লিঙ্গগ্রীবায়। নারীর ভগদেশের যে কোন অংশে, বিশেষ করে যোনিমুখে ও পায়ুদেশের চারপাশে। কেননা এদুটি অঞ্চলই প্রচুর পরিমাণে সিক্ত থাকে। কখনবা ঊর্ধ্ব যোনিতে অর্থাৎ যোনিগাত্রে, ভল্টে এবং জরায়ুগ্রীবায়।

মানুষের দেহে আঁচিল হতে পারে এবং হয়েও থাকে, মানুষটি তখন দেখি নিরুদ্বেগ। আর গোপন অঙ্গে হলেই যত গোলযোগ, যত রাজ্যের ভাবনা। এসবই হচ্ছে পাপী মনের তাপিত প্রকাশ। একদিন রাত্রে এক রমণীর সান্নিধ্যে রতিপ্রমত্ত হওয়ার অপরাধে বিবেকদংশনের যাতনা ভোগ করতে হবে কিংবা ঘৃণ্য অপরাধী দীন হীন ভেবে সদাসর্বদা সঙ্কুচিত থাকতে হবে? এটা ঠিক নয়। একটা সত্য ঘটনা বলি :

"বাংলার বাইরে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াশুনা করি। কিছুদিন আগে এক মেয়ের সাথে সহবাস করি, তখন আমার পুরুষাঙ্গের উপরভাগের চামড়া কিছুটা কেটে যায় এবং তা থেকে বেশ রক্ত বের হতে থাকে। ২।৪ দিন ধরে গোপনাঙ্গ কিছুটা ফুলে থাকে এবং প্রস্রাব করার সময় একটু ব্যথানুভব করি কিন্তু তা কয়েকদিন পরেই সেরে যায়। তারপর দেখি যে জায়গাটা কেটে গিয়েছিল তাতে একটা ঘা হয়েছে এবং তার পাশেই একটা শক্ত আঁচিল হয়েছে। প্রায় ১২।১৪ দিন পরে ঘা শুকিয়ে যায় এবং জায়গাটা একটু ফোলা ও শক্ত থাকে আর খুব চুলকায়। তাই আমি একজন ডাক্তারের কাছে যাই, তিনি তখন তিনটি ইঞ্জেকশন এবং চোদ্দটি ক্যাপসুল দেন এবং পরে সাতটি Penidure ইঞ্জেকশন দেন ছদিন অন্তর।

তারপর ছুটির জন্যে বাড়ী চলে আসি কিন্তু ভয় ও ভাবনা আমার পিছু নেয়। শেষে এখানে এক ডাক্তারকে দেখাই। তাঁর নির্দেশমত রক্ত পরীক্ষা করাই এবং ফলাফল নেগেটিভ হওয়াতে তিনি বললেন ও কিছু নয় এবং ভয়েরও কোন কারণ নেই। তাঁর দেওয়া একটা লোশন আঁচিলে লাগাচ্ছি, এতে কমা দূরে থাক, আঁচিল আরও বেড়েছে এবং ওরই চারপাশে আরও চারটি আঁচিল জন্মেছে। এ আঁচিল শুকনো, কোন ব্যথা বা যন্ত্রণা নেই, এর উপরিভাগ ফুলকপির মতন, শুধু মাঝে মাঝে সুড় সুড় করে।

গত তিনমাস দারুণ দুশ্চিন্তায় কাটিয়েছি, এখনও একটু শান্তি পাই না, সব সময় একটা পাপবোধ কষ্ট দিচ্ছে। ডাক্তারবাবু, প্লিজ, আমাকে জানান আমার এটা কি রোগ এবং প্রকৃত ঔষধ নির্বাচন করে দিন যাতে এই আঁচিল দুর হয়ে যায়।”

সবশেষে চিকিৎসা। এ্যালকোহলে ২৫% পোডোফাইলিন দ্রবণ প্রয়োগ করাই বিধি। ৮-১২ ঘণ্টা পরে সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। প্রয়োজন হলে একসপ্তাহ পরে পুনরায় ঔষধ প্রয়োগ। গোপনাঙ্গের শুষ্কতা এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে নজর দিতে হবে। পুরাতন বীজাণুদুষণের (যেমন গণোরিয়া, ট্রাইকোমনিয়াসিস) চিকিৎসা অবশ্য করণীয়।

রতিজ হার্পিস

হার্পিস প্রায়ই দেখি চর্ম ও শ্লেষ্মঝিল্লীর সংযোগস্থলে, যেমন দেহবিবরে, বিশেষ করে মুখেতে, নাকেতে। হার্পিস প্রকাশের আরেকটি প্রিয় স্থান : গোপনাঙ্গ। বস্তুত: গোপনাঙ্গে ক্ষতর একটি প্রায়শ: দৃষ্ট কারণ হার্পিস। বর্তমানে এটা প্রমাণিত যে, দেহের অন্যস্থানে দৃষ্ট হার্পিস আর জেনিট্যাল হার্পিস, এদুয়ের গোত্র ভিন্ন। জনন-হার্পিস এর জন্যে যে ভাইরাস দায়ী তার নাম 'হার্পিস সিমপ্লেক্স টাইপ II' এবং এটা রতিবাহিত।

নারীর ভগোষ্ঠে, যোনিমুখের চারপাশে, পেরিনিয়মে, যোনিপথের শেষপ্রান্তে (ভল্টে), জরায়ুগ্রীবায় এবং পুরুষের লিঙ্গাগ্রে পুঞ্জ পুঞ্জ মুক্ত দানার মত ছোট ছোট জলফোস্কা দেখা দেয়, অচিরেই ভেঙ্গে গিয়ে এক হয়ে যায় এবং একটি ছোট ক্ষত সৃষ্ট হয়। এমনটি হতে পারে মূত্রদ্বারেও, তখন প্রস্রাবে জ্বালা কষ্ট হবে। এর সঙ্গে প্রায়ই আনুষঙ্গিক (সেকেণ্ডারি ইনফেকশন) বীজাণুদুষণ ঘটে, তখন কুঁচকিস্থিত গ্রন্থি ফোলে, ব্যথা হয়। এক্ষত কিছুদিনের মধ্যেই শুকিয়ে যাবে আপনাআপনি তবে কিনা পুনরায় দেখা দেবে কয়েক মাসের ব্যবধানে। এক কথায়, পুনঃপুনঃ আবির্ভাবই এর বৈশিষ্ট্য।

বীজাণু দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্যে সালফাজাতীয় ঔষধের ব্যবহার সঙ্গত। আসল ক্ষত ভাইরাসজাতীয় এবং এর ওষুধ যদি মেলে (Idoxuridine দ্রবণ) ব্যবহার করতে পারেন, অন্যথায় শুধুই 'নর্মাল সেলাইন' দ্রবণ দিয়ে ক্ষত পরিষ্কার রাখতে হবে।

মলাস্কাম কন্‌টেজিওসাম

এটা হচ্ছে ভাইরাসঘটিত একপ্রকার চর্মরোগ। যেহেতু ভাইরাস-গন্ধী, রোগটা অতীব সংক্রামক। সুতরাং এরোগ ছড়ায় নিবিড় সান্নিধ্যে. সাধারণতঃ দেহের উর্ধ্বভাগেই সীমিত থাকে। ক্বচিৎ কখন গোপনাঙ্গে, পুরুষাঙ্গ-দেহে কিংবা অগ্রচ্ছদায়, সংক্রমণ ব্যাপারটা তখন রতিবাহিত হয়ে পড়ে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই। এরোগ স্বচক্ষে দেখার সৌভাগ্য ঘটেছে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই অবৈধ সংসর্গ হেতু উৎপন্ন।

গোপনাঙ্গে এক বা একাধিক স্ফীত অংশ চোখে পড়বে। দেখতে অনেকটা ছোট ছোট দানার মত। আকারে আলপিনের মাথা থেকে মটর দানার মত। এরই মধ্যস্থল ঈষৎ নত, এটা ক্ষতমুখ (ক্রেটার), চাপ দিলেই এখান দিয়ে অন্তর্নিহিত বস্তু বেরিয়ে আসবে।

চিকিৎসার জন্যে এই ক্ষতমুখে আয়োডিন কিংবা ফিনল লাগিয়ে দিতে হয়। কেউ পছন্দ করেন ইলেক্‌ট্রোকটরি দিয়ে স্পর্শ করতে। কেউবা ভিতরকার দূষিত বস্তু বের করে দিয়ে আয়োডিন ছুঁইয়ে দিতে।

দ্বিতীয় পর্ব

যৌন সমস্যা

৬। সুগন্ধ দুর্গন্ধ আর যৌনতা

সংস্কৃতে একটা কথা আছে, ঘ্রাণেন অর্ধভোজনং, অর্ধেক ভোজন নাকি ঘ্রাণেই সম্ভব। গন্ধগ্রাহীর পেট ভরে না একটুকুও তবুও কিনা আজন্ম শুনে আসছি।

পেট ভরুক আর নাই ভরুক, গন্ধগ্রহণে ভোজনেচ্ছা যে প্রবলতর হয় এটা ঠিক, আর এও ঠিক যে ব্যাহত ঘ্রাণশক্তি নিয়ে রসনার পূর্ণ তৃপ্তি সম্ভব নয়। এই মাত্র উল্লেখ করা শ্লোকটি অতএব ঘ্রাণ নামক ইন্দ্রিয়বৃত্তিরই প্রশস্তি।

আহারের মত বিহারও একটি শারীরবৃত্তি, সুতরাং এখানেও এরকম একটা প্রভাব থাকাটা বিচিত্র নয়। সত্যি কথা বলতে কি, ঘ্রাণেন্দ্রিয়জাত উদ্দীপনার হাত ধরে সেই অমরাবতীতে পৌছান যায় যার নাম যৌনতা।

প্রাণিজগতের যৌনতায় দৃষ্টিপাত করুন, পলকেই দৃষ্টিগোচর হবে গন্ধের সার্বভৌমত্ব বা সর্বব্যাপিতা, গন্ধের ভিতর দিয়েই যৌনতার দ্বার খুলে যায় কত না প্রাণীর আর যৌন নির্বাচনের কত বড় হাতিয়ার এই গন্ধ।

জ্ঞানেন্দ্রিয়জাত অনুভূতিগুলির মধ্যে গন্ধের স্থানটি যেমন বিশেষ তেমনি আদিম, আদিতম স্পর্শের পরেই এর স্থান। বহুতর নিম্ন প্রাণীর জগৎ স্পর্শ আর গন্ধ দিয়ে তৈরী, শামুক একটি সুন্দর উদাহরণ, পরিচয়ের মাধ্যমটি হল শুঙ্গ (এ্যানটেনা), চলতি কথায় শুঁড়।

মৎস্যকুল থেকে শুরু করে উর্ধ্বগ প্রতিটি মেরুদণ্ডী প্রাণী ঘ্রাণশক্তির অধিকারী। এবং অধিকাংশ স্তন্যপায়ীর ঘ্রাণেন্দ্রিয় অপরিসীম শক্তিধর। কারণ, মস্তিষ্কস্থিত অন্যান্য অংশের, বিশেষ করে পুরোমস্তিষ্ক (সেরেব্রম), তুলনায় 'ঘ্রাণজ অঞ্চল', ইংরেজীতে যাকে বলি অলফ্যাক্টরি লোব, যেখানে গন্ধানুভূতি গৃহীত হয়, সেটা সর্বাধিক উন্নত এবং সুগঠিত। ফলে প্রাত্যহিক জীবনে গন্ধের ভূমিকাটি মানুষের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মতই, কেননা এই গন্ধই প্রাণীকে বস্তু-বিশেষের অস্তিত্ববোধ করায়, এমনকি দুই অনুরূপ বস্তুতে স্বাতন্ত্র্যবোধ জন্মায়, আবার চতুষ্পার্শ্বের সঠিক খবর এবং সবচেয়ে বেশী খবরও পাইয়ে দেয়। এভাবে দূরকে নিকট করে, দূরের খবর এনে দেয় এবং নিকটকে আরও কাছে টেনে নিতে সাহায্য করে। গন্ধ যেন প্রাণীর প্রাণভোমরা, elan vital.।

নাসিকার ভূমিসংলগ্ন অবস্থিতি হেতু প্রাণীদের গন্ধ চেনা এবং গন্ধ অনুসরণ করা আরও সহজ, স্বচ্ছন্দ, সুন্দর, উদাহরণস্বরূপ, শিকারী কুকুর, সাপ, টিকটিকি প্রভৃতি চতুষ্পদ সরীসৃপ প্রাণীদের উল্লেখ করা যেতে পারে।

যারা জগৎ চিনেছে এই ঘ্রাণের ভিতর দিয়েই, প্রাত্যহিক জীবনে গন্ধের হাত ধরে চলাই যাদের নিয়তি, সেই প্রাণীদের যৌনজীবনে গন্ধ যে একটা বড় ভূমিকা নেবে সেটা আর এমন বিচিত্র কী, মেঘের পরে মেঘ জমে জল নামার মতই স্বাভাবিক। প্রজনঋতুতে অনেক প্রাণীর, স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই, গন্ধলুব্ধতাই এর নির্ভুল প্রমাণ। অধিকাংশ স্তন্যপায়ীদের কাছে গন্ধই রাগোদ্দীপক, শুধু অন্যতম নয়, শ্রেষ্ঠও বটে। প্রজনঋতুকালে স্ত্রীপ্রাণী সত্য সত্যই গন্ধমোহিনী-বিশেষ, গোপনাঙ্গের ক্ষরণ, মূত্র এবং অন্যান্য ক্লেদও বিশিষ্ট গন্ধে ভরা, এগন্ধেই পুরুষপ্রাণীর যৌনতা দপ্ করে জ্বলে ওঠে। যেমন জাগিয়ে তোলে কুকুরকে। আশেপাশে কোথাও কুকুরীর চিহ্ন নেই, পড়ে আছে শুধু তার মূত্র, তাই শুঁকেই যে কোন পুরুষ কুকুর বলে দিতে পারে কুকুরীর কোন দশা চলছে, প্রজনঋতুর দাবদাহ না শান্ত হিমবায়। আবার কুকুরীকে যখন কাছে পায়, পরশ না করে শুধু আঘ্রাণেই তার হৃদয় ভরিয়ে নেয়। এক সারমেয়-এর রতিগন্ধে অন্য এক সারমেয়-এর উদ্দীপ্ত হওয়ার এবং সেই সারমেয়ীকে আবিষ্কারপূর্বক মিলিত হওয়ার উল্লেখ করেছেন ডাঃ হ্যাভলক এলিস। ডাঃ ফোর্ড এবং ডাঃ বিচ লক্ষ্য করেছেন, স্ত্রী-শজারুর মূত্রসিক্ত কাঠি দিয়ে পুরুষ-শজারুর যৌনতা জেগে উঠতে। প্রাইমেট শ্রেণীভুক্ত প্রাণীদের মধ্যে সাধারণ বানর এবং নরাকার বানরও ঘ্রাণে মত্ত হয়ে বানরীর গোপনাঙ্গে জিহ্বা ও নাসিকা সহযোগে বিবিধ কামকলা প্রয়োগে কুণ্ঠিত নয়।

এক কথায়, স্তন্যপায়ী জগতে গন্ধস্রাবী গোপনাঙ্গের আকর্ষণ করার ক্ষমতা অসীম এবং এগন্ধের জন্যেই পুরুষপ্রাণী খুঁজে পেতে নেয় স্ত্রীপ্রাণীকে, তারপর উপচার প্রয়োগ করে গোপনাঙ্গে: মুখ বা জিহ্বা দিয়ে স্পর্শ করে, টানাটানি করে, মুখ দিয়ে খোটে, মৃদু দংশন কিংবা নাসিকা প্রয়োগ। এতে শুধু পুরুষ নয়, স্ত্রীও উত্তপ্ত হয়ে উঠে।

শুধু স্ত্রী নয়, পুরুষও কামগন্ধের উৎস হতে পারে। পুরুষ-প্রাণীর যৌনাঙ্গলে বা তদেকদেশে গন্ধকোষ থাকতে পারে, যেমন আছে কস্তুরীমৃগ, গন্ধগোকুল, বীবর প্রভৃতি প্রাণীর। প্রথমে গন্ধমৃগর কথা বলি। এক ধরনের নিঃশৃঙ্গ হরিণ, তিব্বতে ও নেপালে দৃষ্ট, পুরুষ হরিণের নাভির নিকটে গন্ধগ্রন্থি থাকে। বসন্তকালে উত্তেজনাসমাগমে এই গ্রন্থি থেকে গন্ধ নিঃসারিত হয়, এটাই 'মাস্ক'

বা কস্তুরী নামে ভুবনবিদিত। এগন্ধ স্ত্রীপ্রাণীকে মোহিত করে, স্ত্রীপ্রাণী গন্ধলোলুপ হয়ে যে পুরুষ প্রাণীর কাছে ছুটে যায় তা নয়, বরং গন্ধ এদেরকে প্রলোভিত করে এবং ডারউইনের মতে, যে প্রাণী সবচেয়ে বেশী সুরভিত স্ত্রী প্রাণীর হৃদয়জয়ে সেই সফলকাম হয় সবচেয়ে বেশী, এভাবে গন্ধ 'যৌন নির্বাচন'-এর আরেকটি সুন্দর উদাহরণ হয়ে ওঠে। প্রসঙ্গতঃ বলে রাখি এগন্ধ উদ্ভিদ-জগতেও ছড়িয়ে আছে, উদাহরণস্বরূপ মৃগমদবাসা কস্তুরীমল্লিকা ফুল, কস্তুরী-গন্ধযুক্ত কালকস্তুরী ও লতাকস্তুরী উদ্ভিদের উল্লেখ করা যেতে পারে।

উভচর বীবর (Beaver) এবং নকুল জাতীয় গন্ধগোকুল (Civet-cat), এদুটি প্রাণীরও গন্ধমৃগসম বিশেষ গন্ধগ্রন্থি আছে, যার সুবাস প্রথমোক্ত প্রাণীর ক্ষেত্রে Castoreum নামে খ্যাত, মনে হয় সংস্কৃত 'কস্তুর' শব্দেরই অপভ্রংশ, দ্বিতীয় প্রাণীর সৌরভ 'Civet'। প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয় যে, আমাদের প্রাচীন ভারতবর্ষেও প্রাণিজ গন্ধের ধারণা ছিল, কস্তুরী শব্দটি সংস্কৃত, এটাই প্রাচীনত্বের প্রমাণ। আরেকটি প্রমাণ এলাচগন্ধযুক্ত মদমত্ত হস্তীর উল্লেখ, বাণভট্ট রচিত কাদম্বরীতে। এবং 'অনঙ্গরঙ্গ' কামশাস্ত্রে, হস্তিনী নায়িকার দেহগন্ধের সঙ্গে মদগন্ধযুক্ত হস্তীর তুলনায়। সবশেষে বলি, পতঙ্গরাও গন্ধমুগ্ধ, অনেক পতঙ্গের কামজীবনে গন্ধের ভূমিকা পূর্বোক্ত প্রাণীদের মতই সমান গুরুত্বপূর্ণ।

ভূমি সংলগ্ন নাসিকার অবস্থিতি, নাসিকা দ্বারা গৃহীত অনুভূতি যার নাম গন্ধ সেটি বিশেষ ও আদিম এবং নার্ভতন্ত্রে ঘ্রাণজ অঞ্চল সর্বাধিক উন্নত ও সুগঠিত—এই তিনটি কারণে প্রাণিজগতে গন্ধ অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। স্তন্যপায়ী জগতে গন্ধযুক্ত উদ্দীপনা বড় রকমের আকর্ষণ, রতিবাসনা জাগিয়ে তুলতে, দূরবর্তী কামপাত্রীর আভাস পেতে, কামপাত্রীকে চিনে নিতে বা জয় করতে এবং পূর্ণ তৃপ্তির পরশ পেতে, এবংবিধ প্রতিটি রতিব্যাপারে সহায়তাহস্ত প্রসারিত করে দেয় এই গন্ধ। আর শুধু গন্ধ দিয়েই যে প্রাণীর রতি-অভিষেক হয়, সেখানে তো সঙ্গী নির্বাচনের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার।

বিবর্তনের সিঁড়ির শেষ ধাপে রয়েছে প্রাইমেট শ্রেণীভুক্ত প্রাণীরা। বানর-কুলে এগৌরব অস্তমিত, এদের যৌনজীবনে গন্ধ একটা অংশমাত্র, পূর্বোক্ত প্রাণীদের মত বড় অংশ জুড়ে বসে নেই। প্রাইমেট শ্রেণীভুক্ত প্রাণীর আরেকটি বড় শরিক মানুষ, এজগতে প্রভাব ক্ষয়িষ্ণু, একাদশী চাঁদের মতই এককালি, লুপ্তপ্রায় বলাই ভাল। কিন্তু কেন? গন্ধের সেই একচ্ছত্র আধিপত্য নেই কেন? কোথায় গেল সেই সসাগরা সাম্রাজ্য? এক কথায় বলা যেতে পারে এসবই বিবর্তনের পরিণতি। অভিব্যক্তির পাল্লায় পড়ে গন্ধেন্দ্রিয়ের এই হেনস্থা, তা

হোক, আখেরে কিন্তু লোকসান হয়নি, লাভই হয়েছে। ব্যাপারটা খুলেই বলি।

বিবর্তনের সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে মানুষের মস্তিষ্কে যে বিপুল পরিবর্তন ঘটেছে তারই পরিণতিস্বরূপ ঘ্রাণজ অনুভূতির গুরুত্ব অনেক কমে গিয়েছে। কিছু পূর্বেই উল্লেখ করেছি অধিকাংশ প্রাণীর পশ্চাৎমস্তিষ্ক সুপরিণত, সুগঠিত, আর এখানেই রয়েছে ঘ্রাণজ কেন্দ্র, এতুলনায় পুরোমস্তিষ্ক যেমন ক্ষুদ্র তেমনি অপরিণত। বিবর্তনের ছোঁয়া লেগে পশ্চাৎমস্তিষ্ককে পিছে রেখে পুরোমস্তিষ্ক জোর কদমে এগিয়ে গেছে, তাই না মানুষের পুরোমস্তিষ্ক আয়তনে, গঠনে, পরিস্ফুরণে অতিমাত্রায় উন্নত।

ফলে হয়েছে কি, মানুষের গন্ধশক্তি প্রাণীদের মত তীক্ষ্ণ, উগ্র, বলবান নয় কিংবা শারীরবৃত্তীয় দৃষ্টিতে বলা যেতে পারে গন্ধানুভূতি-সীমা[১] অনেক কমে গেছে। অধিকন্তু দ্বিপদ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নাসিকা আর ভূমিতে ফারাক হয়েছে অনেক, যার ফলে 'ঘ্রাণজ প্রত্যক্ষ' অর্থাৎ ঘ্রাণেন্দ্রিয়জন্য জ্ঞানের ভূমিকাটি অনাবশ্যক হয়ে পড়েছে। শুধু তাই নয়, ঘ্রাণজ আকর্ষণ কেন্দ্রটিরও স্থানান্তর (ডা: হ্যাভলক এলিসের ধারণায়, ঋজুভাবে অবস্থানের জন্যেই এই পরিবর্তন) ঘটেছে, গোপনাঙ্গ থেকে দেহের ঊর্ধ্বভাগে, তত্রত্য চর্মরাজিতে আর মস্তকে আর বাহুমূলে। তাছাড়া প্রাণিজগতের মত মানুষের গোপনাঙ্গ রঙবাহারী নয়, মদস্রাবী গন্ধমোহিনীও না, এবং মনুষ্য শৃঙ্গারে গোপনাঙ্গ প্রদর্শন অপরিহার্যও নয়।

দূর থেকে হাতছানি দিতে পারে না গন্ধ আর এটা অনুভূত হওয়ার পূর্বেই চক্ষুরাগে যৌনতা জ্বলে ওঠে, নয়নকটাক্ষে অপাঙ্গ বিদ্ধ হয়। গন্ধকে যদি আকর্ষক বা রাগোদ্দীপক হতেই হয় দুটি প্রাণ কাছাকাছি না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে এবং গন্ধডোরে দুটি হৃদয় বাঁধা পড়ার পূর্বেই দৃষ্টি বিনিময় হয়, 'দর্শন প্রত্যক্ষ' তাই ঘ্রাণজ প্রত্যক্ষ অপেক্ষা অধিক কার্যকরী। তাই না গন্ধ নিজের স্বাতন্ত্র্য বিলিয়ে দিয়ে দৃষ্টিশক্তির সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নিয়েছে। এভাবে অনুভূতি ঐশ্বর্যে একদা সম্রাট গন্ধেন্দ্রিয় আজ দ্বিতীয় সারিতে নেমে আসতে বাধ্য হয়েছে।

কমে এসেছে গন্ধের যৌন ভূমিকাটিও। গন্ধমাত্র সম্বল করে সঙ্গিনীজয়ের অভিযানে—সঙ্গিনীকে (বা সঙ্গীকে) চিনে নিতে, তার হদিশ পেতে, তাকে

১। Threshold level of smell consciousness। ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের চরম বিকাশ দেখি কুকুর এবং সরীসৃপদের মধ্যে, এরা তাই অতি সহজেই গন্ধ পায় এবং অতি অল্প গন্ধও এদের অনুভূতিদ্বারে ঘা দেয়।

জাগিয়ে তুলতে—আজ আর কেউ এগিয়ে যায় না, আর কে না বলবে রতি-সুখসারে অধিক তৃপ্তির সন্ধানও দিতে পারে না। প্রাণিজগতে এই মাত্র উল্লেখ করা উদ্দেশ্যগুলি অনায়াসেই গন্ধ দ্বারা সুসম্পন্ন হতে পারে। কিন্তু মনুষ্যজগতে নয়, কেননা আরও মার্জিত ও উন্নত, আরও সুন্দর ও কার্যকরী উপায়গুলি মানুষের হাতে এসেছে, এদের মধ্যে ভাষা এবং দৃষ্টি সর্বাগ্রেই উল্লেখযোগ্য। উৎকর্ষ এবং উপযোগিতার বিচারে দর্শন, শ্রবণ এবং স্পর্শনের যৌন আবেদন ঘ্রাণের চেয়ে অনেক বেশী।

যদিও ভাবের ঘরে বাসা বাঁধতে পারে তবুও কিনা মনুষ্যজীবনে গন্ধের ভূমিকাটি প্রথম সারির নয়, গৌণ, অপ্রধান। বড় জোর বলা যেতে পারে প্রয়োজনীয় সহকারী, এর বেশী নয়। কেননা কামান দেগে ঘ্রাণেন্দ্রিয় উড়িয়ে দিলেও মানুষের কোন ক্ষতি হবে না, গন্ধহীন জগতে নির্বাসিত মানুষের জীবন পূর্বের মতই শান্ত সুন্দর থাকবে, শুধু ভোজনবিলাসীর বিলাস-ব্যসনে ঠাট থাকবে না, অর্থাৎ আহার্য ও পানীয়দ্রব্য উপভোগের সুখৈশ্বর্য কিছুটা ব্যাহত হবে এই যা।

যৌন নির্বাচনের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে প্রাণিজগতে যার অমোঘতা ছিল অপরিসীম, বিবর্তনের পাল্লায় পড়ে সেই গন্ধ আজ নখদন্তহীন, ধার আর ভার দুইই কমে এসেছে। তবুও বলব, মনুষ্যজগতে গন্ধানুভূতি কম বলবান নয়। গন্ধের ফাঁদে পা দিয়ে কোন মানুষ ধরা না দিক, সঙ্গী নির্বাচনে ভূমিকা না থাক, রতিব্যাপারে গন্ধের প্রভাব আছে। প্রকৃতিতে অন্তঃসলিলা কিংবা পরিমাণে অল্প হলেও ঘ্রাণের যৌন আবেদন আছে, প্রয়োজনীয় সহকারী রূপে সাহায্যহস্ত প্রসারিত করতে পারে রতিজীবনের অনেক ক্ষেত্রেই। যেমন, রতারম্ভের মধু গন্ধে ভরা সুন্দর পরিবেশ রচনায় কিংবা রতিক্রিয়ার গন্ধময় আঙ্গিক হিসেবে। আর বিস্তর হলে, এটাই কিন্তু যৌনতার একটি শর্ত হিসেবে দেখা দেবে।

বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, মানুষমাত্রেরই একটা গন্ধ আছে, কামশাস্ত্রে এটাই দেহগন্ধ নামে খ্যাত। এগন্ধ শিশুদের নেই, বৃদ্ধরাও গন্ধহীন, আর এদুই সীমার মাঝে যারা ভিড় করে আছে তারাই গন্ধযুক্ত। এগন্ধ নর-নারী উভয়কেই প্রথম দেখা দিয়েছে বয়ঃসন্ধিকালে কিন্তু নারীকেই বাসিত করেছে সবচেয়ে বেশী। কারণ, পুরুষের তুলনায় দেহগন্ধ-বৈচিত্র্যের গৌরব, গন্ধদ্রব্য, গন্ধপ্রিয়তা এবং ব্যবহার সবই দেখি নারীরই বেশী।

আপনার মনে হয়ত হতে পারে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন না থাকলেই বুঝি এগন্ধের

শিকার হতে হয়। অসভ্য, জংলী, আদিবাসী কিংবা সভ্যজগতের অপরিষ্কৃত নোংরা মানুষই বুঝি স্বীয় গাত্রগন্ধ প্রসারিত করে। ব্যাপারটা কিন্তু ঠিক তা নয়, কেননা দেহগন্ধ আর অশুচিতার দুর্গন্ধ এক নয়, শেষোক্ত গন্ধটি স্বাস্থ্যবিধির পাঠ না নেওয়ারই প্রায়শ্চিত্ত। অর্থাৎ দেহগন্ধ এক জিনিস, আর মলিন বসন বা অপরিষ্কৃত দেহজাত অপ্রিয় গন্ধ কিংবা দেহনিঃসারিত ক্ষতগন্ধ বা দূষিত (অপান) বায়ু, অথবা দুর্গন্ধশ্বাস বা নিঃশ্বাসের পেঁয়াজ, রসুন সুরভি, এরা আর এক জিনিস। অতএব, পরিষ্কৃত, সুসংস্কৃত, মার্জিত সভ্য মানুষেরও স্বতন্ত্র গন্ধ আছে, এমনকি সদ্যস্নাত মানুষটিও নির্গন্ধ নয়। ম্রিয়মান বা অল্প সংবেদী ঘ্রাণশক্তি (হ্যাভলক এলিস), নিম্ন অনুভূতি সীমা (প্লস ও বার্টেলস), শ্বাপদতুল্য তীক্ষ্ণ ঘ্রাণশক্তির অভাব (ভ্যান ডি ভেল্ডি) প্রভৃতি কারণে, মানুষের ভোঁতা নাকে এগন্ধ ধরা না পড়লেও কুকুরকে (কিংবা অন্য কোন শ্বাপদ প্রাণীকে) ফাঁকি দিতে পারে না, এরা গন্ধ শুঁকেই প্রভুকে চিনে নেয়। এখানেই শেষ নয়, এক মানুষ থেকে অন্য মানুষে এগন্ধ ভিন্ন, এসত্যের সবচেয়ে বড় সাক্ষী কুকুরই, ঘ্রাত গন্ধ দিয়েই দুই বা বহুর মধ্যে বিশেষ বস্তু বা মানুষকে চিনে নিতে ভুল করে না।

এগন্ধ শুধু যে ব্যক্তিগত তা নয়, জাতিগতও বটে। দেহগন্ধে জাতীয় বৈশিষ্ট্য লুকিয়ে থাকতে পারে, একথা শুনে হয়ত চমক লাগবে, কিন্তু দুই ডাক্তার হ্যাভলক এলিস, টি এইচ. ভ্যান ডি ভেল্ডি আর দুই নৃবিজ্ঞানী হ...মান প্লস ও ম্যাক্স বার্টেলস, এই চার দিক্‌পালের জবানি যদি শুনতেই হয়, ঢোক গিলে কবুল করা ছাড়া উপায় কি! এঁদের মতে এক একটা জাতি এক এক প্রকার বিশেষ গন্ধ দ্বারা চিহ্নিত এবং একটা সমগ্র জাতিকে যে গন্ধ জড়িয়ে আছে সেটা কিন্তু অন্য জাতির থেকে পৃথক। এব্যাপারে শুধু যে এক জাতির সঙ্গে অন্য জাতির মিল নেই তা নয়, একই জাতির দুটি মানুষও ভিন্নগন্ধী। অর্থাৎ দেহগন্ধে এঁরা প্রত্যেকেই মনে প্রাণে বিশ্বাসী, তেমনি জাতিগত গন্ধের ক্লান্তিহীন প্রবক্তাও। সমর্থনস্বরূপ বলা যেতে পারে, নিগ্রোরা উগ্রগন্ধী, আর এগন্ধের মূলে নোংরামি নেই, জাতীয় বৈশিষ্ট্যই আছে। চীনারা নাকি মৃগমদসুবাসিত! আর মুস্লিমদেহে যে সুরভি মিলবে সেটা পিঁয়াজ-রসুনেরই, অন্ততঃ এজাতীয় দ্রব্য স্পর্শ করেনি এমন মানুষ যদি কোনদিন মুস্লিমসান্নিধ্যে আসে একটা গন্ধ তার অনুভূতির দ্বারে ঘা দেবেই। ইউরোপীয়রাও গন্ধবহুল, নিদেনপক্ষে চীনা বা জাপানীদের চেয়ে তো বটেই। চীনাগৃহে ইউরোপীয় অতিথির আবির্ভাব বলে দেওয়াটা অনেক চীনার পক্ষেই সম্ভব। হ্যাভলক

এলিসের ধারণায় ইউরোপীয়দেহে কেশরাজির প্রাচুর্যের জন্যেই এই গন্ধবিস্তার, কারণ তৈলাক্তদ্রব্য ক্ষরণকারী গ্রন্থি (সিবেসাস গ্ল্যাণ্ড) কেশযন্ত্রেরই একটি অঙ্গ। পক্ষান্তরে ভ্যান ডি ভেল্ডি দেখেছেন বীর্যগন্ধের মৃদুতা ককেশীয় পুরুষেরই বৈশিষ্ট্য আর প্রাচ্যদেশীয় যুবকের বীর্য আরও মদির ও আরও কটু গন্ধে ভরা। উদ্দেশ্যবাদের দিক থেকে বলা যেতে পারে এই নৃজাতিগত গন্ধ প্রকৃতিরই একটি নিয়ম। 'মিসিজেনেশান' বা জাতিমিশ্রণের প্রতিষেধক (প্লস ও বার্টেলস)। কেননা এগন্ধ দিয়েই দুটি জাতির মধ্যে একটা ব্যবধান গড়ে ওঠে, যার প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে অনুরাগের দানা সহজে বাঁধে না।

মানুষ যে 'নির্গন্ধাঃ ইব কিংশুকাঃ' নয়, একথা শুনিয়েছেন অনেকেই। এঁদের মধ্যে আছেন পূর্বোক্ত চার মহারথী, আর আছেন ভারতীয় কামশাস্ত্রকারগণ, কিন্তু ভারতীয়রাই পথিকৃৎ, কেননা, বিশ্ববাসীর সঙ্গে গন্ধময় যৌনতার পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন এঁরাই। ভাবতেও আনন্দ লাগে, ভারতীয় দার্শনিকের কণ্ঠেই প্রথম ধ্বনিত হয়েছে, প্রতিটি পার্থিব বস্তুই গন্ধযুক্ত। সেই মহাভারতীয় যুগে, মৎস্যগন্ধার প্রতি গন্ধমুগ্ধ পরাশর মুনির প্রণয় নিবেদনের ঘটনাটি গাত্র-গন্ধেরই অমর উদাহরণ। আরেকটি সুন্দর উদাহরণ: দেহগন্ধানুযায়ী নারীর শ্রেণীবিন্যাস। এপ্রসঙ্গ প্রথম উল্লেখিত হয়েছে 'রতিরহস্য'-এ, তারপর 'স্মরদীপিকা', 'রতিমঞ্জরী' এবং 'অনঙ্গরঙ্গ'-এ। রতিরহস্য এবং অনঙ্গরঙ্গ, এদুটি গ্রন্থে নারীবিন্যাসের ধারাটি কামগন্ধী, অর্থাৎ কামসলিলের (স্ত্রীঅঙ্গের রসক্ষরণ) সৌরভ ভেদে নারী কখন পদ্মিনী, যখন তার ক্ষরণ প্রস্ফুটিত পদ্মগন্ধ ছড়ায়। চিত্রিণীর কামসলিল মধুময়, শঙ্খিনী ক্ষারগন্ধযুক্তা। হস্তিনীও গন্ধবতী, তবে এগন্ধ রতিপ্রমত্ত পুরুষ হস্তীর মদস্রাব (বাণভট্ট রচিত কাদম্বরীতে এলাচগন্ধীরূপে বর্ণিত) স্মরণ করিয়ে দেবে। রতিমঞ্জরী ও স্মরদীপিকায়, কামগন্ধ নয় গাত্র-গন্ধই প্রেরণা দিয়েছে নারীকে চারটি পুষ্পস্তবকে সাজাবার। পদ্মগন্ধা নারী তাই পদ্মিনী, মীনগন্ধার আরেক নাম চিত্রিণী। শঙ্খিনী ক্ষারগন্ধা আর হস্তিনী মদগন্ধা। এই প্রসঙ্গে আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই সেই বিখ্যাত পদটি যার বয়ান এই, 'শ্রীঅঙ্গের তপ্ত সৌরভ'।

এখন দেখা যাক মনুষ্যদেহে কেমন করে গন্ধের মন্দির গড়ে ওঠে। মোটামুটি-ভাবে ধরা চলে, এমন্দিরের চারটি স্তম্ভ: সুগন্ধ আর দেহগন্ধ আর কামগন্ধ আর দুর্গন্ধ। প্রথমে সুগন্ধের কথা বলি।

সুগন্ধ

সুগন্ধের প্রধানতম উৎস যে গন্ধকারক দ্রব্য সেটা বোধ করি না বলে দিলেও

চলে। সুগন্ধীকরণের উপায় হিসেবে, অগুরু, ল্যাভেণ্ডার, অডিকলোন মিশিয়ে বিলাসবহুল গন্ধবারি স্নান থেকে সুলভ গন্ধপুষ্প (গোলাপ, যুঁই, বেল) বা গন্ধযুক্ত গাছগাছড়া (চন্দন, কস্তুরীলতা) ব্যবহার করা যেতে পারে, ব্যবহার করা যেতে পারে আদি মৃগনাভি কিংবা অকৃত্রিম বাদশাহী আতর অথবা কৃত্রিম সেন্ট বা সুরভি। আর সুবাসিত সাবান, সুরভিত কেশ তৈল তো সবারই ঘরে ঘরে।

উষ্ণপ্রধান অঞ্চলে, যেমন সমগ্র প্রাচ্য দেশে, সুবাসিত দ্রব্যমাত্রেই আদরের, বর্ণোজ্জ্বল পুষ্পস্তবকের সমাদর নেই, সমাদর শুধু গন্ধপুষ্পের। আর এই সৌরভ শুঁকতে শুঁকতে যদি প্রাচীন অতীতে ফিরে যেতে পারি, গন্ধময় প্রাচীন ভারত চোখের সামনে ভেসে উঠবেই, সেই সঙ্গে হিব্রু ও মুস্লিম অধ্যুষিত রাজ্যগুলিও। প্রাচীন ভারতীয় সমাজে আপন শরীর, বাসগৃহ বা সজ্জা সুগন্ধিত করার অভ্যাস ছিল, দৃষ্টান্ত, বিবিধ গন্ধপুষ্প বা পুষ্পসার দিয়ে বাসকসজ্জা, চুয়া-চন্দন-অগুরু-কুঙ্কুমাদি দ্বারা গাত্রলেপন (অঙ্গরাগ), এবং গাত্রগন্ধ দূর করার জন্যে বিবিধ গন্ধদ্রব্য দ্বারা অঙ্গের শোধন (অঙ্গসংস্কার)। এক কথায়, ভারতীয় কাব্যে (কস্তুরী, মৃগমদ, হস্তিমদ) এবং ভারতীয় জনজীবনে (পুষ্পসার, পুষ্পশয়ন ইত্যাদি) গন্ধের ব্যবহার যেমন ব্যাপক তেমনি সুন্দর ছিল, এরই সামান্য কিছু পরিচয় আজও ছড়িয়ে আছে আমাদের শুভকর্মে, প্রাত্যহিক জীবনে।

সমাদৃত ছিল মুস্লিম জগতেও, এবং এই আরব্য সমাজেরই একটি প্রথা ছিল দেহের চারটি অঙ্গ—মুখমণ্ডল, নাসিকা, কক্ষপুট এবং গোপনাঙ্গ—সুরভিত করা। এমনকি সুগন্ধদ্রব্য যে নরনারীকে রতিব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করতে পারে এও জানা ছিল ইসলাম (এবং ভারতীয়) সভ্যতার। 'পারফিউমড গার্ডেন' এবং 'এল কিতাব' গ্রন্থ দুটিই তার সাক্ষী। প্রথম গ্রন্থে বলা হয়েছে কস্তুরী এমন একটা সুরভি যার ঘ্রাণে নারী বিবশ হয়ে পড়ে। দ্বিতীয় গ্রন্থে সুরভিশ্রেষ্ঠ রূপে বর্ণিত কস্তুরী গন্ধ প্রায়শঃ কামভাব আনে এবং রতিলালসার ইন্ধন জোগাতে অদ্বিতীয়।

প্রসঙ্গতঃ বলে রাখা ভাল, কস্তুরী গন্ধ সাধারণতঃ কামোদ্দীপক (Aphrodisiac) রূপেই খ্যাত। সেই আবহমান কাল থেকেই হিন্দু ও মুস্লিম উভয় জগতেরই প্রিয় গন্ধ। এরূপ আরেকটি ঐতিহাসিক গন্ধঃ ল্যাভেণ্ডার। ষোড়শ শতাব্দীর আরব সমাজে প্রচলিত এগন্ধটি গোপনাঙ্গ গন্ধ দূর করতে অদ্বিতীয়।

সভ্য জগতের মত আদিম জগতও মধু গন্ধে ভরা এবং সভ্য মানুষের তুলনায় এরা গন্ধদ্রব্যও ব্যবহার করে অনেক বেশী। গন্ধবিহীন মানুষকে যে এরা ঘৃণা

করে, তাই। কোন কোন পণ্ডিতের মতে এরা নাকি অনেক বেশী গন্ধময় এবং এগন্ধ দিয়ে নাকি কোন কোন আদিবাসীকে চেনা যায়। এদের সুগন্ধীকরণের উদ্দেশ্যটি কখন রতিবিষয়ক, কখন দুর্গন্ধ বিনাশের একটি উপায়, কখন শুধুই ঘ্রাণেন্দ্রিয়-প্রীতি ইচ্ছা। কয়েকটি দৃষ্টান্ত : ইকুয়াডর-স্থিত আদিম পুরুষ (Cayapa) গন্ধযুক্ত গাছগাছড়া ব্যবহার করে রমণীকে রসে বশে রাখতে। পশ্চিম এ্যাপাচি-র (Apace) কুমারীর দেহবল্লরী বেষ্টিত করে থাকে গন্ধবহ শিকড়, কুমারের দৃষ্টিতে নিজেকে তুলে ধরাটাই প্রধান নিমিত্ত। আর, নিউগিনির উত্তর উপকূলে যে দ্বীপপুঞ্জ আছে তত্রত্য আদিম সমাজে (Wogeo) স্বেদগন্ধ বিনাশের জন্যে গন্ধযুক্ত পত্রাদি লেপন জনপ্রিয়।

সুরভিত করার উদ্দেশ্যটি কতটা যৌন আর কতটা অযৌন, এনিয়ে যাঁরা তর্ক জুড়তে চান তাঁদেরও দুটি কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। উদ্দেশ্য দুটি এতই ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে যে ক্ষেত্রবিশেষে আসল কারণটির হদিশ পাওয়া দুঃসাধ্য। দ্বিতীয় বক্তব্য : অযৌন উদ্দেশ্যটি বহুদৃষ্ট হলেও, যৌন উদ্দেশ্য নিয়েও ব্যবহৃত হয় বৈকি! প্রসঙ্গতঃ বলি, সুগন্ধীকরণের আদিম উদ্দেশ্যটি নাকি এই ছিল : গন্ধ চাপা দিয়ে দুর্গন্ধ ঢাকা নয়, স্বাভাবিক দেহগন্ধ আরও প্রসারিত করা।

উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, এটা নিশ্চিত যে অনুরাগই সুগন্ধের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। বাসকসজ্জার মৃদু সুবাসে, সুরভিত কাননের সৌরভবায়ে গন্ধ-গ্রাহীর চোখে মুখে সুখ-হর্ষ-আবেশে উজ্জ্বল যে ছবিটি দেখব সেটাই তো অনুরাগ আর এই অনুরাগের গভীরে লুকিয়ে আছে : ভাবানুষঙ্গের সমারোহ, সুখস্মৃতির আসা যাওয়া আর সমগ্র নার্ভতন্ত্রের উদ্দীপনা বা চঞ্চলতা।

আবেগময় অনুভূতিই গন্ধের প্রাণভোমরা, ইনষ্টিংক্টই নারীকে এটা শিখিয়েছে, হয়ত একারণেই, সেই আবহমান কাল থেকেই নারী গন্ধকারক দ্রব্যের অনুরাগিণী। সত্যি বলতে, পুরুষের তুলনায় গন্ধমুগ্ধতার প্রাধান্য এবং অধিক গন্ধদ্রব্য ব্যবহারের গৌরব নারীরই বেশী, এভাবে নারী নিজেও যেমন তৃপ্তি পায়, সঙ্গীর আনন্দও তেমনি কম হয় না।

দুর্গন্ধ

'ঘ্রাণজ প্রত্যক্ষ' নামক নদীর এপার যদি সুগন্ধে ভরা থাকে, ওপারে নিশ্চয়ই দুর্গন্ধের রাজত্ব। দুর্ভাগ্যক্রমে এই দুর্গন্ধেরই শিকার হতে পারে মানুষ এবং এই হীনদশার উদ্ভব প্রধানতঃ অপরিচ্ছন্নতায় এবং স্বাস্থ্যবিধি না মানায়। মলিন বসন আর ধূসর দেহ ঘিরে যে বায়ুস্তর জমে ওঠে সেটা অনেকেরই কাছে

অপ্রীতিকর। আর স্বাস্থ্যকাব্যে দেহ যদি উপেক্ষিত থাকে দেহীর গন্ধ তখন আর মাধুরী প্রসারিত করে না, প্রসারিত করে দুর্গন্ধ। দুটি উদাহরণ দিই। পর্যুষিত ঘামের জন্যে, দেহের স্বাভাবিক গন্ধ, যাকে বলি দেহগন্ধ, সেটাও পূতিগন্ধময় হয়ে ওঠে। আর যৌনক্লেদ অর্থাৎ যৌন অঞ্চলের, বিশেষ করে ভগাঙ্কুরে বা লিঙ্গাগ্রে, ক্লেদ যদি কিছুদিন অপরিষ্কৃত থাকে, চোখে দেখা যায় এমন পরিমাণে জমে ওঠে, যৌনক্লেদ নিঃসারিত মদির কামগন্ধের তখন সারা, আর বীভৎস গন্ধ বিকিরণ শুরু।

দুর্গন্ধিত পরিবেশের আরেকটি উল্লেখযোগ্য কারণ: ব্যাধিকবলিত দেহ। বিশেষ করে ক্যান্সারের সেই পূতিময় কুৎসিৎ গন্ধ যে শুঁকেছে সেই জানে। আর দেহে যদি অন্য কোন ক্ষত বাসা বাঁধে সেই ক্ষতস্থানের গন্ধও কম অস্বস্তিকর নয়। আবার পোকায় খাওয়া দাঁত, নাসিকা প্রদাহ ইত্যাদি কারণে দুর্গন্ধমুখ বা দুর্গন্ধশ্বাস ব্যক্তি অনেকেরই কাছে অপ্রিয়, তেমনি অপ্রিয় অগ্নিমান্দ্যের অপানবায়ু। প্রসঙ্গতঃ বলে রাখি, দুর্গন্ধস্রষ্টা স্বামী, বিশেষ করে সেই স্বামী যদি হয় আকবর (দুর্গন্ধশ্বাস), মুস্লিম নারী তালাক পাওয়ার অধিকারিণী।

দুর্গন্ধময় কোন কিছুর সান্নিধ্যে এলেই স্বাভাবিক এবং সুস্থ মানুষের হৃদয়ে যে অনুভূতিটি প্রবল এবং প্রধান হয়ে ওঠে তার নাম বিরাগ আর বিরাগ বলতে বুঝি বিরক্তি, ঘৃণা, ক্লেশ। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে দুর্গন্ধের আবেদন সেই পর্যায়ে পৌঁছতে পারে যাকে ঘ্রাণসুখকর বলা চলে, এমনকি, আশ্চর্য কাণ্ড, রতিলালসার ইন্ধনও জোগাতে পারে। কিন্তু কেন? এরা কি তবে সুস্থ নয়? বিকৃতকাম? না কি অস্বভাবী?

না কোনটাই নয়, এরা যেমন সুস্থ তেমনি স্বভাবী। কেননা, একটু সজাগ চোখ নিয়ে আপনার চারপাশে যদি তাকিয়ে থাকেন, এদৃশ্য আপনার চোখে পড়বেই যে, ঘর্মগন্ধ এবং দেহের দ্বারে দ্বারে যার জন্ম সেই শারীরিক ক্লেদাদির গন্ধ অনেকেই পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে শুঁকছেন, কেউ লুকিয়ে চুরিয়ে, কেউবা প্রকাশ্যে।

আর এও চোখে পড়বে, যে মলগন্ধ বা পর্যুষিত স্বেদগন্ধকে (এটা ভিনিগার সম) বলি ন্যক্কারজনক সেই গন্ধই কিনা আহার্যদ্রব্যে খুঁজি পিঁয়াজ হিং রসুনের মধ্য দিয়ে এবং ভিনিগার মিশ্রিত খাদ্যগ্রহণে প্রীত হই। আরও আশ্চর্য, নাভিক্লেদ বা যৌনক্লেদের সঙ্গে মৃগমদসুবাসের তফাৎ কোথায়, তবুও কিনা কস্তুরী ঘ্রাতব্য আর ক্লেদগন্ধ ঘৃণ্য।

পচা চামড়ার কুৎসিত গন্ধে নাক সিঁটকাই বটে কিন্তু এটাই যখন সুরভিতে

লুকিয়ে থাকে তার সমাদর করতে ভুলি না। বস্তুতঃ চামড়ার গন্ধ আশ্চর্যজনক-ভাবে কামোদ্দীপক। এগন্ধের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে পাদগন্ধের এবং পাদুকার, পদযুগলে, মোজায় যে বস্তুকাম জন্মে তার একটি কারণ হয়ত এঘ্রাণেই নিহিত। ডাঃ হ্যাভলক এলিস বলেছেন, পুরুষের গোপনাঙ্গ নিঃসৃত ঘ্রাণ চর্মবৎ। ডাঃ হেগেন ঋতুমতী কুমারীর গাত্রগন্ধে চামড়ার স্বাদ পেয়েছেন।

এরহস্যের কূল পেতে হলে, মানবমনের গভীরে ডুব দিতে হবে। আজকের বয়স্ক ব্যক্তি একদিন শিশু ছিল, সেই শিশুর এক বৎসর বয়স থেকে তিন বৎসর বয়স পর্যন্ত 'পায়ু-ধর্ষকাম দশা'-র কাল, এসময়ে শিশুর মলমূত্রত্যাগ ব্যাপারে কামানুভূতি, যেমন, বেগরোধজনিত সুখবোধ, মলমূত্রপ্রীতি, জন্মে। তখন শিশু মলমূত্র নিয়ে খেলা করে, কোন ঘৃণা নেই, কোন দুর্গন্ধও না। তারপর শিশু যতই বড় হয়, এই বস্তুতে শিশুর ঘৃণা জন্মে, দুর্গন্ধিত মনে হয়, ক্রমশঃ এপ্রীতি অবদমিত হয়ে নির্জ্ঞান মনে বাসা বাঁধে। পরিণত বয়সে এই ফেলে আসা স্মৃতি রোমন্থিত হতে পারে, দেখা দিতে পারে সচেতন মনে, তখন অবশ্য সেই নগ্ন রূপটি থাকে না, ভোল ফিরিয়ে নানা প্রতীকের আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। এক কথায় শৈশবের অবদমিত মলপ্রীতিই বয়স্ককালে আত্মপ্রকাশ করে, ছদ্মবেশী গন্ধটি কখন পেঁয়াজ রসুন হিং ভিনিগার প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্যের, কখন ঘর্মের, কখন অন্য কিছুর। এই একই কারণে গোপনাঙ্গের ঘ্রাণ বা ক্লেদাদির গন্ধ মানুষের যৌনতাকে উদ্দীপ্ত করতে পারে এবং শুধু উত্তেজনাকালে কিংবা রতিকালে অনেক স্বভাবী ও সুস্থ মানুষও এগন্ধে মুগ্ধ হতে পারে। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভাল, মনের প্রহরী অতিসজাগ, সদাজাগ্রত এমন মানুষের পূর্বোক্ত গন্ধে বিরাগই থেকে যায়, অনুরাগ জন্মে না, ঘ্রাণসুখ বা রতিসুখ কোনটাই সে পায় না।

দেহগন্ধ

সুগন্ধ আর দুর্গন্ধের মাঝে যে নদী বহতা তারই দুটি স্রোত, দেহগন্ধ আর কামগন্ধ, যেন জোয়ার আর ভাঁটা। প্রথমে দেহগন্ধের কথা বলি। দেহগন্ধ হচ্ছে দেহেরই সুরভি, অতএব এগন্ধের উৎস ছড়িয়ে আছে মানুষেরই সমগ্র দেহে, বিশেষ করে চক্ষুদ্বয়, কর্ণদ্বয়, নাসিকাদ্বয়, মুখবিবর, মূত্রদ্বার, যোনিমুখ, পায়ু প্রভৃতি দেহদ্বারগুলির আশেপাশে। দেহের এক বা একাধিক অঙ্গ—উল্লেখযোগ্য কয়েকটি অঙ্গের নাম বলছি, কেশরাজি দেহের বা মাথার (কেশগন্ধ), শ্বাসপ্রশ্বাস (শ্বাসগন্ধ), গাত্রচর্ম (স্বেদগন্ধ), বাহুমূল (কক্ষসুরভি), পাদতল (পাদগন্ধ), কর্ণমূল, স্তনমণ্ডল—থেকে নিঃসারিত হয়ে যে গন্ধ সৃষ্ট হয় তাকেই বলব দেহগন্ধ। আর, প্রখ্যাত নৃবিজ্ঞানী প্লস এবং বার্টেলস-এর সঙ্গে সায়

দিয়ে বলা যেতে পারে এগন্ধের উৎস প্রধানতঃ চারটি : গাত্রচর্ম, মস্তক, কক্ষপুট এবং গোপনাঙ্গ।

কেশগন্ধ

কেশরাজি শরীরে কিংবা মস্তকে জাত, সুতরাং কেশগন্ধ বিস্তারে শুধু কুন্তল নয়, দেহস্থ কেশসমূহ, এমনকি সেই সূক্ষ্মকেশরাশি যাকে বলি রোম, তারাও অংশগ্রহণ করে। এই কেশবাহিত গন্ধ সাতিশয় ক্ষীণ এবং মৃদু, নিবিড় সান্নিধ্য বিনা এটা তাই অনাঘ্রাতই থেকে যায়। সংখ্যায় কম হলেও, প্রিয়ার সুরভি, যে সুরভি ছড়িয়ে আছে তার কেশপাশে (কিংবা সমগ্র দেহে), সেই সুরভি কোন কোন পুরুষকে মন্ত্রমুগ্ধ করতে পারে। মন্ত্রমুগ্ধ না করুক, একটা মুগ্ধকর পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে নিশ্চয়ই, এখবরটুকু প্রত্যেক দম্পতিরই জানা উচিত। আরও ভাল করে জানা উচিত এগন্ধ আর যাই হোক, সঙ্গিনী বা সঙ্গীর কাছে যেন কোনমতেই অপ্রিয়, বিরক্তিকর না হয়।

দেহস্থ কেশস্বল্পতায় দেহগন্ধ কম, এক্রিন এবং সেবেসাস গ্রন্থি কম হতে বাধ্য, তাই। আর কেশপ্রাচুর্যে এগন্ধের ছড়াছড়ি, বলেছেন ডাঃ হ্যাভলক এলিস। চীনা-জাপানীদের তুলনায় লোমশ ইউরোপীয়রা অধিকতর গন্ধযুক্ত। প্লস এবং বার্টেলেস ধারণা করতে আনন্দ পেতেন, মনুষ্যদেহে কেশবিন্যাসের বিশেষ ধারাটি যেন ঘ্রাণজ উদ্দেশ্যেই সৃষ্ট, তদনুসারে ঘ্রাণজ কেন্দ্রচতুষ্টয় লোমবহুল অঞ্চলেই বিরাজিত, মস্তকে আর গাত্রচর্মে আর বাহুমূলে আর গোপনাঙ্গে। কক্ষপুট এবং যৌনাঞ্চলের কেশসমূহ ঘাম শুষে নেয়, গড়িয়ে পড়তে দেয় না, এতে কক্ষসুরভি বা গোপনাঙ্গের গোপন ঘ্রাণ আরও মদির হয়ে ওঠে এবং গন্ধের যৌন উদ্দেশ্যটি আরও প্রবলভাবে সার্থক করে তোলে। এখন যদি বলি, কামগন্ধ বিকিরণই কেশরাজির আদিম উদ্দেশ্য, তাহলে কি খুব বেশী বলা হবে, কে জানে।

শ্বাসগন্ধ

ত্যক্ত নিঃশ্বাসও গন্ধবহ হতে পারে, যদিচ এগন্ধ কাছাকাছি না আসা পর্যন্ত অনুভূত হয় না। মানুষের নিঃশ্বাসে যে গন্ধ প্রবাহিত হয় সেটা কখন মিষ্ট, সুরভিত, কখন উত্তেজক কামগন্ধী, কখন দুর্গন্ধময় বা অন্য গন্ধযুক্ত।

প্রিয়া পরিত্যক্ত শ্বাস কোন কোন পুরুষের ভাল লাগে, নিউজিল্যাণ্ডবাসী 'মাউরি' দম্পতিদের আরও ভাল লাগে ঘ্রাণজ চুম্বনে, এদের চরম অনুরাগ নাসিকা উপরি নাসিকা স্থাপন পূর্বক আদর বিনিময়ে। শুধু আদিম শৃঙ্গারে নয়, সভ্যজগতের মুখশৃঙ্গারে বা চুম্বনেও নিঃশ্বাসিত সুরভির গোপন প্রভাব

জড়িয়ে আছে। এমনকি, রতিক্লান্ত রমণীর নিঃশ্বাসেও কামগন্ধ আছে ডাঃ ভ্যান ডি ভেল্ডি-র দৃষ্টিতে, বীর্যসুরভি দ্রষ্টব্য।

শ্বাসগন্ধের যেটা সবচেয়ে ভয়ঙ্কর সেটা হল দুর্গন্ধ। দুর্গন্ধশ্বাস ব্যক্তিমাত্রই যে অপ্রীতিকর, অবাঞ্ছিত, সেটা বোধ করি বলার অপেক্ষা রাখে না, এবং এই একই কারণে সঙ্গপ্রত্যাশী নয় কেউই (৮৮ পৃষ্ঠা)। পিঁয়াজ-রসুনের গন্ধে যে নিঃশ্বাস আমোদিত, সেই গণ্ডির বাইরে থাকতে হয়ত অনেকেই চায় এবং হিন্দু নারীর মুস্লিম যুবককে অনমুরাগের কারণটি হয়ত এখানেই (জাতিমিশ্রণের প্রতিষেধক ব্যবস্থার একটি সুন্দর উদাহরণ)। আবার অন্য গন্ধও, ইথার, ক্লোরোফর্ম, প্যারাল্ডিহাইড প্রভৃতি ঔষধের গন্ধ নিঃশ্বাসের সঙ্গে নির্গত হতে পারে। শুধু রোগী নয়, চিকিৎসকও এভাবে ভেষজ গন্ধের স্রষ্টা হতে পারে। এক ডাক্তারের করুণ কাহিনী বলি: যেদিনই অপারেশন করতেন সেদিনই তার স্ত্রী অপ্রিয় দেহগন্ধের—ইথার গন্ধ ব্যাপ্ত হওয়ার—তীব্র অভিযোগ করতেন, এখানেই শেষ নয়, স্বামীর প্রতিটি আদরই অম্লানবদনে ফিরিয়ে দিতেন সেদিন। সুতরাং গন্ধব্যাপারে খুঁতখুঁতে রমণীর চিকিৎসক স্বামী অবাঞ্ছনীয় নয় কি? প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, প্রচুর পরিমাণে ধূমপান করে এমন পুরুষের ভাষণে, নিঃশ্বাসে বা তার দেহে তামাক তামাক গন্ধ জড়িয়ে থাকতে পারে, সে গন্ধ কোন কোন নারীর কাছে অসহ্য, কামনার উদ্রেকে কেউবা মুগ্ধ।

স্বেদগন্ধ

গাত্রচর্ম নিঃসৃত এগন্ধটির যোগান দেয় মুখ্যতঃ এক্রিন এবং অংশতঃ এপোক্রিন নামক ঘর্মগ্রন্থিরাই, অবশ্য সামান্য কিছু 'কোটা' আছে তৈলাক্তদ্রব্য ক্ষরণকারী গ্রন্থিরাজির। এই সব ক্ষরিতবস্তুর সমাবেশে যে গন্ধ উৎপাদিত হবে তারই নাম স্বেদগন্ধ।

স্বেদগন্ধ প্রতিটি মানুষেরই এক নয় এবং উগ্রতাহেতু এগন্ধ প্রথম থেকেই জানান দেয়। অর্থাৎ সান্নিধ্যের প্রথম পর্যায়েই ধরা পড়ে এবং শ্বাসগন্ধ বা কেশগন্ধের মত অতটা ঘন নিবিড় হওয়ার পূর্বেই।

বলা যেতে পারে, এগন্ধ ভিনিগারসম এবং ক্যাপ্রিক এ্যাসিডের সঙ্গে তুলনীয়। 'যৌন ক্লেদ'-এর মতই, বহুলাংশে ক্যাপ্রিল গোত্রীয় এ্যাসিড দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, এবং সহজেই সামান্য একটু অযত্ন বা অবহেলাতেই, রূপান্তরিত হতে পারে দুর্গন্ধে। এবংবিধ কারণে, স্বেদগন্ধের ফলাফল—অনুরাগ, না বিরাগ—প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নির্ধারিত হয়ে যায়।

স্বেদগন্ধ প্রবলভাবে প্রতিক্রিয়াশীল এবং অতীব বৈচিত্র্যময় এর আবেদন।

স্বেদগন্ধগ্রাহীদের কেউ বিবমিষায় কাতর, কেউ দার্শনিকসুলভ উদাসীন, নির্বিকার। কেউবা কামভারে পীড়িত। প্রথম ঘ্রাণেই লুব্ধ হয়েছে এমন ঘটনা বিরল হতে পারে কিন্তু অসম্ভব নয়। উদাহরণস্বরূপ, ডাঃ ভ্যান ডি ভেল্ডি বর্ণিত নৃত্যশালায় একটি রমণী প্রসঙ্গে দুই যুবকের আলাপন স্মরণ করা যেতে পারে। একজনের দৃষ্টিতে সেই নারী সুন্দরী, তবুও সে তাকে হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করতে অসমর্থ, পথের কাঁটাটি রয়েছিল এই দেহগন্ধেই। কিন্তু এই নারী দ্বিতীয় যুবকের পিয়াপসন্দ, এগন্ধ যে তাকে মাতাল করেছে। এতদনুরূপ গন্ধসচেতন মেয়েরাও। গন্ধযুক্ত কোন পুরুষ এক নারীর কাছে কুৎসিত হয়েও অন্যজনের প্রিয়তম, এমন ঘটনা আমি জানি, যদিচ এটা অনেকেরই কাছে অজানা বিস্ময়।

স্বেদগন্ধগ্রাহী সাধারণতঃ প্রথমে উদাসীন, কিংবা ঘ্রাতজনে সামান্য বিরক্ত-চিত্ত, পরে রাগবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একদা উদাসীন গন্ধই রতিরাগে ভর দিয়েই অসামান্য—অর্থাৎ মোহময় ও মদির—হয়ে উঠতে পারে। প্রসঙ্গতঃ বলে রাখা ভাল, প্রবৃদ্ধ-রাগ মানুষের কাছে বহির্জগতের কোন চঞ্চলতাই (যেমন দেহের ব্যথা, সঙ্গীর গন্ধ, বাইরের ঠাণ্ডা গরম) রতিনিবিষ্টচিত্ততা নষ্ট করতে পারে না। তখন সে রতিময় জগতের শরিক, অন্য কোন ভাবনা নেই, কামই তার মোক্ষ, স্খলন বা রাগমোচনের পর এসব অনুভূতি একে একে ফিরে আসে।

গাত্রচর্ম নিঃসারিত আরও দুটি প্রামাণ্য ঘটনার সুন্দর বিবরণ আছে ডাঃ ভ্যান ডি ভেল্ডির কালজয়ী 'আইডিয়াল ম্যারেজ' গ্রন্থটিতে। প্রথমটি জ্বরগন্ধ বিষয়ক, সপ্তদশী কন্যার জ্বর আসার সময় হলেই এক বিচিত্র গন্ধ মায়ের অনুভূতির দ্বারে ঘা দিত, তখনই তিনি বুঝতেন যে মেয়েটি জ্বরে পড়বে, আর আশ্চর্য কাণ্ড সেইদিনই থার্মমিটারে জ্বরের ওঠানামা ধরা পড়ত। দ্বিতীয় ঘটনাটি সত্যই অভিনব, অভিনব এই হিসেবে যে 'মনো নাম নদী' কোন খাতে বইছে সেটা কিনা দেহগন্ধের ভিন্নতা দিয়ে চিহ্নিত। চিত্তের অবস্থাভেদে গাত্রচর্ম নিঃসৃত গন্ধও যে ভিন্ন হতে পারে এটা ভাবতেও বিস্ময় জাগে বৈকি. কিন্তু ভ্যান ডি ভেল্ডিকে যদি মানতে হয়, সেই সূক্ষ্মনাসা স্ত্রীর ঘটনাটি না শুনে উপায় কী!

এঁর কাছে স্বামীর হাসিখুশি মেজাজটি ধরা দিত মিষ্ট গন্ধরূপে। এটাই যখন ঈষৎ অম্লভাবাপন্ন, তখন তিনি বুঝতেন স্বামীদেহ ক্লান্তিতে ভেঙ্গে পড়েছে। আবার স্বামী যখন ক্রোধের দাবদাহে উদ্দীপ্ত কিংবা তীব্র কামানলে জর্জরিত, তিনি প্রবলভাবে কটু গন্ধের মুখোমুখি হতেন এবং মানসিক অস্থিরতায় এটাই হত অতিশয় ঝাঁঝাল।

কক্ষসুরভি

দেহগন্ধবাচ্য অন্যতম প্রধান এই সুরভি স্বেদগন্ধেরই একটি বিশিষ্ট প্রকারভেদ। নামেই প্রকাশ উৎসস্থলটি কোথায় এবং এই অঞ্চলে, অর্থাৎ কক্ষস্থলে বা কক্ষপুটে, এক্রিন স্বেদগ্রন্থির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, এক বিশেষ ধরনের স্বেদগ্রন্থি, ইংরেজীতে যার নাম 'এপোক্রিন গ্ল্যাণ্ড', আর সেবেসাস গ্ল্যাণ্ড নামক তৈলাক্তদ্রব্য ক্ষরণকারী গ্রন্থি তো আছেই। ফলস্বরূপ এক প্রকার বিশেষ কটুগন্ধের আমদানি হয়েছে, নাম দেওয়া যাক কক্ষসুরভি।

কক্ষ-নিঃস্যন্দিত ঘর্ম প্রথমে নির্গন্ধ থাকে, কিন্তু অচিরেই কক্ষচর্মস্থিত বীজাণু দ্বারা আক্রান্ত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন উপাদানে ভেঙ্গে পড়ে, তখন সৃষ্টি হয় কতকগুলি তীব্রগন্ধী যৌগিক পদার্থের। এগন্ধ কখন এ্যামোনিয়া-র মত ঝাঁঝাল, কখ্ বন্য প্রাণীর মতই অস্বস্তিকর, যেন ছাগী বা সিংহিনীর কাছাকাছি এসেছি, এং ঋতুকালে এগন্ধ নাকি আরও উগ্রমূর্তি ধারণ করে। কখন বলা হয়েছে ক্লোরোফর্ম-এর মত বিবশ করা কিংবা কামোত্তেজিত মেষগন্ধযুক্ত, অথবা ভায়োলেটগন্ধী।

যে যাই বলুক, এসুরভি (এবং স্বেদগন্ধও) সুনিশ্চিতভাবে ব্যক্তিগত, কেউ ভালবাসে, অনেকেই ল্যাভেণ্ডার, অডিকলোন প্রভৃতি সুরভিতবারি সিঞ্চন করে কিংবা পাউডারের প্রলেপ দিয়ে ঢেকে দেয়। বস্তুতঃ, ল্যাভেণ্ডার-ওয়াটার, অডিকোলন জাতীয় গন্ধনাশক দ্রব্যাদি বিজ্ঞাপনের প্রধান মূলধন তো এটাই।

হ্যাভলক এলিসের ধারণায় পুরুষের বাহুমূলই সর্বাধিক গন্ধবিশিষ্ট, কিন্তু ভ্যান ডি ভেল্ডির মতে এগৌরব মেয়েদেরই। হার জিৎ যারই হোক না কেন, এ ব্যাপারে নর-নারী উভয়কেই সমানভাবে সজাগ হতে হবে। কেননা, সভ্য মানুষের দেহগন্ধ বলতে এটাই একমাত্র গন্ধ যা অন্যকে সুনিশ্চিতভাবে প্রভাবিত করতে পারে, ছুঁড়ে দিতে পারে বিরাগ-অনুরাগের উত্তাল তরঙ্গে। আর অভিব্যক্তির বিচারে মনুষ্যজগতে কক্ষপুটের গুরুত্বই সর্বাধিক, এবং প্রধানতম আকর্ষণীয়ও বটে। কারণ, ঘ্রাণজ উৎসস্থল গোপনাঙ্গ থেকে কক্ষপুটে স্থানান্তরিত হয়েছে।

এবংবিধ গুরু সন্নিপাত ঘটেছে বলেই এগন্ধ অবহেলার নয়, সঙ্গী বা সঙ্গিনীর প্রতিক্রিয়া ব্যাপারে সদা জাগ্রত থাকতে হবে। যদি কাতরতা জাগে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটাই স্বাভাবিক, প্রতিষেধক ব্যবস্থার শরণ নিতে হবে বৈকি! আবার এই একই সুরভি উত্তেজক, এমনকি গন্ধ-কাম (smell fetish) হিসেবেও দেখা দিতে পারে, তখন বলব, এগন্ধই আপনার অমোঘ অস্ত্র হোক।

প্রতিষেধক ব্যবস্থার সার কথাটি হল পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা। সাবান গোলা জল দিয়ে পুনঃপুনঃ (দিনের মধ্যে তিন চার বার তো বটেই) পরিষ্কার রাখা এবং নিয়মিতভাবে (প্রতি দুতিন সপ্তাহে একবার) কক্ষলোম ছাঁটাই করা অবশ্য কর্তব্য। এই উদ্দেশ্যে কোন বীজাণুনাশক সাবান, যেমন গোদরেজ-এর সিন্থল সাবানই ভাল। এর পরও যদি গন্ধ ছড়ায়, স্বেদনাশক (Antiperspirant) এবং গন্ধনাশক দ্রব্য (Deodorant) ব্যবহার করবেন নিশ্চয়ই। প্রথমটির উপকরণ 'এ্যালুমিনিয়ম সল্ট'-যুক্ত দ্রবণ, কখন কোন বীজাণুনাশক দ্রব্যের (যেমন হেক্সাক্লোরোফেন, সিন্থল সাবানে এটা আছে) সঙ্গে যুক্ত হয়ে। দ্বিতীয়টির জন্যে রয়েছে ল্যাভেণ্ডার ওয়াটার, অডিকলোন আদি সুরভিত বারি। [illegible]র সকল প্রচেষ্টা বিফল করেও কক্ষসুরভি অপ্রতিহত, তখন ৪ সেন্টিমিটার × ১½ সেন্টিমিটার পরিমিত কক্ষদেশের ত্বক্‌ছেদন[১] করা ছাড়া উপায় কি!

কামগন্ধ

কামগন্ধ দেহেরই গন্ধ, কেননা এগন্ধের স্রষ্টা দেহেরই গোপন কয়েকটি অঙ্গ : উরুমূল, মূলাধার, পুরুষের লিঙ্গাগ্র, লিঙ্গদেহ, লিঙ্গমূল সমেত অণ্ডকোষ, এবং নারীর রতিপীঠ, ভগদেশ, যোনি। কামগন্ধ দেহগন্ধেরই প্রকারভেদ অর্থাৎ কিনা দেহগন্ধ আর কামগন্ধ একই। শুধু তাই নয়, ক্ষেত্রবিশেষে এই দেহগন্ধই কামগন্ধে রূপান্তরিত হতে পারে, কারণস্বরূপ বলতে পারি দেহের প্রতিটি গন্ধই —কি বাহির থেকে ঘরে আনা (যেমন, পুষ্পসার), কি ঘর থেকে বাহির করা (যেমন স্বেদগন্ধ)—নরনারীকে রতিচঞ্চল করতে পারে। আরেকটি কারণ, দেহগন্ধের আবির্ভাব-তিরোভাব কাল এবং নপুংসক বা ক্লীবদেহে এগন্ধের স্বল্পতা বা অবিদ্যমানতা। হিপোক্রেটিসেরও জানা ছিল, বয়ঃসন্ধিকালে বিশেষ গন্ধ দ্বারা বাসিত হয় কিশোর-কিশোরীদেহ, তখন স্বেদগ্রন্থিক্ষরণ আরও কটু, কস্তুরীগন্ধের মতই ঝাঁঝালো। বয়ঃসন্ধিকালে প্রথম সূচিত হয়ে সমগ্র যৌবনভোর মাতিয়ে রেখে শেষ বয়সে কমে যায়, যেন একটা বিশেষ গৌণ যৌন চিহ্ন। সত্য সত্যই গন্ধকে এমর্যাদা—যৌনপ্রকাশক একটি চিহ্নের সম্মান দিয়ে গেছেন ডাঃ হ্যাভলক এলিস।

বিবর্তনের সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে গোপনাঙ্গ ঘ্রাণের, বলা যেতে পারে কামগন্ধেরও স্থানান্তর ঘটেছে দেহের উর্ধ্বভাগে এবং দ্বিতীয় সারিতে নেমে এসেছে এগন্ধ। তবুও বলব, ভিড়ের মাঝে হারিয়ে যায়নি, নরনারী উভয়েই এগন্ধের স্রষ্টা হতে পারে, কম বা বেশী। এবং এব্যাপারে নারীই অধিক

১। Hurley-Shelly operation

সৌভাগ্যশালিনী, অর্থাৎ কি পরিমাণে, কি বৈচিত্র্যে পুরুষের কামগন্ধ-ভাগ্য এত ভাল নয়। শুধু পরিমাণে নয়, প্রকৃতিতেও প্রকারভেদ আছে, এগন্ধ কখন মৃদুমন্দ, দূর থেকে ভেসে আসা মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ বা সোঁদা সোঁদা ভ্যাপসা গন্ধ। কখন ঝাঁঝালো, হয়ত চামড়ার গন্ধ মনে করিয়ে দেয় কিংবা ভ্যালেরিয়ান বা ক্যাপ্রিল জাতীয় একটা কিছু। এবং এব্যাপারেও নারী পুরুষকে টেক্কা দিয়েছে। অর্থাৎ পুরুষের তুলনায় নারীই তীব্রগন্ধী, আর উত্তেজিতা হলে তো কথাই নেই, তখন কামসলিল যোগ দেয়, যোগ দেয় স্ত্রীঅঙ্গের তপ্ত সৌরভ এবং ঘন ঘন নিঃশ্বাসের সুবাস, সব মিলিয়ে পূর্বোক্ত কামগন্ধ আরও মদির হয়ে ওঠে, তখন হয়ত মনে হবে এগন্ধ যেন পুরুষ ধরারই ফাঁদ। সত্যি কথা বলতে কি, পুরুষ এগন্ধে আকৃষ্ট হয়, গন্ধগ্রাহীর দেহে অবশ্য কিছু রতিউত্তাপ জমে থাকা চাই (ভ্যান ডি ভেল্ডি)।

গোপনাঙ্গ ঘ্রাণ

কামগন্ধের প্রধান উৎস এই যে গোপনাঙ্গ ঘ্রাণ, এটা কিন্তু অতীব পরিবর্তনশীল। অর্থাৎ পরিমাণে এবং বৈচিত্র্যে বহুতর ভেদ আছে, প্রতিটি নরনারী তাই এব্যাপারে স্বতন্ত্র এবং স্বমহিমায় উজ্জ্বল। এগন্ধ যদি তীব্র না হয়ে মৃদুমন্দ থাকে, এবং এটাই স্বাভাবিক, বিপরীতলৈঙ্গিক ব্যক্তি মুগ্ধ হতে পারে। আবার অপরিষ্কারের পলি জমে জমে এটাই পূতিগন্ধময় হয়ে আপনার মুগ্ধবোধ নষ্ট করে দিতে পারে। এঘ্রাণ কিন্তু নারীরই বেশী, উত্তেজিতা হলে কিংবা ঋতুমতী হলে এটা আরও ছড়ায়, তখন যে কামসলিল জোটে, রক্ত দানা বাঁধে। পুরুষের গোপনাঙ্গ ঘ্রাণ চর্মবৎ হতে পারে, একথার উল্লেখ আছে হ্যাভলক এলিস-কৃত যৌন মনোবিজ্ঞানে। পুরুষ এবং নারীর এই ঘ্রাণ আরও আরও তীব্র, আরও মদির হবে যদি এরই সঙ্গে যুক্ত হয় উত্তেজনা-ক্ষরণ, রক্ত, বীর্য, ক্ষারদ্রব্য (সাবান)।

এগন্ধের জন্ম শুধু জননেন্দ্রিয়ে নয়, জননেন্দ্রিয়ের চতুষ্পার্শ্বও উৎসস্থলের তালিকায় পড়ে, পড়ে জঘনদেশ, উরুমূল, ভগদেশ (ক্ষুদ্রোষ্ঠ ও বৃহদোষ্ঠ), লিঙ্গদেহ ও অণ্ডকোষ, আর মূলাধার। উপরে জঘনদেশ থেকে নীচে মূলাধার পর্যন্ত বিস্তৃত যৌনাঞ্চলে মরশুমী ফুলের মতই অজস্র ঘর্মগ্রন্থি (বিশেষ করে এক্রিন স্বেদগ্রন্থি) আছে, এরই মধ্যে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে সেবেসাস গ্রন্থি, আর আছে সেই কামগন্ধী, এপোক্রিন গ্রন্থি। এসবের ক্ষরণের জন্যেই এঅঞ্চল একপ্রকার বিশেষ গন্ধ দ্বারা সুরভিত।

গোপনাঙ্গ ঘ্রাণের আরেকটি বিশেষ কারণ লুকিয়ে আছে লিঙ্গাগ্রে বা

ভগাঙ্কুরে জমে ওঠা পদার্থের মধ্যে, যার নাম যৌনক্লেদ (Smegma)। কামগন্ধ উৎপাদনের সর্বাধিক কৃতিত্ব এই ক্লেদেরই, কিন্তু আশ্চর্য লিঙ্গাগ্রে ও ভগাঙ্কুরে না স্বেদ না সেবেসাস কোন গ্রন্থিই নেই, অর্থাৎ এই ক্লেদ আদৌ কোন ক্ষরণ নয়। এটা তবে কী? এটা হচ্ছে অগ্রচ্ছদার অন্তর্গাত্র থেকে এবং লিঙ্গাগ্র-ভগাঙ্কুর থেকে ঝরে পড়া এপিথিলীয় কোষরাজি, থরে থরে জমা হয়ে এটাই ক্লেদ রূপে দেখা দেয়। কয়েকদিন পরিষ্কার না করলেই এর দেখা পাবেন, দেখতে সাদা সাদা, হাতে ধরলে তেল তেলে বা আঠাল আর গন্ধটা বেশ সাড়া জাগানো, ঝাঁঝিয়ে ওঠা বা গেঁজে যাওয়া।

এটা সেই জাতের গন্ধ যা সহজেই মানুষের ইন্দ্রিয়ে ঘা দিতে পারে, কারণ ক্লেদের মধ্যে এমন একটা উপাদান আছে যাকে বলা যেতে পারে ভ্যালেরিয়ান শ্রেণীভুক্ত এ্যাসিড, যেমন ক্যাপ্রিক এ্যাসিড, বিশেষ করে ক্যাপ্রিলিক গোষ্ঠীর এ্যাসিড। উপাদানগত এই বিশিষ্টতার জন্যেই একদিকে এটা যেমন মদগন্ধী বা তীব্র মধুর গন্ধে ভরা; অন্যদিকে তেমনি অতি সহজেই দুর্গন্ধিত হয়ে ওঠে।

নারীর গোপনাঙ্গ বিশিষ্ট ঘ্রাণে সুরভিত করার প্রধান দায়িত্ব এই ভগাঙ্কুরীয় ক্লেদেরই, আবার নারীকে কামগন্ধে বাসিত করে এটাই, যদি ক্লেদের পরিমাণ অল্প থাকে। আর পরিমাণটি যদি হয় চোখে দেখার মত, কিংবা জমাট হয়ে দানা বেঁধে গেছে, এমনকি ছোট ছোট নুড়ি পাথরও[১] দেখা দিয়েছে, সুদীর্ঘকাল সঞ্চিত থাকলে এমনটি হবেই, তখন শুধু যে দুর্গন্ধের আকর হবে তা নয়, পুরুষও নাক সিঁটকাবে। স্বাস্থ্যবিধির অভাবে এর সঙ্গে অন্যান্য দেহক্লেদও (প্রস্রাব, ঘাম) জমা হবে কিংবা রক্তের (বা বীর্যের) ছিটেফোঁটা লাগবে, তখন আরও বীভৎস গন্ধ, কাছে থাকে সাধ্য কার! পুরুষেরও অবিকল তাই। শুধু ক্লেদের পরিমাণ বা সৌরভ নারীর মত চরম নয়।

প্রসঙ্গতঃ বলে রাখা ভাল যে, মিলনোত্তর গোপনাঙ্গে, নরনারী উভয়েরই, প্রথমে একটা সোঁদা গন্ধ, রতিগন্ধ এরই নাম, পরে একটু দুর্গন্ধ নিঃসারিত হতে পারে। যৌনক্লেদ, কামসলিল, যোনিস্রাব এবং বীর্য, এসবের সংমিশ্রণ হেতু এই গন্ধ। একারণে গোপনাঙ্গে জলশৌচ করা উচিত, তাড়াহুড়ো করে মিলনের পরই নয়, তার পরের দিনে কিংবা ঐ দিনেই যদি সুযোগ মেলে। তাছাড়া, প্রত্যহ জননেন্দ্রিয় পরিষ্করণ তো স্বাস্থ্যবিধিরই উপায় বিশেষ।

১। পুরুষের লিঙ্গগ্রীবায় নুড়ি পাথর গজিয়ে ওঠা স্বচক্ষে দেখার সৌভাগ্য ঘটেছে।

উত্তেজনা-গন্ধ

উত্তেজনাকালীন দেহগন্ধের জোগান দেয় প্রধানতঃ কামসলিলই। অংশতঃ যৌনক্লেদ আর কেশগন্ধ শ্বাসগন্ধ প্রভৃতি দেহগন্ধ। উত্তেজনাক্ষরণ, সংস্কৃতে বলা যেতে পারে কামসলিল, মূলতঃ ক্ষারধর্মী, যার পরশ পেলেই গোপনাঙ্গ ঘ্রাণ তীব্রতর হয়, কামগন্ধ হয় আরও প্রকট। সংস্কৃত শাস্ত্রে দেখেছি, উত্তেজিতা নারীর রসক্ষরণ বিচিত্র গন্ধযুক্ত হতে পারে। এবং এগন্ধই—বিকশিত পদ্মগন্ধ, মধুগন্ধ, ক্ষারগন্ধ, মদগন্ধ—নারীর শ্রেণীবিন্যাসের প্রেরণা জুগিয়েছে প্রাচীন কামশাস্ত্রকারগণের।

কিছু পূর্বেই বলেছি, উত্তেজিতা রতিপ্রমত্তা নারী গন্ধ বিলায়। এমন কি নববধূও, এটা নাকি ক্ষতযোনিতার প্রকাশচিহ্ন। আর পণ্যাঙ্গনাদেহ ছাগগন্ধী। কামোত্তেজিত পুরুষ নাকি বিস্বাদ পচা মাখনের মত কিংবা ক্লোরোফর্মের মত বিবশ করা গন্ধস্রাবী (হ্যাভলক এলিস)। উত্তেজনায় জনৈক পুরুষের অতীব কটুগন্ধী হওয়ার কথা বলেছেন ভ্যান ডি ভেল্ডি।

বীর্যগন্ধ

পুরুষের যে স্খলন তার নাম বীর্য, আর কে না বলবে বীর্য একপ্রকার গন্ধ-বিশিষ্ট। এই যে গন্ধ একেই বলব বীর্যগন্ধ। এগন্ধের আদি স্রষ্টা স্পার্মিন নামক রাসায়নিক দ্রব্য, এটা আসে প্রষ্টেটগ্রন্থি থেকে। প্রসঙ্গতঃ স্মরণ করিয়ে দিই প্রষ্টেটগ্রন্থির ক্ষরণ বীর্যের একটি প্রধান উপাদান।

সদ্য স্খলিত বীর্যের গন্ধ কখন পুষ্পময়, স্পেনদেশীয় একপ্রকার বাদামের মত। কখন 'লিগুমিনোসী' অর্থাৎ শিম্বি-গোত্র উদ্ভিদ বা ঘাসের মত সোঁদা গন্ধ। নির্গত হয়ে বায়ুর সংস্পর্শে আসে বীর্য কিংবা অন্য কোন ক্ষরণের সঙ্গে যুক্ত হয়, তখন এগন্ধ তীব্রতর হয়: কেমন একটা আঁশটে গন্ধ নিঃসৃত হয়, যার ব্যক্তিগত ভেদাভেদ থাকে না, যা প্রায় সকলের কাছেই অপ্রিয়। এমনকি একই পুরুষের বীর্যে গন্ধবদল হতে পারে, ডাঃ ভ্যান ডি ভেল্ডি এমন এক পুরুষের কথা বলেছেন যার বীর্য আবেগজ উত্তেজনায় অতিশয় কটুগন্ধ, পৈশীয় চালনায় মধুর গন্ধযুক্ত, পুনঃপুনঃ মিলনে এটাই ক্ষীণ মৃদু কেমন একটা বাসি বাসি গন্ধে অপ্রিয় হয়ে ওঠে।

ডাঃ ভ্যান ডি ভেল্ডির ধারণায় গন্ধবৈচিত্র্য এখানেই শেষ নয়। প্রতিটি পুরুষের বীর্য শুধু যে সমগন্ধী তা নয়, এগন্ধ জাতিগত বৈশিষ্ট্য দ্বারা চিহ্নিত হতে পারে, প্রাচ্য পুরুষের তুলনায় ককেশীয় পুরুষরা ক্ষীণগন্ধী। মোটামুটিভাবে বলা

যেতে পারে, এটা পুরুষের কাছে অস্বস্তিকর বা বমনকারক, নিজ বীর্যগন্ধ অবশ্য এতটা ঘৃণ্য নয়। এবং এগন্ধ নারীর কাছে সুখদায়ক, উদ্দীপক, উত্তেজক।

স্বামীর বীর্যগন্ধে শুধু যে নারী পুলকিতা তা নয়, নতুন করে উত্তেজিত হয়ে দ্বিতীয় মিলনের প্রার্থিনী হতে পারে। কিন্তু প্রেমগন্ধহীন মিলনে, উদাহরণস্বরূপ অনিচ্ছা মিলনে বা বলপূর্বক মিলনে, এপুলক থাকে না। আর বিবাহিত জীবনের প্রথমদিককার নিশিযাপনে অনেকেই বিড়ম্বিত, বীর্যাতঙ্কে অর্থাৎ বীর্য লেগে যাওয়ার অস্বস্তিকর অনুভূতিতে, এরা যেন অর্ধমৃত। এমন কি এই আতঙ্কে স্বামীসঙ্গ পরিহার কিংবা কনডম্ মিলনের আশ্রয় আশ্চর্য নয়। ভ্যান ডি ভেল্ডি বর্ণিত এক রমণীর ঘটনা বলি: কোন এক পুরুষের প্রেমে এই রমণী আসক্ত ছিল এবং প্রথম মিলনের সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্তটি না আসা পর্যন্ত যে ভালবেসে সুখই পেত। কিন্তু প্রথম মিলনের পর এসুখ আর ছিল না, বীর্যগন্ধ মারাত্মকভাবে অপ্রীতিকর হয়ে ওঠে এবং শেষ পর্যন্ত ঐ পুরুষের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করতে বাধ্য হয়।

বীর্য যেহেতু পুরুষের, বীর্যগন্ধের একচেটিয়া অধিকারও তাই পুরুষের, এটা ঠিক নয়। কারণ, কৃতসহবাস রমণীদেহ বীর্যগন্ধে সুবাসিত হতে পারে, হতে পারে বীর্যগন্ধের কেন্দ্রস্থল, কখন কামসলিলের সঙ্গে মিশে গিয়ে, কখন স্ত্রীঅঙ্গে শোষিত হয়ে। প্রথমটি রতিগন্ধ। রতিশেষে বীর্যের প্রায় সবটাই স্ত্রীঅঙ্গ থেকে বেরিয়ে যায়, এটা তাই পুরোপুরি বীর্যগন্ধ নয়। অল্প যেটুকু বীর্য পড়ে রইল, সেটাই স্ত্রীঅঙ্গের বিবিধ ক্ষরণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আরেকটি নতুন ও বিচিত্র গন্ধের সৃষ্টি করে, এরই নাম রেখেছি রতিগন্ধ। সূক্ষ্মনাসা ও 'ঘ্রাণজ' শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিরা এগন্ধের নাগাল পায়, বীর্যসিক্ত কাপড়ে বা বিছানায় কিংবা রতিক্লান্ত রমণীদেহে।

দ্বিতীয়টি বীর্যশ্বাস। মিলনের কিছু পরে, ১৫ মিনিট থেকে এক ঘণ্টা পরে, রমণীর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে বীর্যগন্ধের ক্ষীণ আভাস মিললেও মিলতে পারে। এসৌরভের স্থায়িত্ব দু এক ঘণ্টা এবং এগন্ধে স্বামীর রতিবাসনা জাগ্রত হতে পারে। এজাতীয় ঘটনার সবচেয়ে বড় সাক্ষী ডাঃ ভ্যান ডি ভেল্ডি, এঁর ধারণায় স্ত্রীঅঙ্গে বীর্য শোষিত হয়, অতএব বীর্যস্থিত স্পার্মিন শোষিত হয়ে রক্তের সঙ্গে মিশে যায়, রক্তচলাচলের শেষ পর্যায়ে শ্বাসনল দিয়ে বেরিয়ে আসে। নিঃশ্বাস তখন বীর্যগন্ধী না হয়ে যায় কোথায়?

ঋতুগন্ধ

বীর্যগন্ধ পুরুষের একটি বিশেষ কামগন্ধ, নারীর যেমনি ঋতুগন্ধ। বীর্যগন্ধের

গ্রহীতা এবং ঘ্রাতা পুরুষ ও নারী উভয়েই হতে পারে। এখানে কিন্তু পুরুষই গন্ধগ্রাহী আর নারী গন্ধ বিকিরণকারিণী।

এগন্ধ শুধু নারীরই, নিঃসারিত হয় স্ত্রীজননেন্দ্রিয় থেকে, তবে সব সময়ে নয়, প্রতি মাসের বিশেষ কয়েকটি রক্তঝরা দিনগুলিতে। সুতরাং প্রতিটি নারীই এগন্ধের অধিকারিণী, যদিচ সুবাসের তীব্রতায় এবং ব্যক্তিগত বৈচিত্র্যে ভেদপ্রকরণ বড় বেশী। মাসিক স্রাবের একটা বিশেষ গন্ধ আছে, এটাই সুবাসিত করে ঋতুমতী নারীকে। পুরুষের কাছে এঅনুভূতি কখন ভায়োলেটের মিষ্টি গন্ধ, কখন ক্লোরোফর্মের ঝাঁঝালো গন্ধ, কখন চামড়ার সোঁদা গন্ধ। ঋতুকালে ভগগ্রন্থিসমূহ উজাড় করে ঢেলে দেয় তাদের রসক্ষরণ, ক্ষারধর্মী এই ক্ষরণরাজি রক্তের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে ঋতুগন্ধকে আরও তীব্র করে তোলে। তাছাড়া কক্ষসুরভি নাকি এসময়ে আরও ঝাঁঝালো আরও মদির হয়ে ওঠে। কিন্তু স্বাস্থ্যবিধির সামান্যতম অবহেলায় গন্ধ নিয়ে যত কাব্য সবই মাঠে মারা যাবে, কেননা এটাই তখন পুতিগন্ধময় হয়ে উঠবে। এপ্রসঙ্গে স্মরণ করিয়ে দিই, ঋতুকালে অন্য একটি গন্ধও—ব্যক্তিগত শুচিতার অভাবে রক্তের পচনক্রিয়া জনিত একটা ঘৃণাকারজনক গন্ধ জুড়ে বসতে পারে, এবং এটাকে যেন ঋতুগন্ধ বলে ভুল না করি।

যদিও ঋতুগন্ধ কাপড়ে ঢাকা থাকে কিংবা পুনঃপুনঃ জামা পরিবর্তনে উবে যায়, এগন্ধের নাগাল পায় ঘ্রাণজ শ্রেণীভুক্ত কতিপয় মানব এবং সেই মুষ্টিমেয় সৌভাগ্যবান পুরুষ যাদের ঘ্রাণশক্তি অতিশয় তীক্ষ্ণ।

স্বেদগন্ধের মতই এগন্ধ বিবিধ প্রভাব বিস্তারে সমর্থ। কোথাও সুনিশ্চিত-ভাবে প্রীতিকর, প্রীতিভাবটা কোথাও শর্তসাপেক্ষ অর্থাৎ আপাতঘৃণা জড়ানো হলেও পরিণামে প্রীতি মাখানো। কিন্তু পুরোপুরিভাবে বিরক্তিকর, এমন ঘটনাই বিহ্বলদায়কভাবেই বেশী। অতএব, নারী সাবধান।

গন্ধ ও যৌনতা

মনুষ্যদেহ কেমন করে গন্ধের উৎস হয়ে ওঠে তা জেনেছি। এখন দেখা যাক সেই গন্ধে মানুষ কি ভাবে ব্যাকুলিত হয়। একটি নারী দর্শনে বিভিন্ন পুরুষ হৃদয়ে যেমন ভিন্নতর ভাবরাশি জাগে, তেমনি মলয় সমীরে হয়ত একই গন্ধের বিস্তার, তবুও প্রতিটি নরনারীর কাছে এগন্ধের আবেদন এক নয়। ঘ্রাণেন্দ্রিয়জাত প্রত্যক্ষ রূপটি এক মানুষ থেকে অপর মানুষে ভিন্ন: কখন ঘৃণা বিরক্তি ইত্যাদি ক্লেশকর অনুভূতিতে বিষণ্ণ, কখন সুখ-হর্ষ-আবেগে উজ্জ্বল, কচিৎ কখন কামপ্রবৃত্তির উদ্রেকে রক্তরাঙা। স্বাভাবত কোথাও ঘৃণ্য, দুর্গন্ধিত,

কোথাও এই দুর্গন্ধই ঘ্রাণসুখকর, প্রীতিকর। গন্ধগ্রাহী কখন উদাসীন, আবার এই মানুষই যখন রতিউত্তাপে ঝলসিয়ে উঠবে এগন্ধ অসামান্য হয়ে দেখা দেবে। অর্থাৎ স্বাভাবিক অবস্থায় যেগন্ধ প্রভাবশূন্য, নিস্তরঙ্গ সেই গন্ধই উত্তেজনাকালে প্রীতিকর, রতিপ্রদ। তেমনি যূথীর গন্ধে কেউ কামবিহ্বল, কেউ ফেলে আসা স্মৃতি খুঁজে পায় যূথীবনের ব্যাকুলিত বাতাসে।

এখন স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগবে, কেন এমনটি হবে? গন্ধবাচ্য দ্রব্য একটি উদ্দীপনা মাত্র, সেই উদ্দীপনা নাসাবিবর দিয়ে গন্ধবহ নার্ভ মারফৎ মস্তিষ্কে 'ঘ্রাণজ কেন্দ্র'-এ চালান যায়, তখন যে গুণটি অনুভূত হয় তাকেই বলি গন্ধ। তাই যদি হবে, গন্ধগ্রাহিতায় এত পার্থক্য কেন? কারণটি খুঁজতে গিয়ে দেখব, ভাবানুষঙ্গ, শৈশবকামিতা আর ঘ্রাণজ শ্রেণীভেদের জন্যেই এই ভিন্নরূপতা। এখন এদের কথাই একে একে বলি।

ঘ্রাণজ প্রতিক্রিয়া প্রসঙ্গেরই প্রয়োজনে গন্ধ নামক ইন্দ্রিয়ের বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে চাই। গন্ধানুভূতির প্রথম বৈশিষ্ট্য, প্রকৃতিতে এটা মধ্যম। একদিকে স্পর্শ আর স্বাদ অন্যদিকে ধ্বনি আর দৃশ্য, এদুই জগতের মাঝখানে ঠাঁই করে নিয়েছে আলোচ্য ইন্দ্রিয়টি (গন্ধ)। দ্বিতীয়তঃ, বাস্তবতার দিক থেকে কম প্রয়োজনীয়, ঊর্ধ্বস্থ কিংবা নিম্নস্থ ইন্দ্রিয়গুলির তুলনায়। তৃতীয়তঃ, অনুভূতিতে আবেগময়। জীবনের ঘটনার সঙ্গে সহজেই জড়িয়ে পড়ে এবং এভাবে একটি ভাবরূপের নামাবলী প্রক্ষিপ্ত হয়। চতুর্থতঃ, ভয়ঙ্করভাবে পরিবর্তনশীল। একই গন্ধ এই মুহূর্তে হয়ত পরম প্রীতিযুক্ত, পরক্ষণে সেটাই ঘোর বিতৃষ্ণায় আচ্ছন্ন হতে পারে। ঘ্রাণজ প্রত্যক্ষরূপের অসাধারণ নমনীয়তার জন্যেই এমনটি সম্ভব।

গন্ধ যে শুধু শুঁকতেই ভাল লাগে তা নয়, সমস্ত দেহমনও চাঙিয়ে ওঠে, যার ফলে দেহে জাগে চঞ্চলতা, ফিরে আসে সজীবতা। সঙ্গে সঙ্গে মনও রাঙিয়ে ওঠে, সংবেদতা বৃদ্ধি পায়, ঘ্রাণে মত্ত মনটা তখন স্বপ্নিল জগতে প্রবেশ করে অতি সহজেই, পথের বাধা সরে যায়। ঘ্রাণের সবচেয়ে বড় বাহাদুরি এখানেই।

ব্যাপারটা সত্যিই তাই, কারণ, নার্ভতন্ত্রের উদ্দীপনার সঙ্গে ভাবানুষঙ্গ যুক্ত হয়, স্মৃতি রোমন্থিত হয়। ভাবের ঘরে সিঁধ কাটতে এর জুড়ি আর নেই। আর এই ভাবানুষঙ্গের বিচিত্রতা বহুমুখী, অন্তরঙ্গতাও নিবিড় এবং ঘ্রাণজ প্রতিরূপও অসাধারণরূপে নমনীয়, কিছু পূর্বে উল্লেখ করা গন্ধের তৃতীয় এবং চতুর্থ বৈশিষ্ট্যও তো এই। এবংবিধ বৈশিষ্ট্যরাজির জন্যেই এই মাত্র গন্ধটি হয়ত ভাসা ভাসা নৈর্ব্যক্তিক, কিন্তু পরমুহূর্তে সেটাই একান্ত ব্যক্তিগত এবং তীব্রভাবে

সংবেদ্য হতে পারে। কিংবা দূর থেকে ভেসে আসা অপ্রয়োজনীয় গন্ধটি কখন এব ঘন নিবিড় হয়ে ওঠে তা হয়ত অনেক গন্ধগ্রাহীর অজ্ঞাত থেকে যায়।

গন্ধকে অতএব নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে কল্পনার ইন্দ্রিয়। সত্যি বলতে অন্য কোন ইন্দ্রিয়ের এত কথা বলার ক্ষমতা নেই। ধূপ ধুনো ছিটিয়ে এক অলৌকিক বা অতীন্দ্রিয় জগতের কিংবা কয়েক গুচ্ছ ফুল সাজিয়ে আর সুরভি ছিটিয়ে এক রম্য পরিবেশ সৃষ্টির কথা কে না জানে। সবার কাছে না হোক, কোন কোন মানুষকে প্রাচীন জগতের দ্বারে পৌঁছে দিতে পারে বিশেষ একটি গন্ধ, তুলে ধরতে পারে বিগতকালের বর্ণোজ্জ্বল কয়েকটি পাতা, এনে দিতে পারে কিছু স্মৃতি, আবেগে জড়ানো এবং আনন্দে মাতানো। এভাবে ফেলে আসা সুদূর অতীতের প্রাণবন্ত একটি মুহূর্ত হঠাৎ ঝলসিয়ে ওঠে, শুধু দৃশ্য নয়, তাৎকালিক অভিজ্ঞতাও—ফুলশয্যার সেই অলোকসুন্দর অভিসার কিংবা একত্রে পুষ্পোদ্যানে ভ্রমণ—মনোমুকুরে ধরা পড়ে। এমনই গন্ধের প্রভাব।

গন্ধে ভর দিয়ে কল্পনার ডানা মেলে দেওয়া যায়, হয়ত একারণেই গায়ক, কবি, চিত্রকর, ঔপন্যাসিক ইত্যাদি রম্যকলার শিল্পীমাত্রই গন্ধলুব্ধ, উদাহরণ-স্বরূপ, রবীন্দ্রনাথ, জোলা, নীৎসে, মিল্টন, শেলী ও শেক্সপীয়র সকলেই গন্ধমুগ্ধ ছিলেন। আর বদলেয়ার? কাব্যজগতে যার আকর্ষণ অপ্রতিরোধ্য, 'ফ্লুর দ্য মাল' আরও কতকাল আনন্দসুধা বিতরণ করবে কে জানে, সেই অমর কবি বদলেয়ার তো গন্ধপাগল। অপরের কাছে সঙ্গীত যতটা মুখর এঁর কাছে গন্ধও অবিকল তাই।

আমরা জানি গন্ধানুভূতি একটি শারীরবৃত্তীয় ঘটনা। আর এও জানি, কোন গন্ধের কাছাকাছি এসে মানুষের যে দুটি অনুভূতি প্রবল হয়ে ওঠে তাদের একটি অনুরাগ অন্যটি বিরাগ, এপ্রসঙ্গ পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। গন্ধর উগ্রতা এবং মৃদুতা ভেদেও এমনটি সম্ভব। মৃদুগন্ধ সুগন্ধবাচ্য, এতে অনুরাগ জন্মে। আর উগ্রগন্ধ বিরক্তিকর, এটা বিরাগবর্ধক।

এখানেই শেষ নয়, এই যে অনুরাগ-বিরাগ এটা শর্তহীন কিংবা শর্তসাপেক্ষ দুইই হতে পারে। গন্ধবাহিত অনুভূতি সর্বতোভাবে বিরক্তিকর কিংবা সুনিশ্চিতভাবে প্রীতিযুক্ত হতে পারে, ঘটনা দুটি শর্তহীন অনুরাগ-বিরাগেরই উদাহরণ। আবার এটাই যদি হয় প্রথমে ঘৃণ্য, পরিণামে মধুর (কিংবা আপাত-মধুর পরিণাম-ঘৃণ্য) শর্তসাপেক্ষ গন্ধানুরাগের (কিংবা বিরাগের) মুখোমুখি হব।

এই ভাল লাগা আর ভাল না লাগার গভীরে মানুষের ভাবানুষঙ্গ আর শৈশবকামিতা যেমন লুকিয়ে আছে তেমনি তার শ্রেণীবৈচিত্র্যও কম দায়ী নয়।

প্রথমটির কথা এই মাত্র বলেছি, দ্বিতীয়টি ৮১ পৃষ্ঠায়। বাকী রইল শ্রেণীভেদ, এখন তারই কথা বলি।

কোন কোন সুস্থ এবং স্বাভাবিক নরনারীর জীবনে গন্ধই আবেগজ প্রাধান্য লাভ করে, শ্রেণীবিন্যাস করতে আনন্দ পায় এমন পণ্ডিতজন এদেরকে নাম দিয়েছেন 'অলফ্যাক্টরি টাইপ', বাংলায় বলা যেতে পারে ঘ্রাণজ ব্যক্তি বা গন্ধ-বিলাসী। অ্যালফ্রেড বিনেট এমনই এক পথিকৃৎ। ইংরেজী 'ফেটিশ' (বস্তুকাম) শব্দের সৃষ্টিগৌরব শুধু যে এঁর প্রাপ্য তা নয়, ইন্দ্রিয়বিচারে মানুষকে ঘ্রাণজ, শ্রাবণ, দার্শন এবং তাবন্দ, এই চারটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করার প্রথম কৃতিত্ব এঁরই, ১৮৮৮-এ।

হ্যাভলক এলিসের 'মনোযৌনবিজ্ঞান'-এ (১৯০৫) এই শ্রেণীভেদ আরও বেশী সোচ্চার, স্পষ্ট, উজ্জ্বল। ঘ্রাণজ প্রতিক্রিয়াভেদে নরনারীকে তিনটি সারিতে—ঘ্রাণজ, উদাসীন এবং মধ্যবর্তী—সাজাতেই এঁর আনন্দ। কিছু মানুষ আছে প্রথম সারিতে, যাদের জীবন গন্ধের বলিষ্ঠ বাহু দ্বারা এমনই আবদ্ধ যে, হয় তারা জাতরাগ হবে, না হয় বিগতস্পৃহ, এভাবে যৌনজীবনে সুনিশ্চিত একটা ছায়া পড়ে বলেই এদের বলা হয়েছে ঘ্রাণজ। এরই বিপরীত উদাসীন, গন্ধ কোন আঁচড়ই কাটতে পারে না, না আকর্ষণ না বিকর্ষণ কোনটাই না। বাদবাকী যারা পড়ে রইল তারা 'মধ্যবর্তী' শ্রেণীভুক্ত, এখানে শিক্ষিত কৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিরাই ভিড় জমিয়েছে। যদিচ এদের কামানুষ্ঠান গন্ধভূমিকা বর্জিত, নিবিড় সান্নিধ্যে উত্তাপের পর উত্তাপ যখন জমতে শুরু করে গন্ধ তখন নতুন করে উত্তেজনার খোরাক জোগাতে পারে।

এবারে ডাঃ ভ্যান ডি ভেল্ডির কথা বলি। এঁর গ্রন্থ অনুসরণ করলে গন্ধগ্রাহিতাভেদে তিন চার রকম মানুষের সন্ধান পাব। গন্ধগ্রাহীদের মধ্যে বিরক্তচিত্ততার সংখ্যাই কিন্তু বেশী, এরূপ ব্যক্তিরা দেহগন্ধে বিরক্ত, কামগন্ধে, এদের ঘৃণা জাগে, এদের সঙ্গী বা সঙ্গিনীর এবিষয়ে সজাগ থাকা উচিত। কিছু লোক অবশ্য এরূপ গন্ধে প্রথম থেকেই আকৃষ্ট, সংখ্যায় এরা যে লঘিষ্ঠতম তা নিশ্চিত। এদেরকে ঘ্রাণজ ব্যক্তি বলা চলে, হয়ত একারণেই ঋতুগন্ধ, শ্বাসগন্ধ, গোপনাঙ্গ ঘ্রাণ প্রভৃতি গন্ধের নাগাল পায়। এদের ঘ্রাণেন্দ্রিয় অতিমাত্রায় পরিণত, আমাদের পূর্বপুরুষ এবং অনেক আদিবাসীর মতই। স্পর্শসুখের চেয়ে, চক্ষুরাগের চেয়ে, ঘ্রাণসুখের আবেদন বড় বেশী। যতটা কম মনে করি তার চেয়েও সংখ্যাগুরু শর্তসাপেক্ষ মুগ্ধজনেরা। দেহগন্ধ বা কামগন্ধে প্রথমে হয়ত উদাসী বা বিরক্ত, পরে—উত্তেজনা সমাগমে—এই একই ঘ্রাণে মুগ্ধ বা

মত, অর্থাৎ স্বাভাবিক অবস্থায় নির্বিকার দশা বা বৈরাগ্যসূচক কিন্তু উত্তেজনায় মদির ও মধুর।

গন্ধবহ পথ পরিক্রমার শেষ, লক্ষ্যস্থলে এসে গেছি, এখন গন্ধের সঙ্গে যৌনতার সম্পর্ক কতটুকু তারই বিচার। ঘ্রাণ ও যৌনতার সম্পর্ক যেমন আদিম তেমনি প্রাচীন। আদিমতা সম্পর্কে অনেক বলেছি (৭৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) এখন প্রাচীনত্বের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিই। প্রথমেই উল্লেখ করব একটি প্রাচীন রোমক ধারণার: দীর্ঘনাদ পুরুষের জননেন্দ্রিয় দীর্ঘ এবং তীব্র রতিসম্পন্ন নারীর নাসিকা লম্বা চওড়া, খড়্গের মতই তীক্ষ্ণ, অর্থাৎ নাসিকার সঙ্গে কামভাব বিজড়িত। অঙ্গমাপ বা রতিক্ষমতার সঙ্গে সম্পর্ক নেই, তবুও বলব ধারণাটি একেবারে উড়িয়ে দেওয়ার মত নয়, রতিভাবের সঙ্গে একটা সম্পর্ক আছে নিশ্চিত। মাসিক স্রাবহেতু কিংবা প্রবল রতি-উত্তেজনায় নাসিকা ঝিল্লী প্রতিবর্তীভাবে (reflexly) উদ্দীপ্ত হতে পারে এবং হয়ও, তখন অধিক রক্ত-সঞ্চয়জন্য (nasal congestion) উপসর্গকাতরতা জন্মে। ফলস্বরূপ, হাঁচি কাশি আসে, নাকে সুড়সুড় করে, নাক দিয়ে জল ঝরে, সর্দি লাগে, এমন কি নাক দিয়ে রক্তও পড়ে। এবং নববধূর সর্দি লাগার গভীরে রয়েছে রতিউত্তাপে নাসাঘ্রাত চঞ্চলতাই। আরেকটি উদাহরণ: ঘ্রাণবিষয়ক অমূল প্রত্যক্ষ। রতাবসানে কোন কোন নারীর অনুভূতি এই রকমের, যেন গন্ধময় দারুচিনি দ্বীপে চলে গেছে। এটা আরও নিবিড় আরও ঘন হয়ে দেখা দেয় কোন কোন বিকৃতকাম কিংবা উন্মাদ ব্যক্তির কাছে।

সভ্য ও আদিম উভয় সমাজের অনেক মানুষই গন্ধপুষ্প বা গন্ধদ্রব্য ব্যবহার করে। এবং এগন্ধের সঙ্গে যৌনতার সম্পর্ক কতটুকু বলা বড় শক্ত। অস্বস্তিকর গন্ধ দূর করার জন্যে সুরভি বহু ব্যবহৃত, ব্যবহৃত হয় মনটাকে রাঙিয়ে তুলতেও। আর যৌনতার জন্যে? সজ্ঞান মন যতই প্রতিবাদ জানাক, অবচেতন মনে এমন একটা বাসনা থাকে বৈকি। এটুকু তারস্বরে বলতে রাজী আছি, গন্ধের সঙ্গে যৌনতার সম্পর্ক আছে। এখবর হিন্দু কামশাস্ত্রকারগণের জানা ছিল, মুস্লিম জগতেও (সুরভিত কানন এবং এল কিতাব) অজ্ঞাত নয়। ঠিক বিপরীত কাণ্ড আধুনিক জগতে, অতি অল্প লোকই এবিষয়ে সজাগ। সাক্ষী, ডাঃ হ্যাভলক এলিস, ডাঃ এলবার্ট মোল, ডাঃ ভ্যান ডি ভেল্ডি প্রমুখ পণ্ডিতজন।

সঙ্গী আকর্ষণের জন্যে প্রাণিজগতে গন্ধের প্রভাব যতটা প্রকট মনুষ্যজগতে ততটা নয়, এমন একটা উদ্দেশ্য অসার্থক হয়ে উঠেছে অভিব্যক্তির চাপে পড়ে। তা ছাড়া প্রাণিজগতের গন্ধ দিয়ে ঢালা শৃঙ্গারও মনুষ্যজগতে প্রায় নেই

বললেই চলে। প্রায় নেই বললাম এই জন্যে যে কোন কোন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষও দেহগন্ধে আচ্ছন্ন হতে পারে। একটা কেস বিবরণী বলি তা হলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

"আমার বয়স ২৬। ৮ মাস বিবাহিত। স্ত্রীর বয়স ১৯। স্ত্রীর স্বাস্থ্য ছেলেবেলা থেকেই ভাল এবং মাসিক ঋতুও নিয়মিত। স্ত্রী প্রায়ই চরমানন্দ লাভ করে থাকেন। অধিকাংশ দিনই স্ত্রীর চরমানন্দ লাভের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বা অল্প পরে আমার বীর্য স্খলন হয়। বিয়ের পর থেকেই স্ত্রীর দেহে একটা অদ্ভুত গন্ধ লক্ষ্য করছি। এটা ঠিক দুর্গন্ধ নয়, কোন অন্ধকার বদ্ধ ঘরে অনেক বাদুড়ের বাসা থাকলে সেখানে যেমন একটা সোঁদা গন্ধ হয়, সেই রকম। গন্ধটা কোনদিন কম থাকে, কোনদিন বা বাড়ে। এই কম বেশির কোন ধরা-বাঁধা নিয়ম নেই। কখন কোন সময় কতখানি বাড়ে তা জানি না। তবে গন্ধটা রাত্রে প্রায় প্রত্যহই কম বা বেশী অনুভব করেছি এবং দিনের বেলাতেও যে থাকে তা মাঝে মাঝে লক্ষ্য করেছি। এ থেকে মনে হয় গন্ধটা প্রায় সব সময়েই থাকে। আর যখন বাড়ে তখন এটা ৩/৪ দিন বেড়েই থাকে। গন্ধটা যে কোত্থেকে আসে তা ধরতে পারি না। মলমূত্র ত্যাগের পর জলশৌচ ভাল ভাবেই করে, আর আমার উপদেশ মত স্ত্রী তার গোপনাঙ্গ সাবানের সাহায্যে প্রত্যহই পরিষ্কার রাখে। তা ছাড়া যৌনকেশও নিয়মিতভাবে মুণ্ডন করে এবং অবসরমত পরিষ্কার কাপড় দিয়ে নিম্নাঙ্গ মুছে ফেলে যাতে কোন ঘাম বা নির্গত রস না জমে। এসব ব্যবস্থা অবলম্বন করা সত্ত্বেও গন্ধটা সেই রকম আজও নিঃসারিত হয়ে চলছে। এই গন্ধটা অদ্ভুত হলেও আমার কাছে বিশেষ আকর্ষণীয়। মাদকতাময় এই গন্ধটা আমার কাম উত্তেজনা এবং তৃপ্তির পক্ষে অতীব সহায়ক। গন্ধটা যখন মৃদু থাকে তখন সেটা তো অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ। কিন্তু এই গন্ধটা যখন বেশী বেড়ে যায়, তখন আমার মানসিক তৃপ্তি থাকে না, মিলনে প্রায়ই আমার অঙ্গ দৃঢ় হয় না আর হলেও তাড়াতাড়ি শিথিল হয়ে পড়ে নয়ত স্ত্রীর ও আমার তৃপ্তির আগেই বীর্যপাত হয়ে যায়। সুতরাং গন্ধটা যাতে কমে (কিন্তু একেবারে যেন চলে না যায়) তার উপায় নিশ্চয়ই জানাবেন।"

গন্ধসমস্যায় বিড়ম্বিত এই যুবককে সেদিন বলেছিলাম: আপনার স্ত্রীর দেহগন্ধটি ক্ষতিকর নয়। কোনও রোগের প্রকাশচিহ্নও নয় আর এটা থাকলে স্ত্রীরও কোন ক্ষতি হবে না। তাই গন্ধটা যাতে কমে তার চেষ্টা না করাই বাঞ্ছনীয় কেননা এটা না পেলেই আপনার যৌনজীবনে অশান্তির ছায়া পড়বে।

শুধু আপনার স্ত্রীকে তিনটি বিষয়ে সচেতন হতে হবে। এক, স্ত্রীকে প্রত্যহ অঙ্গমার্জনার সাহায্যে এবং সাবান দিয়ে স্নান করতে হবে। দুই, কক্ষপুট এবং নিরাঙ্গ সর্বতোভাবে পরিষ্কার রাখতে হবে। তিন, স্ত্রীর দেহগন্ধ যখন মাত্রাতিরিক্তভাবে বেশী থাকবে তখন মিলন বন্ধ রাখবেন। সুখের কথা এই বেশী ভাবটা ৩।৪ দিনের বেশী থাকে না।

এই কেস বিবরণী আঙুল তুলে এটাই নিশ্চিত করে দেখিয়ে দিচ্ছে যে গন্ধ যৌনতাকে উদ্দীপ্ত করতে পারে। এবং কোন গন্ধের প্রতি ঘ্রাতজনের অনুরাগ যদি চরমে ওঠে, সেই গন্ধ রতিক্রিয়ার আঙ্গিকের মধ্যে এসে পড়ে। কখনবা এগন্ধের আকর্ষণ অপরিহার্য, তখন গন্ধজ বস্তুকাম কিংবা মর্ষকাম-এর দেখা পায়। এবংবিধ ক্ষেত্রে এগন্ধের দেখা না মিললে পুরুষের অঙ্গোত্থানও (কিংবা নারীর চরমানন্দ) স্থগিত থাকবে।

গন্ধমুগ্ধ কয়েকজনকে বাদ দিলে সমগ্র মানবসমাজের কামজীবনে গন্ধের ভূমিকা খুবই সামান্য। সামান্য হলেও উল্লেখের দাবী রাখে, রতারম্ভিক পর্যায়ে সুগন্ধি-দ্রব্য ব্যবহার এবং কিছু পূর্বে উল্লেখ করা রতাবসানে গন্ধবিষয়ক অমূল প্রত্যক্ষ। তা ছাড়া 'ঔপরিষ্টক' এবং 'চুম্বন' নামক শৃঙ্গার দুটির মধ্যেও নাকি গন্ধের গোপন প্রভাব আছে। প্রথমে চুম্বনের কথা বলি। পণ্ডিতজনের বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে তিনটি ইন্দ্রিয়বৃত্তি—স্পর্শ আর স্বাদ আর গন্ধ—ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে যে শৃঙ্গার সৃষ্টি করেছে তারই নাম চুম্বন। এবং ঘ্রাণজ অংশটুকু আমাদের চোখে আঙুল তুলে দেখিয়ে দেবে মঙ্গোলীয় জাতিদের শৃঙ্গারই (নাসিকা চুম্বন)। ঔপরিষ্টক —মুখমেহন আর মুখচাপল—শৃঙ্গারকে গন্ধজাত প্রভাবের সুন্দর উদাহরণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন ডাঃ এ. মোল। এটা কিন্তু সর্বৈব সত্য নয়, কারণ গোপনাঙ্গে মুখপ্রদানকর্মে যে উদ্দীপনা কার্যকরী রয়েছে তার পিছনে গোপনাঙ্গ ঘ্রাণের ভূমিকা নগণ্য বা শূন্য। এমন একটা গন্ধ ভেসে আসতে পারে ঠিকই, কিন্তু মুখকর্মে রত প্রায় প্রতিটি ব্যক্তিই গন্ধতাড়িত নয়, নিছক উত্তেজনা বা তৃপ্তির জন্যেই এগিয়ে এসেছে।

সমগ্র যৌনজীবনে গন্ধের ভূমিকা অতএব নাটকের পার্শ্বচরিত্রের চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ নয়। বিশিষ্ট ব্যতিক্রম কয়েকজন অস্বভাবী ব্যক্তি, এরা নিউরোটিক (বায়ুগ্রস্ত), সাইকোটিক (উন্মাদ), পারভার্ট (বিকৃতকাম), গন্ধ এদের জীবনে একটা বড় অংশ জুড়ে আছে। কতিপয় ব্যক্তির কাছে বিষ্ঠাসম পূতিগন্ধ খুবই আদরের, যে গন্ধে অধিকাংশরই বমি আসে সেই গন্ধে কামোত্তেজিত হয়, রতিলোলুপ হয়ে ওঠে এরাই। এরূপ মর্বিড ঘটনার সঙ্গে 'বিষ্ঠাবিষয়ক

রাগোন্মেষ'-এর মিল আছে আর আছে তীব্র শৈশবকালীন সংবন্ধন (ফ্রয়েডীয় অবদমিত মলপ্রীতি)। কিংবা 'ঘ্রাণজ মর্ষকামিতা'-র (olfactory masochism)। শেষোক্ত ক্ষেত্রে, শুধু ব্যথার পরিবর্তে ঘ্রাণজ অথচ ব্যথাময় উদ্দীপনা ব্যতিরেকে এরা রাগাবিষ্ট হয় না।

কোন কোন উন্মাদ রোগে এবং বহুতর কামবিকৃতিতে ইন্ধন জোগায় এই গন্ধই। ডাঃ ক্রাফট-এবিং বলেছেন 'ঘ্রাণজ অমূল প্রত্যক্ষ' (hallucination), ডাঃ ম্যাগনাস হির্শফেল্ড ঘ্রাণজ বস্তুকাম (Fetishism), আধুনিক যুগে পেয়েছি ঘ্রাণজ মর্ষকাম। প্রসঙ্গতঃ বলে রাখা ভাল, অপ্রীতিকর গন্ধপ্রীতি, দেহগন্ধ বা কামগন্ধজাত উত্তেজনা কামবিকৃতি নয়। অতএব ১০৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত গন্ধলুব্ধ পুরুষটি বিকৃতকাম নয়।

ঘ্রাণভিত্তিক কামবিকৃতির সুন্দর উদাহরণ : বস্তুকাম। অর্থাৎ কিনা গন্ধও বস্তুকামের হাতিয়ার হতে পারে। সত্যি বলতে, বস্তুকামীর প্রিয় বস্তুগুলির অধিকাংশই মনুষ্যদেহের বিভিন্ন ক্ষরণ, যেমন ঘর্ম, পাদক্ষরণ, কক্ষপুটস্বেদ, গোপনাঙ্গ ক্ষরণ, দ্বারা সিক্ত। দৃষ্টান্ত : ব্লাউজ, শায়া, রুমাল ; পাদুকা, মোজা ; কেশদাম।

অধিকাংশ নরনারীরই গন্ধে প্রলোভন জাগে খুবই কম, আরও কম জাগে উত্তেজনা। কিন্তু বিরাগ জন্মে অনেকেরই। আকর্ষণ না থাক, বিরাগ আছে, একদিন স্বেদস্নাতদেহে স্ত্রীকে আদর করলেই টের পাবেন। মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে, দেহগন্ধ কামগন্ধ কিংবা অন্যান্য গন্ধ সংস্কৃতিবান নরনারীর কামজীবনে ঈষৎ বিকর্ষক, বিশেষ করে স্বাভাবিক কামগন্ধহীন অবস্থায়। এমন কি এথেকে যৌনবিরাগও জন্মে বা বৃদ্ধি পেতে পারে। এবং এই বিরাগ থেকে পুরুষত্বহীনতার ঘটনাও বিচিত্র নয়, সত্য সত্যই ডাঃ এ. মোল এমন একটি ঘটনার প্রামাণ্য নজির দিয়েছেন। পক্ষান্তরে রাগ প্রবৃদ্ধ হলে, এগন্ধেই রতিবাসনা কখন কখন বৃদ্ধি পায়, মিলন নিশ্চিত করে দেয়। আবার স্থানীয় গন্ধ, উদাহরণস্বরূপ কক্ষসুরভি, গোপনাঙ্গ ঘ্রাণ, দিয়ে সোনার যৌনতাকে খুন করা যায়, প্রায় সিদ্ধি পেতে চলেছে এমন রতিভাবও নষ্ট হয়ে যায়। আমিও দুটি ঘটনার সাক্ষী। একটির কথা পূর্বেই বলেছি, ১০৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত পুরুষটি স্ত্রীদেহের তীক্ষ্ণ গন্ধে ম্রিয়মান, এই কদিন পুরুষাঙ্গ দৃঢ় হয় না, হলেও তাড়াতাড়ি শিথিল হয়ে যায়, নয়ত তাড়াতাড়ি বীর্যস্খলন হয়ে যায়। আরেকটি ঘটনার নায়ক রতিব্যাপারে বিগতস্পৃহ, খোঁজ নিয়ে জানা গেল স্ত্রীর গোপনাঙ্গ ঘ্রাণই (অতিরিক্ত রোমশতা, দেহে এবং যৌনাঞ্চলে) এই অনীহার কারণ, অঙ্গপ্রবেশ-

কালে এক ঝাঁক গন্ধ তাকে অবশ করে দেয়, সমস্ত উত্তেজনাও দপ করে নিভে যায়।

অনুত্তেজিত অবস্থায়, দেহগন্ধে বিরাগের বদলে অনুরাগের আবির্ভাব ঘটেছে, এমন ঘটনাকে কামবিকৃতিরূপে চিহ্নিত করতে বলেছেন ডাঃ হ্যাভলক এলিস। এতটা নির্দয় কিন্তু আমরা নই। কারণ, রম্যকলার শিল্পী নয়, বিকৃতকাম নয়, ঘ্রাণজ শ্রেণীভুক্ত নয় এমন সাধারণ মানুষের জীবনেও, বিশেষ করে যৌনজীবনে, দেহগন্ধ বা কামগন্ধের একটা ভূমিকা আছে, আকর্ষণ কিংবা বীতরাগ, একটা কিছু স্পষ্ট হয়ে উঠবেই। এবং কোনটাই বিকৃত নয়, সুস্থ শারীরবৃত্তীয় ঘটনা।

উপসংহারে বলি, কামজীবনে গন্ধের প্রভাব আছে, যদিচ সমগ্র মানব-সমাজের প্রতিটি নরনারীর জীবনে এপ্রভাব খুবই নগণ্য। গন্ধ নামক উদ্দীপনা নাসিকা দ্বারে যখন ঘা দেয়, নার্ভজগতে চঞ্চলতা জাগে, একই সঙ্গে শুরু হয় মানসলোকে যৌন অনুষঙ্গের আনাগোনা, এদুয়েরই প্রভাবে কামভাব আসে। কখন সুগন্ধ, কখন কোন বিশেষ গন্ধ রতিব্যাকুলতা এনে দেয়। কখন, আশ্চর্য কাণ্ড, কোন দুর্গন্ধ (শারীরিক ক্লেদাদির গন্ধ) কোন কোন ব্যক্তির কামপ্রবৃত্তি উদ্রেক করে এবং যৌন উত্তেজনাকালে বহু স্বাভাবিক ব্যক্তির নিকটও এগন্ধ (কিংবা অন্য গন্ধ) প্রীতিকর মনে হয়। বলা হয়েছে, উত্তেজনাকালে (বা রতিকালে) দেহগন্ধ তীব্রতর হয়ে মাদকতাময় পরিবেশ সৃষ্টি করে, অধিকতর তৃপ্তি এনে দেয়। এটা কিন্তু গৌণ প্রভাব এবং অতিসচেতন মনের কাণ্ড-কারখানা নয়।

কি ?—নারীজাতির আত্মত্যাগ দধীচিকেও হার মানায়। বাপ-মা বিয়ে দেয়, তাই বিয়ে হয়। নিজেও যে রূপালী স্বপ্ন না দেখে তা নয়। কিন্তু বিয়ে করে বাস্তবের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে এতই কাহিল যে, আনন্দ পাওয়ার বা চাওয়ার ফুরসত থাকে না। স্বামী দেবতা, তাকে সন্তুষ্ট করাই তার শিক্ষা। তাই নিজে তৃপ্তি না পেলেও দেহদান করে ; নিজের রুজি রোজগার বজায় রাখতে আর স্বামী যাতে অন্য নারীর প্রতি দৃষ্টিদান না করে সে জন্যেও। সন্তানের মা হয়ে অনেকটা সান্ত্বনা পায়। কিন্তু প্রতি বৎসরে মা হতে হতে তার এই অমৃতে অরুচি ধরে। এরই মাঝে মাঝে যৌন উত্তেজনা যে তার না আসে তা নয়। এলেও, মুখ ফুটে বলে না পাছে স্বামী তাকে বেহায়া ভাবে। আর স্বামী-দেবতা যদিও মাঝে মাঝে আনন্দের সঙ্গী করেন, হয় সে সময় নিজের আদৌ কোন ইচ্ছা থাকে না, না হয় সে উত্তেজনা, যদি কিছু আসে, মধ্যপথে অতৃপ্ত থেকে যায়। এমন ক্ষণ-উত্তেজনাকে সে তৃপ্তি বলেই জানে। আর ভাবে, পুরুষের স্খলনের সঙ্গে সঙ্গে তার যৌন কামনা শেষ হতে বাধ্য কিংবা স্বামীর প্রত্যেক রাত্রের অনুষ্ঠান তাকে এই শিক্ষাই দিয়েছে। এথেকে যা কিছু এল তাই তার সহস্র সঞ্চয়।

এমনি করেই নারী যৌন উপেক্ষিতা। পাশ্চাত্ত্য দেশে শতকরা ১০ থেকে ৩০ জন নারী যৌন অতৃপ্তির আগুনে জ্বলে। কিংবা এই অতৃপ্তিকেই তৃপ্তি জেনে শান্ত হয়েছে। আমাদের দেশে এর চেয়ে অনেক বেশী নারী যৌন তৃপ্তি পায় না। এই ধরনের অনেক চিঠি আসে, অনেক নারী আসে। এদেরই কয়েকজনের কথা বলব :

১। "আমার বয়স ২০।২২। পাঁচ বৎসর আগে আমার বিয়ে হয়েছে। এবং বিয়ের দুই বৎসর পরই একটি ছেলের মা হয়েছি। এর পর আর কোন ছেলেপিলে হয়নি। স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালই। যৌনযন্ত্রাদি ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সবই ঠিক আছে। কোথাও কোন বিকৃতি নাই। কিন্তু আজ পর্যন্ত বুঝতে পারলাম না—যৌন আবেগ বা উত্তেজনাটা কি জিনিস! তবু স্বামীর মনরক্ষার্থে দেহদান করতে বাধ্য হচ্ছি। বুঝতেই তো পারছেন এটা কি রকম অত্যাচার। আমাকে বাতলে দিন কি করলে যৌন জীবনে সুখী হব।"

২। "আমার বয়স ৪০, স্ত্রীর ৩০। আমাদের সাতটি পুত্রসন্তান। তাহার মধ্যে দুইটি মরিয়া গিয়াছে, বর্তমানে ৫টি জীবিত। আমার স্ত্রী চিরকালই সঙ্গম করিতে চায় না। খুব অনুনয় বিনয় করিলে মাসে দুইবার কি তিনবার দেহ-মিলনে রাজী হয়। তাহাও বেশ নারাজভাবে, মনের স্ফূর্তির বা আনন্দের সহিত নয়। মিলনের পর হয়ত স্নান করে কিংবা ভালরূপে ধৌত করিয়া আমায় কুৎসিৎভাবে গালিগালাজ করে, হাতের কাছে যাহা পায় তাহা ভাঙিয়া চুরমার করিয়া ফেলে। এবংবিধ কার্যকলাপের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে জবাব দেয়, আমি কোনরূপ আনন্দ উপভোগ করি না, বরং আমার বিরক্তি বোধ হয়।"

৩। "বয়স ২২। ৪ বছর বিবাহিতা। স্বাস্থ্য ভালই। ঋতুস্রাব ঠিকমতই হয়। এই সময়ে বা তার আগে পরে কোন কামজোয়ার আসে না। বিয়ের আগে কোন কামভাব ছিল না এবং বিয়ের একমাস পরে প্রথম মিলন হয়। তার পর থেকে প্রায় প্রত্যহই একবার কি দুবার মিলিত হতাম, এখন সপ্তাহে দু তিনবার। মিলনে আমার কোন অসুবিধা হত না এবং এখনও হয় না। তবে এতে যে কি আনন্দ তা আমি জানি না। শুধু স্বামীর মনরক্ষার্থে দেহদান করি। বিয়ের তিনমাস পরে অন্তঃসত্ত্বা হই, এই মেয়েটির বয়স তিন বছরের একটু বেশী। বর্তমানে তিন মাসের গর্ভবতী। আমার বিবাহিত জীবনের মধ্যে মাত্র দুতিনদিন স্বামীকে জড়িয়ে ধরেছি ও উত্তেজনাভাব প্রকাশ করেছি। এতে আমিও তৃপ্তি পেয়েছিলাম এবং স্বামীও সুখী হয়েছিলেন। এখন কিন্তু চেষ্টা করেও ঐ ভাব আসে না। স্বামী যথেষ্ট শৃঙ্গার করেন, এটা ভালও লাগে। কিন্তু মিলনকালে কোন আনন্দ পাই না, তবে শরীর খারাপ না থাকলে কোন অসুবিধাও অনুভব করি না। শৃঙ্গারের ফলে স্ত্রীঅঙ্গ রসসিক্ত হয় না, কোন উত্তেজনাও আসে না। আমার স্বামী বলেন পৃথিবীর মধ্যে আমি একজন উত্তেজনাহীনা। আমার স্বামীর স্বভাব খুব ঠাণ্ডা প্রকৃতির, খুব সহনশীল। মিলনকালে আমি উত্তেজনাভাব প্রকাশ করতে পারলেই তিনি খুব সুখী হবেন। এটা আমি পারি না বলে আমাদের উভয়েরই দুঃখ। স্বামীকে রতিব্যাপারে তৃপ্তি দিতে পারি না, সুখী করতে পারি না, কেননা আমার কাছ থেকে কি যেন তিনি আশা করেন যা তিনি পান না। বিয়ের পর থেকেই এই ভাব। আমার যাতে কামভাব জাগে ও যৌন উত্তেজনা আসে তার ব্যবস্থা করে দিলে খুবই উপকৃত হব। আমার মোটেই উত্তেজনা নেই কেন আর কামভাবই বা জাগে না কেন? এর প্রতিকারের উপায় বলে দিয়ে আমাদের দাম্পত্য জীবন সুখী করে তুলুন।"

৪। "সন্ত বিবাহিতা। প্রথম দিন ভীষণ ব্যথা পাইয়াছিলাম। তার দুদিন পরে আবার মিলিত হই। তার পর থেকে প্রায় প্রত্যেক রাত্রেই স্বামীকে দেহদান করতে হয়। কিন্তু আজ পর্যন্ত আমি কোন প্রকার সুখ পাইলাম না। বরঞ্চ স্ত্রীঅঙ্গে ভীষণ ব্যথা অনুভব করি। যৌন উত্তেজনা আসে না কেন এবং তৃপ্তিই বা হয় না কেন? আর কেনই বা ব্যথা লাগে? কি করলে ভাল হব?"

৫। "বর্তমান বয়স ২৮, স্ত্রীর ২৮। আমাদের বিয়ে হয়েছে সাড়ে তিন বছর আগে। আমাদের একটা ছেলে আছে তার বয়স ২১ মাস। আমি এবং আমার স্ত্রী উভয়েই ক্ষীণকায়। বিয়ের পরই টের পাই যে আমার স্ত্রীর যৌন অনুভূতি বা উত্তেজনা খুবই কম। শৃঙ্গার প্রভৃতিতে আদৌ কোন উৎসাহ দেখাত না। বলতে গেলে আমাদের মিলনপর্বটি প্রায় একতরফাগোছের। ছেলে হওয়ার পর স্ত্রীর মেজাজ আরও খিটখিটে হয়েছে। সপ্তাহে একবার কিংবা পনেরো দিন অন্তর একবার দেহমিলনেও তার আপত্তি। এক কথায় আমার স্ত্রী এতে মোটেই আনন্দ পায় না। তা ছাড়া আমার স্ত্রী মিলনকালে অঙ্গে ব্যথাও পায়। ছেলে হওয়ার পর এব্যথাটা আরও বেড়েছে। বিশেষ করে অঙ্গপ্রবেশের সময় স্ত্রী যথেষ্ট ব্যথা পায়।"

উপরিউক্ত কেস বিবরণী থেকে যৌন উপেক্ষিতাদের অসহনীয় অবস্থার কথা, আশা করি নিশ্চয়ই, উপলব্ধি করতে পেরেছেন। নারীদের এই যে রতিহীনতা বা রতি-অক্ষমতা, এর নাম 'রতিজড়তা' বা রতিশীতলতা। এর জন্যে স্বামী দায়ী হতে পারে, তখন এটা অপ্রকৃত বা কৃত্রিম ধরনের রতিজড়তা। এই রতিশীতলতা শুধু স্ত্রীর জন্যেও দেখা দিতে পারে। এটা নারীনির্ভর বলেই এই দৈন্যদশার নাম 'প্রকৃত রতিজড়তা'। কোন কোন ক্ষেত্রে, স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের জন্যেও নারীর জীবনে রতিহীনতার আবির্ভাব হতে পারে। আবার সন্তান প্রসবের পর সাময়িক রতিজড়তা দেখা দিতে পারে এবং এই রতিজড়তা আপেক্ষিক ধরনেরও হতে পারে।

আবির্ভাব-কাল ভেদেও রতিজড়তা শ্রেণীবিন্যস্ত হতে পারে, প্রাইমারি কিংবা সেকেণ্ডারি রূপে। প্রাথমিক বা প্রথমাবধি রতিজড়তা, প্রতিটি কামানুষ্ঠানই তৃপ্তিহীন। আত্মকামিতা, সমকামিতা, ইতরকামিতা, কোন কিছুতেই নিবৃত্তি নেই। পাণিমেহন, নারী (বা পুরুষ) কৃত কামাচার, মুখরত, যোনি বা পায়ুরত, এসবই কিনা ব্যর্থ। অবশ্য, নিদ্রিত বা জাগ্রত অবস্থায় স্বপ্ন দেখতে দেখতে রতিপ্রাপ্ত হতে পারে কোন কোন নারী, এটা কোন কামানুষ্ঠান নয়, এই হেতু এরূপ নারী প্রথমাবিধি রতিজড়তার দলেই।

গৌণ বা সেকেণ্ডারি রতিজড়তায়, সঙ্গিযুক্ত বা সঙ্গিবিহীন হয়ে যে কোন কামানুষ্ঠানে রাগমোচনের আলোয় মুখ দেখেছে, অন্ততঃ বারেকের তরেও। এই অক্ষমতা প্রধানতঃ রতিগত, কখন পাণিমেহনগত, কখনবা উভয়গত।

কেন এই রতিজড়তা?

অপ্রকৃত রতিজড়তা—এক্ষেত্রে স্ত্রীর যৌন কামনা ও উত্তেজনা, কম বা বেশী, ঠিকই থাকে। শুধু স্বামীর কোন ত্রুটি, স্বামীর রূঢ় আচরণ কিংবা অশোভন অনুষ্ঠানের জন্যে এই কামনা অতৃপ্ত থেকে যেতে বাধ্য হয়। এই স্বামীরা হয়ত সুরত-রসিক নয়, না হয় যৌন-দুর্বল। অঙ্গশিথিলতা, দ্রুতস্খলন কিংবা দেহমিলনের কলাকৌশল সম্বন্ধে শোচনীয় অজ্ঞতার ফলে, স্ত্রী কোনদিনই চরম পুলকের শিহরন পায় না। ফলে যেটুকু উত্তেজনা ছিল সেটুকুও দুদিন পরে ছাই চাপা পড়ে নিভে যায়। দাম্পত্য জীবনে পুনঃপুনঃ আশাহত হলে স্বাভাবিক রতিসম্পন্ন নারীর জীবনেও এমন রতিজড়তা নেমে আসতে পারে যে হাজার উদ্দীপনাতেও কামভাব না জাগতে পারে, স্বামীর হাজার রতিকুশলতাও ব্যর্থ হতে পারে। এমন কি বিয়ের প্রথমদিককার মিলনে ব্যথায় ব্যথায় জর্জরিত হলে যৌনতার চিরনির্বাসন ঘটতে পারে।

প্রকৃত রতিজড়তা—এটা আদি ও অকৃত্রিম। এক্ষেত্রেও অর্থাৎ যথার্থ রতিজড় নারীর কামভাব পুরোমাত্রায় আছে, রাগমোচন ক্ষমতাও আছে এমন কি গোপনাঙ্গে সংবেদনও আছে তবে সবই কিনা অন্ধকারে নির্বাসিত। কোন কারণে (অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই কারণটি মানসিক) ব্যক্ত বা প্রকাশিত হওয়ার সুযোগ নেই। ফলে এই স্ত্রীরা কোনদিন যৌন কামনার খবর পায় না আর পেলেও তৃপ্তির নাগাল এদের মেলে না, এমন কি স্বামীর রতিদক্ষতা থাকা সত্ত্বেও। এর জন্যে ছেলেবেলা থেকে শুরু করে বর্তমান জীবনের অনেক কিছুই দায়ী হতে পারে। যেমন, রক্ষণশীল পরিবারে চুপ-চুপ যৌন নীতির আবহাওয়ায় পরিপুষ্ট নারীকে যৌনতার প্রতি এমনই একটা বিকৃত ও ঘৃণ্য ধারণায় পেয়ে বসে যে কিছুতেই যৌনব্যাপারটাকে সুন্দর বলে মেনে নিতে পারে না। কিংবা বিবাহপূর্ব জীবনে কোন তিক্ত অভিজ্ঞতা বা যৌন দুর্ঘটনার দরুন যে 'অসবর্ণ শর্তারোপ' ঘটে তার ফলে কোন কোন নারীর দাম্পত্য জীবনে যৌনতার তিল ঠাঁই থাকে না। একটা কেস বিবরণী বলি :

"স্বামীর বয়স ২৪, স্ত্রীর ১৮। দু বৎসর বিবাহিত। একটি পুত্রসন্তানের জনক-জননী, পুত্রটির বয়স ন মাস। এই স্বামীটি রতিব্যাপারে স্ত্রীর নিরপেক্ষতা ও ঔদাসীন্যের অভিযোগ নিয়ে আমার কাছে আসেন। কথা প্রসঙ্গে প্রকাশ

পেল বিবাহপূর্ব জীবনে স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। প্রথমে ছিলেন গৃহশিক্ষক, তার পর আসে অন্তরঙ্গতা, শেষে এটাই প্রেমে পরিণত হল। তখন তাঁদের মধ্যে মাঝে মাঝে রতিবিহীন উপচার অনুষ্ঠিত হত এবং উভয়েই এভাবে তৃপ্তির মাধুরী উপভোগ করতেন। তার পর ব্যাপারটি জানাজানি হয়ে যায়। গৃহশিক্ষক বিতাড়িত হন আর হতভাগ্য ছাত্রীটি হয় নিপীড়িত ও অশেষ লাঞ্ছিত, এমন কি প্রহার, দৈহিক নির্যাতনও বাদ যায়নি। শেষে সমস্ত দুঃখের অবসান হল যখন গৃহশিক্ষক ছাত্রীকে স্ত্রীর মর্যাদা দিলেন। কিন্তু এত সুখ স্ত্রীর কপালে সইল না। কারণ, অভিভাবকদের দুঃশাসনের ফলে মেয়েটির কামজীবনে অসবর্ণ শর্তারোপের বিষময় নিষেধপ্রভাব দেখা দিয়েছে। অর্থাৎ মেয়েটির কাছে কামভাব অশোভন, নোংরা ও ঘৃণ্য রূপে প্রতিভাত হয়ে উঠল। তাই, বিবাহিত জীবনে স্ত্রী আর কামভাবে রাঙিয়ে উঠল না বরং নিষ্ক্রিয়, নীরব, উদাসীন দর্শক হয়ে স্বামীর সাথী হয়ে রইল। অথচ ভাবতেও আশ্চর্য লাগে, এই নারীরই কিনা বিবাহপূর্ব কামজীবন সক্রিয় ছিল, উদ্দীপনায় মুখর হত আর তৃপ্তিময়ও ছিল।"

আবার নিছক আতঙ্ক বা ভয় (যেমন গর্ভাতঙ্ক, মাসিক বা প্রসব ব্যথায় দুশ্চিন্তা, রতিবাহিত ব্যাধির ভয়, মিলনে আঘাত বা ব্যথা পাওয়ার ভয়) থেকেও রতিশীতলতা দেখা দিতে পারে। এজাতীয় ভয়গুলি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অর্থাৎ সচেতন মনেই এদের বাসা। তথাপি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এদের আদি ও অকৃত্রিম উৎসস্থল অচেতন মনেই। অর্থাৎ সচেতন মনের ভয়ই যুক্তির মুখোশ পরে (মনোবিজ্ঞানের ভাষায় একে 'যুক্ত্যাভ্যাস' বলে) কিংবা অজুহাত স্বরূপে সচেতন মনে দেখা দেয়। এই ভয়টা যখন সামান্য অথবা প্রতিষেধক অবলম্বনে চলে যায়, তখন এটা সাধারণ অর্থাৎ সজ্ঞান মনের আত্মরক্ষামূলক প্রক্রিয়াবিশেষ। যখন গভীর ও সুদূরপ্রসারী হয় এবং কিছুতেই মুছে ফেলা যায় না, তখন এটা বিশেষ অর্থাৎ নির্জ্ঞান মনের। একটা উদাহরণ দিই :

"এক দম্পতির করুণ কাহিনী। এঁদের পুত্রকন্যা তিনটি এবং বর্তমানে এঁরা সন্তানকামী নন। গর্ভভয়ে স্ত্রীর প্রায়ই ঋতুবন্ধ থাকে, কখন দেড় দু মাস, কখনবা তিন চার মাস। ঋতুস্রাব একটু বিলম্বিত হলেই স্ত্রী গর্ভভয়ে চরম উৎকণ্ঠায় দিন কাটান, ফলে ঋতুস্রাব আরও বিলম্বিত হয়। এই রকম এক ঋতুবন্ধে এঁরা সস্ত্রীক আমার কাছে আসেন। পরীক্ষায় জানা গেল, ঋতুবন্ধ গর্ভের জন্যে নয়, অন্য কারণে দেখা দিয়েছে। চিকিৎসায় কিছুদিনের মধ্যেই ঋতুস্রাব দেখা দিল। নিছক গর্ভভয়ে এরকম দুর্ভোগের জন্যে এঁদেরকে অব্যর্থ

জন্মরোধক পদ্ধতির (নিক্ষেপক যন্ত্রযোগে পূর্ণমাত্রার জেলী সহযোগে কন্‌ডম্) নির্দেশ দেওয়া হল। এতে কিছুদিন সুফল দেখা দিল। আবার যে কে সেই। সেই উৎকণ্ঠা, সেই চিকিৎসা। আজ চার বৎসর হয়ে গেল এঁরা জেলী সহযোগে কন্‌ডম্ ব্যবহার করছেন, সন্তানাদি একটিও হয়নি। কিন্তু স্ত্রীর গর্ভভীতি এতই উৎকট যে জন্মরোধক পদ্ধতির কার্যকারিতা নিজের চোখে দেখেও, তাঁর আস্থা নেই। তাই প্রতিটি মিলনেই থাকে গর্ভোৎকণ্ঠা, যার ফলে ইনি ৫।৬ বৎসর রতিতৃপ্তির মুখ দেখেননি এবং মিলনেও ঘোর বিতৃষ্ণা। শুধু স্বামীর জিদের ফলেই মাঝে মাঝে যা একটু মিলন ঘটে। এবংবিধ নির্মম টানাপোড়েনে স্বামী ষ্টেরিলাইজেশন অপারেশনে রাজী হলেন, স্ত্রীর কিন্তু ঘোরতর আপত্তি। কেননা পুত্র সন্তান যে মাত্র একটিই।"

সজ্ঞান মনের দাপট যদি এই হয় নির্জ্ঞান মনের ভয়ভাবনার প্রকোপ যে আরও বেশী হবে তা বলাই বাহুল্য। তাই মানসজীবনে নানাবিধ নিষেধ প্রভাব (যেমন নির্জ্ঞান ভয় বা অন্তর্দ্বন্দ্ব) কিংবা সংবন্ধনের (যেমন প্রাক্‌লৈঙ্গিক অথবা ভগাঙ্কুরীয় পর্যায়ে সংবন্ধন) ফলেই যৌনতা চির অন্ধকারে নির্বাসিত হতে পারে। নির্জ্ঞান জগতের ভয়ভাবনাগুলি শুধু যে বিচিত্র তা নয় ভয়ঙ্করও বটে। একে মানুষ সবচেয়ে বেশী ভয় পায়। তাই সব সময়েই মানুষ এর সুরাহা করতে চায়, তা সে যেমন করেই হোক না কেন। এই সমাধান কিন্তু অচেতন মনেই ঘটে অর্থাৎ নিজের অজ্ঞাতসারে বিচিত্রতর উপায়ে মুশকিল আসান ঘটে। কখন গোঁজামিল দিয়ে যেমন ভগাঙ্কুরীয় রাগমোচনে, কখনবা নিজের সর্বনাশ ডেকে এনে, যেমন নিজের রতিভাবের জলাঞ্জলি দিয়ে। তাই তো আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ফ্রয়েডপন্থী কার্ল মেনিঙ্গার-এর মতে নির্জ্ঞান মনের অন্তর্দ্বন্দ্ব সমাধানকল্পে আত্মঘাতী কার্যকলাপের বিশিষ্ট উদাহরণ হল এই রতিজড়তা। এই অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রধানতঃ তিনটি কারণে দেখা দেয় :

এক, নির্জ্ঞান ভয়, যেমন শাস্তি পাওয়ার ভয়, 'উপস্থচ্ছেদ ভীতি'।

দুই, নির্জ্ঞান মনের ঘৃণা, বিতৃষ্ণা ও ঈর্ষা ; যেমন 'লিঙ্গ-ঈর্ষা', প্রতিহিংসা-মূলক বাসনা, কোন অত্যাচার বা অবিচারের প্রতিবিধান স্বরূপ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা।

তিন, কামজ অন্তর্দ্বন্দ্ব, যেমন স্বকাম, সমকাম, 'পিতা-পুত্রী সম্প্রীতি', 'অজাচারেচ্ছা'।

রতিজড়তার অবস্থাটা চাটু থেকে উনুনের মধ্যে গড়িয়ে পড়ার মত। মানস-লোকের ছোটখাট বিপদের (অন্তর্দ্বন্দ্বের) পাশ কাটাতে গিয়ে, বড়সড় বিপদের

(রতিজড়তার) মুখোমুখি হওয়া। কিংবা কোন কারণে দেহমিলন এড়িয়ে যাওয়ার অব্যক্ত বাসনাই রতিজড়তা রূপে ফুটে ওঠে। এটাই যখন আরও প্রকট হয় রতিজড়তার সঙ্গে যোনি-আক্ষেপও দেখা দেয়। অর্থাৎ রতিজড়তা আত্মরক্ষামূলক কার্যকলাপও বটে।

আপেক্ষিক রতিজড়তা—স্থান, কাল, পাত্র ও অনুষ্ঠান ভেদে যৌন উদ্দীপনায় সাড়া দেওয়ার মত ক্ষমতা কোথাও লোপ পায়, কোথাওবা দ্বিগুণিত হয়। যেমন প্রথম স্বামীর কাছে রাগ সঞ্চারিত হল না কিন্তু দ্বিতীয় স্বামীর পরশে রতিজড়তার শাপমোচন ঘটতে পারে (প্রথম খণ্ডের ২০৬ পৃষ্ঠা দেখুন)। কিংবা বহুপতিক বিবাহে কোন স্বামীর বাহুবন্ধে তৃপ্তি নেই অথচ অন্য স্বামীর কাছে ধরা দিয়ে রতিপ্রাপ্তি আছে। আবার দেহমিলনে কামভাব তথা তৃপ্তির ছিটেফোঁটা না থাকলেও, সুপ্তিস্খলনে, পাণিমেহনে কিংবা সমকামিতায় কামতৃপ্তি আসতে পারে। আর স্থান ও কালের তারতম্যে রতিবৈচিত্র্য তো ঘটতেই পারে।

প্রসবোত্তর রতিজড়তা—প্রসবের ধকল, প্রসবোত্তর ক্লান্তি ও দুর্বলতা, স্তন্যদান ও শিশুপালনের ঝামেলা, সব মিলেমিশে যৌন কামনা কমিয়ে দেয়। ছেলেপিলে হলে স্ত্রীর মনোজগতে একটা ছোটখাট বিপ্লব ঘটে যায়। ফলে অনেক রূপান্তর দেখি মায়েদের জীবনে। এখন শিশুই তার জগতে একমাত্র আলো হয়ে বিরাজ করে, তাই আগে যে ভালবাসা সমস্তই উজাড় করে স্বামীকে ঢেলে দিয়েছে তার সবই বা অনেকটা সন্তানে সমর্পিত হয়। একারণেও প্রসবের পর কামেচ্ছা বহুলাংশে কমে যায় কিংবা পুরোপুরি রতিজড়তা দেখা দেয়। এটা সাময়িক। কিছুকাল পরেই রতিজড়তার শাপমোচন ঘটবে, কামেচ্ছাও ফিরে আসবে। মাষ্টার্স ও জনসন এরূপ রতিহীনতার জন্যে অন্য একটি ব্যাখ্যা—শারীরবৃত্তীয় ব্যাখ্যা দিয়েছেন। প্রসবের তিন চার মাস পরে কামবাসনায় পীড়িত হলেও অধিকাংশ নারীর পক্ষে রতিপ্রাপ্তি সম্ভব নয়। রতিকালীন শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তনরাজি—রক্তসঞ্চয়, রসপিচ্ছিলতা, প্রসারণ—অনুপস্থিত থাকে। এসবেরই কারক এস্ট্রোজেন হর্মোন। অতএব এস্ট্রোজেন অভাবই প্রসবোত্তর রতিজড়তার মৌল কারণ। প্রসবকাল ব্যতীত অন্য সময়েও, দৈহিক দুর্বলতা কিংবা মানসিক অবসাদ বা আলোড়নের জন্যেও এমনটি হতে পারে।

বিজ্ঞান, রতিজড়তা ও দম্পতি

নারীর রতিপ্রাপ্তি কতটুকু প্রয়োজনীয়?—আধুনিক কাম-শাস্ত্রকারগণের মতে স্ত্রীর রাগমোচনপ্রাপ্তি অবশ্য কর্তব্য বিশেষ। এবং এই

উদ্দেশ্যে নানাবিধ বিধানের নির্দেশও দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, এর অভাবে নারীজীবনে অশান্তির কথা বলেছেন, ঘরভাঙ্গার নজির দিয়েছেন। এটা পুরোপুরি সত্য নয়। অর্থাৎ রাগমোচন প্রত্যেক নারীর কাছে অপরিহার্য নয় এবং অপ্রাপ্তিতে নারীমাত্রই অসুখী হয় না। কারণ, দাম্পত্য জীবনে যৌনতার মূল্য নারীর কাছে অনেক কম, অন্ততঃ পুরুষের চেয়ে কম। স্বামীর ভালবাসা আর সন্তানের প্রীতি দিয়ে ঘেরা সুখের ঘর বাঁধবার আশায় নারী বিয়ে করে। তাই, এই তিনটি যদি জোটে, রাগমোচন বঞ্চিতা হয়েও এরা হাসিখুশি থাকে।

এত কথা বলার অর্থ এই নয় যে আমাদের কাছে স্ত্রীর রতিপ্রাপ্তির কোন মূল্যই নেই। মূল্য অনেক, কিন্তু অভাবে কি স্বভাব নষ্ট করতে হবে, না হতমান হয়ে খেদ করতে হবে? অর্থাৎ রাগমোচন যদি আসে তো ভাল কথা। আর না এলেই মহাভারত যে অশুদ্ধ হবে এমন তো কোন কথা নেই। কেননা ভীমের মত সবাই বলবান নয়, রতির মত সবাই কামবিহ্বলা নয়, উর্বশীর মত সুন্দরীও নয় সবাই। এই একই নিয়মে কোন কোন নারী রতিবঞ্চিতা। তা ছাড়া জীবনের শান্তি তো শুধু রাগমোচনপ্রাপ্তির মাপকাঠি দিয়ে বিচার করা যায় না। কেউ হাসে না তাই কি সে দুঃখী হতে বাধ্য? আবার কেউ কাঁদে না তাই কি সে চিরসুখী? বাস্তব জগতে এমনটি কখনও সম্ভব হয় না বলেই, রাগমোচনের অভাবে নারীমাত্রই দুঃখী হয় না।

স্বামী, পরপুরুষ ও রতিজড়তা—রতিপ্রাপ্তি ব্যাপারে কামশাস্ত্র নারীর (বিশেষতঃ যথার্থ রতিজড় নারীর) ভাল যতটা না করেছে মন্দ করেছে অনেক বেশী। মিলিত হলেই রাগমোচনের প্রত্যাশা করব, কামশাস্ত্রের এই পাঠ অল্প বিদ্যার মতই ভয়ঙ্করী। কেননা প্রতিটি মিলনে প্রতিটি নারীর পক্ষে রাগমোচনের মুখ দেখা সম্ভব নয়।

শুধু তাই নয়, প্রায় প্রতিটি কামশাস্ত্রে দেখি দাম্পত্য জীবনে রাগমোচনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সবিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। যেন জীবনের সব কিছুই এর মুখাপেক্ষী; এর অভাবে জীবনের কোন মূল্য নেই, শুধু বিশ্বজোড়া ফাঁকি আর অন্তহীন খেদ। ফলে স্বামীর কাছ থেকে তৃপ্তি যদি না আসে, এই স্ত্রীরা ভাবে অন্য পুরুষরা হয়ত তৃপ্তিদানে সমর্থ। এই ভেবে কেউ যদি পরপুরুষের অনুরাগী হয়, তিনি মস্ত বড় ভুল করবেন। কেনন স্বাভাবিক রতিসম্পন্ন স্বামীর কাছে রাগমোচন যদি আসার হয় তো দুদিনেই আসবে। অন্যথায় এই সম্ভাবনা খুবই কম। তা ছাড়া নারীর যদি রাগমোচনপ্রাপ্তির ক্ষমতা না থাকে, কোন

পুরুষের পক্ষেই তা সম্ভব নয়। অর্থাৎ নারীর কামভাব যদি না আসে তার জন্যে পুরুষমাত্রই দায়ী নয়।

সুস্থতা ও রতিজড়তা—কামজীবনে নারীর হয়ত রাগমোচনপ্রাপ্তির স্বাভাবিকতা নেই, তাই বলে অন্যান্য ক্ষেত্রেও যে অস্বাভাবিকতা দেখা দেবে (যেমন রতিজড় নারী বন্ধ্যা হয়) এধারণা ঠিক নয়। অন্য কামউষ্ণ নারীর মত অন্যান্য সব গুণই কামশীতল নারীর পুরোমাত্রায় থাকে। মাসিক স্রাব নিয়মিত হয়, প্রজনন ক্ষমতা অব্যাহত থাকে, কর্মক্ষমতা অটুট থাকে, দৈহিক ও মানসিক সুস্থতাও বজায় থাকে—এক কথায় কামজীবনের প্রসঙ্গ বাদ দিলে, রতিজড় নারী কোনমতেই অস্বভাবী নয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, রতি-অক্ষম (যেমন, পুরুষত্বহীন) পুরুষেরও এরকম একটা অমূলক ভয় (যেমন অকর্মণ্য হয়ে জরদ্গবের মত অবস্থাপ্রাপ্তির আশঙ্কা) থাকে।

রতিজড়তার চিকিৎসা

পুরুষের রতিকুশলতা—পুরুষকে রতিরসিক ও নারী-সচেতন হতে হবে। মিলনপূর্বে নারীকে প্রস্তুত করে নিতে হবে, দেহ ও মনের দিক থেকে। আর যৌনতার দিক থেকে নারীকে রীতিমত উত্তেজিত করতে হবে, উপযুক্ত শৃঙ্গার ও বিবিধ উপচার প্রয়োগে (প্রথম খণ্ড দেখুন)। যে-শৃঙ্গার, যে-উপচার, যে-আসন কিংবা কোন বিশেষ কামকলা যা নারীর কাছে প্রীতিপ্রদ তার প্রয়োগ করতেই হবে। গোটাকতক উদাহরণ দিই: ভগাঙ্কুরে বিবিধ উপচার প্রয়োগ না করলে কোন কোন নারীর রাগমোচন অসম্ভব। কোথাও শুধু স্বামীর ক্রোড়ে মুখোমুখি বসা অবস্থায় কিংবা পুরুষোপরি শায়িত অবস্থায় কোন কোন নারী যৌন তৃপ্তি পান। কেউবা শুধু কামনার জোয়ারের সময়ে, মাসিকের ঠিক আগে বা পরে, যৌনানন্দ পান।

নারীর সক্রিয়তা—সব সময় স্বামীর অজ্ঞতাই নয়, স্ত্রী নিজেও দায়ী অনেক ক্ষেত্রে। এক্ষেত্রে স্ত্রীকেই এগিয়ে আসতে হবে। মিলনে স্বামীর মত স্ত্রীরও এক সুনির্দিষ্ট ভূমিকা আছে (প্রথম খণ্ড দেখুন)। সেগুলি স্ত্রীকে জানতে হবে এবং যথাযথ প্রয়োগ করতে হবে। এক কথায়, মিলনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সব সময়ই নিজে সক্রিয় হয়ে এবং মনের গোপন কথাটি জানিয়ে আপনার রাগমোচন আনয়নে স্বামীকে সহায়তা করুন।

ভগাঙ্কুর-সচেতনতা—ভগাঙ্কুর-সচেতন হয়েও অনেক লাভ আছে, বিশেষতঃ রতিজড়তার ক্ষেত্রে। প্রথম খণ্ডের ৪৬নং ছবির মত ভগাঙ্কুর যদি লিপ্ত-অগ্রচ্ছদাবিশিষ্ট হয় অর্থাৎ ভগাঙ্কুর যদি আবরণীমুক্ত না করা যায় ডাক্তার

দেখান। মূত্রদ্বার থেকে ভগাঙ্কুরের দূরত্ব যদি এক ইঞ্চির বেশী হয়, আসনভঙ্গীর পরিবর্তন সাধিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। পরিবর্তিত আসনে, যেমন, আসীন অবস্থায়, কিংবা বিপরীত ভঙ্গীতে ভগাঙ্কুরে পুরুষাঙ্গের চাপ পড়বে, তাই। তা ছাড়া শুধু ভগাঙ্কুরে বিবিধ কামকলা প্রয়োগে প্রায় অর্ধেকের মত রতিশীতল নারীর রাগমোচন সম্ভবপর। এরা ভগাঙ্কুর-প্রধান তাই এদের রাগমোচন শুধু মাত্র ভগাঙ্কুরে বিবিধ শৃঙ্গার প্রয়োগেই সম্ভব।

দেহের চিকিৎসা—কোন শারীরিক দুর্বলতা, কোন অসুখ, দেহের বা মনের, কিংবা যৌনাঙ্গের কোন ত্রুটি থাকে তো ডাক্তারের পরামর্শ নিন। সর্বতোভাবে ব্যাধিমুক্ত হোন।

রতিদৌর্বল্যের প্রতিকার—কোন যৌন দুর্বলতা, কোন যৌন ব্যাধি থাকলে চিকিৎসিত হোন। পুরুষকে ত্বরিতস্খলনের প্রতিকার ও অঙ্গশিথিলতার চিকিৎসার জন্যে সচেষ্ট হতে হবে। নারীকে মিলনে কষ্ট বা ব্যথার জন্যে (যোনিপ্রদাহ, যোনিআক্ষেপ প্রভৃতি) অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।

গর্ভভীতি পরিহার—গর্ভভয়ে রতিতৃপ্তি ব্যাহত হলে প্রতিটি মিলনে সুষ্ঠু ও নির্ভরযোগ্য জন্মরোধক দ্রব্যাদির—জেলী সহযোগে কনডম্ কিংবা ডায়াফ্রাম্ কিংবা সেবনীয় বড়ি—প্রয়োগ অবশ্য করণীয়।

হর্মোন চিকিৎসা—কোন কোন ক্ষেত্রে হর্মোন চিকিৎসাও বেশ ফলপ্রদ। যে নারী কোন দিনই যৌন কামনার উত্তাপ উপভোগ করেনি, তার পক্ষে হর্মোন-সাফল্য দুরাশা বললেই চলে। আর, আগে এই উত্তাপে রাঙিয়ে উঠত এখন আর তেমনটি হয় না, এদের কাছে এই হর্মোন ম্যাজিকের মতই কাজ করে। এই হর্মোনটি হল এ্যাণ্ড্রোজেন বা পুং-হর্মোন।

মনের চিকিৎসা—সর্বশেষে মনঃসমীক্ষণ বা সাইকোএনালিসিস। যদি দেখেন এত করেও কিছু হচ্ছে না, মনোবিদের পরামর্শ নেবেন। 'বিহেভিয়ার থেরাপি' চিকিৎসাও ফলপ্রদ, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে হেঁকে বলতে পারি।

কামশীতল নারীর ইতিকর্তব্য

কামভাব আসে, উত্তেজনা আছে প্রচুর অথচ রাগমোচন নেই, এঁদের আশু চিকিৎসা চাইই। এই উদ্দেশ্যে কোন অভিজ্ঞ যৌনশাস্ত্রবিদ্ বা মনোবিদ্ ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করতে পারেন। কিন্তু কোন কামভাব আসে না, উত্তেজনাও নেই কিংবা রতিজড়তার দরুন কোন প্রতিক্রিয়া নেই এমন ক্ষেত্রে চিকিৎসার অভাবে কোন ক্ষতি হয় না। এক্ষেত্রে চিকিৎসা ব্যাপারটি আপনার ইচ্ছাধীন। অর্থ আর ধৈর্য যদি থাকে, সুদীর্ঘকালব্যাপী ব্যয়বহুল মনঃসমীক্ষণমূলক

চিকিৎসার আশ্রয় নিতে পারেন। (অর্থ আর ধৈর্য যদি না থাকে যথাশীঘ্র গর্ভবতী হওয়ার জন্মে সচেষ্ট হবেন; নিম্নে বর্ণিত পঞ্চনীতির প্রতি আনুগত্যের কথা সবসময়েই স্মরণে রাখবেন এবং বেচারী স্বামীর প্রতি অকারণে নিষ্করুণ হবেন না।)

আর কিছুতেই যদি রতিজড়তার শাপমোচন না ঘটে? সত্যি কথা বলতে কি, কিছু না কিছু নারী (প্রায় ১০%—২০%, কমপক্ষে শতকরা দশ জন) কাম-শীতল থাকবেই, তা যতই চিকিৎসা করা হোক না কেন। তখন? এমন নিরুপায় ক্ষেত্রে কামশীতল নারীর ইতিকর্তব্য দুটি: এক, সংসারের প্রতি কর্তব্য-পালন। দুই, স্বামীর তৃপ্তিসাধন।

সংসারের প্রতি কর্তব্য—যথার্থ রতিজড় নারীর সাংসারিক কর্তব্যগুলি এই:

এক, শুধু স্ত্রীপুত্র পরিবেষ্টিত হয়ে যৌনতা-হীনতায় কোন পুরুষ ঘর বাঁধতে চায়? যৌন সাহচর্য বাদ দিয়ে শুধু প্রীতি ও মমতার অনুরাগী হয়ে বিয়ে করতে চায় এমন পুরুষ নেই বললেই চলে। একারণে দীর্ঘ রতিবিরতিতে অধিকাংশ পুরুষই অসুখী এবং স্ত্রীর কাছ থেকে কাম-তৃপ্তি পাওয়ার সম্ভাবনা তিরোহিত হলে ঘর ভাঙতে প্রথম উদ্যোগী হয় পুরুষরাই। তাই, স্বামীর তৃপ্তিসাধনে সচেষ্ট হতেই হবে।

দুই, স্বামীর কাছে তৃপ্তি যদি না মেলে অন্য কোথাও যে মিলবেই তার কোন স্থিরতা নেই। আর আপনার নিজের ত্রুটির জন্মে কামশীতলতা ঘনিয়ে এলে, হাজার মুখ বদলালেও রতিজড়তার শাপমোচন যে ঘটবে না তা সুনিশ্চিত। তা হলে জল ঘোলা করে লাভ কি?

তিন, সন্তানাদি না থাকলে সন্তানলাভের প্রচেষ্টায় ব্রতী হোন। তাই জন্মরোধক দ্রব্যাদির ব্যবহার আপাততঃ বন্ধ করুন।

চার, সংসারের কাজের মধ্যে ডুবে থাকুন। স্বামী ও পুত্রকন্যার পরিচর্যায় নিজেকে মগ্ন রাখুন। অশান্তি থাকবে না। জীবনটি ফুলের মত সহজ হয়ে উঠবে।

পাঁচ, মনে রাখবেন, আপনি শুধু একা নন, আপনার মত আরও অনেক নারী আছেন যাঁরা এরসে বঞ্চিত। তাঁরা যদি স্বামীপুত্র নিয়ে শান্তিতে থাকতে পারেন, তা হলে আপনিই বা পারবেন না কেন?

স্বামীর প্রতি কর্তব্য—আপনার তৃপ্তি আসে না, এই হেতু স্বামীকেও রতিবঞ্চিত রাখতে হবে, এটা কোন যুক্তির কথা নয়। অনেক নারী শুধু এই

অজুহাতে স্বামী প্রত্যাখ্যান করেন, মিলনে ঘোর আপত্তি করেন। অনেক সাধ্যসাধনায় অনেকদিন পর পর হয়ত কেউ মিলনে রাজী হন। কেউবা মিলন শেষে গালিগালাজ করে, কটুকাটব্য শোনায়, ভেঙ্গে চুরে তছনছ করে, এমন কি মারধোরও করে। এটা ভুল, মারাত্মকরকমের ভুল। আপনি এমন ছেলে-মানুষি করছেন, কই আপনার স্বামী তো অনাদরে মুখ ফেরায়নি, ঘর থেকে বাইরে যায়নি, বিবাহবিচ্ছেদও করেননি। তা হলে আপনি কেন আপনার কর্তব্যসাধনে পিছিয়ে থাকবেন? অর্থাৎ স্বামীর যে যৌন তাগিদ আছে সেটা আপনাকে মেটাতেই হবে।

নিষ্ক্রিয় থেকে স্বামীকে দেহদানকর্মে স্ত্রীর এতটুকু পরিশ্রম হয় না। উপরন্তু বুদ্ধিমতী ও দরদী নারী মিথ্যে বলেও স্বামীকে রাজী করায়, তৃপ্তি দেয়। প্রয়োজন হলে, নিজের তৃপ্তি হচ্ছে এমন কথাও বলতে হবে। মিলনকালে স্ত্রীঅঙ্গের পিচ্ছিলকরণ ও উচ্চতর উত্তানক ভঙ্গীর সাহায্যে অঙ্গপ্রবেশের আশ্রয়ে দেহদান ব্যথাহীন হতে বাধ্য। এভাবে তৃপ্তিদান স্বামীর প্রতি দয়া প্রকাশ নয়, কর্তব্যসাধন। এবংবিধ সাধনায় সমাহিত থাকলে শেষ পর্যন্ত পুরস্কারও পেয়ে যেতে পারেন। কেননা শতকরা পনেরো জন কামশীতল নারী এভাবে ২।৫ বৎসর কি ৫।১০ বৎসর পরে আপনাআপনি রাগমোচনের মুখ দেখে থাকে।

আদিম ও আদিবাসীদের মধ্যে এবং যারা খেটে খায় তাদের মধ্যে রতি-সমস্যা নেই, বিস্ময়কর ও আশ্চর্যের হলেও অকালস্খলন নেই। কিন্তু শিক্ষিত ও সভ্য সমাজে রতিসমস্যা প্রায় প্রতিটি মানুষের। রতিস্থায়িত্বের আক্ষেপ তো দেখি প্রতিটি পুরুষের। কেননা স্থায়িত্বকাল যার ২।৫ মিনিট সে চায় আরও ৫।১০ মিনিট, আর যার ১০।১৫ মিনিট সে চায় আরও কিছুক্ষণ। ফ্রয়েড বলে গেছেন সভ্যতা যতই বিস্তৃত হবে, ততই মানসিক দ্বন্দ্ব ও উৎকণ্ঠার হার বৃদ্ধি পাবে এবং সেই সঙ্গে দেখা দেবে বিবিধ রতিসঙ্কট যেমন, ত্বরিতস্খলন, অঙ্গশিথিলতা, রতিজড়তা ইত্যাদি। বস্তুতঃ ফ্রয়েডের চোখে এটাই হল সভ্যতার সঙ্কট। ডিকিন্‌সন্‌ও প্রতি আটজনের মধ্যে একজনের ত্বরিতস্খলন হতে দেখেছেন। আর কিনসী অকালস্খলনের হার যে ক্রমশঃই বেড়ে চলেছে তার উল্লেখ করেছেন এবং এর একটা সুন্দর পথনির্দেশও দিয়েছেন।

কি ?—ত্বরিতস্খলনের আক্ষরিক অর্থে এটাই বুঝি যে অকালে রেতঃপাত। অর্থাৎ একটা স্বাভাবিক কাল নির্দিষ্ট করা আছে, এর আগে স্খলন হলেই বলব অকালস্খলন। এখন এই স্বাভাবিক কালের মাপকাঠি নিয়েই যত না বিপত্তি। এই 'কাল' এক পুরুষ থেকে অপর পুরুষে ভিন্ন। আবার এই একই সময় এক নারীর কাছে পর্যাপ্ত হলেও, অন্য নারীর কাছে প্রীতিপ্রদ না হতে পারে। তা হলে স্পষ্টই বোঝা গেল যে তথাকথিত কালের বিচারে ত্বরিতস্খলনের সংজ্ঞা নির্ণীত হতে পারে না। একটা উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার হয়ে যাবে :

এক রাজার কথাই ধরা যাক। রাজার দুই রাণী, সুয়োরাণী আর দুয়োরাণী। রাজার রতিস্থায়িত্ব দু মিনিট। এই দু মিনিটেই সুয়োরাণী তৃপ্ত। কিন্তু দুয়োরাণী কোনদিনই তৃপ্ত নয়। অর্থাৎ সুয়োরাণীর কাছে যেটা স্বাভাবিক, দুয়োরাণীর কাছে সেটাই হল অস্বভাবী অর্থাৎ অকালস্খলন।

সোজা কথায়, রতিকালের স্বাভাবিকতা কালনির্ভর নয়, সঙ্গিনীর তৃপ্তির মুখাপেক্ষী। সঙ্গিনীর তৃপ্তিলাভের পর পুরুষের যে স্খলন ঘটে সেটা কিন্তু অকালস্খলন নয়। এমন কি স্বামীর এক মিনিটে বীর্যপাতও ত্বরিতস্খলন নয় যদি এক-আধ মিনিটের মধ্যে স্ত্রীর রাগমোচন দেখা দেয়।

কালের সমস্যা বাদ দিলেও আরও দুটি প্রশ্ন আছে। একটি হল নারীর যৌনতা, অপরটি অকালস্খলনের পৌনঃপুনিকতা।

পুরুষের রতিস্থায়িত্ব পুরোদস্তুর স্বভাবী হয়েও শুধু নারীর দোষে অকাল-স্খলনের পর্যায়ে নেমে আসতে পারে। যেমনটি উপরিউক্ত দুয়োরাণীর ক্ষেত্রে ঘটেছে। দুয়োরাণী যদি সক্রিয় হতেন, নিজের দেহে যৌনতার জোয়ার এনে রাজাকে সাহায্য করতেন, রাজাকে ত্বরিতস্খলনের বদনাম কুড়ুতে হত না আর রাণীও তৃপ্তি পেতেন। অর্থাৎ কিনা নারী সংবেদী ও সক্রিয় না হলে, প্রতিটি পুরুষেরই (স্থায়িত্বকাল যতই বেশী হোক না কেন) বীর্যপাত হবে স্ত্রীর তৃপ্তির আগেই অর্থাৎ অকালস্খলন দেখা দেবে। সোজা কথায়, স্ত্রী যদি একটু সক্রিয় হয়, স্বামীকে ত্বরিতস্খলনের জন্যে আক্ষেপ করতে হয় না। এটা যে শুধু আমার মনের কথা তা নয়, ত্বরিতস্খলন সম্বন্ধে কিনসী রিপোর্টের সার কথাও তো এই। প্রসঙ্গতঃ বলে রাখি, অনিচ্ছা, নিষ্ক্রিয়তা ইত্যাদি স্বকীয় ত্রুটি হেতু স্ত্রী যদি রতিপ্রাপ্ত না হয়, ত্বরিতস্খলন বলে কিছু থাকে না। আর রাগমোচনে অক্ষমতা অর্থাৎ রতিজড়তার ক্ষেত্রে এপ্রশ্ন তো ওঠেই না।

সবশেষের প্রশ্নটি হল—পৌনঃপুনিকতা। স্ত্রীর কামতৃপ্তির আগেই পুরুষের স্খলন হতে পারে এবং হয়েও থাকে। তবে কিনা প্রতিটি রতিব্যাপারেই নয়, এই মাঝে মধ্যে। এবং এজাতীয় ঘটনমাত্রায় ৫০% পর্যন্ত ছাড় দেওয়া যেতে পারে (মাষ্টার্স ও জনসন)। এসবই স্বাভাবিক। কিন্তু এর চেয়েও অধিক হারে কিংবা প্রায় প্রতিটি মিলনেই এর পুনরাবৃত্তি ঘটলে পুরুষের স্খলনকাল নিঃসন্দেহে ত্বরিত পর্যায়ের। অর্থাৎ কিনা শতকরা পঞ্চাশ থেকে শতটি ক্ষেত্রে নারীর রতিলাভ নিষ্ফলা হবে, তবেই পুরুষকে ত্বরিতস্খলনকারী রূপে চিহ্নিত করা সম্ভব।

অতএব ত্বরিতস্খলনের যথার্থ সংজ্ঞা হল : শতকরা পঞ্চাশ বা ততোধিক মিলনে, কি প্রতিটি মিলনেই সংবেদী ও সক্রিয় নারীর পুলকলাভের আগেই পুরুষের স্খলন।

অপ্রকৃত ত্বরিতস্খলন—পুরুষের রতিস্থায়িত্ব স্বাভাবিক (এই দু পাঁচ মিনিট) হয়েও, স্ত্রীর নিষ্ক্রিয়তা কিংবা স্বামীর অজ্ঞতার ফলে অকালস্খলনের পর্যায়ে নেমে আসে। প্রথমটি হল তথাকথিত ত্বরিতস্খলন, দ্বিতীয়টি অপ্রকৃত। এবংবিধ ক্ষেত্রে, উপযুক্ত উপচার প্রয়োগে স্ত্রীকে সর্বতোভাবে যৌন উন্মুখ করে নিলে কিংবা স্ত্রী নিজে সক্রিয় হলে এই সময়ের মধ্যেই স্ত্রীর তৃপ্তি আসতে পারত। একারণেই, এটা প্রকৃত ত্বরিতস্খলন নয়।

প্রকৃত ত্বরিতস্খলন—স্ত্রীর তরফ থেকে সহযোগিতা ও সক্রিয়তা সবই এসেছে, স্বামীও উপচার যথাযথ প্রয়োগ করেছে, কিন্তু শুরুতেই স্খলন হয়ে যায়। অঙ্গসংযোগের আগে কিংবা অঙ্গসংযোগ করা মাত্রই, অঙ্গপ্রবেশের সময় কিংবা অঙ্গপ্রবেশ শেষে; অঙ্গচালনার সঙ্গে সঙ্গে কিংবা একটি কি দুটি কটিচালনার পরেই এই অকালস্খলন দেখা দেয়। স্বাভাবিক স্খলন কিন্তু এই সময়ে দেখা দেয় না, কিছু পরে। দ্বৈত অঙ্গচালনায় উভয়ের রাগ বিস্তৃত হয় কিছুক্ষণ, তার পর আসে রাগসঞ্চয়ন পর্যায়, তখন হয় স্বাভাবিক স্খলন। এটা স্ত্রীর কামতৃপ্তির সামান্য একটু আগে (অর্থাৎ বীর্যস্খলন পর্যায় শেষ হতে না হতেই স্ত্রীর তৃপ্তি দেখা দেবে) কিংবা কামতৃপ্তির সময় বা তার পরে, দেখা দেয়। অর্থাৎ এই স্বাভাবিক স্খলন হল শেষের শুরু। এই শেষের শুরুই প্রকৃত অকালস্খলনে নেই। এতে আছে শুরুতেই শেষ।

আপেক্ষিক ত্বরিতস্খলন—এই প্রকৃত অকালস্খলন আবার আপেক্ষিক হতে পারে। নিজ স্ত্রীর কাছে স্বামীর স্খলন স্বাভাবিক থেকেও পরস্ত্রীর কাছে অকালস্খলন হতে পারে। এটাই হল অকালস্খলনের আপেক্ষিক রূপ।

কেন এই ত্বরিতস্খলন?

রাগসঞ্চয়ন পর্যায় ঝড়ের মত বেগে ঘনিয়ে এলেই ত্বরিতস্খলন দেখা দেবে। নানাবিধ কারণে এটা সম্ভব, অঙ্গগত ত্রুটির জন্যে কিংবা মনোগত কারণে। অঙ্গীয় ত্রুটির জন্যে অকালস্খলন বড় একটা হয় না, অন্ততঃ আমি তো পঁচিশ বৎসরের অভিজ্ঞতায় আজ পর্যন্ত একটার বেশী দেখলাম না। অন্যান্য পণ্ডিতদের মতও তাই, তাঁরা এত কম দেখেছেন যে শতকরা একটি (১%) কি আরও কম ক্ষেত্রে আঙ্গিক ত্রুটির জন্যে অকালস্খলন হয় তা বলতে বাধ্য হয়েছেন। সোজা কথায়, অধিকাংশ (৯৯%) ত্বরিতস্খলনই মনোগত কারণে ঘটে।

অঙ্গীয় ত্রুটি—কোন কোন ত্বরিতস্খলনকারীর খেদ, শুক্র তরল বলেই স্বল্পকালের বেশী ধরে রাখা যায় না। এরকম একটা আগাম ভাবনা দেখি কোন কোন বিবাহেচ্ছু পুরুষেরও, শুক্রতারল্যের উৎকণ্ঠায়। এসবই ভুলে ভরা তথ্য, কারণ আকৃতি দেখে প্রকৃতি সম্পর্কে পূর্বাভাষ করা যায় না। এক কথায়, বীর্যের তরলতা ত্বরিতস্খলন ঘটায় না, ঘটাতে পারে না।

নার্ভতন্ত্র, এণ্ডোক্রিনতন্ত্র ও জনন-মূত্রতন্ত্রের কোন গোলযোগে অকালস্খলন হতে পারে। অত্যধিক দুর্বলতা বা অবসাদগ্রস্ততায়, দীর্ঘ রোগভোগে কিংবা অন্য কোন কারণে শরীরের ক্লান্তিতে নার্ভ ঝিমিয়ে পড়লে এটা হতে পারে। সিফিলিস প্রভৃতি ব্যাধিতে, কোন আঘাতে, কিংবা শ্রোণীদেশে দীর্ঘমেয়াদী

রক্তসঞ্চয়ের ফলে স্খলনকেন্দ্র ব্যাধিত কিংবা দুর্বল হলে এটা দেখা দেবে। গণোরিয়া কিংবা অন্য কোন কারণে জনন-মূত্রতন্ত্রের, বিশেষতঃ প্রস্টেট গ্রন্থি ও বীর্যস্থলীতে কোন প্রদাহ বা আঙ্গিক ত্রুটিতেও হবে। আর, পুরুষাঙ্গের (বিশেষতঃ লিঙ্গাগ্রের) অতিসংবেদনশীলতায়, মুদা কিংবা কোন রকম অস্বস্তিকর পরিবেশে (অর্শ, কৃমি, পরিপূর্ণ মূত্রস্থলী ইত্যাদি) এটা নাকি ঘটতে পারে। প্রস্টেট গ্রন্থির লাগোয়া মূত্রনালীপথের প্রদাহ কিংবা দীর্ঘমেয়াদী রক্তসঞ্চয়হেতু সংবেদনশীলতার কথা বলেছেন ম্যাক্স হুনার (Huhner) প্রমুখ কেউ কেউ। লিঙ্গাগ্রের স্পর্শকাতরতার উল্লেখ করেছেন অনেকেই। প্রথমটি কোন কোন ক্ষেত্রে সত্য হলেও, দ্বিতীয়টির সত্যতায় অনেকেরই অবিশ্বাস। ত্বরিতস্খলনের শাপমুক্তি শুধু লিঙ্গত্বক্‌ছেদনেই সম্ভবপর নয় বলেই, সংবেদনশীলতার মতবাদে কেনেথ ওয়াকার, লোভেনস্টাইন, মাস্টার্স ও জনসন, পিল্লে প্রমুখ যৌন পণ্ডিতদের আদৌ কোন আস্থা নেই। আমাদেরও তাই।

মানসিক ত্রুটি—এত অজস্র ও এত বিচিত্র মানসিক কারণে অকালস্খলন হতে পারে যে প্রত্যেকটির আলোচনা করতে গেলে একটা মহাভারত রচনা করতে হয়। তবুও সংক্ষেপে এদের উল্লেখ করছি :

প্রচণ্ড উত্তেজনা—দ্রুত রেতঃপাতকারীরা প্রায়ই বলে থাকেন প্রচণ্ড উত্তেজনার জন্যেই এমনটি ঘটছে। এই দ্রুততা কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রেই অতি উত্তেজনার জন্যে নয়, এটা মনোবিদ্‌গণের মতে মানসিক ভীতি বা উৎকণ্ঠারই বহিঃপ্রকাশ। কেননা প্রচণ্ড উত্তেজনার জন্যে অকালে স্খলন এক-আধ দিন হতে পারে। কিন্তু দিনের পর দিন হবে কেন? ফ্রয়েডীয় মতে, পূর্বসুখের মাত্রা বেশী হয়েছে বলেই অন্ত্যসুখের মেয়াদ কমে এসেছে অর্থাৎ স্খলন ত্বরিত হয়েছে। এবং এরও কারণ প্রচণ্ড উত্তেজনা নয়, সেই মানসিক ভীতি বা উৎকণ্ঠাই।

ব্যতিক্রম শুধু একটিই। প্রবলভাবে কামোত্তেজিত, অবিরত কামাঙ্কুশবিদ্ধতায় অস্থির পুরুষের ত্বরিতস্খলন হতে পারে। যেমন, বিয়ের পর কয়েক সপ্তাহ। এই একই কারণে প্রথম যৌন অভিজ্ঞতায়, নতুন কামপাত্রী সংস্পর্শে, দীর্ঘ রতিবিরতির পর, এবংবিধ কয়েকটি ক্ষেত্রে প্রথম কয়েকবার দ্রুত স্খলন হতে পারে। রতিভুবনে হঠাৎ চঞ্চলতা ক্রমশঃ থিতিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে স্থায়িত্বও স্বাভাবিক রূপটি ফিরে পাবে, একই রাত্রে দ্বিতীয়-তৃতীয় মিলনে কিংবা পরবর্তী দিনগুলিতে রতিব্যাপার অধিককাল স্থায়ী হয়। অবশ্য শুরুতেই যদি কোন ভয় বা উৎকণ্ঠা জাঁকিয়ে বসে (অতি দ্রুত রেতঃপাত হচ্ছে, সুতরাং

নিশ্চয়ই কোন ত্রুটি আছে, একথা ভাবতে ভাবতে) অন্য কথা। তখন এই ভয় বা উৎকণ্ঠাই ত্বরিতস্খলন জিইয়ে রেখে দেবে। নিম্নোক্ত কেস বিবরণীই একটি সুন্দর উদাহরণ—

"বয়স ২৬। দু মাস বিয়ে করেছি। বিয়ের আগে ১৮ বৎসর বয়স থেকে নিয়মিতভাবে আত্মরতির সাহায্যে যৌন উত্তেজনা মিটিয়ে এসেছি। এখন স্ত্রীমিলনে আমার এক মস্ত বাধার সৃষ্টি হয়েছে। কিছুক্ষণ শৃঙ্গার করার পর অঙ্গপ্রবেশ করানোর মুহূর্তেই বা করাতে না করাতেই বীর্যপাত হয়ে যায়। এব্যাপারে মনটা আমার অত্যন্ত খারাপ। আমার মনে হয়, অতদিন ধরে পাণিমেহন করারই ফল এটা।"

অস্থানে, কুস্থানে—যৌন অনুষ্ঠানে স্থানের প্রভাব আছে। পরিবেশ সুন্দর ও অনুকূল হবে ; স্থানটি নির্জন, গোপন, সুরক্ষিত হবে, এক কথায় মনোরম ও প্রীতিপ্রদ হবে। এদের, কোন একটির অভাবে, অর্থাৎ অ-সুন্দর (বেশ্যালয়) ও প্রতিকূল (অরক্ষিত স্থানে) পরিবেশে অকালস্খলন হামেশাই ঘটে।

অসময়ে—সুসময়ে সকলেই বন্ধু হয়, স্খলনকালও প্রীতিপ্রদ হয়। তাই অসময়ে অকালস্খলন যে হবে এটা আর বিচিত্র কি ? উত্তেজনার জোয়ার নেই, সারা দিনের ক্লান্তিতে দেহ অবসন্ন, অনিচ্ছায় জোর করে, শুধু স্ত্রীর তাগিদে মিলনে রত হলে, অকালস্খলন না হওয়াটাই আশ্চর্য। রতিতৃপ্তির জন্যে ভাল মেজাজের প্রয়োজন। তাই দিনের দুশ্চিন্তা, কর্মস্থলের দুর্ভাবনা, আর্থিক সমস্যা ইত্যাদির ফলে কিংবা অন্য কোন কারণে খোশমেজাজের অভাব ঘটলে অকাল-স্খলন হবে। একটা ঘটনা বলি শুনুন :

"একদিন এক যুবক, অকালস্খলনের অভিযোগ নিয়ে আমার কাছে এলেন। পরীক্ষায় কিছুই পাওয়া গেল না। মনটাও দেখি পরিষ্কার আর স্থান-কাল-পাত্রের কোন রকম শয়তানিও নেই। অথচ একমাস ধরে ত্বরিতগতিতে বীর্যপাত হয়ে চলেছে। শেষে জানা গেল, মাস খানেক আগে একটা মোটা অঙ্কের টাকার লোকসান হয়েছে, দুঃখ ভোলবার জন্যে ইনি সস্ত্রীক দার্জিলিং চলে গেলেন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সজ্ঞান মনের দুঃখ ভুলিয়ে দিলেও অন্তর্জ্ঞান মনে এই দুঃখ ঠিকই ছিল। এরই ফলে অকালস্খলন হত। যা হোক, কিছুদিনের মধ্যেই ঐ লোকসান লাভের অঙ্কে পুষিয়ে গেল। তখন কিন্তু এই দুর্ভোগ ছিল না।"

কামপাত্রীর সহযোগিতা—স্থান ও কালের মত পাত্রীভেদেও স্খলন এগিয়ে যেতে পারে, বিলম্বিত হতে পারে। নতুন কামপাত্রী, প্রথম মিলন

প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রচণ্ড উত্তেজনার দরুন যে অকালস্খলন হতে পারে তা পূর্বেই বলেছি। এখন বলব, পাত্রীর কাছে আশানুরূপ সাড়া না পেলে, পাত্রী অসহ-যোগী ও নিষ্ক্রিয় হলে কিংবা কোন কারণে পাত্রীতে ঘৃণা বা বিরাগ সঞ্জাত হলেও এটা হতে পারে। আমার পরিচিত এক দম্পতির কথাই বলছি, স্ত্রী যেদিনই অসহযোগী হবে, স্বামীর ঠিক সেদিনই অকালস্খলন হবে। তাই না স্টেকেল বলেছেন: স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সত্যিকারের প্রেম ও অনুরাগ থাকলে, স্বামীর কখনই ত্বরিতস্খলন হবে না।

ভয়ে ভয়ে—ত্বরিতস্খলনের আরেকটি বন্ধু হল ভয়। তাই ভয়ে ভয়ে মিলিত হলে অকালস্খলন যে হবে তা সুনিশ্চিত। রতিবাহিত ব্যাধির ভয়ে বেশ্যালয়ে অনেকেরই ত্বরিতস্খলন হয়। লোকনিন্দার ভয়ে বিবাহেতর সংসর্গ প্রায়ই তিক্ত অভিজ্ঞতায় ভরা। ধরা পড়ার ভয়ে কিংবা গর্ভভয়ে অনেক প্রাক্-বিবাহ মিলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। দাম্পত্য জীবনে গর্ভভয়ে স্বামীর ত্বরিতস্খলন ও স্ত্রীর রতিজড়তা দেখা দিতে পারে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, গর্ভরোধক পদ্ধতিতেও (যেমন খণ্ডিত সুরত) এমনটি হতে পারে। নিছক যক্ষ্মা রোগের ভয়ে অকালস্খলন হতে দেখেছি: স্ত্রীর দেহে টি. বি. রোগের বীজাণু যেদিন ধরা পড়ল সেদিন থেকেই শুরু হল স্বামীর দুর্ভোগ।

উপরিউক্ত ক্ষেত্রগুলিতে দেহ চায় সম্ভোগ কিন্তু মন চায় এড়িয়ে যেতে। এদেরই আপস রফা হল—যত তাড়াতাড়ি শেষ হয় ততই মঙ্গল। তাই অকালস্খলন।

যৌনাতঙ্ক ও হীনমন্যতা—কোন যৌন-আতঙ্ক (শুক্রক্ষয়জাত পরিণাম চিন্তা), কোন যৌন ভীতি (ক্ষুদ্র অঙ্গ ইত্যাদি), কোন যৌন সংশয় (এবারেও হয়ত অকালে স্খলন হবে) কিংবা নারীভীতি (স্ত্রীকে তৃপ্তি দিতে পারব না) প্রভৃতি হীনভাব পোষণে অনেক ত্বরিতস্খলন ঘটে। নানান কারণে এই হীনমন্যতার সৃষ্টি হতে পারে। প্রাক্‌বিবাহ, বিবাহোত্তর কিংবা বিবাহেতর অবৈধ যৌন অভিজ্ঞতার তিক্ততার ফলেই এর জন্ম। অঙ্গের মাপ, অঙ্গের দৃঢ়তা ও রতিকালের স্থায়িত্ব প্রভৃতি কোন একটিতে সংশয় জাগে। ক্ষুদ্র অঙ্গের জন্যে কোন নারী বিদ্রূপ করে, তৃপ্তির অভাবে কেউবা পৌরুষত্বে খোঁচা দেয়। কোথাও পুরুষ, নারীর অতৃপ্তির জন্যে, মরমে মরে কিংবা বিশালবপু নারীকে দেখে ভয়েই জড়সড় হয়ে পড়ে। একটা ঘটনা বলি:

"দুই বৎসর হল বিয়ে করেছি। স্ত্রী আমার চেয়ে এক বৎসরের বড়। লম্বায় ও চওড়ায় সে আমার চেয়ে অনেক বড়। আমি যেন তার কাছে

নেহাতই বাচ্চা। বীর্যস্খলন খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যেত বলে তাকে কোনদিন সুখী করতে পারিনি, এনিয়ে স্ত্রী আমাকে খুবই ঠাট্টা বিদ্রূপ করে।"

অর্থাৎ কোনও একটা কারণে যৌন ব্যাপারে হীনমন্যতা দেখা দেয়, মনে জাগে আত্ম-সংশয়, যৌন ক্ষমতায় সন্দেহ। ফলে মিলনের শুরুতে বা মিলন-কালে দেখা দেয় 'আত্ম-জিজ্ঞাসা'। এটাই গ্রাস করে যৌন সত্তাকে, আংশিক-ভাবে বা পরিপূর্ণভাবে। এই খণ্ডগ্রাসেরই বহিঃপ্রকাশ হল অকালস্খলন, পূর্ণগ্রাস হলে পুরুষত্বহীনতা। তখন সংশয় পাকাপোক্ত হয়; জিজ্ঞাসার জবাব মেলে 'আত্মনিরীক্ষা'-য়। তার পর থেকে শুরু হয় আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্মনিরীক্ষার সহাবস্থান বা পারস্পরিক সহযোগিতা, দেখা দেয় অকালস্খলনের দুষ্টচক্র।

পাপবোধ—নিছক পাপবোধের জন্যেও ত্বরিতস্খলন হতে পারে। নিম্নোক্ত ঘটনা দুটিই এর প্রমাণ :

(১) "বয়স ২৪, অবিবাহিত, স্থানীয় কোন কলেজের ছাত্র। ১৪ বৎসর থেকে হস্তমৈথুনে অভ্যস্ত। তখন থেকেই মাসে ৪।৫ বার, কি আরও কম বেশী, করে আসছি। অদ্যাবধি কোন নর বা নারীর সঙ্গলাভ করিনি। হস্তমৈথুন কিন্তু আজও ছাড়তে পারিনি। আজকাল এটা ক্ষণস্থায়ী হয়ে গেছে। ইদানীং বীর্য স্খলিত হতে ১ মিনিট সময়েরও প্রয়োজন হয় না। কিছুদিন পরেই বিয়ে হবে। কি করে বীর্যধারণ করতে পারব জানাবেন।"

(২) "স্ত্রী যখন আটমাসের গর্ভবতী, তখন বাপের বাড়ী চলে যায়। স্ত্রীবিরহে প্রথম প্রথম খুবই কষ্ট হত। পরে থাকতে না পেরে কয়েকবার বেশ্যালয়ে যেতে বাধ্য হই। প্রসবের ৪।৫ মাস পরে স্ত্রী ফিরে আসে। এখন কিন্তু স্ত্রীমিলনে রত হওয়া মাত্রই বীর্যপাত হয়ে যায়। পূর্বে এমনটি কখনও হয়নি।"

অসামাজিক কার্যকলাপকে (তা যে ব্যাপারেই হোক না কেন) লোকে বলে পাপ। আর পাপ করলেই একটা না একটা শাস্তি পেতে হয়, এও প্রত্যেকেরই জানা। লেখাপড়া শিখে মানুষ পাপপুণ্যের মোহ অনেকটা (সজ্ঞানে) কাটিয়েছে কিন্তু নির্জ্ঞান মন সেই আদিমই থেকে গেছে। তাই মন নিজের শাস্তি নিজেই মাথা পেতে নেয়। এরই বহিঃপ্রকাশ হল ত্বরিতস্খলন।

একারণেই আদর্শ ও বিবেকবিরুদ্ধ যৌন ক্রিয়ায় (যেমন পাণিমেহন), অবৈধ ও অসামাজিক সংসর্গে (কুমারী মিলন, শিক্ষকছাত্রী মিলন ইত্যাদি)

এবং প্রাক্‌বিবাহ ও বিবাহেত্তর মিলনে (বেশ্যাগমন, পরস্ত্রীগমন ইত্যাদি) প্রায়ই অকালস্খলন ঘটে।

মানসিক অসুস্থতায়—নির্জ্ঞান মনের ভয়, ঘৃণা, কামজ অন্তর্দ্বন্দ্ব, যৌন-ঈর্ষা ও যৌন-প্রতিহিংসার ফলেও অকালস্খলন হতে পারে। কার্ল আব্রাহাম নির্জ্ঞান মনের ঘৃণা থেকে সঞ্জাত মূত্রনালীপথের সংবেদনশীলতার জন্যে ত্বরিত-স্খলন হওয়ার কথা বলেছেন। ক্ষুব্ধ কুপিত শিশু যেমন নিশীথের শয্যামূত্রে কিংবা স্বেচ্ছাকৃত মূত্রত্যাগে মায়ের কাপড় ভিজিয়ে দিয়ে মাকে জব্দ করতে চায়, পুরুষের ত্বরিতস্খলন ব্যাপারটাও ঠিক তাই, এভাবে স্ত্রীর গোপনাঙ্গ নোংরা করতে চায়। ক্রুদ্ধ শিশুর মতন, পুরুষও অকালস্খলনের মারফত নারীকে উপেক্ষা করে, রতি-বঞ্চিত করে শাস্তি দেয়। এক কথায় মানসলোকে কোন সংবন্ধন কিংবা কোন নিষেধপ্রভাব কার্যকরী থাকলে ত্বরিতস্খলন হবে। যেমন, সঙ্গিনীর প্রতি গভীর ঘৃণা, বিদ্বেষ। সঙ্গিনীকে পরিহার বা অস্বীকার করার মত গোপন চিত্তবৃত্তি। ধর্ষকামমূলক রূপকল্পনা। এসবই পুরুষকে ঠেলে দেবে ত্বরিতস্খলনের দিকে। আর কোন কামবিপর্যয়, কোন যৌন বিকৃতি কিংবা কোন মানসিক ব্যাধিতে এটা তো হতেই পারে।

ত্বরিতস্খলনের দুষ্ট চক্র

অনেকেরই ধারণা উত্তেজনার আতিশয্যে ত্বরিতস্খলন ঘটে। কোন কোন ক্ষেত্রে, যেমন বিয়ের পর, প্রথম যৌন অভিজ্ঞতায়, এটা সত্য হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এটা অতি উত্তেজনার জন্যে নয়। শতকরা ৯৯টি ক্ষেত্রেই এর জন্যে দায়ী কোন না কোন ভয় বা উৎকণ্ঠা। মানসলোকে কোন যৌন ভীতি, কোন নিষেধপ্রভাব কিংবা কোন সংবন্ধন কার্যকরী থাকে বলেই এটা ঘনিয়ে আসে। কখন লোকনিন্দা, গর্ভ বা রোগ ভয়ে মিলন এড়িয়ে যাওয়ার, কখন স্থান-কাল-পাত্রের শয়তানিতে মিলনে ঘোর অনিচ্ছাই ত্বরিতস্খলনরূপে আত্মপ্রকাশ করে। কখন হীনমন্যতা বা যৌনাতঙ্ক, কখনবা গভীর মনের অসুস্থতার পরিচায়ক।

পূর্বেই বলেছি, যৌন অনুষ্ঠান মস্তিষ্ক ও নার্ভতন্ত্রের অধীন। এরা অতি মাত্রায় সংবেদনশীল। তাই প্রথম খণ্ডে ১০৩ পৃষ্ঠায় চিত্রিত নার্ভতন্ত্রের কোন একটি স্তরে বিন্দুমাত্র রাহুর ছায়া দেখতে কিংবা ভয়ের কোন পদধ্বনি শুনতে পেলেই, এই স্বাভাবিক প্রক্রিয়াটি বেঁকে বসে, অঙ্গোত্থান সুদৃঢ় হয় না আর অকালে বীর্যস্খলন দেখা দেয়। তখন দেখা দেয় সংশয়; মনে মনে দুশ্চিন্তা, উৎকণ্ঠা আর উদ্বেগের তোলপাড় শুরু হয়। এরই ফলে শুরু হয় আত্মজিজ্ঞাসা। দিনরাত ঐ চিন্তা। শেষে এই চিন্তাই আপনাকে খুন করবে। তার পর এই

চিন্তাকে (ভয়কে) পিছনে রেখে, যৌন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শক্তিপরীক্ষা। ফলে যা ঘটবার তাই ঘটে, পুনরায় অকালস্খলন। এই আত্মনিরীক্ষায় ভয়টি আরও দৃঢ়মূল হয়ে ওঠে। যতই ভয় ততই অকালস্খলন আর যতই অকালস্খলন হয় ততই ভয়টা পাকাপোক্ত হয়।

ত্বরিতস্খলন—ভয়—(আত্মজিজ্ঞাসা)—পুনরায় দ্রুত স্খলন (আত্মনিরীক্ষা) —আরও ভয়—আরও অকালে স্খলন—এভাবে একটা দুষ্ট চক্র গড়ে ওঠে।

একটা উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার হয়ে যাবে। দ্রুত স্খলন হচ্ছে এমন এক যুবকের যৌন জীবন আলোচনা করা যাক। ইনি ১৪ থেকে ২৬ বৎসর বয়স পর্যন্ত পাণিমেহন বা অন্য উপায়ে বীর্যপাত করেছেন। দাম্পত্য জীবনে এটা যে ক্ষতিকারক সে ধারণাও বদ্ধমূল করেছেন। এমন অবস্থায় বিয়ে করলেন। এক নিদ্রাবিহীন রাত্রে স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হলেন। ২৬ বৎসরের দীর্ঘ যৌন জীবনে স্ত্রীই হলেন প্রথম নারী। তাই গভীর উত্তেজনায় মেতে উঠলেন। কিন্তু মিলনের আনন্দটুকু যেন হঠাৎ ফ্যাকাসে হয়ে গেল ত্বরিত-স্খলনের জন্যে। এই দ্রুতস্খলন যে স্বাভাবিক এবং কিছুদিনের মধ্যেই এটা যে ঠিক হয়ে যাবে তা ভাবলেন না। উল্টে, ভেবে শিউরে উঠলেন—"সর্বনাশ হয়েছে। লোকে হস্তমৈথুন সম্বন্ধে যা বলত তাই ফলতে চলল দেখছি। কেন তখন তাদের কথা শুনিনি। এখন দেখছি এই দীর্ঘকালীন হস্তমৈথুনের বিষময়

১ নং ছবি—ত্বরিতস্খলনের দুষ্ট চক্র
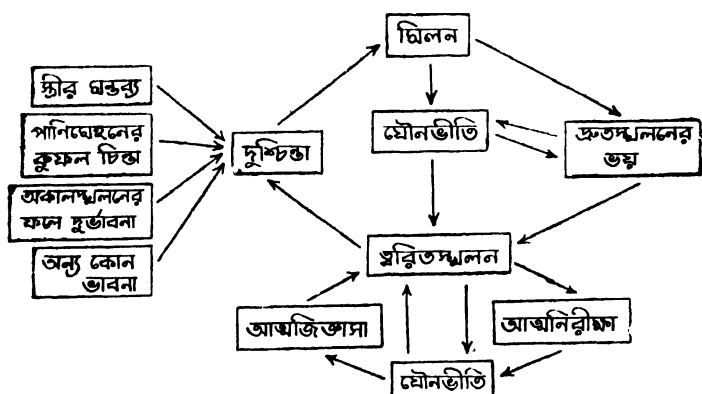
পরিণাম এই ত্বরিতস্খলন।" ফলে ভয়টা জাঁকিয়ে বসল। দ্বিতীয় মিলনের ঠিক পূর্বে শুরু হল এই দুশ্চিন্তা—যদি এবারেও অঙ্গসংযোগমাত্র স্খলন হয়ে

যায়। যদি হয়ে যায়, যদি হয়ে যায় ভাবতে ভাবতে সেবারেও ত্বরিতস্খলন হল। ফলে হল কি, ভয়টা আরও জাঁকিয়ে বসল। আর এই ভয়টাকে পাকাপোক্ত করতে সাহায্য করল পাণিমেহনের কুফল চিন্তা আর স্ত্রীর মন্তব্য। এমনি করেই যত দ্রুতস্খলন হতে লাগল ততই ভয় দুটি দৃঢ়মূল হতে থাকল (১নং ছবি দেখুন)। শেষে দুষ্ট চক্রের আবির্ভাব :

ভয়—মিলন—দ্রুতস্খলন—আরও ভয়—আরও অকালে স্খলন—আরও ভয়। তাই যুবকটি যখনই শৃঙ্গার শুরু করেন তখন থেকেই এই দুষ্ট চক্রের অদৃশ্য প্রতিক্রিয়া চলতে থাকে যার জন্যে অঙ্গসংযোগের সময় বা অঙ্গপ্রবেশ করতে না করতেই বীর্যস্খলন হয়ে যায়। এই দুষ্ট চক্র আর বেশীদূর এগিয়ে গেলে কিংবা বেশীদিন কার্যকরী থাকলে, আংশিক বা পূর্ণ পুরুষত্বহীনতা দেখা দিতে পারে।

প্রতিকারের উপায়

রাগসঞ্চয়ন পর্যায়ের মাত্রাটা কিছুক্ষণের জন্যে কমিয়ে রাখতে কিংবা এর গতিবেগ শ্লথ করে দিতে সক্ষম হলেই ত্বরিতস্খলন হবে না। নিম্নলিখিত নানাবিধ উপায়ে এটা সম্ভব। যে উপায়েরই আশ্রয় নেওয়া হোক না কেন, মনের প্রত্যয় ফিরিয়ে আনাটাই এদের মূল লক্ষ্য।

১। আশু চিকিৎসা—কেউ ত্বরিতস্খলনের সঙ্গে আপস রফা করে স্বচ্ছন্দে জীবনটা কাটিয়ে দেয়। ত্বরিতস্খলনহেতু কোন গ্লানি, কোন ব্যর্থতা এদেরকে স্পর্শ করতে পারে না, বিশেষ করে স্ত্রী যদি কামশীতল হয়। এঁরা ভাগ্যবান। কিন্তু অধিকাংশই ত্বরিতস্খলনে মর্মাহত। ত্বরিতস্খলনের ফলে যে দুটি উৎকণ্ঠা দেখা দেয় তারাই সবচেয়ে বেশী ক্ষতি করে। একটি হল নিজের যৌন ক্ষমতায় সন্দেহ, অপরটি স্ত্রীর কামতৃপ্তি ব্যাপারে জিজ্ঞাসা কিংবা স্ত্রীর একনিষ্ঠতায় সন্দেহ। এই উৎকণ্ঠা দুটির জন্যেই দ্রুততার উপশম হয় না, অকালে স্খলন হয়েই চলে। ফলে দুর্ভাবনা আরও বেড়ে যায়, এরই ক্রমপরিণতি হল অঙ্গশিথিলতা, তার পর আরও বেশী শিথিলতা, শেষে সম্পূর্ণ পুরুষত্বহীনতা। এমনটি হতে পারে বলেই স্ত্রী যখন বিদ্রোহ করে (কটু মন্তব্য, কিংবা মিলনে আপত্তি) কিংবা অঙ্গশিথিলতার আভাস দেখা দেয় তখন চিকিৎসার জন্যে ছোটাছুটি না করে ত্বরিতস্খলনের শুরুতেই চিকিৎসার চেষ্টা করা উচিত। অনেক দেরিতে চিকিৎসা শুরু করলে অঙ্গশিথিলতা বা পুরুষত্বহীনতা কিংবা স্ত্রীর অহেতুক খেদ বা রতিজড়তার মুখোমুখি হতে হয় আর আরোগ্যলাভের জন্যে সময়ও লাগে অনেক। অতএব রতিবিপর্যয়ে আশু চিকিৎসাই চিরবাঞ্ছনীয়।

ত্বরিতস্খলন কোথায় স্বাভাবিক এবং কোথায় অস্বাভাবিক তা জানতে

হবে। স্বাভাবিক ক্ষেত্রগুলিতে (যেমন রতিব্যাপারে প্রথম অভিজ্ঞতায়, দীর্ঘ বিরতির পর পুনর্মিলনে, প্রচণ্ড উত্তেজনায়) এটাকে সহজচিত্তে মেনে নিতে হবে। বিবাহোত্তর মধুযামিনীতেও তাই। বিয়ের পর একমাসের মধ্যে এটা আপনাআপনিই ঠিক হয়ে যাবে। অন্যথায় অবশ্যই যৌনশাস্ত্রবিদ্ ডাক্তার দেখাবেন। দিনের পর দিন একনাগাড়ে ত্বরিতস্খলন হওয়াটা স্বাভাবিকতার লক্ষণ নয়। বিশেষতঃ অঙ্গসংযোগের পূর্বেই বীর্যপাত হলে। শেষোক্ত ক্ষেত্রে আশু চিকিৎসা বাঞ্ছনীয়। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে 'বিলম্বিত লয়ে রাগসঞ্চার' পদ্ধতি প্রয়োগের তিন মাসের মধ্যে কোন উপকার না পেলে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে। মনে রাখবেন, চিকিৎসা ব্যাপারে যতই দেরি করবেন ততই নিজের সর্বনাশ ডেকে আনবেন আর সারতে ততই কষ্ট হবে।

২। **দুষ্ট চক্রের বিষদাঁত ভেঙ্গে দিতে হবে।** দুষ্ট চক্রের আবর্তন রোধ করতেই হবে। এর জন্যে চাই দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় আর দৃঢ় আত্মবিশ্বাস। কোন ভাবনা, কোন ভয় থাকলে সব পণ্ডশ্রম হবে। ধৈর্যের সঙ্গে আস্তে আস্তে এগিয়ে যেতে হবে। সব সময়ই মনটাকে রাঙিয়ে রাখতে হবে। কোন সময়েই ব্যর্থতার কথা ভাবলে চলবে না। এরকম দুর্ভাবনা মনে এলেই বুক ভরে নিশ্বাস নেবেন আর ভাববেন—'আমার রতিস্থায়িত্ব এত অল্প নয়। আমি স্ত্রীকে নিশ্চয়ই তৃপ্তি দিতে পারব।' আর একবার বিফল হলেই হাল ছেড়ে দিলে চলবে না। একবারে না হলে পরের বারে, পরের বারে না হলে তার পরের বারে সাফল্যলাভ করব এ-আশা রেখে এগুতে হবে। মন থেকে সব রকমের ভয় ভাবনা মুছে ফেলতে হবে, বিশেষ করে মিলনের পূর্বে। আর স্ত্রীকেও আদরে সোহাগে স্বামীর ভয় ভাবনা ভুলিয়ে দিতে হবে। সোজা কথায় ঐ দুষ্ট চক্রের প্রধান নায়ক যৌন ভীতির হাত থেকে রেহাই পেতেই হবে। আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে হবে। রবার্ট ব্রুস যদি পারেন, আপনিই বা পারবেন না কেন?

৩। **বিলম্বিত লয়ে রাগসঞ্চার**—দ্রুত রেতঃপাতকারীদের জন্যে মিলনের স্বতন্ত্র রীতিনীতি আছে। মৎ প্রবর্তিত এই নিয়ম মতে অনেক ক্ষেত্রেই আশাতীত সাফল্য পাওয়া যায়।

● মিলনপূর্বে মনে কোন রকম উৎকণ্ঠা বা দুর্ভাবনা ঘেঁষতে দেবেন না। অর্থাৎ মন থেকে সব ভয় ভাবনা মুছে ফেলে স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হতে হবে। বুক ফুলিয়ে নিশ্বাস নিন আর সাফল্যের বিজয়গর্বে উল্লসিত হতে সচেষ্ট হোন। অর্থাৎ এবারে যে সফল হবেন তা ভাবতে থাকুন।

● সুরতোপযোগী অবস্থা থাকা চাই। অনিচ্ছার জের টেনে কোনদিনই মিলনে লিপ্ত হবেন না। ক্লান্তি, অবসাদ, দুশ্চিন্তা অথবা কোন সমস্যায় জর্জরিত হয়ে আসরে নামবেন না। কোন কারণে যৌন ইচ্ছার ঘাটতি হলে জোর করে জোয়ার আনবার চেষ্টা করবেন না। স্থান, কাল ও পাত্রীর সৌরভে আকৃষ্ট হয়ে যৌন কামনা উদ্দীপ্ত না হয়ে ওঠা পর্যন্ত মিলন স্থগিত থাকবে।

● মিলনপূর্বে মূত্রত্যাগ বাঞ্ছনীয়।

● শৃঙ্গারকালে অত্যধিক উত্তেজিত হবেন না, মিলনকালেও তাই। বেশী মাত্রায় উত্তেজিত হয়ে পড়লে, সবই পণ্ডশ্রম।

● রতিকালে যতদূর সম্ভব নিষ্ক্রিয় থাকবেন—নীরব সাক্ষীগোপালের মত। সবসময়েই স্ত্রীকে সক্রিয় হতে অনুরোধ করবেন। স্ত্রীকেই উত্তেজিত হতে হবে এবং শৃঙ্গারের ভার স্ত্রীকেই নিতে হবে।

● পূর্ণ ও দৃঢ় উত্থান না হওয়া পর্যন্ত অঙ্গসংযোগ নিষিদ্ধ।

● উপযুক্ত শৃঙ্গার প্রয়োগ করতে করতে স্ত্রী যখন বেশ খানিকটা উত্তেজিত হয়ে পড়বেন তখন, মুখোমুখি ও পাশাপাশি শায়িত অবস্থায়, পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ স্ত্রীর যোনিনাসা বা ভগাঙ্কুরে স্থাপন করতে হবে। এভাবে কিছুক্ষণ (৩-৫ মিনিট) অঙ্গযুক্ত থাকার লাভ আছে অনেক। এতে নিজের আত্মবিশ্বাস ফিরে আসে—কই অঙ্গসংযোগমাত্রই তো স্খলন হল না? তা হলে আমিও দীর্ঘমেয়াদী স্থায়িত্ব ফিরে পাব, এই ভেবে আত্মতৃপ্তি, তথা আত্মপ্রত্যয় আসবে।
এভাবে উপচার প্রয়োগের ফলে স্ত্রী আরও উত্তেজিতা হবেন ও প্রচুর সুখানুভব করবেন, এমন কি পূর্ণ বা আংশিক তৃপ্তিও পেতে পারেন।

● তার পর, যোনিমুখে পুরুষাঙ্গ সংযোগ। আর কিছুই নয়, শুধুই সংযোগ। এভাবে কিছুক্ষণ (২-৪ মিনিট) অঙ্গযুক্ত থাকার পর পুরুষাঙ্গের সামান্য একটু অংশ (এক ইঞ্চির মত) স্ত্রীঅঙ্গে প্রবেশ করাতে হবে। চুপচাপ এই অবস্থায় থাকুন। ভুল করেও উত্তেজিত হবেন না বা নিতম্বচালনা করবেন না। আর মনটাকে সাফল্যের বুলি শুনিয়ে চাঙ্গা করুন। এমনি করে খুব আস্তে আস্তে এবং একটু একটু করে পুরুষাঙ্গ প্রবেশ করাতে হবে। এভাবে সমস্ত অঙ্গ-প্রবেশের জন্যে ৫ থেকে ১০ মিনিট সময় লাগবে। এর মধ্যে যদি দেখেন বীর্য স্খলিত হওয়ার উপক্রম হয়েছে, জোরে জোরে দীর্ঘনিশ্বাস নিতে থাকুন, গুহ্যদ্বার প্রসারিত করুন, আর নিশ্চল নিশ্চুপ হয়ে পড়ে থাকুন। অর্থাৎ সমস্ত দেহটাকে শ্লথ করে দিন, উত্তেজিত হলে মনটাকে অন্য খাতে বইয়ে দিন আর যৌন অঞ্চল শিথিল করে দিন। এজন্যেই জোরে জোরে নিশ্বাস নেওয়া আর নীচের

দিকে কোঁত দেওয়া। কিন্তু ভুলেও ঠোঁট কামড়ে, মুঠি চেপে ধরে শক্ত হওয়া নয়, গুহ্যদ্বারের সংকোচন নয়, এদুয়ের যোগাযোগ ঘটলেই বীর্য বেরিয়ে আসবে।

● কিংবা অঙ্গপ্রত্যাহার করে পীড়িতক পদ্ধতিরও আশ্রয় নিতে পারেন। এটা স্ত্রীকৃত্য, অতএব স্ত্রীকেই এব্যাপারে অগ্রণী হতে হবে। আর স্ত্রী যদি বেঁকেই বসেন, স্বামীর হস্তক্ষেপ ছাড়া উপায় কী।

স্খলনাবেগ নিবারণের জন্যে এটাই সবচেয়ে ভাল পথ ও সবচেয়ে কার্যকরী উপায়। এ-পদ্ধতির আবিষ্কর্তা জেমস সীমানস, ১৯৫৯-এ। হস্তকৃত লিঙ্গাগ্র-পীড়নই এ-পদ্ধতির মূলমন্ত্র। প্রথমেই যথাযথ অঙ্গুলিযোজনা। এই উদ্দেশ্যে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ স্থাপিত হবে লিঙ্গাগ্রের তলদেশে, ঠিক যেখানে অগ্রচ্ছদা-সংযোজক (ফ্রেনাম) আছে, সেখানে। উপরিভাগে থাকবে তর্জনী ও মধ্যমা পাশাপাশি, লিঙ্গমুকুটের শেষ প্রান্তে তর্জনী আর লিঙ্গগ্রীবায় মধ্যমা (২নং ছবি দেখুন)।

তার পর এই তিন আঙুল দিয়ে একই সঙ্গে চাপ দিতে হবে লিঙ্গাগ্রে, তিন-চার সেকেণ্ড কাল পর্যন্ত, এর বেশী নয় কিন্তু। এবং একটু জোরেই চাপ দিতে
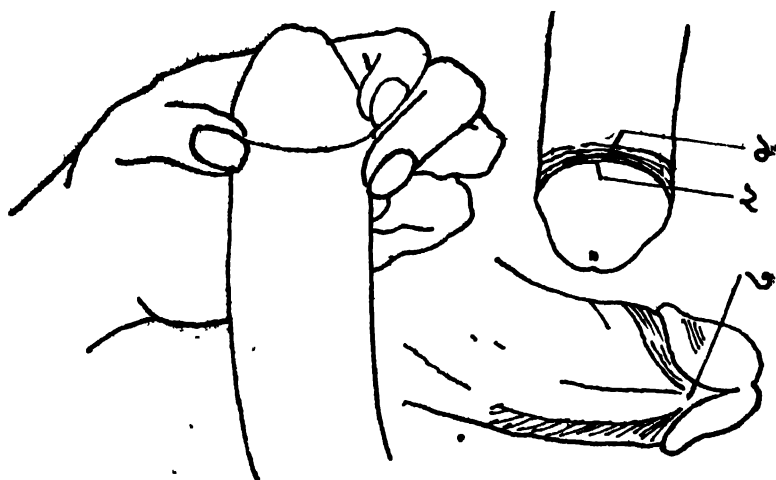
২ নং ছবি—পীড়িতক পদ্ধতি

বাঁ পাশে চিত্রিত হয়েছে স্ত্রীহস্তকৃত লিঙ্গাগ্রপীড়ন। আর ডান পাশে অঙ্গুলি-যোজনার স্থানক্রম চিহ্নিত করা হয়েছে।

১। লিঙ্গগ্রীবা (মধ্যমা)। ২। লিঙ্গমুকুটের শেষ প্রান্ত (তর্জনী)। ৩। অগ্রচ্ছদা-সংযোজক (বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ)।

হবে, এচাপ অবশ্য ব্যথা এনে দেবে শিথিল অঙ্গে। কিন্তু দৃঢ় অঙ্গে কোনই কষ্ট হবে না, বরং স্খলনাবেগ অচিরেই তিরোহিত হবে।

● এই মাত্র উল্লেখ করা নিয়মমত, প্রথম কয়েকদিন বিলম্বিত লয়ে অঙ্গ-প্রবেশ আর কটি উত্তোলন। অঙ্গ উত্তোলিত হবে, পূর্বের মত ধীরে ধীরে। তবে কিনা দেহটা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়বে অর্থাৎ এগিয়ে নিতে হবে, যাতে যোনিনাসা বা ভগাঙ্কুরে পুরুষাঙ্গের চাপটা পড়বে বেশী, ফলে স্ত্রীরও কিছুটা (বা সবটা) তৃপ্তি হবে।

● তার পর শুরু হবে অঙ্গচালনা, ধীরে, অতি ধীরে। প্রথমে সিকি, তার পর অর্ধেক, তার পর তিন-চতুর্থাংশ, শেষে গোটা অঙ্গ চালিত হবে। একটু অঙ্গচালনা তার পর একটু বিশ্রাম, এই সম্বন্ধটুকু যেন সব সময়েই বজায় থাকে। তার পর, বাড়াতে হবে গতিবেগ। পূর্ণ অঙ্গচালনার পর একটা পূর্ণ যতি। তার পর দুবার অঙ্গচালনার পর পূর্ববৎ যতি। এভাবে গতিবেগ আস্তে আস্তে বাড়িয়ে যেতে হবে। কটিচালনাকালে বীর্য পতনোন্মুখ হতে চাইলে, পূর্বোক্ত পন্থার আশ্রয় নেবেন, স্খলনোন্মুখ রতি নিবর্তিত হবে। এমনি করে বীর্যপতন অবস্থা কেটে গেলে আবার আস্তে আস্তে সক্রিয় হবেন।

● এমনি করে, ধৈর্য ধরে এগিয়ে যেতে পারলে আপনি কিছুদিনের মধ্যে (৭-১৫ দিন) পূর্ণ দেহমিলনে সক্ষম হবেন। এই প্রক্রিয়া অবলম্বনের সময় স্ত্রীঅঙ্গ অতি মাত্রায় পিচ্ছিল করে নিতে হবে, পাশাপাশি অবস্থায় মিলিত হতে হবে এবং স্ত্রীর নিজ কটিচালনা করা চলবে না। পরে অবশ্য এই আসন বদলান যায়, স্ত্রীও রতিকালে সক্রিয় হতে পারেন। তবে, স্বামীর পক্ষে দ্রুত কটিচালনা সব সময়েই পরিত্যাজ্য।

● সব শেষের কথা হল এমন বিলম্বিত প্রক্রিয়ার মিলনে মাঝে মধ্যে অকালস্খলন হতে পারে। এতে ভেঙ্গে পড়বেন না যেন, সাহসে ভর দিন, আত্মবিশ্বাস বজায় রাখুন। শান্তসমাহিত চিত্তে এটা গ্রহণ করতে হবে এবং যথাশীঘ্র এপ্রক্রিয়া পুনঃপ্রয়োগের জন্যে সজাগ হতে হবে, সেই রাত্রেই কিংবা পরের দিনে। আর, যখনই দেখবেন ত্বরিতস্খলন হয়ে যাচ্ছে, স্ত্রীকে তৃপ্ত করতে পারছেন না, যোনিনাসা বা ভগাঙ্কুরের শরণাপন্ন হবেন। মনে রাখবেন হস্ত বা পুরুষাঙ্গের সাহায্যে বিবিধ শৃঙ্গার প্রয়োগে নারীকে তৃপ্তি (এ-তৃপ্তি আংশিক হলেও তৃপ্তির কিছুটা তো থাকে) দেওয়া সম্ভবপর। তাই, প্রথমেই যোনিনাসা বা ভগাঙ্কুরে উপচার প্রয়োগে স্ত্রীকে তৃপ্ত করে নিতে পারেন তার পর উপরিউক্ত পন্থানুযায়ী অগ্রসর হতে পারেন। কিংবা বিলম্বিত রাগসঞ্চার পদ্ধতিমত

চলতে গিয়ে আপনার বীর্যস্খলন হয়ে গেলে, যোনিনাসার বা ভগাঙ্কুরের সাহায্যে স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করতে পারেন। স্খলন হয়ে গেলেও, অঙ্গ কিছুক্ষণ শক্ত থাকে। যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ অঙ্গ সাহায্যে তার পর অঙ্গুলি সাহায্যে যোনিনাসায় বা ভগাঙ্কুরে শৃঙ্গার প্রয়োগ করা যায়।

৪। **স্ত্রীর সহযোগিতা চাই-ই।** পুরুষের যৌন জীবনে নারীর প্রভাব যে কতখানি তা লিখে বোঝান সম্ভব নয়। এই নারীর অসহযোগিতায় বা ঔদাসীন্যে পুরুষের তৃপ্তি ষোলকলায় পৌঁছতে পারে না, এই নারীর অজ্ঞতা বা ত্রুটি, ঘৃণা বা কটু মন্তব্যে পুরুষের যৌন শক্তি হ্রাস পেতে পারে অর্থাৎ ত্বরিত-স্খলন, পুরুষত্বহীনতা ইত্যাদির আবির্ভাব হতে পারে। আবার এই নারীই দু হাত বাড়িয়ে স্বাগত সম্ভাষণ জানালে পুরুষের তৃপ্তি দ্বিগুণিত হয়, রতিস্থায়িত্ব দীর্ঘায়িত হয়।

তাই পুরুষের রতিসমস্যার (পুরুষত্বহীনতা, দ্রুত রেতঃপাত ইত্যাদি) সমাধানে নারীরও সুনির্দিষ্ট ভূমিকা আছে :

এক, কোন কারণে স্বামী মিলনে অনিচ্ছা প্রকাশ করলে, জোর করে যৌন সম্পর্ক দাবী করা উচিত নয়। ক্লান্ত, অবসন্ন স্বামী মিলনের উপযুক্ত নয়। সমস্যাজর্জর হলে কিংবা আসন্ন ঘুমে এলিয়ে পড়লে এই একই কথা। স্থান-কাল-পাত্রের দিকে লক্ষ্য রেখে স্বামীকে বিচার করতে হবে।

দুই, কোন কারণে নিজের তৃপ্তি ব্যাহত হলে স্বামীকে বাক্যবাণে জর্জরিত করা অনুচিত। নিজ তৃপ্তির আগে স্বামীর স্খলন হলে কিংবা অঙ্গ-শিথিলতা দেখা দিলে স্বামীকে ঠাট্টা বিদ্রূপ না করে, আদর দিয়ে স্বামীর দুর্বলতা ঢেকে দেওয়া উচিত।

তিন, জন্মনিয়ন্ত্রণের ভার নিজেকেই নিতে হবে। কোন স্ত্রীসুলভ আবরণী (যেমন ডায়াফ্রাম্) ব্যবহার করে ভারাক্রান্ত স্বামীকে জন্মরোধক দ্রব্যাদি প্রয়োগের ঝামেলা থেকে মুক্তি দিতে হবে। এটা একান্তই অসম্ভব হলে কন্‌ডম্ ব্যবহার করতে হবে এবং এক্ষেত্রে অঙ্গসংযোগের পূর্ব মুহূর্তে স্বামীর অঙ্গে কন্‌ডম্ পরিয়ে দিয়ে স্বামীকে সাহায্য করতে হবে।

চার, কষ্টসাধ্য অঙ্গপ্রবেশের দরুন ত্বরিতস্খলন হতে পারে। তাই সহজ অঙ্গপ্রবেশের জন্যে স্বামীকে সাহায্য করতে হবে : উচ্চতর উত্তানক ভঙ্গীর (প্রথম খণ্ডের ৪২ পৃষ্ঠা) আশ্রয়ে যোনিমুখের শিথিলতা আনয়ন এবং স্ত্রীঅঙ্গের পিচ্ছিলকরণ।

পাঁচ, প্রয়োজন হলে বিবিধ কামকলা প্রয়োগে স্বামীর রাগসঞ্চার করতে হবে। অঙ্গশিথিলতায় অঙ্গের দৃঢ়তাপ্রাপ্তির জন্যে এবং ত্বরিতস্খলনে দ্বিতীয় মিলনের প্রস্তুতির জন্যে।

ছয়, চিকিৎসা চলা কালে স্বামীকে সর্বতোভাবে সাহায্য করা উচিত। স্বামীকে সব সময়েই উৎসাহ দিতে হবে। কোন সময়ের তরেই স্বামী যেন না বিষণ্ণ ও নিরুৎসাহ হয়। বিলম্বিত লয়ে মিলনের সময় স্বামীর সঙ্গে সহযোগিতা করতে হবে: সদাসর্বদা স্বামীকে উৎফুল্ল রাখতে হবে, স্বামীর ভয় ভাবনা আদরে সোহাগে ভুলিয়ে দিতে হবে, শৃঙ্গারের সময় নিজেকে সক্রিয় হতে হবে, অঙ্গসংযোগ ও অঙ্গপ্রবেশের সময় নিজের তরফ থেকে কোনরকম অঙ্গচালনা নয়, অকালে বীর্যপাত হয়ে গেলে স্বামীকে রাঙিয়ে রাখবে। আর প্রয়োজন মত নিজের তৃপ্তিসাধন নিজেই করে নেবে—হয় প্রথমেই ভগাঙ্কুরে শৃঙ্গার প্রয়োগের সাহায্যে, না হয় পরে দ্রুত নিতম্বচালনার সাহায্যে কিংবা ভগাঙ্কুরে শিথিল পুরুষাঙ্গ ঘর্ষণে। তৃপ্তি যদি নাও আসে স্বামীর মুখ চেয়ে দুদিনের জন্যে সহ্য করতে হবে, এমন কি স্বামীর কাছে মিথ্যে করেও বলতে হবে যে তৃপ্তি পেয়েছি।

সাত, তথাকথিত দ্রুত স্খলনে স্ত্রীর সহযোগিতা ও সক্রিয়তা অপরিহার্য।

৫। ত্বরিতস্খলনের কার্যকারণগুলি দূরে সরিয়ে রাখতে হবে। যেমন:

● গর্ভভীতি ত্বরিতস্খলনের অন্যতম কারণ। তাই, গর্ভভয়ে উৎকণ্ঠিত হলে, সুষ্ঠু ও নির্ভরযোগ্য জন্মরোধক দ্রব্যাদির প্রয়োগ প্রতিটি মিলনে চাইই। এব্যাপারে জেলী সহযোগে পুরুষের কনডম্ মন্দ নয়। এতে দু কাজই হয়, জন্মরোধ তো হয়ই, সেই সঙ্গে রতিস্থায়িত্বও কিছুটা বাড়ে।

● অস্থানে-কুস্থানে ও অসময়ে মিলিত না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। অন্যান্য কারণগুলি যে ক্ষেত্রে কার্যকরী থাকে, সেখানেও একই কথা।

● আর জানতে হবে: ত্বরিতস্খলনের জন্যে পাণিমেহন দায়ী নয়। অতিরিক্ত বীর্যক্ষয় বা ইন্দ্রিয়চালনারও এব্যাপারে কোন দায়িত্ব নেই, অর্থাৎ এর জন্যে যৌন দুর্বলতা দায়ী নয়। দায়ী নিজের মনের দুর্বলতা।

বিবিধ চিকিৎসা

ত্বরিতস্খলনের ব্যাপারে কত রকমের প্রক্রিয়া ও চিকিৎসা পদ্ধতির—প্রাচীন

ও নবীন, উভয় শাস্ত্রেরই—যে রেওয়াজ আছে তার ইয়ত্তা নেই। এদের অধিকাংশই খুব সুবিধের নয়। দু একটা যাও বা ভাল আছে তাও যৌনশাস্ত্রবিদ্ চিকিৎসকের নির্দেশমত পালন করাই বাঞ্ছনীয়। অর্থাৎ এখন এই অনুচ্ছেদে যে সমস্ত চিকিৎসাপ্রণালীর উল্লেখ করব তা নিজ বুদ্ধির বিচারে প্রয়োগ করবেন না, এটাই আমার অনুরোধ।

১। **বাজীকরণ**—হিন্দু ও মুস্লিম কামশাস্ত্রে রতিশক্তিবৃদ্ধিকারী ঔষধ ও প্রক্রিয়াদির বর্ণনা আছে (মৎপ্রণীত 'পুরুষত্ব এবং পুরুষত্বহীনতা' গ্রন্থে এপ্রসঙ্গ বিশদভাবে আলোচিত)। রতিশক্তিবর্ধক দুটি ব্যায়ামের উল্লেখ করছি :

এক, মূত্রত্যাগকালীন ব্যায়াম। রোজ কয়েকবার করে। একবার জোরে মূত্রত্যাগ, পরে খুব আস্তে আস্তে। অথবা প্রথমেই সবেগে মূত্রত্যাগ করুন, করতে করতে হঠাৎ বন্ধ করে দিতে হবে। কিছুক্ষণ ধরে রেখে আবার সজোরে মূত্রত্যাগ তার পর আবার বন্ধ। এমনি করে সবটুকু বের করে দিতে হবে। কেউ কেউ মিলনপূর্বে এভাবে প্রস্রাব করতে বলেছেন।

দুই, সুরতের প্রাক্কালে কিংবা অন্য সময়ে রোজ কয়েকবার খানিকক্ষণ ধরে, বারবার ক্রমান্বয়ে গুহ্যদ্বার সঙ্কুচিত ও প্রসারিত করার উপদেশও দিয়েছেন কেউ কেউ।

এধরনের ব্যায়ামে কিছুটা উপকার হয়ত হতে পারে। কেননা এতে যৌনাঙ্গের মাংসপেশীতে রক্তসঞ্চালন হয় এবং এগুলি পরিপুষ্ট হওয়ার সুযোগ পায়। কিন্তু সবচেয়ে বেশী উপকার (আমার মতে এটাই এর একমাত্র উপকার) হয় মনের। অর্থাৎ মনের দুর্বলতা খানিকটা কেটে যায়। আর তা হলেই তো কাজ হাসিল হবে।

২। **শিশ্নমুণ্ডের অনুভূতি-হ্রাসকারক দ্রব্যাদি**—অনেকের ধারণা শিশ্নমুণ্ড বা লিঙ্গাগ্রের অতিসংবেদনশীলতাই নাকি ত্বরিতস্খলনের জন্যে দায়ী। এই উদ্দেশ্যে কেউ নির্দেশ দেয় কনডমের, কেউবা অবেদনমূলক মলমের, অন্য কেউ লিঙ্গত্বক্‌ছেদনের।

এক, কনডম্—কোন কোন পুরুষ, যাঁরা দ্রুত রেতঃপাতের দরুন যৌন অশান্তিতে ভোগেন, কনডম্ ব্যবহারে উপকার পান। পুরুষাঙ্গকে নারীদেহের প্রবল উত্তাপের হাত থেকে কিছুটা রেহাই দেয় এই রবারের আচ্ছাদনী, তাই। তা হলেও এই রেহাই পাওয়াটা চিরস্থায়ী নয় এবং রতিস্থায়িত্ব যেটুকু দীর্ঘায়িত হয় তার মেয়াদ খুব সামান্যই। তা ছাড়া, কনডম্ সব ক্ষেত্রে কার্যকরী নয়। এমন অনেক রোগী দেখেছি যাঁদের রতিক্ষমতা কনডম্ (পাতলা ও মোটা দুইই)

পরেও দীর্ঘস্থায়ী হয় না। আবার এমনও দেখেছি, কন্‌ডম্‌ ব্যবহারে আরও দ্রুত রেতঃপাত হয়।

পুরুষাঙ্গের সংবেদনশীলতাই ত্বরিতস্খলনের একমাত্র কারণ নয় বলেই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কন্‌ডম্‌ ব্যবহারে কোন সুফল দেখা দেয় না। আর দেখা দিলেও তার কারণ আবরণীর মাধ্যমে সংবেদনশীলতা কমে যাওয়ার জন্যে নয়, বরং কন্‌ডম্‌ পরেছি—এই মনোভাবের দরুন। মনের উপর এই প্রভাব যতদিন কার্যকরী থাকবে, শুধু ততদিনই কন্‌ডমে রেতঃপাত একটু বিলম্বে ঘটবে। তাই, প্রথম প্রথম কন্‌ডম্‌ প্রয়োগে বেশ সুফল ফলে আর যত দিন যায় ততই দ্রুত রেতঃপাত হতে থাকে, শেষে কন্‌ডম্‌ পরেও যা না পরেও তাই। একটা মজার ঘটনা বলি :

এক ভদ্রলোক মিলনপূর্বে একাদিক্রমে তিন তিনটি কন্‌ডম্‌ (দুটি পাতলা ও একটি মোটা) পুরুষাঙ্গে প্রয়োগ করেন। এত কন্‌ডম্‌ পরেন শুধু দ্রুত রেতঃপাতের জন্যে। কোন কন্‌ডম্‌ই যদি ব্যবহার না করেন অঙ্গপ্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে রেতঃপাত ঘটে যায়, আর তিন তিনটি কন্‌ডম্‌ ব্যবহারে এটা ঘটে এক থেকে দু মিনিটের মধ্যে। কিন্তু তিনটির মধ্যে কোন একটি যদি (কি পাতলা, কি মোটা) বাদ যায়, তা হলে যে কে সেই ? এখন আপনিই বিচার করুন কন্‌ডমের প্রভাব কোনটি, মানসিক প্রত্যয় না অনুভূতি হ্রাস ?

দুই, অবেদনমূলক ঔষধ—লিঙ্গাগ্রে কিংবা মূত্রনালীপথের অভ্যন্তরে ২-৩% কোকেন কিংবা কোকেন জাতীয় দ্রবণ বা মলম প্রয়োগের ১৫।২০ মিনিট পরে মিলিত হলে একটু কাজ পাওয়া যায়। এই উপকার প্রথম প্রথম পাওয়া গেলেও, দু দিন পরে আর পাওয়া যায় না। অর্থাৎ কিনা এর ফলাফল সাময়িক। তা ছাড়া, এটা পাত্রনির্বিশেষে কার্যকরী নয়।

লিঙ্গ বা লিঙ্গমুণ্ডে এই জাতীয় ঔষধ প্রয়োগে অঙ্গের অনুভূতি বা সংবেদনশীলতা একটু কমে যায়। এটাই কিন্তু এর মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। তাই যদি হত, এই ঔষধ সর্বত্রই কার্যকরী হত এবং ফলাফলও চিরস্থায়ী হত। এজাতীয় ঔষধ প্রয়োগে রোগী কনফিডেন্স বা মনের জোর ফিরে পায়। অর্থাৎ মনের উপর প্রভাব বিস্তার করাই এর মুখ্য উদ্দেশ্য।

তিন, লিঙ্গত্বক্‌ছেদন—কন্‌ডম্‌ কিংবা কোকেন জাতীয় মলম প্রয়োগ করে যদি কার্যসিদ্ধি হয়, তা হলে ত্বক্‌ছেদনই তো সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ উপায়, এই ধারণার বশবর্তী হয়ে যদি ত্বক্‌ছেদন করিয়ে বসেন তা হলে কিন্তু ঠকতে হবে। কেননা, ত্বক্‌ছেদন করালেই যে ত্বরিতস্খলন হবে না এমন কোন স্থিরতা নেই।

ত্বকছেদনকারীদের রতিস্থায়িত্ব নাকি একটু বেশী। এটাকে জনশ্রুতি বলাই ভাল। এর পিছনে কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। ডাঃ আর. এল. ডিকিন্‌সন, ডাঃ টি. এন. এ. জেফকোট, ব্রিটিশ মেডিক্যাল জার্নাল কর্তৃপক্ষ প্রভৃতি অনেকেই এটা বিশ্বাস করেন না। আমরাও না। ত্বক্‌ছেদন করিয়েও রতিস্থায়িত্ব বাড়েনি এমন ঘটনা স্বচক্ষে দেখেছি। আবার বাল্যকালে ত্বক্‌ছেদন করানো হয়েছে এমন অনেক পুরুষকে দ্রুত রেতঃপাতে ভুগতে দেখেছি। একারণে ত্বক্‌ছেদনকারীদের রতিস্থায়িত্ব ত্বক্‌ছেদন করানো হয়নি এমন পুরুষদের চেয়ে বেশী তা বিশ্বাস করতে রাজী নই।

শুধু তাই নয়, মুদ্রা রোগ যাদের আছে তাদেরও যে ত্বক্‌ছেদন করালে ত্বরিতস্খলন ভাল হয়ে যাবে এমন কোন কথা নেই। অর্থাৎ ত্বক্‌ছেদনের পর এটা ভাল হতেও পারে আবার নাও হতে পারে। যদি ভাল হয়, সেটা যে মানসিক প্রভাবের ফলেই তা বলাই বাহুল্য। ডাঃ কেনেথ ওয়াকার, ডাঃ লোভেনস্টাইন প্রমুখ পণ্ডিতদের ত্বক্‌ছেদনের এই মানসিক প্রভাবেই আস্থা বেশী।

৩। **বীর্যস্তম্ভন**—কবিরাজী, হাকিমী, হোমিওপ্যাথি ও এ্যালোপ্যাথি প্রভৃতি সব রকমেরই দাওয়াই আছে। এমন কি অনেক রকমের তুক-তাক, গাছ-গাছড়া, শিকড়-বাকড়ের চলন আছে। প্রত্যেকটিরই উদ্দেশ্য হল বীর্যস্তম্ভন। উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন, এদের অধিকাংশরই আসল রূপটি হল ঘুম-পাড়ানী মাসিপিসী। এরা মনটাকে শান্ত রাখে, মনটাকে রাঙিয়ে তোলে কিংবা দুর্ভাবনা তাড়িয়ে দেয়। এভাবে দুষ্ট চক্রের প্রধান নায়ক 'যৌন ভীতি' দূর করতে চেষ্টা করে। আর এটা সম্ভব হলেই তো স্খলনের দ্রুততা কমে আসবে। তা ছাড়া ঔষধের যে একটা মানসিক প্রভাব আছে সেটাও ভুললে চলবে না।

রতিব্যাপারে নিঃশঙ্কচিত্ততা এনে দেয় বলেই, মাথা ঠাণ্ডা রাখে এমন ঔষধাদির, উদাহরণস্বরূপ ট্রাঙ্কুলাইজার, চলন সবচেয়ে বেশী। এদের মধ্যে 'মেলেরিল' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কেন জানি না, শুধু এটাই কোন কোন ক্ষেত্রে বীর্যস্তম্ভনের শক্তি ধরে। এতদনুরূপ আরেকটি যাদু ঔষধ, টোফ্রানিল। অবসাদের গাঢ় কালিমা যদি কাউকে ঢেকে রাখে, সেই দুর্বল পুরুষের রতিবহ্নি ধূমায়িত করতে এই টোফ্রানিল-ই অদ্বিতীয়।

সবশেষে বলি, যথার্থ বীর্যস্তম্ভন রক্তচাপহ্রাসকারক ঔষধাদি (যেমন 'ইসমেলিন') দিয়েই সম্ভব। কিন্তু সুস্থ মানুষে, যার ব্লাড প্রেসার স্বাভাবিক, এটা চলে না। কারণ, হিতের চেয়ে অহিত (নিম্নচাপজনিত দুর্ভোগ) আরও মারাত্মক।

৪। **হর্মোন চিকিৎসা**—এই উদ্দেশ্যে পুংহর্মোন প্রয়োগের রেওয়াজ আজকাল খুবই দেখি। ঔষধ নির্মাতাদের বিজ্ঞাপনের ফাঁদে পড়ে আর নিজেদের অজ্ঞতার ফলে অনেককেই এই হর্মোন নিতে দেখেছি। এতে যেটুকু কাজ হয় সেটুকু শুধু ডিসটিলড ওয়াটার বা পরিশ্রুত বিশুদ্ধ জলের ইঞ্জেকশন নিলেও হবে।* ইঞ্জেকশন বা সূচিপ্রয়োগের এমনই প্রভাব! অবশ্য, উপযুক্ত ক্ষেত্রে লুট্যিয়াল্ হর্মোন ইঞ্জেকশন নিলে যে কাজ হবে তা স্বীকার করতে কোন দ্বিধা নেই।

৫। **ইলেকট্রিক চিকিৎসা**—মূলাধারে বা পেরিনিয়মে উত্তাপ প্রয়োগে (যেমন ডায়াথার্মি) সুফল মেলে। প্রষ্টেট গ্রন্থির মর্দনেও (প্রস্টেটিক মাসাজ) কাজ পাওয়া যায়।

৬। **রতিবাহিত ব্যাধির চিকিৎসা**—রতিবাহিত ব্যাধি, বিশেষতঃ পুরাতন গণোরিয়া কিংবা অন্য কোন প্রদাহ থাকলে, রোগটি সমূলে বিনাশ করতে হবে। কেননা, গণোরিয়ার ফলে ত্বরিতস্খলন হতে পারে। এক্ষেত্রে, প্রষ্টেট গ্রন্থিটি ও তার লাগোয়া মূত্রনালীপথটি গণোরিয়া-মুক্ত বা প্রদাহ-মুক্ত করতে পারলেই ত্বরিতস্খলন যে ভাল হবে তা সুনিশ্চিত।

৭। **মাদক দ্রব্যাদি**—মিলনের আধ ঘণ্টা পূর্বে কিছুটা সিদ্ধি বা সুরা পানে বেশ সুফল পাওয়া যায়। এতে মনে স্ফূর্তি আসে, মেজাজ রঙিন হয়ে যায়, ভাবনা লঘু হয়ে পড়ে, এক কথায় মন থেকে সমস্ত ভাবনা দূরে সরে যায় বলেই রতিস্থায়িত্ব একটু বেড়ে যায়। মনের এই অবস্থা এনে দিতে পারে এমন অনেক ঔষধও আছে।

৮। **দ্বিতীয় মিলন**—দ্বিতীয় মিলনে রতিস্থায়িত্ব একটু বেড়ে যায়। এই তথ্যটাও ত্বরিতস্খলনে কাজে লাগান যেতে পারে। মিলনের এক ঘণ্টা কি আধ ঘণ্টা পূর্বে পাণিমেহনের আশ্রয়ে বীর্যপাত করা যায়। আবার, প্রথমবার দ্রুত স্খলন হলেও দ্বিতীয়-তৃতীয়বারে স্ত্রীকে তৃপ্তি দেওয়া সম্ভব। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, হঠাৎ কোন কারণে দ্রুত রেতঃপাত হলে, যথাশীঘ্র (ঐ রাত্রেই কিংবা পরের দিন) দ্বিতীয় মিলনের জন্যে সচেষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়। পর পর কয়েকটি মিলনে সফলতা এলেই দ্রুত রেতঃপাতের গ্লানি মন থেকে মুছে যাবে, তাই।

৯। **সঙ্গম-সখা-যন্ত্র**—এত করেও যদি আত্মবিশ্বাস ফিরে না আসে, যৌন-ভয় না ভাঙ্গে, সঙ্গম-সখা নামক যন্ত্রের আশ্রয় নেওয়া যেতে পারে। যন্ত্রটি বিশেষভাবে কার্যকরী পুরুষত্বহীনতায় এবং সেই ত্বরিতস্খলনে যেখানে অঙ্গ-

প্রবেশের পূর্বেই অর্থাৎ কামকলা উপভোগের সময় কিংবা নারীদেহ স্পর্শমাত্রই হঠাৎ যবনিকা নেমে আসে অথবা অঙ্গ অল্প দৃঢ় হয়ে স্খলন হয়ে যায়। ব্যবহারকারীকে প্রথমেই ডাক্তারের মাপমত যন্ত্রটি বম্বে থেকে আনিয়ে নিতে হবে। তার পর শুরুতেই যন্ত্রটি পরে নিতে হবে, কোন কামকলা নয়, নিতম্বদেশে বালিশ স্থাপনপূর্বক উত্তানক ভঙ্গীতে সরাসরি অঙ্গপ্রবেশের চেষ্টা এবং অঙ্গপ্রবেশের পরই যতক্ষণ সম্ভব অবিরত অঙ্গচালনা। আবার দ্রুত বীর্যপাতের পরও শিথিল অঙ্গে প্রয়োগ করা যায়, তার পর যতক্ষণ সম্ভব অঙ্গচালনা। এই প্রবেশ সফলতায় এবং স্খলনোত্তর অঙ্গচালনার উল্লাসে প্রত্যয় ফিরে আসে, ব্যর্থতার শঙ্কা লোপ পায়। এযন্ত্র সম্বন্ধে আরও বিশদ তথ্যের জন্যে আমার অন্য বই 'পুরুষত্ব এবং পুরুষত্বহীনতা' দ্রষ্টব্য।

১০। **মনের চিকিৎসা**—যদি কিছুতেই কিছু না হয়, 'সাইকোএন্যালিসিস' অর্থাৎ মনঃসমীক্ষণ চিকিৎসার শরণ নেওয়া ছাড়া অন্য কোন পথ দেখি না।

মনোবিদ্ চিকিৎসকের আরেকটি সাম্প্রতিক হাতিয়ার: বিহেভিয়ার থেরাপি। এটা আর কিছুই নয়, পুনঃশর্তারোপ। অর্থাৎ কিনা একটি শর্ত (যেমন রতিব্যাপারে দ্রুতগতি) ভেঙ্গে আরেকটি শর্ত-র (মন্দগতি) প্রতিষ্ঠা। নানাবিধ উপায়ে এটা সম্ভব, এদের মধ্যে জে. উলফ প্রবর্তিত 'সিসটেমেটিক ডিসেন্‌সিটাইজেসন' পদ্ধতিটিই সমধিক প্রচলিত এবং সাফল্যহারও মোটামুটিভাবে আশাপ্রদ।

সেক্সজগতের বিস্ময়পুরুষ ডাঃ উইলিয়াম মাষ্টার্স এবং তাঁর সহযোগিনী ভার্জিনিয়া জনসন, ত্বরিতস্খলনের চিকিৎসায় ৯৭.৮% সাফল্য দাবী করেছেন (১৯৭০)। এঁদের চিকিৎসার ধারাটি সংক্ষেপে ব্যক্ত করছি।

শিক্ষাগত শর্তারোপ-ই (লার্নিং প্রসেস) এচিকিৎসার মূলমন্ত্র, এই দিয়েই স্বামীর ভয় ভেঙ্গে আত্মপ্রত্যয় ফিরিয়ে আনা হয় এবং সেই প্রত্যয় প্রতিষ্ঠিত রাখা যায়। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য, স্ত্রীর সক্রিয় ভূমিকা। এবং আমরাও তাই বলে আসছি বহুকাল থেকেই। চিকিৎসা ব্যাপারে প্রধানা নায়িকা তিনিই।

প্রথমেই দম্পতিকে বুঝিয়ে দিতে হবে, দুসপ্তাহব্যাপী শিক্ষাকালীন পরিবেশটা হবে দাবিদাওয়াহীন, অর্থাৎ রতিব্যাপারে স্বামীর কোন প্রত্যাশা থাকবে না, থাকবে না কোন অস্থিরতা বা তীব্রতা এবং স্ত্রীও কোন দাবি রাখবে না, শিক্ষাদানকালে স্ত্রীদেহে উত্তেজনাতরঙ্গ আছড়ে পড়তে পারে প্রবলভাবে, তবুও না, শবরীর মত অপেক্ষা করতে হবে সানন্দে। তার পর, অকাল-স্খলনের ভাবনা আর আত্মজিজ্ঞাসা থাকবে না এমন ভয়শূন্য শিথিল অথচ আনন্দময়

এবং সর্বোপরি দাবিদাওয়াহীন পরিবেশে স্বামীর শিক্ষারম্ভ। শিক্ষাদাত্রী স্ত্রী স্বয়ং।

প্রথমেই পুরুষাঙ্গে হস্তক্ষেপপূর্বক দৃঢ়তা আনয়ন। পূর্ণ দৃঢ়তা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে কিছু পূর্বে আলোচিত পীড়িতক পদ্ধতির আশ্রয়। উদ্দেশ্যটা এই যে পুরুষাঙ্গে বিবিধ কামকলা প্রয়োগ করতে গিয়ে যদি কোন স্খলনাবেগ ঘনিয়ে আসে সেটা দূরীকৃত হবে। স্ত্রীহস্তকৃত লিঙ্গাগ্রপীড়নের পর ১৫ থেকে ৩০ সেকেণ্ড বিরতি। তার পর পর্যায়ক্রমে শুরু হবে আবার সেই উপচার, সেই পীড়ন, সেই বিরতি। এভাবে গড়ে উঠবে একটা চক্র : পুরুষাঙ্গে স্ত্রীহস্তকৃত উপচার—৩।৪ সেকেণ্ড লিঙ্গাগ্রপীড়ন—১৫।৩০ সেকেণ্ড বিরতি—উপচার—পীড়ন—বিরতি। এভাবে কামক্রীড়া চলবে ১৫ থেকে ২০ মিনিট কাল ধরে।

প্রসঙ্গতঃ বলে রাখা ভাল, পীড়ন ও বিরতির ফলে পুরুষাঙ্গে সামান্য একটু শিথিলভাব, এই ১০% থেকে ৩০%-এর মত, দেখা দিলেও দিতে পারে, এতে ভয় পাওয়ার মত কিছু নেই। কেননা, এই মাত্র উল্লেখ করা ক্ষণবিরতির পর পুরুষাঙ্গে উপচার প্রয়োগ করাই নিয়ম, যার ফলে দৃঢ়তা পুনরুদ্ধৃত হবে অচিরেই।

এমনি করে এতক্ষণ পর্যন্ত স্খলন না হওয়াটা নিশ্চয়ই ত্বরিতস্খলনকারীর জীবনে একটি অভূতপূর্ব ঘটনা। এবং এঘটনা নিশ্চয়ই তার ভয় ভাঙিয়ে দেবে, এনে দেবে সাহস, প্রাণ ভরিয়ে। এতে অবস্থার উন্নতি ঘটবে অনেক, স্বামীর অকালস্খলনের ভাবনা ক্রমশঃ লোপ পাবে, কিঞ্চিৎ আত্মপ্রত্যয় ফিরে আসবে এবং সেই সঙ্গে স্ত্রীও উল্লসিত হবে স্বামীর সাফল্যে। ফলে উভয়েই উৎসাহিত হয়ে জোর কদমে এগিয়ে চলবে, শিক্ষাক্রম পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত।

দুতিনদিন স্খলনরহিত রতিবিহীন উপচার সাফল্যের পর দ্বিতীয় পর্বের শুরু : আসীন বিপরীত ভঙ্গীতে অঙ্গসংযোগ। প্রথমেই স্ত্রীহস্তকৃত উপচার প্রয়োগ, পূর্ণ উত্থানের পর দুতিনবার লিঙ্গাগ্রপীড়ন, তার পর বিপরীত ভঙ্গী অর্থাৎ উত্তানসম্পুট ভঙ্গীতে শায়িত স্বামীর দেহোপরি স্ত্রীর উপবেশন। এই ভঙ্গীতে শুধুই অঙ্গপ্রবেশ, কোন রকম কটিচালনা নয়। এভাবে রতিমাধুরী আস্বাদনে ছেদ পড়বার উপক্রম হলেই অর্থাৎ স্খলনাবেগ ঘনিয়ে এলেই স্বামী জানাবে, স্ত্রী তখন কটি উত্তোলন করবে, তার পর লিঙ্গাগ্রপীড়ন, তার পর পুনরায় অঙ্গসংযোগ। এসবই আসীন বিপরীত ভঙ্গীতে অনায়াসসাধ্য, এভঙ্গী তাই নির্বাচিত।

এভাবে অধিককাল, কমপক্ষে ১৫-২০ মিনিট কাল স্খলনরহিত থাকতে হবে,

নিশ্চল নিশ্চুপ হয়ে এবং কোন কটিচালনা না করে। এবং এটা সম্ভব হলেই নিজের প্রতি পূর্ণ আস্থা ফিরে আসবে, আত্মপ্রত্যয়-দৃঢ় মানুষটি তখন তৃতীয় পর্বে পা দেবে।

যেখানে অঙ্গসংযোগমাত্রই কিংবা একটি দুটি কটিচালনায় স্খলন হত, সেখানে এত অধিককাল নিবিড় সংযোগ নিশ্চয়ই মানুষটিকে রাঙিয়ে দেবে। সত্য সত্যই দিন দুই-তিন ১৫ থেকে ২০ মিনিট কাল স্ত্রীঅঙ্গে বন্দী থাকার পর মানুষটির অনুষ্ঠানভীতি আরও ভেঙ্গে যাবে, আরও সাহসে বুকটা ফুলে উঠবে। উৎসাহদীপ্ত স্বামী তখন মাঝে মধ্যে সামান্য একটু কটিচালনা করবে। এতে রতিবল যেমন বৃদ্ধি পাবে তেমনি মদত দেবে অঙ্গদৃঢ়তায় আর রসপিচ্ছিলতায়, কেননা অঙ্গসংযোগের পর উভয়পক্ষই যদি স্তব্ধ হয়ে থাকে নারীর পিচ্ছিলতা আর পুরুষের দৃঢ়তা দুই-ই হ্রাস পাবে। পুরুষের স্খলনকর্তৃত্ব বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীও শুরু করবে কটিচালনা, প্রথম প্রথম ধীরে অতি ধীরে এবং রতিলাভের উদ্দেশ্য না রেখে।

সবশেষে পার্শ্বস্থ ভঙ্গী। পরবর্তী দিনগুলিতে, যখন ধীরে প্রত্যাবৃত্ত হচ্ছে স্খলন-প্রত্যয় ও কামানুষ্ঠানে আস্থা, তখন শুরু হবে পার্শ্বস্থ ভঙ্গীতে রতিবিহার। যথারীতি কিছুকাল কামকলা উপভোগ, তার পর কয়েকবার, কমপক্ষে দুতিনবার লিঙ্গাগ্রপীড়ন, এর পর বিপরীত ভঙ্গীতে অঙ্গসংযোগ এবং একপাশে ফিরে যাওয়া, অঙ্গসংযোগ বিচ্ছিন্ন না করেই। তখন শুরু হবে নিয়ন্ত্রিত ও সীমিত অঙ্গচালনায় রতিবিহার। আর আসন্ন স্খলনমুহূর্তে স্বামী ইঙ্গিত দিলেই স্ত্রীকৃত পীড়ন। এভাবে কিছুদিন মিলিত হলেই, স্বচক্ষে দেখা অধিককাল স্থায়িত্বে স্বামী পুলকিত হবে নিশ্চয়ই এবং সেই হেতু পুরুষচিত্তও প্রত্যয়দৃঢ় হবে।

পূর্ণ স্খলনকর্তৃত্ব আসার পরও ছ মাস থেকে বার মাস পর্যন্ত মাঝে মধ্যে নিয়ন্ত্রিত মিলন বাঞ্ছনীয়। সপ্তাহের একটি মিলনও যেন পীড়িতক পদ্ধতির পরশ পায়, অঙ্গসংযোগ প্রাক্কালে কয়েকবার। স্ত্রীর ঋতুকালে একদিনের তরেও ১৫-২০ মিনিট কাল ব্যাপী সেই প্রাথমিক কামক্রীড়া যাতে স্খলন নেই আছে শুধু উদ্দীপনা আর পীড়ন, পীড়ন আর উদ্দীপনা। আর রতিব্যাপারে দীর্ঘ ছেদ যেন না পড়ে, অর্থাৎ নিয়মিতভাবে মিলিত হতে হবে প্রতি সপ্তাহে।

তথাকথিত ত্বরিতস্খলন

স্বামীর বীর্য ধারণ ক্ষমতা স্বাভাবিক হয়েও, শুধু স্ত্রীর বিলম্বিত রাগমোচনের জন্যে, অকালস্খলনের পর্যায়ে নেমে আসতে পারে। এটাই হল তথাকথিত ত্বরিতস্খলন।

পূর্বেই বলেছি পুরুষের স্বাভাবিক ও সক্রিয় রতিস্থায়িত্বের একটা সীমা আছে, এটা দুই থেকে পাঁচ মিনিটের মধ্যে। নারীর কিন্তু এজাতীয় কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। পুরুষের পাঁচ-দশ-বিশ মিনিট রতিস্থায়িত্ব মেয়েদের কাছে কিছুই নয়। আবার এই নারীই যখন পাণিমেহনে প্রবৃত্ত হয় তখন অনেক অনেক কম সময় (৩-৫ মিনিট) লাগে। তখন পুরুষের মতই স্বল্পস্থায়ী। অর্থাৎ যখনই সক্রিয় হয়, উত্তেজিত হয়ে নিজেকে এলিয়ে দেয়, যৌন কর্তৃত্ব নিজের হাতে নেয়, যৌন অনুষ্ঠানের মেয়াদ কম হয়ে পড়ে। মিলনের সময়, যৌন কর্তৃত্বের রশি পুরুষের হাতে থাকে; উত্তেজনার লাগাম ছেড়ে নিজেকে এলিয়ে দেয় না, নানাবিধ নিষেধ প্রভাবের বন্ধন জড়িয়ে ধরে বলেই রাগমোচনে নারীর এত সময় লাগে। তাই তো কিনসী প্রমুখ গবেষকরা মিলনকালে নারীকে বন্ধনমুক্ত হয়ে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে এলিয়ে দেওয়ার, ছড়িয়ে দেওয়ার জন্যে অনুরোধ জানিয়েছেন; অর্থাৎ স্ত্রী যদি একটু সক্রিয় হয়, স্বামীকে ত্বরিত-স্খলনের জন্যে আক্ষেপ করতে হয় না।

মিলনকালে, নারী পুরোপুরি সকর্মক না হলে, সর্বান্তঃকরণে সহযোগিতা না করলে পুরুষের স্খলন নারীর তৃপ্তির আগে ঘনিয়ে আসবে। নারীকে সক্রিয় করার সোজা উপায় হল আসনভঙ্গীর পরিবর্তন করা। বিপরীত ভঙ্গী অর্থাৎ "পুরুষ নীচে, নারী উপরে" এই আসনে কিংবা 'মুখোমুখি বসা' অবস্থায় এটা সবচেয়ে বেশী মাত্রায় সম্ভব। আর অতি প্রচলিত 'নারী নীচে, পুরুষ উপরে' আসনে এটা যে একেবারে অসম্ভব তা নয়। এই আসনে নারী নিজের নিতম্বচালনা করলেই সক্রিয় হয়ে পড়বে। সক্রিয়তার বিচারে শীর্ষস্থানীয় হল বিপরীত ভঙ্গী, এই আসনে আসীন কিংবা শায়িত অবস্থায় প্রায় প্রত্যেক নারীই তৃপ্তি পায় এবং খুব কম সময়ের (১-৩ মিনিট) মধ্যেই। এর পরেই স্থান পাবে আসীন সম্মুখভঙ্গী। সর্বশেষের স্থানটি অতি প্রচলিত আসনের, "পুরুষ উপরে, নারী নীচে"। এইসব আসনভঙ্গীর বর্ণনা পাবেন আমার অন্য বই 'বিবাহিত জীবন'-এ।

"রতিস্থায়িত্ব ২।৩ মিনিট, আরও বাড়াতে চাই"—এঅভিযোগ দেখি অনেক পুরুষেরই। ২।৩ মিনিটের মধ্যে বীর্যপাত হওয়াটাকে এরা ত্বরিতস্খলন ভাবে (এমন কি স্ত্রীর রতিপ্রাপ্তি সত্ত্বেও)। আমি কিন্তু এটাকে ত্বরিতস্খলন বলি না। তার কারণ হল স্বামী ও স্ত্রীর পারস্পরিক সহযোগিতায় এই সময়ের মধ্যেই উভয়ের তৃপ্তি আসতে পারে। যা হোক, এই ২।৩ মিনিট স্থায়িত্বটা একেবারে ফেলনা নয়। রতিকুশল স্বামীর কাছে এই ২।৩ মিনিটই অনেক।

স্ত্রীকে যথাযথ তৈরী করে নিলে, মনের দিক থেকে, যৌনতার দিক থেকে, দেহের দিক থেকে অর্থাৎ সর্বতোভাবে স্ত্রীকে যৌন উন্মুখ করে নিলে ২।৩ মিনিট স্থায়িত্বটাই স্ত্রীর রাগমোচনের জন্যে যথেষ্ট। এই তৈরী করে নেওয়াটাই স্বামীর রতিদক্ষতা।

অতএব স্বামীর রতিকুশলতা ও স্ত্রীর সহযোগিতাই হবে দাম্পত্য জীবনের মূল লক্ষ্য। এতে কোন পক্ষেরই দুঃখ থাকবে না, স্বামীর স্খলন স্বাভাবিক হবে, স্ত্রীরও চরম তৃপ্তি দেখা দেবে।

অতিবড় কাম না পায় সমাদর। ব্যাপারটা সত্যই তাই। নারীর ক্ষেত্রে তো বটেই, মাঝে মধ্যে পুরুষেরও।

ময়্যাল ষ্ট্যাণ্ডার্ড বা নীতি বিচারে দ্বিমুখী সমাজে, যেখানে উচ্ছৃঙ্খলতার নিন্দা, নিয়মভঙ্গের গ্লানি সবই নারীর জন্যে আর একই দোষে দুষ্ট পুরুষের ভাগ্যে এর শতাংশও বর্ষিত হয় কিনা সন্দেহ, সেই দোরোখা নীতি দিয়ে চিহ্নিত আমাদের এই বর্তমান সমাজে পুরুষের অতিকামিতা গর্বের বস্তু। এটা যেন পুরুষের শোভা, শৌর্য ও বীর্য। আর কামাতুর নারী? সে তো উপহাসের বস্তু, নাটক নভেলের উপাদান, গালগল্পের খোরাক। অতিরেক কামদোষে দুষ্টা নারীকে আমরা নিন্দা করি, ধিক্কার দিই, কলঙ্ক চিহ্ন এঁকে দিতে ভুলি না। অর্থাৎ সমাজের কাছে পুরুষের অতিকামিতা যত না সমস্যা, তার চেয়েও সহস্র-গুণিত নারীর অতিবড় কাম। এবং ভয়ঙ্করও বটে, সহস্রশীর্ষ যন্ত্রণার মতই ভয়ঙ্কর।

এখনই প্রশ্ন উঠবে, 'অতিবড় কাম' বলতে কী বুঝব? এপ্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে আরেকটি প্রশ্নের মুখোমুখি হব: কোনটি স্বাভাবিক। এবড় কঠিন প্রশ্ন। এবং এপ্রশ্নের সমাধান যে কত জটিল, কত গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে সেটা জগৎবাসীর চোখে আঙুল তুলে দেখিয়ে দিয়েছেন ডঃ এ্যালফ্রেড কিনসী এবং তাঁর সহকর্মীগণ। আধুনিক গবেষকগণও, দৃষ্টান্তস্বরূপ ডাঃ ক্লিফোর্ড এ্যালেন, ডঃ এলবার্ট এলিস, অকুণ্ঠ স্বীকৃতি দিয়েছেন।

আভিধানিক অর্থে অতিবড় কাম হচ্ছে সাতিশয় রতিবাসনা, ঘন ঘন কামানুষ্ঠানের অভিলাষ। অর্থাৎ কিনা কামনার একটা নির্দিষ্ট মাপকাঠি আছে যার বেশি হলেই বলব অতিকামিতা। কিন্তু এই সীমারেখায় ঘণ্টা বাঁধবে কে? যত সমস্যা এখানেই। কেন তা বলছি।

মানুষের যৌনশক্তি প্রচণ্ড রকমের পরিবর্তনশীল, এক মানুষের যৌনতার তীব্রতা এত গতিশীল ও বিস্ফোরক যে শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দই যার একমাত্র তুলনা। অন্য মানুষের এটাই মৃদু, বিলম্বিত, গজেন্দ্রগমন-এর মতই ঢিমে তালে চলা। কামানুষ্ঠানের সংখ্যা, এই বৎসরে ১৫০ বার (অর্থাৎ সপ্তাহে ২।৩ বার)

হলেই কেউ হাসিখুশি। এসংখ্যা একজনের কাছে পর্যাপ্ত এবং স্বাভাবিক—ধর্ম, সমাজ, নীতি সবাই স্বাভাবিকতার ছাড়পত্র দিয়েছেন এসংখ্যাকে—হলেও অন্যজনের হয়ত মন ভরে না, সে চায় আরও আরও, বৎসরে সহস্রবারেও আপত্তি নেই, প্রতিটি রজনীতে এক বা একাধিকবার, সম্ভোগ বিনা এদের প্রাণ কাঁদে। আবার এই একই সংখ্যায় (১৫০ বার) অন্যজন ক্লিষ্ট কাতর, সংখ্যাগত প্রাচুর্যে দুদিনেই হাঁফিয়ে ওঠে, সপ্তাহে একবারই এদের কাছে 'যথেষ্ট'। তা হলে স্পষ্টই বোঝা গেল শুধু সংখ্যাবিচারে কামস্বভাবিতা নির্ণীত হতে পারে না।

এবারে সাক্ষীর কাঠগড়ায় চারজন পণ্ডিতের জবানি শোনা যাক। প্রথমেই ব্রিটিশ মনোবিদ্ চিকিৎসক ডাঃ ক্লিফোর্ড এ্যালেন। ইনি বলেছেন স্বাভাবিক ক্ষুধার যেমন সংজ্ঞা নির্ণয় করা যায় না তেমনি যৌনতার স্বাভাবিকতা যে কোনটা তার রূপ দেওয়া সম্ভব নয়, দুরূহ বলাই ভাল।

আধুনিক যুগের সর্বাধিক খ্যাত যৌনবিজ্ঞানী আমেরিকান মনোবিদ্ ডঃ এলবার্ট এলিস আরেক কদম এগিয়ে গেছেন, কামবাসনার কোন রূপটি স্বাভাবিক আর অস্বাভাবিক, এমন কি কামানুষ্ঠানের ধরনধারণ কতটা সুস্থ আর কতটা বিকৃত (কামবিকৃত) সে বিচারের ভার সাধারণ মানুষের নেই। কারণ, যৌন-ব্যাপারে স্বাভাবিকতা নির্ণায়ক কোন চরম সুনিশ্চিত মানদণ্ড নেই। এব্যাপারে স্বভাবিতা নামক বিচার যেমন আপেক্ষিক তেমনি সংস্কৃতি-সাপেক্ষ। কোন একটি যৌন আচরণ প্রতিটি দেশে ও প্রতিটি কালে একই সমাদর পায়নি। কখন বিকৃত, কদাচার, ঘৃণ্য। কখন স্বাভাবিক, সুস্থ, শ্লাঘনীয়। প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত, সমকামিতা।

এবার জার্মান ডাঃ ম্যাগনাস হির্শফেল্ড, আধুনিক যৌনশাস্ত্রের জনক হিসেবে যিনি চিরপূজ্য তাঁর বয়ানটা শোনা যাক: সমগ্র যৌনতার দ্বার খুলে দিয়ে কামানুষ্ঠানের যে সংখ্যাটি চোখে পড়বে সেটা ক্ষণপ্রভার মতই চঞ্চল, বড়ই পরিবর্তনশীল। কেউ সপ্তাহে কয়েকবার, কেউবা আরও কম মিলনের প্রত্যাশী। কেউ চায় প্রত্যহ এক বা একাধিকবার, এমন কি বৎসরে সহস্রসংখ্যক মিলনেও অকুতোভয় নয় এমন মানুষের সন্ধান তিনি দিয়েছেন, অবিবাহিত এক যুবকের রমণ সংখ্যাটা এই এবং কোন এক দম্পতির বিয়ের প্রথম আট বৎসরে প্রত্যহ ৩।৫ বার মিলিত হওয়ার এবং উভয়েরই সুস্থতার কথা বলে গেছেন ডাঃ হির্শফেল্ড। মানুষের যৌনশক্তিতে এবংবিধ প্রকারভেদ সম্ভব বলেই বাসনার কোন রূপটি স্বাভাবিক তা শুধু সংখ্যা দিয়ে নির্ণীত হতে পারে না।

সবশেষে কিনসী রিপোর্ট। এখানে দেখব সমগ্র জনসমাজের দুই-তৃতীয়াংশ (৭৭.৭%) পুরুষের কামানুষ্ঠান সপ্তাহে ১ থেকে ৬.৫ বার। বাদবাকীদের

হার বড়ই খাপছাড়া : ১১.২% পুরুষ দু সপ্তাহে একবার যৌন অভিলাষী হয়, দশ সপ্তাহে একবার চাই এমন বিরলকাম পুরুষও আছে, মাত্র ২.১%। এরা সবাই নিম্নকামযুক্ত। অবশিষ্ট রইল ৭.৬% পুরুষ, এরা সবাই উচ্চকামযুক্ত, এদের কামানুষ্ঠানের হার সপ্তাহে সাতবার তো বটেই, কখন আরও বেশী, সপ্তাহে দশ বার, কুড়িবার,. কি তারও বেশী, এমন কি সপ্তাহে ত্রিশেরও অধিক, এবং একই হারে একনাগাড়ে ত্রিশ বছর কামরসে প্রমত্ত পুরুষের আশ্চর্য ঘটনাও।

নারী কিন্তু পুরুষের মত অতিকামী নয়। শতকরা মাত্র দুজন নারীর রতি-বাসনা এ্যাভারেজ পুরুষের সমান কিংবা বেশী। যদিচ সাহিত্যে, নাটকে, গল্পগুজবে অতিশয় কামযুক্তা নারীর ছবি হামেশাই দেখব এবং এদেরকে ভুল ক'রে কামোন্মাদ বলা হয়েছে।

সাতিশয় কামাতুরা নারী যুগে যুগে চিত্রিত হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করতে পারি তিন রোমক মহিলার, রোমসম্রাট ক্লডিয়াস পত্নী 'ভ্যালেরিনা মেসালিনা', সম্রাট অগষ্টাস দুহিতা 'জুলিয়া', সম্রাট জাষ্টিনিয়ান পত্নী 'থিয়োডোরা' এবং রাশিয়ার সম্রাজ্ঞী 'ক্যাথারিন দি গ্রেট'। এদের মধ্যে থিয়োডোরা-ই যথার্থ কামোন্মাদ ছিলেন, অন্য সবাই 'অতিবড় কাম'-এর সুন্দর দৃষ্টান্ত (এলবার্ট এলিস)।

তুলনামূলক বিচারে, পুরুষের মত নারী কখনই বেবশা নয়, বেপরোয়াভাবে উচ্ছৃঙ্খলও না। কি বিবাহপূর্ব যৌনতায়, কি বিবাহোত্তর জীবনে, উভয় ক্ষেত্রেই। এই বিবাহপূর্ব রতিবিহীন উপচার-এর (নেকিং এ্যাণ্ড পেটিং) কথা ধরা যাক না কেন। একুশ বা ততোধিক পুরুষের অঙ্কক পেয়েছে এমন নারীর সংখ্যা শতকরা ১১ জন, অনুরূপ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন পুরুষরা সংখ্যায় প্রায় দ্বিগুণিত, ৩৭% (কিনসী রিপোর্ট)। শেষোক্ত পুরুষদের মধ্যে শতকরা ১২ জনই প্রতিটি সঙ্গিনীর (অর্থাৎ একুশ বা ততোধিক) সঙ্গে রতিসহবাসে লিপ্ত হয়েছে। এতদনুরূপ নারীর সংখ্যা মাত্র ১%।

কিনসী রিপোর্টে দেখব, রমণীকুলে বিবাহোত্তর রতিঅভিজ্ঞতার হার কখনই ১৭% এর বেশী নয়, কিন্তু পুরুষজগতে এটাই ৫০%। এরূপ রমণীর শতকরা তিন (এবং সমগ্র বিবাহিতা নারীর এসংখ্যা কিন্তু ½% এর মধ্যে) জনের প্রণয়ীর সংখ্যা কুড়িজনেরও বেশী।

কিনসী রিপোর্টে ৫১৪০ জন রমণীর যৌন ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষিত। বিবাহপূর্বেই রতিআস্বাদনের অভিজ্ঞতা হয়েছিল ১২২০ জন রমণীর,

এদের মধ্যে শতকরা দুজন কুড়িরও অধিক পুরুষের অঙ্কশায়িতা, আর প্রণয়ীসংখ্যা বিচারে দশ থেকে কুড়ির মধ্যে সীমিত এমন নারী শতকরা চারজন।

হির্শফেল্ড এবং কিনসী বর্ণিত এরূপ উচ্চকামযুক্ত নর বা নারীকে কী বলব? অস্বভাবী (এ্যাবনর্মাল) বা কামবিকৃত (পার্ভার্টেড) বলবেন অনেকেই। কেউ বলবেন অসুস্থ (মর্বিড), ভ্রষ্ট (ডিজেনারেট) কিংবা ব্যাধিত (প্যাথলজিক্যাল)। কেউবা হর্মোন অতিরেকদোষে দুষ্ট। না, কোনটাই ঠিক নয়। এদেরকে অস্বভাবী না বলে অল্পদৃষ্ট বলাই ভাল।

আহার ব্যাপারে কেউ যেমন অল্পভোজী, কেউ ভূরিভোজনের প্রত্যাশী, কেউবা এদুয়ের মধ্যপথে থাকতেই ভালবাসে, এরা মধ্যভোজী। রতি ব্যাপারেও ঠিক তাই। উচ্চকাম আর মধ্যকাম ব্যক্তিকেই আমরা সচরাচর দেখি, এবং আমাদের ধর্ম, সমাজ সবই কিনা এদের স্বপক্ষে, শুধু এই কারণে এদেরকে যদি সুস্থ বলি, এবং এই সমাজ ও ধর্ম কামানুষ্ঠানের যে সংখ্যাটিকে ছাড়পত্র দিয়েছে সেটাই যদি স্বাভাবিক রূপে গণ্য করি, উচ্চকাম বা অতি উচ্চকাম নর-নারীকে অসুস্থ ও অস্বভাবী বলতে বাধ্য। অন্ততঃ এযাবৎকাল ধর্ম, সমাজ, নীতি তাই বলে এসেছে। আমরা বলব এরা প্রত্যেকেই সুস্থ, স্বাভাবিক। বিকৃতকাম নয়, মানসিক ব্যাধিগ্রস্তও না। কামোন্মাদ তো নয়ই। এদের যৌনতা আর পাঁচজনের মত নয়, শুধু এই অজুহাতে এরা অস্বভাবী হতে পারে না। শুধু সংখ্যাপ্রাচুর্যের জন্যে অস্বভাবী চিহ্নিত করতে হলে অতিভোজীদেরও তাই বলতে হয়। এতে কি কেউ রাজী হবে, কে জানে!

একদা ডাঃ হির্শফেল্ড-এর ধারণা করতে আনন্দ হত, যুক্তিযুক্ত উদ্দেশ্য নিয়ে রতিবিহার, অনুষ্ঠান নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা কামীজনের করায়ত্ত এবং নিজেদের ব্যক্তিত্বও অবিকৃত অর্থাৎ অতিশয় রতিঅনুষ্ঠান সত্বেও নিজের কাছে নিজের ছবিটি অমলিন নয়; এরূপ কামানুষ্ঠানে অসুস্থতার নামগন্ধ থাকতে পারে না।

কিনসী যুগে, বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে, যৌনব্যাপারে স্বভাবিতা আর অস্বভাবিতার দ্বন্দ্ব বহুলাংশে ঘুচে গেল, এবং কিনসীর এটাই সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব। এঁর মতে, কোন কামানুষ্ঠানকে অস্বভাবী কিংবা বিকৃত না বলে সচরাচর দৃষ্ট নয় কিংবা দুর্লভ বলাই ভাল। এবং শুধু উচ্চ হারের জন্যে কোন মানুষকে অসুস্থতার সার্টিফিকেট দেওয়া যায় না, অবশ্য ব্যক্তিগত বা সামাজিক অশান্তি যদি না থাকে তবেই।

সর্বাধুনিক যুগে, বিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে, ডঃ এলবার্ট এলিস জোর গলায় হেঁকে বলেছেন, কামানুষ্ঠানের পিছনে বাধ্যতামূলক কোন প্রেরণা, কোন অন্ধ

আবেগের প্রবল তাড়না, কিংবা আত্মঘাতী প্রবৃত্তি (যেমন নিজের অনিষ্টসাধন) লুকিয়ে যদি না থাকে, অস্বভাবিতার বা বিকৃততার ভিন ঠাঁই নাহি রে' অর্থাৎ কেউ যদি শান্ত সমাহিত মন নিয়ে পুনঃপুনঃ মিলনে মত্ত হয়, এবং এর মধ্যে যদি কোন রকম বাধ্যবাধকতাব গন্ধ না থাকে সেই কাম সুস্থ এব' স্বভাবী। 'অতিবড় কাম'-এর ছাপ পড়ে পড়ুক, তবুও।

অতিবড় কাম আবাব দু রকমের। একটি নিউরোটিক। অন্যটি তা নয়, অর্থাৎ স্বাভাবিক। শেষেরটিতে নিউরোটিক গন্ধ নেই বলেই যথার্থ যৌনতার সমারোহ ঘটেছে এখানে। সেক্সের জন্যে সেক্স হচ্ছে এর মূলমন্ত্র, অর্থাৎ নিছক যৌনতার জন্যেই যৌনতৃপ্তি। পূর্ণতৃপ্তির মায়াভরা আমেজ আছে। তৃপ্তিশেষে কিছুক্ষণ—'অসাড় পর্যায়'-এর ব্যাপ্তি, তখন নব-উত্তেজনা ঠিকরে যায়, কোন আঁচড় বসাতে পারে না। মানসিকতার দিক থেকে, এবং এটাই সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য, কামপাত্রে মমতা ও প্রীতিব সঞ্চাব। এই ত্রিবিধ লক্ষণাবলী দিয়ে চিহ্নিত কামানুষ্ঠান মাত্রই স্বভাবী ও সুস্থ। কিনসী ও হির্শফেল্ড উল্লেখিত অতিকামিতার ঘটনারাজি এই শ্রেণীভুক্ত। এবং সচরাচর দৃষ্ট বহুমুখকামিতাও।

আরেক ধরনের অতিবড় কাম আছে, যথার্থ যৌনতা এখানে নীরব, ফলতঃ কৃত্রিম যৌনতায় পর্যবসিত। এরূপ কামী ব্যক্তি পুরোপুরি নিউরোটিক, কখনবা উন্মাদবোগের সীমা ছুঁই ছুঁই। পূর্ণ তৃপ্তি এদের জন্যে নয়, যদিচ অর্গ্যাজম বা রাগমোচন বলতে যা বোঝায় তার নাগাল অনেকেই পায়, অন্ততঃ ডঃ এলবার্ট এলিস-এর অভিজ্ঞতা তো এই। আবার তৃপ্তির আভাস মাত্র মিলেছে কিংবা তৃপ্তির কণামাত্র নেই, এমন ঘটনার অভাব নেই, তবে পূর্বসূরীদের মতে এই অতৃপ্তিই যে একমাত্র নির্ণায়ক সেটা ঠিক নয়। অসাড় পর্যায় ক্ষণপ্রভার মতই ক্ষণিক, মিলনের পবমুহূর্তেই পুনর্মিলনের প্রত্যাশা তাই আশ্চর্য হলেও সম্ভব। মানসিক পরিতৃপ্তির সাহচর্য নেই, শুধুই অশান্তি, সেক্সজাত টেনসন কমা দূরে থাক আরও বেড়ে যায়, কেবলি টেনসন, এবং যেটুকু তৃপ্তি জোটে তাতে আশ মেটে না আরও তৃপ্তিব লোভে এবং অতৃপ্তির ক্ষেত্রে আরও কামানল উদ্দীপ্ত, এসবেরই আবেগফলাফল পুনঃপুনঃ মিলন। অধিকন্তু, কামপাত্রে কোন মমতা জাগে ন', সোহাগভরা প্রীতির জড়িয়ে ধরাও নেই, তাই না মিলন মেলা ভাঙার সঙ্গে সঙ্গেই দূরে ছুড়ে ফেলে দেয়, ফলে এক শয্যার উষ্ণতা মিলিয়ে যেতে না যেতেই আরেক ভিন্ন শয্যায় পলায়ন, পাত্র থেকে পাত্রান্তরে বল্গাছুট অশ্বের মত ছুটে ছুটে যাওয়া।

শেষোক্ত ধরনের অতিবড় কাম-ই কামজগতের এক বিস্ময়-ঘটনা। পুরুষ

এবং নারী উভয়েই চির অতৃপ্ত যৌনবাসনার শিকার হতে পারে। পুরুষের হলে পুরুষকে বলা হয় 'ডন জোয়ান', 'ক্যাসানোভা'। আর রোগটিকে বলি ইংরেজীতে স্যাটারিয়াসিস, বাংলায় পুং-কামোন্মত্ততা। প্রখ্যাত মনোবিদ্ ফেনিকেল পুরুষের অতিবড় কামের নাম দিয়েছেন 'ডন জোয়ান সিণ্ড্রোম'। প্রসঙ্গতঃ বলি, স্যাটার হচ্ছে পৌরাণিক জীব, অর্ধেক মানব আর অর্ধেক ছাগল, এবং এই জীবের মত আচরণই—অপরিতোষণীয় রতিবাসনা—'স্যাটারিয়াসিস' নামে বিদিত। অন্য কেউ বলেন, ব্যাপারটা তা নয়, পুরুষাঙ্গ অর্থবোধক একটি গ্রীক শব্দই এই পরিভাষার জনক।

সদাই রতিপ্রত্যাশী নারীকে বলি মেসালিনা, এ্যামাজন, নিম্ফোম্যানিয়াক, সংক্ষেপে নিম্ফো। আর রোগটিকে বলা হয় নিম্ফোম্যানিয়া, বাংলায় বৃষস্যন্তীতা বা স্ত্রী-কামোন্মত্ততা। ব্যুৎপত্তিগত অর্থটি এই: নিম্ফ্যাক অর্থাৎ ক্ষুদ্রোষ্ঠদ্বয়ের উন্মত্ততা (ম্যানিয়া) মর্বিড এবং অপ্রতিরোধ্য যৌনতার প্রতীক।

ডাঃ ম্যাগনাস হির্শফেল্ড এদুই শব্দের পরিবর্তে 'হাইপার-ইরটিজম' শব্দের পক্ষপাতী, বাংলায় অতিকামিতা বা অতিবড় কাম চলতে পারে। বর্তমানে অবশ্য 'স্যাটিরিয়াসিস' এবং 'নিম্ফোম্যানিয়া'র চলন সবচেয়ে বেশী।

রতিব্যাপারে বেশী বাড়াবাড়ি করলেই, যেমন অতিকামী স্ত্রী কিংবা বহু-পুরুষগামিনী নারীকে 'নিম্ফো' নামে অভিহিত করা হয়। কিংবা ৬০।৭০ বৎসরও পরাস্ত করতে পারেনি যার যৌনতাকে সেই নারীকেও কিংবা সপ্ততিপর কামযুক্তা সক্রিয় নারীকেও 'কামবাই' বলতে শুনেছি বাংলায়, (আমি বলি 'কামোন্মাদ'ই সুন্দর), কোনটাই ঠিক নয়। এরকম একটা ভুল করার সম্ভাবনা প্রবল বলেই কামোন্মাদের যথার্থ লক্ষণাবলীর সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেব। ডঃ এলবার্ট এলিস চারটি বৈশিষ্ট্য দিয়ে এদের চিহ্নিত করেছেন। যেমন, এক, অবশীভূত বাসনা। রতিবাসনা এমনই অপ্রতিরোধ্য, দুর্দান্ত যে কিছুতেই তাকে নিবৃত্ত করা যাবে না, হৃদয়ে তরঙ্গায়িত হওয়ার পর অচিরেই রতিবাসনার উপভোগ চাই। দুই, অবিরাম বাসনা। রতিপ্রয়োজন অবিরত, কারণ প্রাণ ভরানো তৃপ্তি কিছুতেই এদের মেলে না। এক তৃপ্তি মেলে তো আরেক তৃপ্তির পিছনে ছোটে (আর তৃপ্তি না পেলে তো ছুটবেই)। একই সন্ধ্যায় হয়ত কয়েকবার তৃপ্তি ধরা দিল, তবুও কিনা অতৃপ্ত, আরও আরও চাই। এতৃপ্তির বুঝি শেষ নেই! ফলে অচিরেই যৌনতা জাগে, তখন চাই নিবৃত্তি। তারপর আবার। এবং এর অর্থই হল বহুপুরুষ আর বহুমিলন। তিন, বাধ্যবাধকতা। বাধ্যতামূলক একটি যৌন আচরণের সুন্দর দৃষ্টান্ত এই কামো-

মত্ততা। অর্থাৎ শুধু যে এটা অপ্রতিরোধ্য তা নয়, কে যেন তাকে প্রবল বেগে আকর্ষণ করছে, এবং এই কামপথে রুখে দাঁড়াবার শক্তিটুকুও তার নেই, যেতে তাকে হবেই। এই অনুকর্ষী প্রবৃত্তিটাই মানসিক অসুস্থতার লক্ষণ। চার, অনুশোচনা। 'প্রমোদে ঢালিয়া দিনু মন, তবু প্রাণ কেন কাঁদে রে'—এ সত্য কামোন্মাদের ক্ষেত্রে ভয়ঙ্করভাবে প্রযোজ্য। কারণ, বাধ্যতামূলক যৌন আচরণ মাত্রই অনুশোচনা জড়ানো। সমাজের কাছে এজাতীয় বহুকামিতা ঘৃণ্য, নিন্দনীয় ও কলঙ্কচিহ্নিত, এটা সে বোঝে। যার ফলে নিজেকে সে অপরাধী ভাবে, নিজের সম্বন্ধে নিজের ধারণাও খাটো মাপের হয়ে পড়ে, তখন আরও বিক্ষুব্ধ, আরও উদ্বেগ। এই উদ্বেগ-কাতরতা আর এই মলিন আত্ম-প্রতিকৃতি কিন্তু এদেরকে অশান্ত করে তোলে, শান্তি খোঁজে কামরসে ডুব দিয়ে। এভাবে হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এদের কামানল।

শুরুতেই কিন্তু এমন ভয়ঙ্কর রূপটি চোখ ধাঁধিয়ে দেয় না। প্রথম প্রথম ভূয়৷৷ব সুখং এদের পথ দেখায়। তারপর মিলন ক্রমশঃ বাধনহারা আর পাগলপারা হয়ে ওঠে। অনুকর্ষী প্রবৃত্তি আসর জাঁকিয়ে বসে। বিচার বুদ্ধি, শুভাশুভ জ্ঞান ধীরে ধীরে লোপ পায়, তখন অবাধ নির্বাচনের ব্যাপ্তি সামনে যাকে পায় তাকেই স্পর্শ করে। আর কামপাত্র সম্পর্করহিত হয়ে লিঙ্গসর্বস্বতায় পর্যবসিত।

অতিকামিতার উৎস খুঁজতে গিয়ে গভীর সমুদ্রমনেই ডুব দিতে হবে, কেননা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখব কারণটি রয়েছে এখানেই। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে দেহগত বা শারীরবৃত্তীয় কারণেও কামানল উদ্দীপ্ত হতে পারে। দৃষ্টান্ত: আঘাতপ্রাপ্ত বা ব্যাধিত মস্তিষ্ক, রাগমোচনে অক্ষমতা, হর্মোন বৈষম্য, প্রৌঢ়সন্ধি।

ফ্রয়েডীয় মতে, কামোন্মত্ততা হচ্ছে অন্তর্নিহিত মনোদ্বন্দ্ব এবং কামপাত্র সম্পর্কিত অশান্তিরই বহিঃপ্রকাশ। কামোন্মাদ পুরুষ ও নারী উভয়েরই একটি বৈশিষ্ট্য তীব্র স্বকাম আর জীবনের প্রতি শূন্যতাবোধ। এপুরুষ খুঁজে ফিরে মরে দরদী প্রেমময়ী মাতাকে। বহুনারীর মধ্যে সে কিনা একজনাকেই খুঁজছে, খুঁজছে সেই মাতাকে যে তাকে ভালবাসবে, আদর করবে। এটা সে পায় না বলেই নিত্য নতুন নারীর সন্ধানে নিজেকে মগ্ন রাখে (অনুরূপভাবে কামোন্মাদ নারীর অন্বিষ্ট: স্নেহময় পিতা)।

আরেক দল মনোবিদ্, বিকল্প পিতা বা মাতাকে খুঁজছে এজাতীয় অজাচার-মূলক সম্পর্ক, যার উৎস সেই শৈশবে পিতামাতার প্রতি ঈর্ষাকাতরতায়

(ইডিপাস কমপ্লেক্স), বাদ দিয়ে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করতে চান। এঁদের মতে পিতামাতার স্নেহরসে সিক্ত নয় এদের শৈশবকাল। স্নেহ বঞ্চিত বলেই কামোন্মাদরা এত ভালবাসার কাঙাল। যৌবনে এটাই সে পেতে চায় কাম-পাত্রের কাছ থেকে। কিংবা সে যে ভালবাসার যোগ্য এটাই প্রমাণ করতে চায়। কখনবা পিতামাতার প্রতি বিরুদ্ধাচরণ, সন্তানকে ব্যভিচারী দেখে পিতামাতারা গালমন্দ করবে, দুঃখ পাবে, এতেই তার তৃপ্তি।

অন্যের ভালবাসার কামনা ছাড়াও, নিজক্ষমতার সপ্রমাণ অস্তিত্ব, নিজ ব্যক্তিত্ব প্রকাশ কিংবা প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার বাসনাও কামোন্মাদনায় মদত জোগাতে পারে। অর্থাৎ কিনা, কর্মজগতে বা রতিজগতে নিজের অক্ষমতা (যেমন রাগমোচনে অক্ষমতা), নিজ সম্বন্ধে অত্যন্ত হীন ধারণা (যথা, সাফল্যে ঘোর সন্দেহ ; কোন ব্যাপারে তীব্র অনিশ্চয়তা ; অসম্পূর্ণ বা অপরিণত বোধ) ইত্যাদি মনোভাবও, আশ্চর্য কাণ্ড, বহু মিলনের প্রেরণাস্থল হতে পারে। ফ্রয়েডীয় দৃষ্টিতে এটা হচ্ছে প্রচ্ছন্ন সমকামিতার আভাস, সঙ্গ-পরশ-যুক্ত হয়ে এটাই জাহির করতে চায় যে সে সমকামী নয়। আধুনিক মনোবিদ্‌গণের ধারণায়, উদাহরণ-স্বরূপ ডঃ এলবার্ট এলিস, মুষ্টিমেয় কয়েকজন সমকামী হলেও, অধিকাংশই কিন্তু ইতরকামী। এবং এদের আগ্রহ মিলনে নয়, সঙ্গীবিজয়ে, কারণ, বিজয়োৎসবের উল্লাস ক্ষীণ হতে না হতেই কামপাত্র পরিত্যক্ত, নতুন পাত্রবরণের নব উন্মাদনা জাগে। এভাবে—অর্থাৎ নব নব যৌনসম্পর্কস্থাপনের মধ্য দিয়েই —নিজের অক্ষমতা, ক্ষুদ্রতা, দীনতার গ্লানি কিছুকালের জন্যে মুছে যায় বলেই এরা নারী (বা পুরুষ) জয়ের নেশায় মেতে ওঠে। কিন্তু জয় করেও তবু ভয় যায় না, সেই পুরাতন হীনমন্যতার ক্ষত আবার সঙ্গীবিজয়ে উৎসাহ দেয়।

কামোন্মাদ ব্যক্তি পুরুষ কিংবা নারী যাই হোক না কেন, উভয়ের মধ্যেই নিহিত রয়েছে আরেকটি বিশিষ্টতা : কামপাত্রে অসম্পর্ক বা সম্পর্কহীনতা। কামপাত্রে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করে না, শুধু স্বীকার করে যৌনতা, মায়ামমতা বলতে কিছুই জাগে না, শুধু জাগে বাসনাই। কামপাত্র যেন জীবন্ত যৌন অঙ্গ রূপেই প্রতীত।

এক কথায়, কামোন্মাদ অসুস্থ ব্যক্তি। এরা পুনঃপুনঃ মিলিত হয়, ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে এবং আত্মঘাতী উপায়ে। ভালবাসার প্রচণ্ড অভিমান, পিতামাতার প্রতি চরম বিদ্রোহ এবং পুরুষজয় কিংবা নারীশিকারের উৎকট দুর্মর প্রেরণাই এদেরকে বাধ্য করায় বিরামবিহীন রতি উপভোগে। ভয়ঙ্কর সেই অভিলাষ পূরণের উদ্দেশ্যে নিজেকে কোথায় না টেনে নিয়ে যায়, নিজের

সর্বনাশ নিজের চোখের আলোয় দেখেও। প্রসঙ্গত: বলে রাখি, মনোবিদ্‌গণের হাতেই এদের নিরাময় সম্ভব।

লক্ষণচতুষ্টয়ের—অপ্রতিরোধ্য বাসনা আর অবিরাম বাসনা আর অনুকর্ষী প্রবৃত্তি আর আত্মক্ষয়ী মনোভাব—সমাবেশ দুর্লভ, কাজে কাজেই প্রকৃত কামোন্মত্ততা যে দুর্লভ হবে তা বলাই বাহুল্য। সচরাচর আমরা যাদের দেখি তারা কিন্তু কামোন্মাদ নয়, বহুবল্লভা রমণী কিংবা বহুনারীগামী পুরুষ। এদের মধ্যে অধিকাংশই, অতিশয়কামযুক্ত পুরুষ কিংবা রমণী, এদের ইন্দ্রিয়দোষ যে নিয়ন্ত্রিত বা নির্বাচিত তা নিঃসঙ্কোচে বলা যেতে পারে (কনট্রোলড বা সিলেকটিভ প্রমিসকিউটি)। কারণ মনের দিক থেকে এরা সুস্থ। কোন অনুকর্ষী ভাব নেই। প্রকৃত যৌনতা আছে। কামপাত্রও নির্বাচিত এবং প্রীতিযুক্ত। দোষটা শুধু সংখ্যায়, সাধারণ অপেক্ষা বহুগুণিত এটাই যা দোষের। তবুও বলব, এ প্রাচুর্য বিধিদত্ত, প্রকৃতিগত কারণেই। এই 'অতিবড় কাম' অতএব সুস্থ।

অধিকাংশ ছাঁটাই করার পর যে কয়েকজন পড়ে থাকবে তারা অবশ্য মনোদোষে দুষ্ট। অর্থাৎ কিনা অতিমাত্রায় ইন্দ্রিয়পরায়ণতা মানসিক অসুস্থতারই লক্ষণ। এটা হচ্ছে বাধ্যতামূলক যৌনস্বেচ্ছাচারিতা (কম্‌পালসিভ প্রমিসকিউটি)। এযাবৎকাল 'নিম্ফো' বলে যাদের চালান হয়েছে, সেই হতভাগিনীদের প্রায় প্রত্যেকেই এই দলে। রতিব্যাপারে ভূমৈব সুখং এদের ইষ্টমন্ত্র, কামপাত্রে কিছু সম্পর্ক আছে, কিছু প্রেম কিছু ভালবাসা দিয়েও স্পৃষ্ট। তবে দোষের মধ্যে আছে সেই ভয়ঙ্করী অনুকর্ষী প্রবৃত্তির অন্ধ তাড়না আর আত্মহন্ত্রীরূপে নিজের অনিষ্টসাধন। এজাতীয় উচ্ছৃঙ্খল যৌনতার পায়ে বেড়ী পরাতে পারে শুধু মনোবিদ্‌ চিকিৎসকরাই।

তৃতীয় পর্ব

বিষয় কামবিকৃতি

আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম। এটা বৈষ্ণবশাস্ত্রের কথা। কামশাস্ত্রের কথা এই, ইন্দ্রিয়প্রীতির দুই কুশীলব নর ও নারী এবং প্রীতির শেষ রতিবিহারে। এটাই নিয়ম।

সচরাচর দেখা এই নিয়মেরও ব্যতিক্রম আছে। অর্থাৎ কিনা কামতরণী অন্য খাতে বইতে পারে। কামস্রোতের এই যে ভিন্নমুখিতা এরই নাম সেক্সুয়্যাল পার্ভার্সান বা সেক্সুয়্যাল ডিভিয়েসন। বাংলায় বলা যেতে পারে কামবিকৃতি বা কামবিকার।

সনাতন রীতি বিরোধী কিংবা অপ্রচলিত কামানুষ্ঠানমাত্রই অস্বভাবী, বিকৃত দুর্নীতিগ্রস্ত—এমন সাবধানবাণীও উচ্চারিত হয়েছে বারবার, এমন কি অনেক গ্রন্থকারও এই দলে। এঁদের চিন্তাধারার কয়েকটি নমুনা তুলে ধরছি।

সাতিশয় স্বল্পদৃষ্ট যে কামানুষ্ঠান তাতে বিকৃতির ছাপ আছে। যেমন পশুকামিতা। কোন একটি সমাজে বা অঞ্চলে অপ্রচলিত (মুখমেহন) বা অনৈতিক (পশ্চাৎ বিহার), অতএব এটা বিকৃত। আবার প্রকৃতিবিরুদ্ধ এই অর্থে অস্বভাবী (যেমন সমকাম) কিংবা প্রজননবিহীন এই অর্থে অজৈবিক (নিরাপদকালে মিলন) কামানুষ্ঠানও বিকৃতরূপে চিহ্নিত হয়েছে।

এক কথায় বলা যেতে পারে কামবিকৃতি হচ্ছে রতিতৃপ্তির উপায়বিশেষ যা বিকৃত, অপ্রচলিত, এবং প্রজননবিহীন। কিন্তু আরও গভীরে প্রবেশ করলে দেখব যথার্থ সংজ্ঞানির্ণয় এত সহজ নয়। কেন তা বলছি।

যখন বলি ঐ মানুষটি লম্বা কিংবা শক্তসমর্থ কিংবা ভাল, সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে আরেক জনের ছবি ভেসে উঠবে যিনি বেঁটে কিংবা দুর্বল কিংবা মন্দ। অর্থাৎ কিনা মনে মনে প্রথমজনের সঙ্গে দ্বিতীয়জনের তুলনা করি। তেমনি 'কামবিকৃতি' শব্দটি শুনলেই মনে হবে বুঝি একটা স্বাভাবিক মাপকাঠি আছে যা থেকে সরে গেছে বলেই এটা বিকৃত।

দুঃখের কথা, রতিব্যাপারে এমন কিছু নেই যাকে নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে এ্যাবসলিউট ষ্ট্যাণ্ডার্ড। নর্ম্যাল সেক্সুয়ালিটি বা স্বাভাবিক যৌন আচরণের এমন কোন মাপকাঠি নেই যা কিনা অনপেক্ষ ও সর্বজনসম্মত, যথার্থ এবং

প্রামাণ্য। ইতিহাসের ছাত্রমাত্রই জানে যৌনতার মাপকাঠি প্রচণ্ডভাবে পরিবর্তনশীল, শুধু যুগ থেকে যুগে নয়, দেশ থেকে দেশেও, এমন কি একই সমাজেও। পৃথিবীর কোন এক প্রান্তে কোন এক সমাজে আজ যা বিকৃত, ঘৃণ্য, সেটাই কিনা, আশ্চর্য কাণ্ড, শুধু গ্রহণীয় নয়, স্বাভাবিক রূপেও স্বীকৃত, তবে অন্য সমাজে অন্য প্রান্তে, এই একই সময়ে কিংবা অন্য কোন কালে। যথার্থতঃ নিখিল নীল বিশ্বে এমন কোন যৌন আচরণ নেই যা কোন না কোন কালে বিকৃত, গর্হিত। একদা প্রশংসিত স্বজনাবিবাহ (ফ্যারাওদের ভ্রাতাভগিনী বিবাহ) আজ কিনা অজাচাররূপে নিন্দিত। গ্রীসীয় সমকামিতার সেই গৌরবও কবে অস্তমিত!

আবার রতিতৃপ্তির স্বাভাবিক পথ থেকে সরে গেলেই কি বিকৃত বলব? না, একটি দুটি ক্ষেত্রে যদি বা বলি, সবক্ষেত্রেই নয়। আরেকটু তলিয়ে দেখা যাক।

মানসলৈঙ্গিক বিচারে সুস্থ এবং আবেগজ বিচারে পরিণত ব্যক্তির কাছে সাধারণতঃ সুরতই কামতৃপ্তির জন্যে সবচেয়ে তৃপ্তিপ্রদ উপায়। এটা অতএব অধিকাংশ সময়ই অধিকাংশ ব্যক্তির কাছে মুখ্য কামচেষ্টারূপে পরিগণিত হবে। এর অর্থ এই নয়, সরাসরি সুরতই এদের একমাত্র লক্ষ্য, কিংবা সুরতের বদলে অন্য কোন কামক্রীড়ার আশ্রয় নেবে না বা নেয় না, অথবা রতিবিহারের প্রারম্ভিক অঙ্গ হিসেবে ধর্ষমর্ষকামমূলক বা বস্তুকামমূলক বা প্রদর্শন-বিলসনকাম-মূলক কামকলা—এসবই অনুষঙ্গ যৌন আবেগের প্রকাশচিহ্ন—অনাস্বাদিত থাকবে। সত্যি কথা বলতে কি, এসবের কিছু না কিছু উঁকি দেয় প্রতিটি দম্পতিরই শয়নমন্দিরে। অর্থাৎ কিনা প্রতিটি কামবিকৃতির বীজ লুকিয়ে আছে আমাদেরই হিয়ার মাঝে।

পাণিমেহন, সুপ্তিস্খলন, রতিবিহীন উপচার (মুখমেহন ইত্যাদি), সমকামিতা, ইতরকামিতা, পশুকামিতা—এই ষড়বিধ উপায়ে সাড়া দেওয়ার ক্ষমতা মানব-যৌনতার একটি অঙ্গীকার। অভিব্যক্তির বিচারে এটা হচ্ছে জৈবিক উত্তরলব্ধি। অর্থাৎ কিনা যৌন প্রতিবেদনের বিচারে মানুষের এই বহুমুখতা পুরোদস্তুর স্বাভাবিক। কিন্তু নিবৃত্তির কোন একটি পথই যখন চরম এবং একমাত্র শর্তরূপে দেখা দেবে, কামবিকৃতির মুখোমুখি হব। অনুরূপভাবে, অনুষঙ্গ যৌন আবেগের প্রকাশচিহ্ন ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতে পারে মানবরতিতে, তখন এর রূপটি হবে যৌন আবেগের পরিপূরক, কাজে কাজেই সুস্থ ও স্বাভাবিক। কিন্তু অঘটন ঘটবে পরিপূরকের বদলি হলেই, অর্থাৎ স্বাভাবিক যৌন আবেগের সিংহাসনে

অনুষঙ্গ কোন একটি আবেগের অভিষেক অসুস্থ, অস্বাভাবিক, বিকৃত। কয়েকটি উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

রতিপুলক বৃদ্ধির জন্যে সুস্থ পুরুষ কল্পনার (কিংবা কোন অনুষঙ্গ যৌন আবেগের) আশ্রয় নিতে পারে এবং নিয়েও থাকে। রতিকালে স্ত্রীর কোন বিশেষ সাজের (যেমন কোন অন্তর্বাস, মোজা কিংবা পুষ্প) জন্যে অনুরোধ জানাতে পারে। তেমনি অনুরোধ জানাতে পারে স্ত্রী স্বামীকে কয়েকদিন না কামিয়ে দাড়ি গজানোর জন্যে, দাড়ির ঘর্ষণে পুলকিতা হতে চায়। এরা সবাই কি বিকৃত? উদার বিশাল দৃষ্টিতে এসবই স্বাভাবিক। কেননা দয়িতজনের সুস্থতা ও প্রসন্নতা বিঘ্নিত হয়নি এবং রতিযজ্ঞও শিবহীন সমান নয়।

অন্য এক স্বাভাবিক দম্পতির কথা, এরা মুখরত-র আশ্রয় নেয় ঠিকই কিন্তু সুরতমাধুরী বাদ পড়ে না কদাচ। কিংবা মাঝে মধ্যে পারস্পরিক পাণিমেহন, অবস্থার ফেরে সাময়িককালের জন্যে। পক্ষান্তরে, সুরতব্যাপার বাদ দিয়ে শুধুমাত্র এদুটিই যদি আশ্রয়স্থল হত, এঁদেরকে নির্দ্বিধায় বিকৃত বলতাম।

প্রায় প্রতিটি কামবিকৃতির অঙ্কুর মানবরতিতে খুঁজে পাব। অর্থাৎ প্রতিটি স্বাভাবিক ব্যক্তির হৃদয়ে এসব বাসনা লুকিয়ে আছে রতিপ্রাক্কালে যার প্রকাশ দেখব অতি অল্পমাত্রায় এবং একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত এসবই স্বাভাবিক। যেমন, কল্পনায় কিংবা বাস্তবে ব্যথাময় উদ্দীপনা চাই এমন অনেক নরনারী আছে, অন্যথায় রাগমোচন হবে না, তবুও এরা সুস্থ। পক্ষান্তরে, প্রকাশিত আক্রমণমূলক মনোভাব বা আচরণ যদি চরমে ওঠে, প্রহারে প্রহারে সঙ্গীকে জর্জরিত করবে কিংবা নিজে বিদ্ধ হবে এরূপ যাতনায়, নিঃসন্দেহে ধর্ষকাম-মর্ষকাম নামক বিকৃতকামিতার ঘটনা হবে। ঈক্ষণকাম, প্রদর্শনকাম, বস্তুকাম, এসবেও এই একই কথা প্রযোজ্য। অনুরূপভাবে সমলৈঙ্গিক কামানুষ্ঠান। মাঝে মধ্যে মুখবদল কিংবা অভাবে স্বভাব নষ্ট, তখন স্বাভাবিক। আবার এই একই আকর্ষণ নিয়ত, একপেশে এবং বাধ্যতামূলক রূপে প্রতিভাত হলেই কামনা বিকৃত হতে বাধ্য। প্রসঙ্গতঃ বলে রাখা ভাল, এই একই যুক্তির জাল ছড়িয়ে শুধুমাত্র সুরতঅভিলাষী ইতরকামী ব্যক্তিকে অস্বভাবী (নিদেনপক্ষে নিউরোটিক বলেছেন ডঃ এলবার্ট এলিস) বলা যায় না। এটা সঙ্গতও নয়, কারণ, একমাত্র সুরত (অন্তবিধ পাঁচটি উপায়ে অনীহা বা অক্ষমতা) যে পুরুষের লক্ষ্য তিনি আবেগজ বিচারে পরিণত (ডাঃ এ্যান্থনি ষ্টর) এবং সর্বাধিক পরণিত যৌন আচরণের নির্ভুল স্বাক্ষর দেখি ইতরকামিতায়।

অপ্রচলিত, দুর্লভ, অনৈতিক (? অস্বভাবী) বলেই বিকৃতির মোহর দিতে

হবে, এটা ধোপে টিকল না বিজ্ঞানের আলোয়। কামনার আনাগোনা যে সড়ক দিয়ে সেটা এতই বিশাল বিস্তৃত, কখনবা অলিগলি দিয়ে, এক কথায় এতই জটিল পথে বিচরণ যে কোন পথটি অস্বাভাবিক আর কোনটি বিকৃত তা হলফ করে বলা শক্ত। এপ্রসঙ্গ পরবর্তী অধ্যায়ে বিশদভাবে আলোচিত। শুধু দুর্লভ বা অতি অল্পদৃষ্ট, এই অজুহাতে পশুমেহনকে কামবিকৃতি বলা অন্যায়। কামনা-নিবৃত্তির একটি উপায় এবং শারীরবৃত্তীয় বিচারে একটি যৌন প্রতিবেদন। অভিব্যক্তির দিক থেকে বলা যেতে পারে, স্তন্যপায়ী প্রাণীদের কাছ থেকে পাওয়া মানবযৌনতার একটি ধর্ম। তেমনি যুক্তির জাল ছড়ানো যায় অপ্রচলিত এবং অনৈতিক কামানুষ্ঠানের ক্ষেত্রেও।

অস্বভাবী কামানুষ্ঠানে এবং বিকৃতকামিতায় তফাৎ অনেক। ইতরকাম অনুষ্ঠানে কতিপয় উপচারে, যেমন পারস্পরিক পাণিমেহনে, অস্বভাবী নামক বিশেষণটি প্রায়শঃ আরোপিত। দয়িতজনের মধ্যে মাঝে মাঝে কিংবা রতারম্ভ হিসেবে এবংবিধ অনুষ্ঠান অস্বভাবী নয়, বিকৃত তো নয়ই। কিন্তু অজস্র সুযোগ সুবিধা থাকা সত্ত্বেও কোন এক অজ্ঞাত কারণে আভ্যন্তর রত অর্থাৎ সুরত প্রচেষ্টা যদি শিকেয় তোলা থাকে এবং শুধুই বাহ্যরত নিয়ে সতত মাতামাতি, ব্যাপারটা অস্বভাবী এবং বিকৃত হতে বাধ্য।

যৌনতার একমাত্র কার্য বা স্বাভাবিক উদ্দেশ্য প্রজননই, এমতবাদে প্রবল আস্থা ছিল অনেক বৈজ্ঞানিকেরই, এবং এখনও যে না দেখি তা নয়, এদের কাছে প্রজনন গন্ধ নেই এমন কামচেষ্টা মাত্রই উপেক্ষিত। একদা তাই বিকৃতির চিহ্ন পড়ত সেই সব কামাচরণে যা প্রজননভারে নুয়ে পড়ত না কিংবা সুরত বাদ দিয়ে রচিত রতি-নাটকে। তা হলে তো রতিবিহীন উপচারকেও বিকৃতি বলতে হয়, আদর বিনিময়ের উদ্দেশ্যে শুধুমাত্র চুম্বনকেও। তাই যদি হত পৃথিবীর প্রায় সবাইকে কামবিকৃত হতে হবে। কাজে কাজেই প্রজননবিহীন কামানুষ্ঠান মাত্রই বিকৃতরূপে চিহ্নিত হতে পারে না।

এক কথায়, দুর্লভ, অপ্রচলিত, অনৈতিক, অস্বভাবী, অজৈবিক, এসব ভূষণ পরিয়ে দিলেই বিকৃত হয় না। সত্যিকারের যে বিকৃতকাম সে রতিসম্পাদনে অক্ষম কিংবা সুরতব্যাপারটা পুনঃপুনঃ দূরে সরিয়ে রাখে। এক বা একাধিক যৌন আগ্রহ (অনুষঙ্গ আবেগ), সাধারণ (এ্যাভারেজ) মানুষের রতিজীবনে যার ভূমিকা গৌণ, সেটাই কিনা মুখ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ, রতিতৃপ্তির জন্যে অপরিহার্য এবং একমাত্র উপায়। সুরতসম্ভোগের পথ কণ্টকিত নয়, যেমন

অনায়াসলভ্য তেমনি মসৃণ, তথাপি সুরতবর্জন এবং পরিবর্ত পদ্ধতি বাধ্যবাধকতার সঙ্গে আঁকড়ে ধরাই প্রাপ্তবিকারের প্রধান পরিচয়।

দেখা গেল, আপাতদৃষ্টিতে যৌনতাপ্রকাশের অস্বভাবিতাই কামবিকৃতির আসল পরিচয় নয়। স্বাভাবিক পথ থেকে সরে গেছে কিংবা অস্বাভাবিক পথে ধাবিত, এই হেতু কোন অনুষ্ঠান, দৃষ্টান্তস্বরূপ ধর্ষকাম, সমকাম, বস্তুকাম, বিকৃত নয়। আরও তিনটি সম্বন্ধ-বিশিষ্টতা থাকা চাই:

এক, প্রাধান্য। সুরতের পরিবর্তে অন্য কোন কামক্রীড়া প্রভুত্ব বিস্তার করবে। নিরন্তর, অনবরত। এক-আধ দিন নয়, এক আধবারও না। পুনঃপুনঃ অনুষ্ঠিত হবে। সমগ্র যৌন-সত্তা গ্রাস করবে কিংবা স্বভাবী রতি (অর্থাৎ সুরত) বাদ পড়বে প্রায়শঃ। দুই পুরুষের কথা ধরা যাক, উভয়েই নর ও নারীর প্রতি অনুরক্ত। তথাপি কামানুষ্ঠানের প্রাধান্যভেদে একজন সমকামী, অন্যজনে ইতরকামী। ইতরকামীজনে পুরুষের চেয়ে নারীর প্রতি কামাবেগ অধিক, এই হেতু ইতরকাম অনুষ্ঠানের সংখ্যাও অধিক। বিপরীত ছবিটি দেখব দ্বিতীয়জনে, ইনি তাই সমকামী।

দুই, পরিবর্ত পদ্ধতিতে একনিষ্ঠতা। কামতৃপ্তির জন্যে নির্বাচিত পদ্ধতিটিই একমেবাদ্বিতীয়ম্। অর্থাৎ বিকৃতকাম ব্যক্তির পক্ষে দ্বিতীয় পদ্ধতি অসম্ভবপ্রায়।

এদের বাঁশী শুধু একটি সুরই জানে। সর্বাবস্থায় শুধু একটি প্রকরণই এদের কাছে প্রিয়। এবং এটি এদের চাইই। এই যে একাসক্তচিত্ততা, শুধু একটিতেই নিবদ্ধ থাকা, কেবলি একই পদ্ধতির বশীভূত থাকাটাই—ইংরেজীতে একেই বলা হয় এক্সক্লুসিভনেস—এদের বিশেষত্ব।

কামতৃপ্তির উদ্দেশ্যে ষড়বিধ উপায়ের কথা বলেছি কিন্তু এদের মধ্যে শুধু একটিই, যেমন পাণিমেহন কিংবা সমকামিতা, একমাত্র পথ হিসেবে নির্বাচিত হতে পারে। কিংবা শৃঙ্গারের অঙ্গ হিসেবে ব্যবহৃত কোন একটি উপচারে একান্তনির্ভরতা, যেমন শুধুই নিরীক্ষণ কিংবা শুধুই প্রদর্শন। এভাবে তৃপ্ত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে কামবিকারযুক্ত। এদের কাছে পাণিমেহন কিংবা সমকামিতা, নিরীক্ষণ কিংবা প্রদর্শন কামতৃপ্তির একমাত্র উপায়। নান্যেব গতিরন্যথা।

তিন, বাধ্যতা। প্রাপ্তবিকার ব্যক্তির কামানুষ্ঠান বাধ্যতামূলক। স্বেচ্ছা-প্রণোদিত নয়, সজ্ঞান মনের নিয়ন্ত্রণাধীনও না। মনের মধ্যে একটা প্রচণ্ড আবেগ বা প্রতীকী কল্পনা কুরে কুরে খায়, শেষ পর্যন্ত এটাই তাকে বাধ্য করায়। এমনটি—যেমন সমকামিতা—না করে (বা ভেবে) নিষ্কৃতি নেই, এমনই অন্ধ আবেগ তাড়িত, বাধ্যতাই যার মূলীভূত কারণ।

স্পষ্টই বোঝা গেল, কামবিকারের পরিচয় শুধুমাত্র সুরতবর্জনে নয়, প্রজননহীনতাও দিগ্‌দর্শক নয়। আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে, কামীজনের সঙ্গে কামানুষ্ঠানে বাধ্যবাধকতা সম্পর্ক, কোন একটি বিশেষ কামানুষ্ঠানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং একান্তনির্ভরতা। কামবিকৃতির যথার্থ সংজ্ঞা অতএব এই : কামবিকৃতি হচ্ছে রতিতৃপ্তির উপায়বিশেষ, প্রধানতঃ কিংবা একমাত্র, প্রায় প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই সুরত* বাদ দিয়ে এবং বাধ্যতা নামক আবেগ বিজড়িত।

সেক্সুয়্যাল ডিভিয়েসন বা পার্ভার্সান শব্দটি অপ্রীতিকর, শব্দগত অর্থেও সামঞ্জস্য নেই। শব্দটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে মনে হবে একটা নির্দিষ্ট স্বাভাবিক বিন্দু থেকে সরে এসেছে, যেটা সত্য নয়। অধিকন্তু মনের মধ্যে যে ভয়ঙ্কর ছবিটি—কদর্য, ঘৃণ্য, লালসাদুষ্ট ছবিটি ভেসে উঠবে সেটা অনেক অস্বভাবিতায় নেই। পার্ভার্সান বললে বড় বেশী বলা হয়, বড় বেশী হেয় করা হয়। একলঙ্ক সাজে না অনেক বিকৃতিরই। একারণে ভিন্ন শব্দ প্রবর্তন করতে চেয়েছেন কোন কোন বৈজ্ঞানিক। তাই না, মহামতি ষ্টেকেল-এর পছন্দ 'প্যারাফিলিয়া', যার মূলগত অর্থ 'প্যারালাল টু লাভ', অর্থাৎ এমন একটা আবেগ যা প্রেমের সঙ্গে সমান্তরালভাবে স্থিত। এই প্রতিশব্দ ব্যবহার করতে দেখেছি ডঃ এলবার্ট এলিস ও অন্যান্য মনোবিদ্‌কে। ডাঃ হ্যাভলক এলিস নাম রেখেছেন যৌন প্রতীকতা (ইরটিক সিম্বলিজিম), কারণ অস্বভাবী কার্যকলাপের ছদ্মবেশে মৈথুনকর্মই প্রকাশিত, অর্থাৎ সুরতেরই প্রতীকচিহ্ন। পণ্ডিতরা যাই বলুন, কামবিকৃতি আর পার্ভার্সান এতই সহজবোধ্য, এতই জনপ্রিয় যে, এনামই টিকে গেল। তা ছাড়া এমন অনেক অস্বভাবিতা আছে যাকে যৌনপ্রতীকতার প্রকাশচিহ্ন কিংবা প্যারাফিলিয়া বললে বড় কম বলা হয়। এদুই কারণে, আমরা বিকৃতিলক্ষণাক্রান্ত কামানুষ্ঠানকে কামবিকৃতিই বলব, ইংরেজীতে পার্ভার্সান বা ডিভিয়েসন।

প্রকারভেদ

পরিণত, সুস্থ ও বয়স্ক পুরুষ সাধারণতঃ নারীকেই বেছে নেয় এবং কামতৃপ্তির উপায়টি হল সুরত। বৈজ্ঞানিক পরিভাষায়, পুরুষের (কিংবা নারীর) 'কামপাত্র' অতএব নারী (কিংবা পুরুষ) এবং উভয়েরই 'কামচেষ্টা' হল সুরত। এখন এই কামানুষ্ঠান বিকৃত হতে পারে দুটি প্রধান উপায়ে : কামপাত্র কিংবা কামচেষ্টার পালাবদল ঘটিয়ে। প্রথমোক্ত দলে যারা ভীড় করেছে তাদের কাছে সুরতব্যাপার বর্জিত, এবং গোপনাঙ্গের বদলে মুখবিবর কিংবা পায়ুদেশই এদের

* এখন থেকে সুরত অর্থে লিঙ্গযোনি সহবাসই বুঝতে হবে।

কাছে একান্ত প্রিয়, এরা মুখকামী কিংবা পায়ুকামী। পরের সারিতে যারা আছে তাদের কাছে গোপনাঙ্গ আছে শুধু নৈকট্য হিসেবে, আসলে এরা প্রিয়জনের মলমূত্রত্যাগেই আকৃষ্ট, এটা মলকাম বা মূত্রকাম। আরেকদল গোপনাঙ্গ বর্জন করেছে সম্পূর্ণরূপে, বদলি হিসেবে পেয়েছে দেহেরই কোন অঙ্গ, যেমন স্তন, পদ, কেশদাম, কিংবা দেহজ আকর্ষণ অসারবোধে নির্বাচিত হয়েছে বস্ত্র, জুতা—এদের প্রত্যেকেরই আকর্ষণ বস্তুকাম রূপে খ্যাত। এপর্যায়ের শেষের সারিতে যারা আছে তারা সমগ্র পাত্রীকেই চায়, তবে কিনা অসহায় প্রতিরোধহীন অবস্থায়, অর্থাৎ কিনা শবরূপে, এটা শবকাম।

অস্বভাবী কামপাত্রের আরও কয়েকটি উদাহরণ দিই। প্রথমেই উল্লেখযোগ্য সমলৈঙ্গিক পাত্র, ভিন্নলৈঙ্গিক পাত্রের, যেমন নারীর, পরিবর্তে শুধু পুরুষে অনুরাগ জন্মাতে পারে, এটা সমকামিতা। অনুরাগ জন্মাতে পারে (সমলৈঙ্গিক কিংবা ভিন্নলৈঙ্গিক) অসমবয়স্ক পাত্রে, অতিবয়স্ক কিংবা অল্পবয়স্ক, প্রথমটি প্রৌঢ়কামিতা, দ্বিতীয়টি বালকামিতা। কিংবা মনুষ্যেতর কোন প্রাণীতে, এটা তির্যকমেহন, পশুকামিতা। অথবা নৈর্ব্যক্তিক কোন কিছুতে, প্রাণহীন কোন বস্তুতে, যার নাম বস্তুকাম।

কামচেষ্টার রং বদলায় দ্বিতীয় প্রধান পথটিতে। এখানে কামপাত্র প্রায় স্বাভাবিক। তবে কিনা সম্পর্কস্থাপনের ধারাটা আমূল বদলে গেছে। রতিব্যাপারে উদ্যোগপর্ব রূপে কামানুষ্ঠান অভিলাষীরাই দ্বিতীয় দলে সমাবিষ্ট, এদের জীবনে অংশতঃ আবেগ কিংবা অনুষঙ্গ আবেগসমূহই প্রধান, মূল যৌন আবেগের (সুরতের) ধারাটি শুকিয়ে গেছে। এদের আনন্দ তাই প্রিয়জনকে ব্যথা দিতে (ধর্ষকাম) বা প্রিয়জনের কাছ থেকে ব্যথা পেতে (মর্ষকাম)। কখন তৃপ্তি শুধুই নারীদেহমাধুরী নিরীক্ষণে (ঈক্ষণকাম) কিংবা নারীকে লিঙ্গপ্রদর্শনে তৃপ্তি (বিলসনকাম)।

ব্যক্তিভেদেও শ্রেণীবিন্যাস সম্ভব। এক, ব্যক্তিক কামবিকৃতি। ব্যক্তিকে আশ্রয় করেই এবিকৃতি। লিঙ্গভেদে এটা আবার দুরকমের, সমকামবিষয়ক এবং ইতরকামবিষয়ক। যেমন, সমকাম বালকামিতা, ইতরকাম প্রৌঢ়কামিতা। দুই, নৈর্ব্যক্তিক বিকৃতকামিতা। ব্যক্তিবিহীন বিকৃতি, যথা বস্তুকাম, বসনকাম।

বিকৃতকাম ব্যক্তি প্রধানতঃ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত। একদলের যা কিছু অস্বভাবিতা সবই মনে মনে, শুধু বিকৃত কামানুষ্ঠানের কল্পনাতেই তৃপ্ত। কল্পনার গণ্ডি পেরিয়ে বাস্তবে রূপায়িত হতে পারে, এরাই দলে ভারী। অর্থাৎ বাস্তবে অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত এদের তৃপ্তি নেই। অন্য কয়েকজনের বিকৃতি পরিবেশ

নির্ভর। দুষ্ট পরিবেশে কিংবা অসুস্থ প্রভাবে—যেমন রোগের প্রকোপে, ঔষধ-সেবনের বা মদ্যপানের প্রতিক্রিয়া হিসেবে কামবিকার দেখা দিতে পারে।

কামবিকৃতির শিকার প্রধানতঃ পুরুষরাই, কখনবা নারী। ক্বচিৎ কখন একই অঙ্গে একাধিক বিকৃতকামিতার উপস্থিতি সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি, ধর্ষকামিতার সঙ্গে সমকামিতার অবস্থান আশ্চর্য নয়। সমাজে যথার্থ কামবিকৃত ব্যক্তির সংখ্যানির্ণয় দুঃসাধ্য। শতকে গুটিক বলা হয়, কিন্তু এসংখ্যা মনে হয় অনেক বেশী। কেননা বিকৃতদের অধিকাংশই চিকিৎসার জন্যে আসে না কিংবা অপরাধ করে না। সমকাম, বস্তুকাম এবং প্রদর্শনকাম, এই ত্রিবিধ বিকৃতকামই সর্বাধিক দৃষ্ট। অল্পদৃষ্ট পঙ্‌ক্তিতে রয়েছে ধর্ষমর্ষকাম, নিরীক্ষণকাম, বালকামিতা, প্রৌঢ়কামিতা, তির্যকমেহন, ঘর্ষণকাম, শবকাম, মলমূত্রকাম।

বিকৃত কামানুষ্ঠানের আসল রূপটি ভস্মাচ্ছাদিত। কিংবা বাধাপ্রাপ্ত, যেমনটি বায়ুরোগে ঘটে। প্রতিবর্তী ক্রিয়া রূপে গণ্য করলে চলবে না। এটা হচ্ছে মানবসম্পর্কে ব্যর্থতা। এটা আসলে দয়িতজনের বদলিবিশেষ। যেমন সমকামীর কাছে পুরুষ হচ্ছে নারীর বদলি, তেমনি বস্তুকামীর কাছে বস্তু হচ্ছে গোপনাঙ্গসমান। প্রদর্শনকামীর কাছে প্রদর্শনকর্ম স্বুরততুল্য। ধর্ষমর্ষকামীর প্রভুত্ব কিংবা বশ্যতাও তাই।

বিকৃতকাম হচ্ছে বয়স্ক প্রেমসম্পর্ক স্থাপনে ব্যর্থতারই বহিঃপ্রকাশ। এবং এটাই রাতারাতি অদৃশ্য হয়ে যাবে, যদি বিকৃতকাম প্রেমে পড়ে, অবশ্য ইতরকাম-সম্বন্ধী বয়স্ক ব্যক্তির সঙ্গে। এবং শেষোক্ত ব্যক্তির সঙ্গে প্রণয়ার্থে যতটুকু পরিণতির প্রয়োজন তা যদি ফিরে পায়।

বিকৃতকাম মানে মানবসম্পর্কে ব্যর্থতা, পূর্ণতঃ বা অংশতঃ। ইতরকামসম্বন্ধী ব্যক্তির সঙ্গে সমান ভিত্তিতে সম্পর্করচনায় অপারগ, সম্পূর্ণভাবে তৃপ্তিজনক উপায়ে ভালবাসার দেওয়া নেওয়ায় অক্ষম। বিকৃতকামিতাকে অতএব বলা যেতে পারে ভালবাসাহীন যৌনতার ইতিহাস।

স্বেচ্ছাকৃত কর্ম নয়, দুষ্টবুদ্ধির তাড়না নয়, অতিশয় রতিভারে কৃত তাও নয়। বিকৃতভাবের মূলীভূত কারণ: স্বুরতভীতি আর বাধ্যতা। এভাবে একটা তৃপ্তি মেলে ঠিকই কিন্তু এটাই সব নয়। কেননা বাধ্যতাজনিত এই অনুষ্ঠানই তৃষ্ণা মেটায় সঙ্গলাভের আর প্রশংসা অর্জনের আর আত্মমর্যাদা পুনরুদ্ধারের।

উৎস

অন্যান্য মৌল প্রবৃত্তির মত, একই স্বাভাবিক নিয়মে যৌনতাও স্বাভাবিক

পথ থেকে সরে যেতে পারে। এবং সেই 'নেচার' ও 'নার্চার' দ্বন্দ্ব এখানেও চোখে পড়বে। স্বভাবতঃই সমধিক গুরুত্ব আরোপিত প্রকৃতি (নেচার) অপেক্ষা পরিবেশেই। অর্থাৎ অর্জিত বা লব্ধ কারণাবলীই অধিকাংশ পণ্ডিতের আস্থা অর্জন করেছে এবং সাম্প্রতিককালের প্রায় প্রতিটি গ্রন্থেই এজাতীয় মতবাদ প্রতিষ্ঠিত। কেউ কেউ অবশ্য জন্মগত মতবাদে বিশ্বাসী। প্রসঙ্গতঃ বলে রাখি প্রাচীনকালে এটাই ছিল একমাত্র মত। উৎসবিচারে কামবিকৃতি অতএব দুটি প্রধান শিবিরে বিভক্ত: জন্মগত আর অর্জিত। ক্বচিৎ কখন, মস্তিষ্কে আঘাত বা ব্যাধিও কারণস্বরূপা হতে পারে।

জন্মগত—সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীতে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম কয়েক দশকে সহজাত মতবাদের জয়জয়কার। তদানীন্তন জার্মান বিশেষজ্ঞগণ, ডাঃ ক্রাফট-এবিং, ডাঃ ম্যাগনাস হির্শফেল্ড, এবং হ্যাভলক এলিস-এর মত দিকপাল, এঁরা সকলেই অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছেন। এঁদের বক্তব্য বিকৃতি এসেছে স্বতঃপ্রবৃত্ত-ভাবে, কখন পূর্বপুরুষদের অনুসরণ করে, এরই নাম এ্যাটাভিজম। কখন বংশ-গত উত্তরলব্ধি হিসেবে। কখন প্রকৃতিগত বা জন্মগত প্রবণতার জের টেনে। কখনবা জেনেটিক ত্রুটির মাধ্যমে।

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে সি. লম্ব্রসো অতি উৎসাহভরে প্রবর্তন করেছিলেন পূর্বগানুকৃতি মতবাদের, যার মূল বয়ানটি হল পূর্বপুরুষদের দোষ-ত্রুটি, আচার-আচরণ, অভ্যাস, এসবের ছাপ পড়বে আমাদের জীবনে। এটা কোন সন্তোষ-জনক ব্যাখ্যা নয়, এদিয়ে সমকামিতা কিংবা ধর্ষকামিতার কোন অর্থবোধও হয় না। এটা তাই বর্জিত, পরিত্যক্ত।

অভিন্ন যমজদের মধ্যে দেখা গেছে একজন বিকৃত হলে অন্যজনেও সেই পথের শরিক হবে। এই পর্যবেক্ষণ থেকে বলা হয়েছে এটা বংশগত। অর্থাৎ পিতা পিতামহের ছিল, তাদের কাছ থেকে পাওয়া।

জেনেটিক ত্রুটি হেতু এরা আবেগজ পরিণতি পায় না, বয়স্থ পরিণত ব্যক্তির যৌনতা পূর্ণভাবে এদের অধিগত নয়। কিংবা জিনসম্বন্ধী কোন কারণে, মাতৃনির্ভরতা কাটিয়ে উঠতে পারে না, পিতামাতার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদে অপারগ, যার ফলে কামের এই বিকার বা ব্যত্যয়। কোন কোন পণ্ডিতের ধারণায়, ক্রোমোজোম অস্বভাবিতাই সমকামিতার হেতু। জিন-বিশেষজ্ঞগণের মতে, বিকৃতকামের মূলীভূত কারণ জীবকোষমধ্যস্থ ক্রোমোজোম ও জিনের সেই পরিবর্তন, বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় যার নাম 'মিউটেসন'।

একদা জনপ্রিয় জন্মগত মতবাদের আজ আর সেই রবরবা নেই। কারণ

কিছু কিছু বিকৃতি চিকিৎসাসাধ্য এবং এঘটনাই দেখিয়ে দিচ্ছে সহজাত মতবাদের অসারতা। তদুপরি ঘটনাভিত্তিক পর্যবেক্ষণ সর্বজনস্বীকৃত নয়, এবং কালেভদ্রে পরিলক্ষিত হলেও প্রমাণিত হয় না। কেননা আরও কার্যকারণ থাকতে পারে।

রেশমী অন্তর্বাস বা লাল চুলে অসীম আগ্রহ—ব্যাপারটা এতই স্পষ্ট যে এটা জন্মগত নয়, অভিজ্ঞতার ফলাফল। অন্যদিকে কতিপয় কামবিকারের, বিশেষ করে সমকামিতার উৎস জন্মগত হলেও হতে পারে, তথাপি সন্দেহের অবকাশ আছে যথেষ্ট। কিন্তু বস্তুকাম, বসনকাম এবং অন্যান্য বিকৃতির ক্ষেত্রে তিলমাত্র সন্দেহ নেই, শৈশবাবস্থার প্রভাব ও অভিজ্ঞতাই দায়ী।

অর্জিত—এব্যাপারে সকলেই একমত, এটা যদি অর্জিত হয়, শৈশবেই হবে। অর্থাৎ প্রায় প্রতিটি বিকৃতির বীজ বাল্যেই প্রথম বপিত। একথা প্রথম থেকে বলার দুর্লভ কৃতিত্ব কালজয়ী ডাঃ সিগমুণ্ড ফ্রয়েড-এরই। এঁর মতে শিশু বহুমুখকামী। অর্থাৎ শিশুকে প্রায় প্রতিটি বিকৃতকামিতাই স্পর্শ করবে, অবশ্যই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র সংস্করণে। এবং এই কামবহুরূপতা একটি বৈশিষ্ট্য। আরেকটি বৈশিষ্ট্য কামজ ক্রমবিকাশের একটি সুনির্দিষ্ট ধারা আছে। প্রথম পাঁচ বছরে কামের শৈশব দশা—শুরুতে মুখকাম দশা তারপর ক্রমান্বয়ে পায়ুকাম দশা ও মূত্রকাম দশা এবং শেষে লৈঙ্গিক দশা। পরিণত দশা সূচিত হয় বয়ঃসন্ধি-কালে—কামস্থানরাজির মধ্যে লৈঙ্গিক প্রাধান্য, কামজ সহচরবৃত্তিগুলির (দর্শন, পীড়ন ইত্যাদি) একীভবন এবং ইতরকামিতা, এই তিনটি প্রচেষ্টার সমাবেশে প্রাপ্তবয়স্ক পরিণত কামিতার প্রতিষ্ঠা (এ প্রসঙ্গ আরও বিশদভাবে আলোচিত আমার অন্য বই 'বিবাহিত জীবন-এ)। কোন কারণে সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে উঠতে না পারলে, কামস্রোত যে নির্দিষ্ট বিন্দুতে থেমে যাবে সেটাই পরিণত বয়সে পুনরাবৃত্ত হবে। যেমন মুখকাম দশায় থেমে থাকা মানুষ ধর্ষকামী হবে, পায়ু-কামে আবদ্ধ মানুষ হবে সমকামী। ফ্রয়েডীয় মতে, এটাই আদিতম মতবাদ, ইডিপাস গূঢ়ৈষাই আদি কারণ। এটা আর কিছু নয়, সেই শৈশবকামিতারই ছবি, তবে কিনা বহুল বর্ধিত এবং মূল কামস্রোত ভিন্ন ভিন্ন সহচর উপাদানে বিভক্ত, ভিন্ন ভিন্ন অনুষঙ্গ আবেগে খণ্ডিত।

রতিব্যাপারে পরিবেশেরও প্রচণ্ড প্রভাব আছে, এমন কি মানুষকে বিকৃত-কাম করে দিতে পারে এই পরিবেশেই। পরিবেশবাদীদের প্রাণপুরুষ ডাঃ আই. পি. পাভলভ প্রবর্তিত 'প্রতিবর্তী ক্রিয়া'-র আশ্রয়ে কিছু কিছু বিকৃতি ব্যাখ্যা করা যায়। পুনঃপুনঃ উদ্দীপ্ত হওয়ার ফলে যে কোন ঘটনাই যৌনবহ হয়ে

উঠতে পারে। যেমন শিক্ষক কর্তৃক বেত্রাঘাতের অভিজ্ঞতা থেকে ধর্ষকামের উদ্ভব। শৈশবকালীন কোন বস্তুর সঙ্গে সুখানুভূতি যদি বারবার জড়িয়ে পড়ে, বস্তুরতি দেখা দিতে পারে।

আরেকদলের মতে, বিকৃতকাম হচ্ছে পরিণত প্রেমে ব্যর্থতা, আবেগজ অপরিণত অবস্থার উল্টো পিঠ, এবং এরও উৎস সেই শৈশবে। এটা সহজেই বোঝা যাবে শৈশবকালীন বাধাবিপত্তি বিশ্লেষণে—পিতামাতার সঙ্গে শিশুর সম্পর্ক, নির্ভরতা ও একাত্মতা। শৈশবে জাত অপরাধবোধ ও হীনতাবোধ লুপ্ত না হয়ে বিরাজিত থাকে বলেই এহেন দুরবস্থা, বলেছেন ডাঃ এ্যান্থনি ষ্টর।

সাম্প্রতিককালে মনোবিদ্‌গণের শ্যেন দৃষ্টি পড়েছে ব্যক্তিজীবনে সামাজিক প্রতিক্রিয়ায়, বিশেষ করে এক ব্যক্তির সঙ্গে আরেক ব্যক্তির ব্যবহারগত আচরণের প্রতিক্রিয়ায়। কোন কোন মনোবিদের ধারণায়, এটা হচ্ছে সাধারণ ব্যক্তিত্ববিষয়ক সমস্যা কিংবা সেই বিশেষ সমস্যা যার মূলে রয়েছে এক ব্যক্তির সঙ্গে আরেক ব্যক্তির সম্পর্ক। ডাঃ ক্লারা টম্পসন এই সিদ্ধান্তে উপনীত—কামবিকৃতিকে শুধু ব্যক্তিত্ব সমস্যার লক্ষণ হিসেবে গণ্য করাই উচিত।

সর্বাধুনিক এবং সর্বশেষ (?) উৎস : লিঙ্গভূমিকা (জেণ্ডার রোল)। ডাঃ জন মনি, ডাঃ জন হ্যাম্পসন এবং ডাঃ যোয়ান হ্যাম্পসন (সকলেই আমেরিকান মনোবিদ্) কর্তৃক প্রথম প্রবর্তিত। শতাধিক পূর্ণক্লীব ও অর্ধক্লীব নরনারীর গবেষণালব্ধ পর্যবেক্ষণ থেকে জানা যায় অতি শৈশবেই লিঙ্গভূমিকা গেঁথে যায় মানবচিত্তে, তারপর বদল করতে গেলেই বিপর্যয় অনিবার্য। আরও জানা গেছে, মানসলৈঙ্গিক বিচারে প্রতিটি শিশুই নিরপেক্ষ (নিউট্রাল) অর্থাৎ সে যখন জন্মে তখন তার কোন লিঙ্গ নেই, না সমকামী, না ইতরকামী, বলা যেতে পারে লিঙ্গনিরপেক্ষ। তারপর ধাবিত হয় একটা লিঙ্গের দিকে যার শেষ পরিণতি ইতরকাম কিংবা সমকাম।

পিতামাতার কাছে শিশু পুত্র কিংবা কন্যাসম পালিত হয়। লালনপালনের মধ্য দিয়ে যে জগৎ ধরা পড়ে সেটাই হল আরোপিত লিঙ্গ (এসাইনড সেক্স), এরই মহলা দেবে বারবার তার খেলার মধ্যে আর কল্পনার জগতে। এভাবে একটা নির্দিষ্ট লিঙ্গ ভূমিকা গড়ে উঠতে থাকে। বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে অভিজ্ঞতা ও পরিবেশের মধ্য দিয়ে যেতে হয়, যে শিক্ষাদীক্ষা, ধ্যানধারণা, সমাজসংস্কৃতি অভিভাবক কিংবা কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তিদের কাছ থেকে পায় তাই দিয়ে পূর্ণ হয় পুংলিঙ্গ কিংবা স্ত্রীলিঙ্গ ভূমিকা, রতিজ বিন্যাস সমেত। শেষ পর্যন্ত সমলৈঙ্গিক ভূমিকার সঙ্গে একাত্মবোধের ফলে ইতরকাম বয়স্ক পুরুষ জন্ম নেয়।

এই আলোকে দেখব, কামবিকৃতি হচ্ছে ভুল শিক্ষার পরিণাম, নিউরোটিক চরিত্রপূজা কিংবা বিপরীতলৈঙ্গিক একাত্মতা। প্রকৃষ্ট উদাহরণ, বসনকামিতা, বিপরীতকামিতা, এবং সমকামিতা। বিকৃতিমাত্রই অসুস্থতার চিহ্ন ধরে নিলে শুধুই যে ভুল হবে তা নয়, বেশী বলাও হবে। বরং সামাজিক প্রসঙ্গে শিক্ষালাভ ও অভিজ্ঞতার ফসল বলেই মনে হয়।

পুরুষরাই কেন সংখ্যাগরিষ্ঠ ?

চমক লাগলেও এটা সত্য, অধিকাংশ বিকৃতিই পুরুষজগতে দৃষ্ট, যদিচ কিছু কিছু নারী বিকৃতকামিতার শিকার হতে পারে। বসনকাম, বস্তুকাম, প্রদর্শনকাম, নিরীক্ষণকাম, এবং ধর্ষমর্ষকামমূলক কাহিনী শ্রবণে উদ্দীপ্ত হওয়া, এসবই পুরুষদেরই একচেটিয়া। কারণ হিসেবে কিনসী ও তাঁর সহকর্মীগণ বলেছেন, যৌন অভিজ্ঞতা এবং সেই সূত্রে কামপাত্রী দ্বারা সহজে শর্তাবদ্ধ হয় পুরুষরাই।

আর একটি উল্লেখযোগ্য কারণ, পুরুষত্বে আশ্বস্ত হতে চায় পুরুষই এবং রতিক্ষমতার সপ্রমাণ অস্তিত্ব দেখতে চায় অহরহ। নারীর সঙ্গে যদি তুলনা করি, যৌন ভূমিকায় অধিকতর আশ্বস্ততার বড় বেশী প্রয়োজন পুরুষেরই এবং এপ্রয়োজনের গভীরে আছে আরও তিনটি কার্যকারণ। এক, রতিব্যাপারে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে পুরুষকে অঙ্গোত্থান আনতে হবে এবং সেই দৃঢ়তা বজায় রাখতে হবে। পক্ষান্তরে, এমন কোন শর্ত নেই নারীর, তার কাছে নিষ্ক্রিয়তা আর সক্রিয়তা দুই-ই সমান। দুই, বাল্য থেকে যৌবনে পদার্পণ এবং প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে পুরুষকে বেশ কয়েকটি সিঁড়ি অতিক্রম করতে হয়, মনোরাজ্যে মাতৃনির্ভরতা পেরিয়ে আসতেই হবে, স্বকীয় স্বতন্ত্র সত্তায়। নারী অপরদিকে মাতৃসত্তার সঙ্গে নিবিড়ভাবে একাত্ম থাকতে পারে। তিন, পুরুষের কাছে কোন বিকল্প নেই মাতৃত্বের, যা নারীকে এনে দেয় গভীর স্থায়ী তৃপ্তি, সর্বোপরি নারীরূপে প্রতিষ্ঠা। অধিকন্তু, কর্মক্ষেত্রে পুরুষালি সাফল্যের নিরিখ বেশ বড় মাপের, সুদূরবিস্তৃত, এবং সেই মাতৃত্বের মত স্বগায় আস্বাদের তুল্যমূল্য কিছু নেই। এবংবিধ কারণে, অধিকাংশ বিকৃতি পুরুষসমাজেই নিবদ্ধ।

বিকৃতকামীদের বৈশিষ্ট্য

অধিকাংশই পুরুষ। প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে এদের অসুবিধা বড় বেশী। এরা অসামাজিক, অর্থাৎ মিশুকে নয়। নিজেকে গুটিয়ে রাখে, এরা নিঃসঙ্গ থাকতেই ভালবাসে। এরা ইন্ট্রোভার্ট, এদের চিন্তা অন্তর্বৃত, এবং এই অন্তর্মুখীনতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। অন্তর্বৃত্ত ব্যক্তিমানসে প্রতিবর্তী ক্রিয়া অতিঅল্পেই প্রতিষ্ঠিত হয়, একারণে সহজেই

শর্তাবদ্ধ এবং তীব্র পাপবোধে জর্জরিত হয় প্রায়ই। কোন অনুষ্ঠানের বদলে চিন্তা করতে ভালবাসে অর্থাৎ কিনা কল্পনার জগতে বসবাস করে। আবেগজ বিচারে অপরিণত।

তীব্র পাপবোধ আর চরম হীনতাভাব এদের বৈশিষ্ট্য। স্বভাবী যৌন আবেগ ভয়ঙ্করভাবে পাপবোধ দিয়ে জড়ান। অর্থাৎ সুরতব্যাপারটা ভয়লজ্জা-পাপ বিজড়িত। কিন্তু এই অনুপাতে পাপবোধ অনেক কম। সমকাম, বসনকাম, নিরীক্ষণকাম ইত্যাদি অস্বভাবী কামসমূহে এই অপরাধী মনোভাবের জন্যেই এরা নিজেকে অরক্ষিত নিরাপত্তাহীন ভাবে, ছোট ভাবে, মনে করে আত্মমর্যাদাও ধূলিলাঞ্ছিত। ফলে মানুষকে ভালবাসতে পারে না, বয়স্ক মানব-সম্পর্কস্থাপনে অক্ষম। এই অক্ষমতারই ফলাফল বিকৃতকামিতা।

প্রাপ্তবিকার ব্যক্তিদের যৌনব্যাপারে হীনতাভাব খুবই স্বাভাবিক। বয়স্ক মানবরতির সঙ্গে একাত্মতা স্থাপনে ব্যর্থতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। নরনারীর লৈঙ্গিক ভূমিকায় সন্দেহ এবং ঘৃণার পাত্রকে কেউ ভালবাসে না এই বোধ, এই দুটি কারণে জাত যৌনহীনতার একটি প্রভাব : অন্য উপায়ে ভালবাসা অর্জনের চেষ্টা করে, সচেষ্ট হয় লুপ্ত আত্মমর্যাদা ফিরে পাওয়ার জন্যে। বস্তুতঃ অনেক বিকৃতকাম চরম উচ্চাকাঙ্ক্ষী, ক্ষমতা ও সাফল্যের শিখরে উঠতে চায়, যেন হীনতাভাব পুষিয়ে নিচ্ছে। আরেকটি প্রভাব, কল্পনারাজ্যে সতত আশ্রয়।

মনে হতে পারে বিকৃতকাম ব্যক্তিমাত্রই অতিশয় কামুক। না তা নয়, এদের কামশক্তি প্রায়শঃ দুর্বল। স্বাভাবিক কামস্রোত ব্যাহত বা রুদ্ধ। যৌন-ব্যাপারে অপূর্ণতাবোধ প্রবল। লিঙ্গযোনি সহবাসে অহেতুক ভীত। প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই স্বাভাবিক যৌন প্রতিবেদনে কিছু না কিছু প্রতিবন্ধকতা : কামপাত্র সাতিশয় ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে সীমিত, একটিমাত্র পদ্ধতিতেই নিষ্ঠাবান, শুধু বিকৃত পন্থা দিয়েই দুর্বল রতির অভিষেক এবং এভাবে সবলতাপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত মরা গাঙ্গে বান ডাকে না অর্থাৎ একমাত্র এই উপায়ে রতিপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু সুরতের মত পূর্ণ তৃপ্তি কদাচ মেলে না। একারণে কামবিকারযুক্ত ব্যক্তিচিত্তে অল্পবিস্তর একটা ক্ষোভ বা একটা টেনসন জমে থাকে যা তাকে প্ররোচিত করে পুনরায় কামানুষ্ঠানের জন্যে। বিকৃতকামীদের মধ্যে রতিসুখী ব্যক্তি দুর্লভ। কামচরিতার্থতার জন্যে অনেক আঁকাবাঁকা পথে বিকৃত উপায়ের আশ্রয় নিতে হয়, দ্বিতীয়তঃ রতিমাধুরীর নাগাল পায় না যা সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের অনায়াসলভ্য।

মনে হতে পারে, কামনাবাসনার মত অন্যান্য ব্যাপারেও হীনদশাগ্রস্ত। শুধু

যে যৌনতা বিকৃত তা নয়, অন্যান্য ব্যাপারেও কামবিকারযুক্ত ব্যক্তি অস্বভাবী। এদের বুদ্ধিশুদ্ধি কম, আচারআচরণে বিকৃতিচিহ্ন, শিক্ষাদীক্ষায় হীন, ব্যবহারিক জীবনে বা কর্মক্ষেত্রে অসফল। এরকম একটা 'জন্মগত হীনতা' প্রকল্প সমর্থনে জোরালো প্রমাণের খুবই অভাব এবং যথার্থতঃ অন্যান্য সুস্থ পুরুষের চেয়ে এরা নিকৃষ্ট নয় কোন অংশেই, কোন বিচারেই খাটো নয়।

পক্ষান্তরে এদের অনেকেই স্বীয় হীনতাভাব পুষিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে পরোক্ষভাবে, অর্থাৎ অন্য উপায়ে ভালবাসা ও শ্রদ্ধা অর্জনের চেষ্টা করে প্রাণপণ। ফলতঃ সমাজজীবনে অনেকেই ক্ষমতাবান ও ব্যক্তিগত জীবনে সফল, প্রতিষ্ঠিত। হয়ত একারণেই বিকৃতকামীরা প্রায়ই বলে থাকেন, বিকৃতিই প্রতিভার জনক। এটা কিন্তু সত্য নয়, যদিচ যৌন অস্বভাবিতার ছড়াছড়ি দেখব অধিকতর বুদ্ধিদীপ্ত প্রতিভাবান পুরুষ কিংবা শিল্পীদের মধ্যেই।

এরাও মানুষ

সাধারণের কল্পনায় এরা ভয়ঙ্কর, দুর্ধর্ষ, অপরাধী। বরং উল্টোটাই সত্য। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বাভাবিক প্রতিবেশীর চেয়ে কম ভয়ঙ্কর এবং অপরাধী নয়। অধিকন্তু, যৌন অপরাধ ও কামবিকৃতি এক নয়। একজন যৌন অপরাধী, যেমন নারী ধর্ষণকারী, হতে পারে, তবুও বিকৃত নয়। অপরদিকে স্ত্রীর কাছে চরম নিগৃহীত না হওয়া পর্যন্ত অন্যজনের তৃপ্তি নেই, ইনি নিশ্চয়ই বিকৃত, তথাপি আইনতঃ দণ্ডনীয় অপরাধে অপরাধী নয়। কবুল করা ভাল, দাগী যৌন অপরাধীও আছে কিন্তু এরা সংখ্যায় মাত্র ৩%। এবং অধিকাংশ যৌন অপরাধে অপরাধী এমন বিকৃতকামিতায়, ধর্ষকামিতা বাদে প্রায় প্রত্যেকটি বিকৃত কামানুষ্ঠানে বল প্রয়োগ করা হয় না।

এক কথায়, তিল তিল বঞ্চনা কিংবা আপজাত্য দিয়ে গড়া কোন দৈত্যদানব নয়, ভয়ঙ্কর কোন অপরাধীও নয়, নেহাৎই সাধারণ মানুষ, শুধু কামধারা বিবর্তনে কিছু ত্রুটি বা কিছু দুর্ঘটনা জড়িয়ে গেছে। এবং কামনাবাসনা প্রসঙ্গ বাদ দিলে অন্যান্য প্রতিটি বিচারে আর পাঁচজনের মতই, কোন অংশে খাটো নয়।

ধরে নেওয়া হয়েছে, যেন স্বতঃসিদ্ধ উপপাদ্য আর কি, যৌন বাসনা ও যৌ
আচরণের একটা সুনির্দিষ্ট ধারা আছে। এবং এর সঙ্গে না মিললেই অস্বভাবিতা
দেখা পাব। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয়, স্পষ্ট করে লেখা নেই কোথাও
কী এই ধারা এবং সুনির্দিষ্ট বলতে কী বুঝব? কামস্বভাবিতার এমন কোন
স্থিরচিত্র নেই যা মাপকাঠি হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই
স্বভাবিতা নির্ণায়ক লক্ষণাবলীর বড়ই অভাব।

আমরা পাঁচজনে যাকেই ভাল বলব সেটাই স্বাভাবিক, আর মন্দ বললেই
সেটা হবে বিকৃত। যে সমাজে বাস করি তার অনুশাসনই প্রতিফলিত অর্থাৎ
কিনা স্বভাবিতার খসড়া করি আমরাই, আমরাই ঘোষণা করি কোনটা বিকৃত
সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তির মনোভাবই প্রতিভাসিত হয় স্বাভাবিক কাম ও
বিকৃতকামের মধ্য দিয়ে। অতএব সমাজনির্ভর এবং মনুষ্যসৃষ্ট। কাজে কাজেই
কামস্বভাবিতার রূপটি দৃঢ়, অনড় নয় (রিজিড), বরং নমনীয়, পরিবর্তনশীল
(ফ্লেক্সিবল)। চরম (এ্যাবসলিউট) নয়, আপেক্ষিক (রিলেটিভ) এবং স্থানকাল
ভেদে ভিন্ন। যথার্থতঃ স্থানকাল ভেদে অবিমিশ্র প্রশংসার গৌরব কোন
কামানুষ্ঠানের নেই। এক যুগে যা গর্বের এক দেশে যা স্বাভাবিক, অন্য কালে
কিংবা অন্যত্র সেটাই বিকৃত, ধিকৃত। প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত : সমকামিতা।

পূর্বেই বলেছি, যৌনব্যাপারে কোন যথার্থ ও প্রামাণ্য ষ্ট্যাণ্ডার্ড (মাপকাঠি)
নেই, কারণ স্বভাবিতার সংজ্ঞাবদল হয় দেশ থেকে দেশে, যুগ থেকে যুগে।
একদা কোন একটি যৌনতা স্বীকৃত হয়েও অন্য কালে বা অন্য স্থলে বিকৃতরূপে
পরিত্যক্ত। এমন কি একই সমাজে যৌনবিষয়ক স্বভাবিতা প্রসঙ্গে প্রতিটি
জনের ধারণা সমান নয়। এক কথায়, পৃথিবীতে এমন কোন আচরণ নেই যার
শিরোপরি নিন্দা বর্ষিত হয়নি কোনদিন কিংবা সমাদর পায়নি। কয়েকটি
দৃষ্টান্ত দিই :

একদিন ভ্রাতাভগিনী বিবাহ ফ্যারাওদের প্রিয় ছিল। ইদানীং স্বজনাবিবাহ
(ক্রস-কাজিন বিবাহ) নিষিদ্ধ। শুধু যে বাৎস্যায়নের কালে উঁকি দিত তা নয়,
আধুনিক দম্পতির শয্যাপ্রাঙ্গণে আসনটি পাকা করে নিয়েছে যে মুখরত, সেই

কিনা আমেরিকার কতিপয় রাষ্ট্রে, এবং ভারতেও, প্রকৃতিবিরুদ্ধ ক্রাইম, ক্রাইম আইনের দৃষ্টিতেও। বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন সভ্যতায় ভঙ্গীবিষয়ক ধারণার সীমানাবদল হয়েছে: একদা বিপরীত ভঙ্গী বিকৃত ছিল এবং পুরুষ উপরে নারী নীচে, এই প্রচলিত ভঙ্গী বাদ দিয়ে অন্যান্য প্রতিটি ভঙ্গীই নিন্দিত ছিল (কতিপয় ধর্মসংহিতার অনুশাসন), আজ কিনা স্বভাবিতার কোল পেয়েছে এসব ভঙ্গী। ব্যথার প্রদীপ জ্বেলে রতিপূজা সমাপ্ত হলেই কামবিকৃতি (ধর্ষমর্ষকাম) রূপে আখ্যাত হবে। কিন্তু আশ্চর্য এখানেই যে, সাহিত্য সিনেমায় আকছার দেখব এজাতীয় প্রতীক কল্পনা কিংবা হিংস্রতার রং লাগান যৌনতা।

মানবযৌনতা 'স্বভাবী' ও অস্বভাবী' বিশেষণে প্রায়শঃ ভূষিত। কিন্তু এই শব্দ দুটি যত্রতত্র ও যদৃচ্ছ প্রয়োগ করায় কোন সারবত্তা নেই, নেই কোন যৌক্তিকতা, বলেছেন কালজয়ী গবেষক ডঃ এ্যালফ্রেড কিনসী এবং খ্যাতকীর্তি রেনে গাঁইও। কেননা, আমরা যাকে অস্বভাবী বলি সেটা প্রকৃতির নিয়ম মানে না, গ্রাহ্য করে না জৈবিক সূত্র। শুধু দেশাচার, প্রচলিত প্রথা বিরুদ্ধ, সংহিতার —আইন ও নীতির—সঙ্গে মেলে না, কিংবা প্রজননের নামগন্ধ নেই, এই অপরাধে এটা বিকৃত। একটা দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি। মুক্তমনা মানুষমাত্রই সাড়া দিতে পারে সমকামিতায়, উপযুক্ত উদ্দীপনা যদি থাকে। এক্ষেত্রে প্রকৃতির নিয়ম অনুসৃত হয়েছে ঠিকই এবং জৈবিক শারীরবৃত্তীয় সূত্রও অক্ষত আছে। সবই ঠিক, কেবল দেশাচার-আইন-নীতির আনুকূল্য নেই এবং প্রজননবর্জিত, অতএব বিকৃত কিংবা অস্বভাবী না হয়ে যায় কোথায়!

এতদনুরূপ সতর্কতা বাণী উচ্চারিত হয়েছে অন্যান্য দিক্‌পাল মনীষীর কণ্ঠেও। প্রথমে প্রখ্যাত মনোবিদ্ ডাঃ ষ্টেকেল-এর কথা বলি: রতিব্যাপারে স্বভাবী মনের সন্ধান বৃথা। স্বভাবিতার আদর্শসুলভ প্রতিটি শর্ত পূরিত, তথাপি মনোমাঝে এমন সব অদ্ভুত বাসনা লুকিয়ে থাকতে পারে যেটা ব্যক্ত হলেই বিকৃত নামক বেড়ালটি বেরিয়ে পড়বে। সম্ভবতঃ এমন কোন পুরুষ নেই যাকে নির্দ্বিধায় স্বভাবী বলা যেতে পারে। কারণ, প্রত্যেকেই কিছু না কিছু সরে এসেছে কোন না কোন ব্যাপারে। কাজে কাজেই, মানুষের কামজীবন অস্বভাবীরূপে চিহ্নিত করার কোন অধিকার আমাদের নেই, যদি না সমগ্র মানবসমাজের দুই-তৃতীয়াংশকে অস্বভাবী বলতে রাজী থাকি।

যৌনজগতের আরেক বিস্ময়পুরুষ ডাঃ ম্যাগনাস হির্শফেল্ড, এঁর ধারণায়, প্রতিটি বিকৃতির নিদর্শন স্বাভাবিক কামজীবনে প্রতিভাসিত। বিকৃতি হচ্ছে স্বাভাবিক পুরুষের কোন একটি আবেগের চরম তীব্রতা কিংবা কোন প্রবণতার

অতিরেকদোষ। একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত আমরা সবাই বস্তুকামী, প্রদর্শনকামী, নিরীক্ষণকামী, ধর্ষমর্ষকামী। যখনই সীমা ছাড়াবে অর্থাৎ ভয়ঙ্করভাবে অতিশয়িত, বিকৃতির দেখা পাব। কিংবা আপনাতে আপনি শেষ, অর্থাৎ সুরতকাতরতা নেই, ব্যাপারটা অস্বভাবী হবে।

সেই যে, কবে ডাঃ সিগমুণ্ড ফ্রয়েড হেঁকে বলেছিলেন, 'আমরা প্রত্যেকেই কামবিকৃতির বীজ বহন করছি,' তারপর থেকে প্রায় প্রতিটি মনোবিদ্ এই একই কথার পুনরুক্তি করেছেন।

যদিচ যৌনব্যাপারে স্বভাবিতার যথার্থ সংজ্ঞানির্ণয় দুঃসাধ্য, অন্য মাপকাঠিও আছে, এটা হচ্ছে আবেগজ পরিণতি। এটা যার নেই তাক বিকৃতকাম হিসেবে ধরে নিতে পারি। এবং বলাই বাহুল্য এই আবেগজ পরিণতি স্বাভাবিক কামের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য।

পরিণতচিত্ত পুরুষ নারীর সঙ্গে স্থায়ী সম্পর্কস্থাপনের ক্ষমতা রাখে, যেখানে ভালবাসা প্রকাশের শ্রেষ্ঠ পথ সুরতই। সম্পর্ক স্থায়ী, পাত্র বিপরীতলৈঙ্গিক, কামচেষ্টা সুরত, আর তৃপ্তিও ষোলকলায় পূর্ণ—এই চতুর্বিধ লক্ষণাবলীর সমাবেশে আবেগজ পরিণতি জন্মে। অতএব স্বাভাবিক কামের পরিচয় এসবেই নিহিত।

বিপরীতলৈঙ্গিক ব্যক্তি বয়স্ক হবে, ভালবাসার যোগ্য হবে এবং নিজেকেও ছোট ভাববে না, সমান ভিত্তিতে ভালবাসা দিবে আর নিবে, যাতে করে সম্পর্কটার বনিয়াদ স্থায়ী হয়। কামস্থানগুলির মধ্যে উপস্থই শীর্ষস্থানে বিরাজিত থাকবে এবং গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়াররূপে গণ্য হবে যার মাধ্যমে ভালবাসার আদানপ্রদান চলবে। অর্থাৎ কিনা সুরতই হবে ভালবাসা প্রকাশের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। রতিব্যাপারটা শুধু যে ইতররতিক হবে তা নয়, জীবনের আর পাঁচটা আচরণের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হবে।

কামতৃপ্তির সবচেয়ে ভাল ও সবচেয়ে তৃপ্তিপ্রদ উপায়টি হল সুরত। অধিকাংশ সময়ে অধিকাংশ লোকই তাই সুরতঅভিলাষী। এর অর্থ এই নয় যে সুরতই একমাত্র পথ কিংবা মানসলৈঙ্গিক বিচারে ও আবেগজ বিচারে পরিণত ব্যক্তি সুরতের পরিবর্তে অন্য কোন যৌন আচরণের, দৃষ্টান্তস্বরূপ বৃতারম্ভে বস্তুকামবিষয়ক কিংবা ধর্ষমর্ষকামমূলক অনুষ্ঠান, আশ্রয় নেয় না। এমনটির উদাহরণ হয়ত আমরা সবাই।

বোঝা গেল, যৌনতার ছবিটি বিরাট এক ক্যানভাসে বিধৃত। এক সীমানায় এমন সব বিষয়—অতি তুচ্ছ, অতি সামান্য—দেখব যে এসব আমরা

রতিক্রীড়ার অঙ্গ হিসেবেই ধরে নিয়েছি। যেমন, প্রেয়সীর দন্তাঘাত বা অন্য কিছুতে হর্ষ, উচ্ছ্বাস। অন্য সীমানায়, দয়িতজনে ব্যথা বা আঘাত, যাকে বলি ধর্ষকাম।

সত্যি কথা বলতে কি, স্বভাবিতা এবং অস্বভাবিতার মধ্যিখানে স্পষ্ট করে একটা সরল রেখা টেনে দেওয়া সম্ভব নয়। কোথায় স্বাভাবিককাম সারা আর কোথায় বিকৃতকাম শুরু এমন কোন সূক্ষ্ম রেখার অস্তিত্ব জানা নেই। কেমনা আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই কতিপয় কামবিকৃতি ভ্রূণাকারে খুঁজে পাব। যেমন যৌনতার ক্রমবিকাশে সমকাম একটি অবশ্যম্ভাবী অধ্যায়; ধর্ষমর্ষকাম, প্রদর্শন-নিরীক্ষণকাম ও বস্তুকাম ইত্যাদি আবেগ যৌনপ্রবৃত্তির স্বাভাবিক উপাদান। এখন একে একে এইসব বিষয়ে আলোচনা করব, যৌনতার স্বাভাবিক প্রকাশ ও বিকৃত প্রকাশ সীমানা দিয়ে চিহ্নিত করা দুঃসাধ্য, এই আলোকে। আলোচনা করব কামকলার বিবিধ আঙ্গিক যা কিনা অস্বভাবী বা বিকৃত রূপে গণ্য। বহির্যোনি সুরত, রতিবিহীন উপচার, মুখমেহন প্রসঙ্গও।

ধর্ষমর্ষকাম

এই ধর্ষমর্ষকামের কথাই ধরা যাক না কেন। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই এজাতীয় প্রবণতা খুঁজে পেতে পারি নিশ্চয়ই। অন্যান্য বিকৃতির মত এখানেও স্বভাবী কাম ও অস্বভাবী কামের মাঝখানে রূপালি বিভাজন রেখা সম্ভব নয়।

ব্যাপক দৃষ্টিতে, প্রায় প্রতিটি মানবসম্পর্কে উঁকি দিতে দেখা যাবে ধর্ষমর্ষ-কামকে, বিশেষ করে সেই সব মানবসম্পর্কে যা কিনা অপরিণত, অর্থাৎ সমান ভিত্তিতে ভালবাসা দেওয়া নেওয়া নেই। ব্যথার তিলেক আভাস নেই, তবুও ধর্ষমর্ষকামের দৃষ্টান্তস্থল হবে, সম্পর্কটা যদি হয় প্রভুত্ব কিংবা বশ্যতা বিজড়িত।

আমরা জানি রতিব্যাপারে পুরুষই সচরাচর সক্রিয়, তার আচরণে আক্রমণ-মূলক ইঙ্গিত। পক্ষান্তরে নারীর নিষ্ক্রিয়তা ও গ্রহীতার ভূমিকায় বশ্যতার আভাস। সত্য সত্যই স্বাভাবিক সুস্থ নারীমাত্রই পুরুষকে দেখতে চায় প্রভুরূপে এবং পুরুষের পক্ষেও কিছুটা বলপ্রয়োগ প্রয়োজন বইকি নারীকে জয় করে নিতে। স্বাভাবিক সুরতে নরনারীর এবংবিধ ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। দেখা যাচ্ছে, ধর্ষকাম পুরুষ প্রকৃতিতে নিহিত, মর্ষকাম নারীর মজ্জাগত।

রাগ প্রবৃদ্ধ হলে কিংবা রতিকালে স্বামী স্ত্রীকে অথবা স্ত্রী স্বামীকে অল্পবিস্তর ব্যথা দেয় আর স্ত্রী কিংবা স্বামী সেটা অম্লানবদনে সহ্য করে। সংস্কৃতে প্রণয়-কলহ, নখদন্তবিলেখন, নখদশনচ্ছেদ্য, প্রহণন বা পাণিঘাত ও ইংরেজীতে 'লাভার্স বাইট' (প্রণয়দংশন) শব্দগুলি এঘটনারই চূড়ান্ত নিদর্শন। কিঞ্চিৎ

বলপ্রয়োগে নারী পুলকিতা হয়, এমন কথা প্রথম শতাব্দীতে রচিত ওভিড-এর কামশাস্ত্রে আছে। প্রক্রিয়াগুলি স্বাভাবিক কামকলার অন্তর্গত। অস্বভাবী হবে তখন, যখন এই আক্রমণমূলক প্রবৃত্তিগুলিই নরনারীর জীবনে চরম হয়ে দেখা দেবে। পুরুষের অঙ্গোত্থান যদি সঙ্গীকে নির্মম যাতনা (কশাঘাত, অস্ত্রদ্বারা ক্ষতকর্ম ইত্যাদি) দেওয়ার মুখাপেক্ষী হয়, কিংবা মিলনের পরিবর্তে এবংবিধ নিপীড়নে পুরুষের রতিপ্রাপ্তি হয়, ঐ পুরুষ ধর্ষকামী। তেমনি পুরুষ কর্তৃক চরম নিগৃহীত না হওয়া পর্যন্ত নারীর রতিপ্রাপ্তি স্থগিত থাকাটা নিঃসন্দেহে অস্বভাবী, এটা মর্ষকাম।

মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে, অল্পমাত্রায় ধর্ষকাম ও মর্ষকাম স্বাভাবিক কামজীবনে লীন হয়ে আছে। যথার্থতঃ ধর্ষমর্ষকামমূলক অনুষ্ঠানে অনেকেরই রুচি, এটা এদেরকে জাতরাগা করে। কিন্তু আক্রমণমূলক প্রবৃত্তি এবং বশ্যতা নামক আবেগ এত অজস্রভাবে বিকশিত হতে পারে যে, কোনটা স্বাভাবিক আর কোনটা নয় বলা বড় শক্ত। তা ছাড়া যুগ ও সভ্যতা ভেদে এটা কখন স্বাভাবিক, কখনবা বিকৃত। উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি, একদা বিপরীত আসীন ভঙ্গী পুরুষকে মর্ষকামবিকৃত রূপে চিহ্নিত করত। রতিকালীন নখঘাত, মর্দন, নিপীড়ন, দংশন ইত্যাদি কামকলা ধর্ষকামমূলক আচরণের অঙ্গ ছিল। এদেরকে অস্বভাবী বললে অনৃতভাষণ হয়, কেননা স্বাভাবিক কামের সীমানা আকাশের নীলিমার মতই বহুবিস্তৃত। এইমাত্র উল্লেখ করা আসনভঙ্গী ও কামকলাসমূহ অতএব বিকৃত নয়। শুধুমাত্র এই হেতু যে এসবই সুরতমুখী একটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ।

মর্ষকামের দৈহিক ও মানসিক প্রকাশ অল্পস্বল্প দেখব স্বাভাবিক সুরতে। মানসতার দিক থেকে, নিপীড়িত হওয়ার অভিলাষ, সমর্পণ করার বাসনা; সম্পূর্ণরূপে মিলিত হওয়ার জন্যে নিজ ব্যক্তিত্বের বিসর্জন। বশ্যতার স্পষ্ট চিহ্ন শুধু নারীতে নয়, পুরুষেও সম্ভব। যেমন বিপরীত ভঙ্গীর অভিলাষ ও মুখরত, এক পক্ষের প্রভুত্ববোধ এবং অন্য পক্ষের বশ্যতাভাব এই হেতু।

পুরুষের আক্রমণমূলক প্রবৃত্তি ও নারীর বশ্যতা স্বাভাবিক ঘটনা। এটাই যখন বল্গাছুট হবে, নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করবে, কিংবা বশ্যতার অপর নাম হবে ক্রীতদাসত্ব, স্বাভাবিককাম ভ্রষ্ট হবে বিকৃতকামে, ধর্ষকামে, কিংবা মর্ষকামে। এটাও মনে রাখা দরকার, এদুটি আচরণ লক্ষ্যপথে (সুরতে) পৌঁছাবার উপায় বিশেষ। অর্থাৎ কিনা উপচারের জন্যে উপচার নয়, সুরতের জন্যেই উপচার। সুতরাং এই ধর্ষমর্ষকামমূলক উপচার যখন আপনাতে আপনি শেষ, সুরতের

নামগন্ধ নেই, অস্বভাবিতার গন্ধ ভেসে আসতে বাধ্য। যেমন পুরুষ মর্ষকামীর কাছে মুখমেহন কেবলি চরম হীনতাময় কিংবা বিপরীত ভঙ্গী বিনা অঙ্গোত্থান বা পুলকলাভ নেই। এক কথায়, ধর্ষমর্ষকামমূলক আচরণ যখন অতিশয়িত, চরম পর্যায়ের, মারাত্মকভাবে ভয়ঙ্কর কিংবা সতত সুরতবর্জিত, বিকৃত হতে বাধ্য।

বস্তুকাম

অল্পস্বল্প বস্তুকাম প্রতিটি পুরুষে ছড়িয়ে আছে এবং কোন ধরাবাঁধা সড়ক নেই যার একপাশে স্বভাবিতা, ওপাশে বিকৃত বস্তুকাম। কেননা পুরুষের রতি-জাগানিয়া দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত দেখি নারীর কোন একটি বৈশিষ্ট্যে যেমন গড়ন, ভঙ্গী, কিংবা দেহের কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, শেষোক্ত আকর্ষক বস্তুকে 'ফেটিশ' বা ভক্তিবস্তু বলা যেতে পারে। ডাঃ ক্রাফট-এবিং এই অংশতঃ আকর্ষণকে বলেছেন ব্যক্তিগত বস্তুকামভিত্তিক আকর্ষণ এবং এঁর ধারণায় এটাই সকল শারীরবৃত্তীয় প্রেমের বীজ।

প্রণয়িনীকে কে নিষেধ করেছে উৎকট সৌন্দর্যচর্চায়? নখরঞ্জনী, ভ্রূরঞ্জনী ইত্যাদি ব্যবহারে কিংবা নানাবিধ উপায়ে বক্ষোদেশ নিতম্বদেশ আরও প্রকটিত করে নিজেকে আরও মোহময়ী, আরও লাস্যময়ী করতে চায় অনেকেই। কোন বিশেষ সাজে বা বিনা আভরণে প্রিয়া আসুক, পুরুষের এই দাবী (এবং নারীর পূর্বোক্ত বাসনা) যদি খাটো করা হয় বিকৃতির লেবেল লাগিয়ে, কোন মানুষই যে রেহাই পাবে না, বিকৃত হবে! তাই তো বলি, স্বাভাবিক কামজীবনের সূক্ষ্ম বস্তুকামভিত্তিক উপাদানসমূহে এবং বিকৃত বস্তুকামে বিভাজক পরিষ্কার রেখা নেই, এই সীমানা অস্পষ্ট।

নারীর কোন বৈশিষ্ট্য—কোন পোশাক বা কোন বিশেষ অঙ্গ—স্বাভাবিক মানুষকে আকৃষ্ট করে, রতিআগ্রহ জাগায়, তারপর এই আগ্রহ ছড়িয়ে পড়ে নারীর সবখানে, বিশেষ করে গোপনাঙ্গে। বস্তুকামে এই ব্যাপ্তি ব্যাহত অর্থাৎ কিনা ঐ অঙ্গ বা ঐ পোশাক হচ্ছে বৈকৃতকামের ভক্তিবস্তু।

বোঝা গেল, অল্পমাত্রায় বস্তুকাম স্বাভাবিক যৌনতার উপাদান, ভয়ঙ্করভাবে অতিশয়িত এবং প্রবলভাবে লক্ষণীয় হলেই বিকৃতির আভাস মিলবে। এবং কোন বিশেষ যৌন উদ্দীপনা, তা সে যতই অদ্ভুত, যতই কিম্ভূতকিমাকার হোক না কেন, স্বাভাবিকরূপে গণ্য হবে যদি সেটা মানুষকে নারীমুখী করে, সুরতে প্রবৃত্ত করে। কিন্তু এটাই অর্থাৎ উদ্দীপনা (হেতুভাব) যখন ফলভাব (সুরত) থেকে পৃথগীকৃত হবে কিংবা মূল যৌন আবেগই নিষেধিত, ব্যাপারটা অস্বভাবী ঘটনারূপে চিহ্নিত হতে বাধ্য।

প্রদর্শনকাম ও নিরীক্ষণকাম

শিশুদের মধ্যে, বিদ্যালয়ে এবং অন্যত্র প্রদর্শনকাম এতই বহুদৃষ্ট যে আমরা ধরে নিতে পারি, মানবপ্রকৃতিতে এই আচরণ গভীরভাবে প্রোথিত এবং সহজাত প্রবৃত্তি বিশেষ, অর্থাৎ এটা শিখতে হয় না, অর্জিত গুণাবলীও না।

নিরীক্ষণকামের ব্যাপকতা দৃষ্টে অনুরূপভাবে এই একই কথা বলা যেতে পারে নিরীক্ষণ প্রসঙ্গে। অর্থাৎ কিনা মানবযৌনতায় এটা স্বাভাবিক।

একটা মাত্রা পর্যন্ত সবাই যেমন প্রদর্শনকামী, তেমনি সবাই নিরীক্ষণকামী, অবশ্যই সীমিত অর্থে। যে নারী তার রূপের পসরা সাজিয়ে নিজেকে যথাসম্ভব আকর্ষণীয় করে তোলে সে নারী নিশ্চয়ই প্রদর্শনকামী নয়, তেমনি সুন্দরী নারী সন্দর্শনে যে পুরুষের চক্ষুরাগ তৃপ্ত হয় সে নিরীক্ষণকামী নয় নিশ্চয়ই।

রতিব্যাপারে নিরীক্ষণ আর প্রদর্শন স্বাভাবিক ঘটনা। সঙ্গীর দেহ (বক্ষ ইত্যাদি) কিংবা স্ত্রীর গোপনাঙ্গ দর্শনে, আঁধারের চেয়ে আলোকে, অধিকাংশ পুরুষই উত্তেজিত হয়ে পড়ে এবং কিছু নারীও এই দলে। প্রায় সকল পুরুষেরই (এবং অনেক নারীরও) আনন্দ রতিকালীন দেহবস্ত্র বর্জনে। কোন কোন দম্পতি নগ্ন সৌন্দর্যের পূজারী, এরা চায় আলোকিত অভিসার, ক্বচিৎ কখন আয়নায় প্রতিবিম্বিত হতে। এসবই স্বাভাবিক, কারণ, নিরীক্ষণ ও প্রদর্শন মানুষকে সুরতের জন্যে তৈরী করে দেয়।

আবার এটাই বিকৃতকামে স্খলিত হবে যখন অতিরেকদোষযুক্ত কিংবা স্বয়ং-সম্পূর্ণ ক্রিয়াবিশেষ। প্রচলিত রতিতৃপ্তির প্রধান বদলি রূপে দেখা দিতে পারে, নিরীক্ষণ (কিংবা প্রদর্শন) তখন আর স্বাভাবিক নয়, বিকৃত। স্বয়ংসম্পূর্ণ ক্রিয়াবিশেষ, সুতরাং অস্বভাবী। এখানেই শেষ নয়, বিকৃতকামীর কাছে প্রদর্শন কিংবা নিরীক্ষণ-বাসনা বাতিকে বা আবেশজ ক্রিয়ায় রূপান্তরিত। বিকৃতকামিতার মুখ্য লক্ষণ অতএব প্রাধান্যে। এবং বাধ্যতাই প্রধান নিয়ামক।

সমকামিতা

সমকামিতা বিকৃত না স্বভাবী, এই মীমাংসায় বিশেষভাবে প্রযোজ্য এই মাত্র উল্লেখ করা লক্ষণ দুটি। অতএব সমরতিক আচরণের গন্ধ পেলেই মানুষকে অস্বভাবী বলা অন্যায়। এটা বিশ্বজনমত, সমর্থন করেছেন ডাঃ ক্লিফোর্ড এ্যালেন, ডাঃ এ্যান্থনি ষ্টর, ডঃ এলবার্ট এলিস, ডঃ ফোর্ড ও বিচ এবং এ্যালফ্রেড কিনসী প্রমুখ বিশেষজ্ঞগণ।

প্রথমে কিনসী রিপোর্টের কথা বলি। জীববিদ্ ও মনোবিদ্গণের দৃষ্টিতে প্রজননই যৌনতার একমাত্র স্বাভাবিক ফাংসান এবং প্রজননবিহীন কামকেলি

সচরাচর উপেক্ষিত। এবং এঁরা একরকম ধরেই নিয়েছেন সমর্থ যৌন উদ্দীপনায় যে সাড়া মিলবে সেটা ইতরকাম সম্পর্কিত। এজাতীয় বিপরীতলৈঙ্গিক প্রতিবেদন মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি ও জন্মগত ধর্ম। এবং প্রাণিজ উত্তরলব্ধি-বিশেষ, অর্থাৎ অভিব্যক্তি বিচারে এটা স্বাভাবিক। বাদবাকী অন্য সব আচরণ অস্বভাবী, বিকৃত। এরূপ ব্যাখ্যা রহস্যময়। কেননা এটা যৌন প্রতিবেদনের শারীরবৃত্তীয় তথ্যসম্মত নয়। অবশ্য এটা সত্য যে অধিকাংশ স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে সমরতি অপেক্ষা ইতররতিই সংখ্যাগরিষ্ঠ। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে সমকামিতা নীতিনির্ভর এবং যেহেতু অস্বাভাবিক সেহেতু অল্পদৃষ্ট।

তিলমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই, সমরতিক আচরণ প্রতিটি মুক্তমনা মানুষের সাধ্যায়ত্ত। ৩৭% পুরুষের এরূপ অভিজ্ঞতা আছে (কিনসী রিপোর্ট)। নৃতত্ত্ববিষয়ক পর্যবেক্ষণ থেকে জানতে পারি, প্রায় প্রতিটি আদিম সমাজেই কিছু না কিছু সমরতিক অনুষ্ঠান চোখে পড়বে (ফোর্ড ও বিচ)। স্কুলকলেজে, কয়েদখানায়, সৈন্যবিভাগে, হস্টেলে, ছাত্রাবাসে সমকামিতা এত অধিক দৃষ্ট যে একে অস্বভাবী বললে বড় বেশী বলা হয়।

যথার্থতঃ মাঝে মধ্যে অনুষ্ঠিত সমকামিতা—কখন অভাবে, কখনবা বৈচিত্র্য-হিসেবে—অস্বভাবী নয়। প্রকৃতিবিরুদ্ধও না। কিন্তু যখনই কেউ পূর্ণতঃ বা প্রধানতঃ আকৃষ্ট, সে যথার্থ সমকামী ও বিকৃত। শুধু এই একটিতেই নিবদ্ধ, ইন্দ্রিয়ের অন্য সব দ্বার রুদ্ধ, তখন সেই প্রাধান্য, সেই বাধ্যতা প্রকটিত হয়ে স্বভাবিতা নষ্ট করে দেবে।

বিবিধ কামকলা

ভালবাসা নামক অদৃশ্য রজ্জু দিয়ে বদ্ধ নরনারী মাত্রই বিবিধ কামকলার আশ্রয় নিয়ে থাকে। কখন নিয়মিতভাবে, কখনবা বৈচিত্র্যহিসেবে। কিন্তু প্রচলিত সড়ক ধরে আনাগোনা না করলেই প্রশ্ন উঠবে এবং উঠেছেও। তখন অস্বভাবী ভেবে শিউরে উঠতে পারে স্ত্রী, কখনবা স্বামী। এমন কি বিকৃতকাম রূপেও আখ্যাত হতে পারে।

দয়িতজনে প্রণয়দংশন, নখক্ষত, আঘাত কিংবা প্রণয়িনী কর্তৃক নিপীড়িত হতে দেখেছি। দেখেছি আয়নায় আয়নায় দেহমাধুরীর প্রতিবিম্বে পক্ষপাত কিংবা অন্ধকারের পরিবর্তে আলোকে নগ্ন সৌন্দর্য অবাক বিস্ময়ে নিরীক্ষণ অথবা আগ্রহভরে প্রদর্শনকর্মে কোন দম্পতির অনুরাগ। স্বামীর অনুরাগ কোথাও স্ত্রীর ঘন কেশদাম বা পীনোন্নত বক্ষ বা গুরুনিতম্বের কোন একটিতে কিংবা প্রেয়সীকে পুষ্পিত, সুরভিত কিংবা বিশেষ বেশবাসে সুসজ্জিতা দেখতে

চায়। এসবই মানুষকে জাতরাগা করে, রতিযজ্ঞের শেষ আহুতির মুখ দেখায়, অতএব পুরোদস্তুর স্বাভাবিক (১৭৪-১৭৭ পৃষ্ঠা দেখুন)। প্রদর্শন-নিরীক্ষণবিষয়ক, বস্তুকামভিত্তিক, ধর্ষমর্ষকামমূলক উপচার ছাড়াও অনেক কিছু আছে এবং ছড়িয়ে থাকতে পারে যে কোন দাম্পত্যজীবনে। দৃষ্টান্ত : মুখমেহন। বহির্যোনি সুরত। পায়ুরত। অপ্রচলিত আসনভঙ্গী। রতিবিহীন উপচার। পারস্পরিক পাণিমেহন। ইত্যাদি।

ডাঃ ম্যাগনাস হির্শফেল্ড, ডাঃ ভ্যান ডি ভেল্ডি থেকে শুরু করে, কিনসী, ফোর্ড ও বিচ, রেনে গাঁইও পেরিয়ে আধুনিকতম যুগের এলবার্ট এলিস, এ্যান্থনি ষ্টর, ক্লিফোর্ড এ্যালেন, যাকেই সাক্ষী মানব, সকলেই একবাক্যে বলবেন, স্বভাবিতার শেষ নাহি যে, শেষ কথা কে বলবে? অর্থাৎ স্বভাবী যৌনতার পরিমণ্ডল এত বিস্তৃত যে উপরিউক্ত কামকলাব কোনটাকেই অস্বভাবী বলা যায় না। বস্তুতঃ দম্পতিমাত্রেরই অধিকার আছে যে কোন কামকলা বুকে তুলে নিতে। এ্যান্থনি ষ্টর বলেছেন : রতিপ্রারম্ভিক হিসেবে কোনটাই বিকৃতরূপে গণ্য করার কোন হেতু নেই, যদি সেটা কামীযুগলের উপভোগ্য হয়।

বিবাহিত জীবনে বৈচিত্র্যের জন্যে কিংবা কৌতূহল বশে কোন কিছু পরখ করার জন্যে কোন কামানুষ্ঠানই বিকৃত নয়। কিন্তু এটাই যখন চরম প্রাধান্য পাবে অর্থাৎ অঙ্গোত্থান তথা রতিবিহারের একমাত্র শর্ত হয়ে দেখা দেবে কিংবা এটাই একমাত্র লক্ষ্য হবে, অস্বভাবী যৌন অনুষ্ঠানের দেখা পাব। এই বিপরীত কিংবা পশ্চাৎভঙ্গীর কথাই ধরা যাক না কেন। একমাত্র এই আসন ব্যতীত অন্য আসনে পুরুষের অঙ্গোত্থান না হলে পুরুষকে অস্বভাবী (ধর্ষকামী কিংবা মর্ষকামী) ধরে নিতে হবে। কিন্তু নারীর ক্ষেত্রে সর্বত্রই এটা প্রযোজ্য নয়। কেননা এখন নারীও আছেন যাদের রতিতৃপ্তি শুধু এই ভঙ্গীতেই মেলে আর এরা দেহমনের দিক থেকে সর্বতোভাবে সুস্থ। কেউ কেউ এদেরকে প্রবল-ভাবাপন্ন, প্রভুত্বপিয়াসী কিংবা পুরুষালি মনোভাবাপন্ন বলে থাকেন, কোন কোন ক্ষেত্রে এটা সত্য হলেও সবক্ষেত্রেই কিন্তু নয়।

বিপরীত ভঙ্গী বা অন্য কোন ভঙ্গী বিকৃত নয়। বিকৃত নয় প্রণয়দংশন, নখক্ষত, পাণিঘাত। এসবেরই উল্লেখ আছে প্রাচীন কামশাস্ত্রে, যেমন, অনঙ্গরঙ্গ-এ ও কামসূত্র-এ। এবং ভ্যান ডি ভেল্ডিও বলেছেন স্বামীস্ত্রীর মধ্যে সব কিছুই গ্রাহ্য, অনুমোদিত, সঙ্গিনী (বা সঙ্গী) অবশ্যই পছন্দ করবে বা আপত্তি জানাবে না।

অঙ্গসংযোগের পূর্বে বিবিধ কামকলার আস্বাদন স্বাভাবিক। কিন্তু

ব্যাপারটা রতিবিহীন হলেই যে স্বভাবিতার জাত যাবে তা নয়। এই যে রতিবিহীন উপচার, ইংরেজীতে যাকে বলা হয় 'নেকিং অ্যাণ্ড পেটিং', সেটা স্বভাবতঃই বিবাহপূর্ব কামজীবনে প্রায়শঃ দৃষ্ট। ক্বচিৎ কখন বিবাহিত জীবনেও, যেমন বৈচিত্র্য হিসেবে, গর্ভভয়ে, অস্থানে-কুস্থানে। কোন দম্পতি যদি এটাই নিয়ে মেতে থাকে, তাঁর কাছে উপচারই রতিতৃপ্তির একমাত্র ধ্রুব পথ (অহেতুক সুরতভীতি, সতীত্বনাশে বা আত্মসমর্পণে পাপবোধ, বস্তুকামভিত্তিক দুর্বলতা যেমন বক্ষোশৃঙ্গার, ইত্যাদি কারণে) বিকৃতির মুখোমুখি হব। ব্যতিক্রম হিসেবে উল্লেখযোগ্য, ভগাঙ্কুরীয় রাগমোচন। সুরতে তৃপ্তি নেই, তৃপ্তি আছে ভগাঙ্কুর শৃঙ্গারে এমন বিবাহিতা নারীরও অভাব নেই, এদেরকে স্বাভাবিক বলতে কোন দ্বিধা নেই।

এই একই বক্তব্য পারস্পরিক পাণিমেহনে এবং বহির্যোনি সুরতে। গর্ভভয়ে, নিরুপায় ক্ষেত্রে এবং মাঝে মধ্যে বৈচিত্র্যের খোরাক হিসেবে যোনি বাদ দিয়ে নারীদেহের অন্যান্য অংশে রতিপ্রচেষ্টা কিংবা পারস্পরিক পাণিমেহন কোনমতেই অস্বভাবী নয়। প্রসঙ্গতঃ বলে রাখি, ইতররতিক পায়ুকাম মাত্রাতিরিক্তভাবে কম, ১%-এরও কম, এবং বৈচিত্র্য হিসেবে স্বভাবসঙ্গত। স্বভাবিতার সমর্থনে দুটি প্রামাণ্য নজির তুলে ধরব। প্রখ্যাত ব্রিটিশ মনোবিদ্ এবং 'টেক্সট বুক অব সাইকোসেক্সুয়্যাল ডিসঅর্ডারস' গ্রন্থপ্রণেতা ডাঃ ক্লিফোর্ড এ্যালেন-এর মতে এসবই সুরতমুখী উত্তেজনার প্রকারভেদ এবং রতিতৃপ্তির পন্থা বিশেষ, যা সাময়িক, এবং একাসক্তভাবে একাশ্রিত নয়, অতএব বিকৃতগন্ধ নাহি তায়।

তা ছাড়া ডঃ এ্যালফ্রেড কিনসী ও তাঁর সহকর্মীগণও হেঁকে বলেছেন, এসবই জৈবিক পূর্বানুসরণ বা স্তন্যপায়ীসুলভ উত্তরলব্ধি (ম্যামালিয়ান হেরিটেজ)। মানুষ মেরুদণ্ডী, স্তন্যপায়ী, উষ্ণশোণিত প্রাণী এবং প্রাইমেট শ্রেণীভুক্ত। কাজে কাজেই এইসব গুণবিশিষ্ট অন্যান্য প্রাণিসমূহের যৌন আচরণের কিছু কিছু ধারা মানুষের মধ্যে অনুসৃত হতে পারে। আমরা জানি, স্তন্যপায়ী প্রাণীদের যৌনতায় তিনটি বিবরজাত উদ্দীপনার—মুখজাত উদ্দীপনা এবং পায়ুজাত উদ্দীপনা এবং উপস্থজাত উদ্দীপনার প্রাধান্য স্বতঃসিদ্ধ। সুতরাং স্তন্যপায়ীসুলভ এজাতীয় আচারআচরণ মনুষ্যজগতেও আবির্ভূত হতে পারে, এতে চমকিত হওয়ার কিছুই নেই। এ যে জৈবিক উত্তরাধিকার !

নরনারীর মুখকর্ম কখন কখন সমকামিতা রূপে চিহ্নিত হয়েছে, শুধুমাত্র এই একটি যুক্তির হাত ধরে—সমকামীদের কামজীবনে মুখরত বড় ভূমিকা নেয়। এটা কিন্তু আদৌ বিজ্ঞানসম্মত নয়। এটা হচ্ছে স্তন্যপায়ীসুলভ একটি মৌল

আচরণ এবং যৌনতারই একটি অঙ্গ। সমগ্র মেরুদণ্ডী প্রাণিসমূহের যৌন-আচরণে গোপনাঙ্গে মুখপ্রয়োগ ব্যাপারটা এতই অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পর্কিত যে একে আমরা জৈবিক বিচারে পুরোপুরি স্বাভাবিক বলতে বাধ্য। এমত ডঃ কিনসীর। সমর্থন করেছেন ডঃ ফোর্ড ও বিচ প্রমুখ অন্যান্য পণ্ডিতগণও। বস্তুতঃ সকল পুরুষেরই হৃদয়ে একটা প্রবণতা আছে বিবরজাত উদ্দীপনাসমূহের প্রতি। সংস্কার আর ভাবপ্রবণতা একপাশে সরিয়ে রেখে অপক্ষপাত দৃষ্টিপাতে এটা নিশ্চয়ই চোখে পড়বে। মানবসমাজে মুখমেহন দুর্লভ নয়, প্রায় প্রতিটি শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিই আশ্রয় নিয়ে থাকে, অল্প বা বিস্তর। অতএব একে বিকৃত বলা যায় না (হির্শফেল্ড)।

শুধু অশালীন, অপ্রচলিত, অল্পদৃষ্ট, প্রাণীসুলভ—এই অজুহাতে বিকৃতির লেবেল এঁটে দেওয়া যায় না। কিংবা ব্যাপারটা প্রভুত্বের (ধর্ষকাম) কিংবা বশ্যতার প্রতীক (মর্ষকাম) অতএব বিকৃত তাও না। নৈয়ায়িক, ন্যায়াধীশ, শুচিবাগীশ এদের রায়ে বিকৃত হবে না, বিকৃত হবে সুরতকে বরবাদ করলেই, শুধুই উপচারভোগ, সুরতকাতরতা নেই, তখন। অন্য কোন উপায়ে রাগমোচনের দেখা নেই এবং আবেগতাড়িত, বাধ্যতামূলক কিংবা আবেশজ ক্রিয়াবিশেষ যেখানে শুধুই আত্মার হীনতাসাধন (ক্রীতদাসত্ব) কিংবা চরম প্রভুত্ববোধ সঞ্চারিত।

পুরুষকৃত (কিংবা স্ত্রীকৃত) মুখমেহনের সঙ্গে এক নিঃশ্বাসে কামবিকৃতি উচ্চারণ করা ভুল, কেননা সমরতিক অনুষ্ঠান ভিন্ন অন্য কোথাও মৈথুনভাব বর্জিত হয় না এবং শতকরা ষাট জন পুরুষেরই রক্তরাঙা অভিজ্ঞতা আছে। অভিজ্ঞতা আছে কিছু কিছু নারীরও। কখন রাগবৃদ্ধির জন্যে, কখন বৈচিত্র্যের জন্যে, কখনবা উত্তেজিত করার জন্যে। এব্যাপারে পুরুষরাই অধিকতর আগ্রহী এবং নারী প্রায়শঃ আহত। প্রাণিজগতের তুলনায় মানবজগতে সংখ্যাল্পতার কারণটি নিহিত আছে সাংস্কৃতিক প্রভাবে ও সামাজিক বিধিনিষেধে। কিন্তু আদিম মানসতার দিক থেকে, মানুষের আচরণ স্বীয় এ্যানাটমি অপেক্ষা অধিকতর স্তন্যপায়ীসুলভ।

শুধু যে পরিসংখ্যান বিচারে মুখমেহন স্বাভাবিক তা নয়, দৈহিক-জৈবিক বিচারেও এটা ক্ষতিকর নয়। যদি কোন কুফল হয় সেটা অন্তর্নিহিত অস্বভাবিতার জন্যে নয়। এর জন্যে দায়ী সমাজ-সংস্কৃতির প্রভাব। অনুষ্ঠান-কালীন মনোভাব, মন্দকর্ম বা বিকৃত উপচারে নিজেকে নিয়োজিত করেছি

সুতরাং ক্ষতি না হয়ে যায় কোথায়! অর্থাৎ পাপবোধ বা হীনতাভাব দায়ী, পরোক্ষভাবে একে আমরা অস্বভাবী বলি তাই না অঘটন।

মীমাংসা

এখন আমরা নিশ্চয়ই জবাব দিতে পারব, যদি কেউ প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন—ইনি কি বিকৃতকাম, না স্বভাবী? এযাবৎ আলোচিত তথ্য সম্বল করে কিছুটা নিশ্চয়তার সঙ্গে বলা সম্ভব কোথায় অস্বভাবিতা উঁকি দিচ্ছে। কিন্তু বলা নিষ্প্রয়োজন, প্রচলিত মাপকাঠিতে বিচার করতে গেলেই ভুল হবে। এব্যাপারে বিকৃতি-সংজ্ঞার হাত ধরে এগনোই বুদ্ধিমানের কাজ। যখনই কেউ সহবাস ছেড়ে দেবে বা সহবাসে অপারগ কিংবা রতিবিষয়ক অনুষঙ্গই অপরিহার্য হয়ে উঠবে রতিতৃপ্তির জন্যে অথবা কোন বিশেষ একটি পদ্ধতিতে একাসক্তচিত্ততার সঙ্গে একটা বাধ্যবাধ্যকতা জড়িয়ে থাকবে, বিকৃতকামীর দেখা পাব। বিকৃতি নির্ণয়ের সূত্র অতএব চারটি। এক, সুরতবর্জন। দুই, প্রাধান্য। তিন, একটিতেই নিবদ্ধ থাকা। চার, বাধ্যবাধকতা।

সকল পথের শেষ যেমন রোম-এ, তেমনি যাবতীয় কামক্রীড়ার শেষ সুরতে। অর্থাৎ উপচারের জন্যে উপচার নয়, সুরতের জন্যেই উপচার। কল্পনা-সম্ভব প্রতিটি কামকলা লক্ষ্যে (সুরতে) পৌঁছাবার উপায় বিশেষ। লক্ষ্যভ্রষ্ট উপচার অতএব শিবহীন যজ্ঞসমান। সত্যসত্যই উপচার যখন আপনাতে আপনি শেষ, চরম পরিণতি উপেক্ষিত, মিথুনলক্ষ্যে পৌঁছানোর কোন তাগিদ নেই, এক কথায় স্বয়ংসম্পূর্ণ ক্রিয়াবিশেষ, অস্বভাবিতার গন্ধ ভেসে আসতে বাধ্য।

যৌনতার ব্যত্যয় ঘটেছে এটাই মূল বিচার্য বিষয় নয়। প্রাধান্যই বড় কথা। একটা সীমা পর্যন্ত সবই স্বাভাবিক, বস্তুতঃ ধর্ষমর্ষকাম, বস্তুকাম, প্রদর্শন-নিরীক্ষণ-কাম, এসবই অধিকাংশ এ্যাভারেজ মানুষের যৌনতার সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত, মাঝে মধ্যে অবশ্য কোন একটি আবেগ একটু আধটু উপচে পড়লেও পড়তে পারে। কিন্তু নিয়তই অতিরেকদোষযুক্ত কিংবা লক্ষণীয়ভাবে সীমাছাড়া, অস্বভাবী রূপটি ফুটে উঠবে।

রতিতৃপ্তির একমাত্র উপায় হিসেবে শুধুই উপচারভোগ কিংবা অন্যান্য কামানুষ্ঠান বাদ দিয়ে শুধুই পাণিমেহন, অথবা সমলৈঙ্গিক ব্যক্তি বিনা পুলকলাভ অসম্ভব—এসবই শুধু একটিতেই নিবদ্ধ থাকার ঘটনা এবং ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে অস্বভাবী। আবার এই একান্তনির্ভরতার পিছনে রয়েছে বাধ্য-বাধকতার অন্ধ আবেগ।

যদি কোন কামানুষ্ঠানের স্বভাবিতায় সন্দেহ জাগে কিংবা কামীজনের সুস্থতায় প্রশ্ন, প্রথমেই খতিয়ে দেখতে হবে জিজ্ঞাসিত অনুষ্ঠানটির ঘটনমাত্রা ও শতকরা হার, ব্যাপকতা ও লোকপ্রিয়তা। বহুদৃষ্ট ব্যাপক জনপ্রিয় কামানুষ্ঠান যে স্বভাবী হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত : পাণিমেহন। এটা সত্য, পাণিমেহন নিন্দিত, ধিকৃকৃত। কিন্তু সত্য নয় যে এটা বিকৃত, কারণ এতই ব্যাপক যে প্রায় প্রত্যেকেরই (৯৩% পুরুষ ও ৬২% নারী) কাছে অনাস্বাদিত নয়। তা ছাড়া যৌনতার ক্রমবিকাশে পাণিমেহন একটা অবশ্যম্ভাবী অধ্যায়। প্রসঙ্গতঃ বলে রাখি, এটাই যখন পরিণত বয়সের আকাশে একমাত্র ধ্রুব পদ্ধতিরূপে ঝলসে উঠবে, বিকৃতপদবাচ্য হবে।

অর্থাৎ কিনা বিকৃতি মীমাংসায় এটাও লক্ষ্য করতে হবে, কামচেষ্টার ফলাফল হিসেবে প্রজননকে কি সরিয়ে রাখা হয়েছে? নাকি সুরতব্যাপার বর্জিত। ডাঃ সিগমুণ্ড ফ্রয়েড, ডাঃ ক্লিফোর্ড এ্যালেন প্রমুখ মনোবিদ্‌গণের মতে বিকৃতি-বিচারে এটাই নাকি দিগ্‌দর্শক, সকল বিকৃতির শেষের পরিচয় প্রজননহীনতায়। প্রজননচেষ্টার উচ্ছেদ ঘটিয়ে স্বতন্ত্রভাবে তৃপ্তির পথ খোঁজে যে-পাণিমেহন, যে-উপচার সেটা কিন্তু বিকৃত নয়। আবার সুরতব্যাপার বর্জিত না হয়েও বিকৃতকামের চিহ্ন পড়েছে ইতরকাম প্রৌঢ়কামিতায়। অতএব শুধুই প্রজনন পরিহার কিংবা কেবলি সুরতবর্জন বিকৃতকামিতার একমাত্র লক্ষণ হতে পারে না। গুরুত্বপূর্ণ বিচার্য বিষয়গুলি এই : প্রাধান্য আর বাধ্যতা আর একান্ত-নির্ভরতা।

এক, প্রধান্য। মাঝে মধ্যে এক-আধ দিন সমরতি কিছুই না। এক্ষেত্রে অস্বভাবিতা প্রকাশিত ঠিকই, কিন্তু এই দেখে বিকৃতির রায় দেওয়াটা ঠিক নয়। পক্ষান্তরে, এটাই যখন নিরন্তর, অনবরত, এমন কি সুরতও উপেক্ষিত, বিকৃতি-লক্ষণাক্রান্ত হতে বাধ্য।

দুই, একান্তনির্ভরতা। একতারার একটি তারের মত শুধু একটিতেই নিবদ্ধ থাকাটা সুস্থতার পরিচয় নয়। রতিব্যাপারে বিবিধের মাঝে সুরতই মহান। তাই শুধুই নিরীক্ষণ আর কিছু নয়, ব্যাপারটা তখন বিকৃতিপদবাচ্য হতে বাধ্য। তেমনি কেবলি পাণিমেহন কিংবা শুধুই উপচার, সুরতের নামগন্ধ করে না যে জন, সেইজন বিকৃতকামী।

তিন, বাধ্যতা। কামীজনের সঙ্গে কামানুষ্ঠানের বাধ্যবাধকতা জড়িয়ে আছে, সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ এটাই। একটা 'অনুকর্ষী বায়ু' কুরে কুরে খাচ্ছে, নির্দিষ্ট কামানুষ্ঠান বিনা নিষ্কৃতিলাভ নেই। কে যেন চুম্বকের মত সতত প্রলুব্ধ

করছে, অন্যথায় কেবলি আবেগমথিত হওয়া, এমন একটা পীড়নকর অবস্থা, বংশীলুব্ধ নাগিনীর মত বশ্যতা—এমনটি যদি কখন দেখেন, বুঝবেন কামানুষ্ঠান বিকৃতিযুক্ত।

দম্পতির ইতিকর্তব্য

কামকলায় বৈচিত্র্য প্রসঙ্গে অনেকেরই, বিশেষ করে স্ত্রীর, আপত্তি। যেমন, গোপনাঙ্গে কামকলা প্রয়োগ জঘন্য, নোংরা। বিপরীত ভঙ্গী অস্বভাবী। পশ্চাৎ বিহার নির্লজ্জ অতিকামুকতা। মুখমেহন বিকৃতযৌনতা। এমন কি কটু মন্তব্য করতেও শোনা যায়। বাদবিসম্বাদ হতেই পারে, দাম্পত্যজীবনে অশান্তি, বার-নারীগমন, বিবাহবিচ্ছেদ গড়িয়ে যেতে পারে।

কোন বিশেষ পোশাক, সুরভি বা অন্য কিছু (মোজা, দস্তানা ইত্যাদি) ব্যবহারের অনুরোধ নারীর কাছে বিকৃত মনে হতে পারে, মনে করতে পারে স্বামী তাকে ভালবাসে না, ভালবাসে তার পোশাক বা বহিরঙ্গ, এই ভেবে ক্ষুণ্ণ হতে পারে।

কিংবা রব তুলতে পারে স্বামী বিকৃতরুচি। যত রাজ্যের উদ্ভট বাসনা-কামনায় যার রুচি সেই স্বামীর সঙ্গে ঘর করা কি সাজে ? এরকম প্রশ্ন তুলতে পারে স্বামীও, যদি দেখে চলতি পথ থেকে সরে গেছে স্ত্রী।

নিজস্ব ধ্যানধারণার বাইরে কিংবা অপ্রচলিত কিছু দেখলেই এঁরা আঁৎকে ওঠেন। স্বাভাবিক কাম সম্বন্ধে সুন্দর ও বলিষ্ঠ ধারণা নেই বলেই এঁদের এই দুরবস্থা।

এঁদেরকে বলি, মিছে খেদ, মিছে বিলাপ কাতর। কেননা স্ত্রীর (কিংবা স্বামীর) বুদ্ধিমত্তায়, সহযোগিতায়, সক্রিয়তায় এবং সৎ অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শে এজাতীয় সমস্যার সহজ সমাধান সম্ভব। পারস্পরিক ভালবাসা, আকর্ষণ ও তৃপ্তি যদি থাকে এসব বাধা তুচ্ছ। বস্তুকামভিত্তিক, ধর্ষমর্ষকাম-মূলক কিংবা নিরীক্ষণপ্রদর্শন বিষয়ক কোন উপচার কিংবা অন্য কোন বিশেষ কামকলা ইত্যাদি স্বামীর নানান বায়না হাসিমুখে মেটাতে পারে স্ত্রী।

একে যদি অন্যের পরিপূরক হয়, যথার্থ বিকৃতযৌনতায় কিছু এসে যায় না, যেমন ধর্ষকামী স্বামী সুখী হবে, স্ত্রী যদি হয় মর্ষকামী। কিন্তু এমনটি না হলেই অনাসৃষ্টি এবং এটাই সচরাচর দেখব। আবার অল্পমাত্রার ধর্ষমর্ষকামে—এটা বিকৃত নয় স্বাভাবিক—অনেকেরই পছন্দ। অতএব, দম্পতিরা যদি সুখী হয়, সুখে থাকতে দিন, বিকৃতির রাজটিকা পরিয়ে অকারণে দুঃখিত করবেন না যেন। আর যদি দেখেন অস্বভাবিতার মিথ্যা সন্দেহে ক্লিষ্ট—যেমন ভগাঙ্কুরীয়

রাগমোচনে স্ত্রী (কখনবা স্বামী) ক্ষুণ্ণ—সেটা ভেঙ্গে দিন, বুঝতে দিন এটা স্বাভাবিক।

স্বামী এবং স্ত্রীকে বুঝতে হবে, দাম্পত্যজীবনে সবই গ্রাহ্য। কোন কিছুই অসুন্দর নয়। কোন অঙ্গ অশুচি নয়, সুরতমুখী কামকলামাত্রই পবিত্র। বৈচিত্র্যের জন্যে আস্বাদিত কোন কামানুষ্ঠানই বিকৃতযৌনতা নয়। তাই যে কোন অঙ্গে যে কোন কামকলা প্রয়োগে তৃপ্তি পাওয়ার স্বাধীনতা আছে স্বামীস্ত্রীর। শুধু লক্ষ্য রাখতে হবে বৈচিত্র্যের গুঁতোয় সঙ্গী যেন না কাতর হয়ে পড়ে। স্ত্রীর ইতিকর্তব্য আরও একটু বিশদভাবে আলোচনা করা যাক।

প্রথমেই একটি ঘটনার উল্লেখ করব, বক্তা মাননীয় ডাঃ ম্যাগনাস হির্শফেল্ড। স্বামী মামলা রুজু করেছেন বিবাহবিচ্ছেদের, স্বামীর অঙ্গে হস্তক্ষেপ করতে নারাজ শুধু এই অজুহাতে। সত্য সত্যই অনেক স্ত্রী এসবে অসম্মত, ভাবে এটা নোংরা অশ্লীল, এমন কি নিজ অঙ্গেও হাত দিতে চায় না, ডায়াফ্রামের মত জন্মরোধক পদ্ধতি তাই উপেক্ষিত। এটা বাড়াবাড়ি। এদেরকে বলি, সেক্সকে মেনে নিন। বৈচিত্র্যের আসনখানি বিছিয়ে দিন। প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি জীবনে একঘেঁয়েমির ঘানি টানতে হবে না কোনদিন, পারস্পরিক আকর্ষণও বজায় থাকবে বার্ধক্যের দিনগুলিতে এবং স্বামীর বহুমুখকামিতাও শান্ত থাকবে। ভুলবেন না যেন, পুরুষ কামকলায় বৈচিত্র্যপিয়াসী এবং বহুমুখী তৃপ্তির জন্যে লালায়িত। সুতরাং স্ত্রীর চোখ দুটি অবশ্যই গাঁটছড়া বাঁধবে এদুটি বিষয়ের প্রতি।

জানবেন, রতিব্যাপারে স্বামীস্ত্রীর মধ্যে কোন কিছুই নোংরা নয়। দেহের কোন অঙ্গই নিষিদ্ধ নয়, সব কামকলাই সিদ্ধ। কোন আসনভঙ্গীই নিম্নরুচি বা অতিকামিতার প্রকাশ নয়, নয় কোন বিকৃতযৌনতা বা অস্বভাবিতার লক্ষণ। প্রচলিত বাধানিষেধ ভুলে যান। স্বামীকে খুশিমত আদর করতে দিন। পছন্দ-মত আসনে স্বামীকে মিলিত হতে দিন।

স্বামীর যদি কিছু বায়না থাকে, সাধ্যমত পূরণ করতে হবে। ধরুন, স্বামী হয়ত চায় সৌন্দর্যের নগ্ন আভরণ, আলোকাভিসার কিংবা অন্য কিছু। শোনা-মাত্রই নাকচ করবেন না যেন, সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করুন। ভুলবেন না, দিনের পর দিন এজাতীয় প্রত্যাখ্যান বা ক্ষোভ জমা হতে থাকলে পুরুষের মন অন্য নারীতে আসক্ত হতে পারে।

মনে রাখবেন, রাগমোচনার্থে কোন বিশেষ প্রক্রিয়ার সহায়তা মাত্রই অস্বভাবী রূপে চিহ্নিত করে না। কয়েকটি উদাহরণ দিই। কোন বিশেষ

উপচার (বক্ষচোষণ) ব্যতিরেকে কিংবা, 'পুরুষ উপরে, নারী নীচে', এই প্রচলিত আসনে তৃপ্তি আসে না, কিন্তু মনোমত শৃঙ্গার বা ভঙ্গীর (বিপরীত, আসীন বা অন্য কিছু) স্পর্শ পেলেই এরা পুলকিতা। আবার ভগাঙ্কুর-প্রধান নারীর সংখ্যাও কম নয়, স্বাভাবিক সুরতে অর্থাৎ যোনিমধ্যে পুরুষের অঙ্গ-চালনায় এদের তৃপ্তি নেই, এদের কামজীবন এতই শর্তাবদ্ধ যে যোনিজ রাগ-মোচন হবে না, হবে শুধু ভগাঙ্কুরীয় রাগমোচন, যার জন্যে চাই ভগাঙ্কুরে বিবিধ কামকলা প্রয়োগ। প্রথম দুই সারির নারীর স্বভাবিতায় যত না প্রশ্ন দেখি, তার চেয়ে অনেক প্রশ্ন ওঠে শেষোক্ত নারী ক্ষেত্রে। এঁরা সবাই স্বাভাবিক। সম্প্রতি প্রমাণিত, শারীরবৃত্তীয় বিচারে উভয় পুলকই সমান (মাষ্টার্স ও জনসন) এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে শেষোক্ত নারীদের স্বভাবিতা প্রথমোক্তদের চেয়ে কোন অংশে কম নয়।

স্বামীকেও বলি, কোন কিছু জোর করে স্ত্রীর ঘাড়ে চাপিয়ে দেবেন না। অনাগ্রহী স্ত্রীকে বাধ্য করাবেন না পৌরুষের দাবীতে, স্বামিত্বের রূঢ় অধিকারে, কর্কশ বলপ্রয়োগে।

কোন বিশেষ কামকলায়, যেমন গোপনাঙ্গে চুম্বন, আয়নায় প্রতিবিম্ব, কিংবা কোন বিশেষ ভঙ্গীতে (যেমন পশ্চাৎভঙ্গী) কিংবা অন্য কিছুতে আপনার অসীম দুর্বলতা আছে, সেটা নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি (যেমন বিয়ের প্রথম দিকে) মেতে উঠবেন না। কেননা প্রথম প্রথম স্ত্রীর লজ্জা হয়ত বাধা দিতে পারে এবং সময়ের পদক্ষেপে লজ্জার জড়তা কেটে গেলে দেখবেন স্ত্রীই হয়ত এব্যাপারে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ কিনা পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতা দানা বাঁধলে, ভিন্নতর কামকলা ও নতুনতর আসনভঙ্গীর উত্তেজনা ও নতুনত্ব আস্বাদনে কোন বাধা নেই। উভয়ের রাগবৃদ্ধির জন্যে, কামকলায় বৈচিত্র্যসাধনের জন্যে মাঝে মধ্যে এসবের প্রয়োজন আছে। তবুও বলি, পরিবর্তন ব্যাপারে স্ত্রীর প্রতিক্রিয়ার দিকে নজর দিতে হবে, মতামতেরও দাম দিতে হবে।

সময় দিন, ধৈর্য ধরুন, একদিন হয়ত স্ত্রী রাজী হবেন। কটূক্তি নয়, বল-প্রয়োগও না, শুধু অনুনয়। স্ত্রীর রুচি, সংস্কার, মতামত, ভাবপ্রবণতার দাম দেবেন। এক কথায়, রইয়ে সইয়ে, পুনঃপুনঃ চেষ্টায় স্ত্রীর সম্মতি আদায় করে নিন। আর এত করেও যদি দেখেন স্ত্রী কিনা গররাজী বুঝবেন এরূপ বিশেষ কামকলা বা ভঙ্গী ব্যাপারে নিশ্চয়ই তিনি অসহায়ভাবে অক্ষম। আপনাকে ভালবাসে যথেষ্ট, কোন একটা গুরুতর বাধা আছে নিশ্চয়ই যার জন্যে আপনাকে ফিরিয়ে দিচ্ছে।

দেখেছি অধিকাংশ স্ত্রীই দুঃখিত কিংবা ব্যথিত, স্বামীর অতিরিক্ত দাবীতে, নানান বায়নাতে। এও দেখেছি, উল্টোটাও কচিৎ কখন সত্য, স্ত্রীরও হৃদয়-বাসনা অপূর্ণ রয়ে গেছে, স্বামী কেবলি ফিরিয়ে দেন নানা অজুহাতে। এটাও ঠিক নয়। স্ত্রী যদি সাহসভরে কোন প্রস্তাব রাখেন সেটা হেসে উড়িয়ে দেবেন না কখন। কোন বিশেষ ভঙ্গী, কোন বিশেষ কামকলা বা অন্য কোন অনুরাগের কথা যদি বলেন সেটা সরাসরি নাকচ করবেন না যেন। সাধ্যমত সাধপূরণে ত্রুটি যেন না ঘটে এবং এই আন্তরিকতাটুকুই স্ত্রীর কাছে যথেষ্ট।

সমলৈঙ্গিক ব্যক্তির প্রতি ধাবিত যৌনতারই নাম সমকাম। বিকৃতিসমূহের মধ্যে সমকাম যেমন বিশেষ তেমনি প্রোজ্জ্বল। ঘটনমাত্রা বিচারে শীর্ষস্থানীয় বিকৃতি, শুধু মানবজগতে নয়, সমগ্র প্রাণিজগতেও ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। সর্বাধিক দৃষ্ট এই কামবিকৃতি সর্বাধিক আলোচিতও বটে, বস্তুত: সমরতি বিষয়ক গ্রন্থাবলী এবং পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ সংখ্যা নির্ণয়ে যে কোন গবেষকই হিমশিম খেতে বাধ্য। বিশ্বচরাচরে ব্যাপ্তি প্রসঙ্গ ব্যতিরেকে আরও একটি মৌলিক বিশেষত্বও সহজেই নজর কাড়বে। যেমন সমকামিতায় সঙ্গীর জন্যে রাগ অনুরাগ, এমন কি গভীর প্রণয়, প্রায়শ: দৃষ্ট। বলা বাহুল্য অন্যান্য কাম-বিকৃতি উদাহরণস্বরূপ বস্তুকাম, ধর্ষকাম, ইন্দ্রিয়তৃপ্তিসর্বস্ব, কোন অনুরাগ বিজড়িত নয়। ফলে হয়েছে কি, অন্যান্য বিকৃতির তুলনায় সমকামিতার চিকিৎসা অতীব কষ্টসাধ্য, কখনবা দুরূহ।

সমকামিতা কোথাও প্রকাশিত। বাস্তবে অনুষ্ঠিত কিংবা মনশ্চক্ষে দৃষ্ট। কোথাওবা প্রচ্ছন্ন। বিবাহের পর ধরা পড়ে, পুরুষের অক্ষমতায় এবং নারীর ব্যভিচার সংশয়ে অর্থাৎ সন্দেহবাতিকে কিংবা রতিজড়তায়। সমকামীদের মধ্যে কেউ একনিষ্ঠ, একটি সঙ্গীর সঙ্গে প্রায় স্থায়ী সম্পর্ক গড়ে তোলে। কেউ ব্যভিচারী, একের পর এক নতুন মুখের সন্ধানে মত্ত। পায়ুকামীরা ভিন্ন শ্রেণীর কিংবা ঘোর অধঃপতিত ব্যক্তি, এটা সত্য নয়। বস্তুতঃ, পায়ুকাম-অভিলাষী ও পারস্পরিক পাণিমেহনে আগ্রহী, এই দুই প্রকার সমকামীর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

সম অর্থবোধক গ্রীক উপসর্গ (প্রেফিক্স) 'হোমো' থেকে এসেছে হোমো-সেক্সুয়্যালিটি, এরই বাংলা পরিভাষা বা প্রতিশব্দ হচ্ছে, সমকাম বা সমরতি বা সমকামিতা। কাজে কাজেই এটা হচ্ছে সেই কামজ ভালবাসা যার পাত্রপাত্রীরা সমলৈঙ্গিক। অর্থাৎ কিনা পুরুষের প্রতি পুরুষের কিংবা নারীর প্রতি নারীর আকর্ষণই সমকামিতা, এর মধ্যে বন্ধুত্বও এসে পড়েছে, এটা কিন্তু সমরতি নয়, যতক্ষণ না সমলিঙ্গদেহজাত উদ্দীপনায় স্খলন বা রাগমোচন হচ্ছে। আবার এই আকর্ষণ তথা কামানুষ্ঠানের রূপটি যখন হবে প্রধানতঃ কিংবা পূর্ণতঃ, বিকৃতি পর্যায়ভুক্ত হবে।

কোন সন্দেহ থাকার কথা নয়, মূলতঃ দুটি পুরুষের বা দুটি নারীর মধ্যে অনুষ্ঠিত রতব্যাপারই সমরতিপদবাচ্য। কিন্তু কেউ কেউ সমরতির সগোত্রতা দিয়েছেন ভিন্নলৈঙ্গিক মুখমেহনে কিংবা মৈথুনবর্জিত অন্য কোন কামানুষ্ঠানে। এটা ভুল। অন্য কেউ বলেছেন, সমলৈঙ্গিক পারস্পরিক পাণিমেহন সমরতিক অনুষ্ঠান হবে না, যদি না মুখকাম কিংবা পায়ুকাম দ্বারা চিহ্নিত হয়। এর চেয়েও মারাত্মক ভুল দেখি; পায়ুদান করে যে নিষ্ক্রিয় সঙ্গী শুধু তাকেই সমকামী বলা হয়েছে এবং সক্রিয় সঙ্গী সবসময়ই ইতরকামী। এও ভুল, কেননা, এসবই সমকামিতার উদাহরণ। দুই পুরুষ বা দুই নারী মিলে কোন রকম কামানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হলেই ব্যাপারটা সমরতিক অনুষ্ঠানের পর্যায়ভুক্ত হবে নিশ্চিত।

রাশি রাশি সমার্থক শব্দ আছে সমকামিতার। উল্লেখযোগ্য কয়েকটির নাম বলছি। ১৮৬২-এ উলরিখ প্রবর্তিত 'আর্নিং' শব্দটি কখনই প্রতিষ্ঠা পায়নি। যেমন পায়নি, ১৮৬৯-এ ওয়েষ্টফল উদ্ভাবিত 'বিপরীত যৌনতা' (কণ্ট্রারি সেক্সুয়্যালিটি) যা কিনা অর্থবহতার দিক থেকে সমকামিতার চেয়েও সার্থক; ক্রাফট-এবিং, মোল, হ্যাভলক এলিসও একথা বলেছেন। শেষে অবশ্য হ্যাভলক এলিস মনোনীত করেছেন 'কাম বিপর্যয়' (সেক্সুয়্যাল ইনভার্সান) শব্দটিকে, অর্থ যার সীমিত, শুধু জন্মগত ত্রুটি হেতু যৌনতা বিপর্যস্ত, ব্যাধিত যৌন আকর্ষণ সমলৈঙ্গিক, আর সমকামিতা বহু ব্যাপ্ত, প্রতিটি মানবজাতি এবং অধিকাংশ উচ্চতর প্রাণীতে ব্যাপ্ত। এক সময়ে সমকামীরা নিজেদেরকে এই 'ইনভার্ট' নামে জাহির করত। বর্তমানে কদাচ ব্যবহৃত (অবশ্য অন্য অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে, প্রকারভেদ দ্রষ্টব্য)। কেউ ব্যবহার করেন ভৌগিক নিষ্ক্রিয় সমকামীদের জন্যে। কেউবা যথার্থ লিঙ্গ বিপর্যয়ে এবং এটাই সঙ্গত। আরেকটি উল্লেখযোগ্য প্রতিশব্দ তৃতীয় প্রকৃতি (থার্ড সেক্স), বলেছেন এডওয়ার্ড কার্পেন্টার। হোমোসেক্সুয়্যালিটি শব্দটি হাঙ্গেরীয় ডাঃ বেঙ্কার্ট (Benkert) কর্তৃক প্রথম ব্যবহৃত, ১৮৬৯-এ। তারপর সমগ্র জীবনের সাধনায় যিনি সমকামীদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন একজন সামাজিক মানুষ হিসেবে সেই কালজয়ী ডাঃ ম্যাগনাস হির্শফেল্ডই একে ছড়িয়ে দিয়েছেন ভুবন মাঝে। আমাদের পছন্দ হোমোসেক্সুয়্যালিটি, কেননা এটা সহজেই বোধগম্য, শ্রুতিসুখকর, সেই সঙ্গে পরিষ্কারভাবে বজায় থাকে স্পষ্ট অর্থও।

এইমাত্র উল্লেখ করা পারিভাষিক শব্দাবলীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে 'লেসবিয়ান লাভ' বা 'লেসবিয়ানিজম'। এটা শুধু মহিলা সমকামীদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। 'লেসবস' দ্বীপবাসিনী গ্রীক মহিলা কবি স্যাফো ছিলেন নামকরা সমকামী।

এঁরই নামে চিহ্নিত করা হয়েছে স্যাফিক লাভ, স্যাফিজ়িম এবং লেসবিয়ানিজ়ম-এ সঙ্কেত আছে এঁর বাসস্থলের।

প্রকারভেদ

ইতরকামী, নইলে সমকামী, এই দুই শ্রেণীতে মানবজাতি বিভক্ত, এধারণা ঠিক নয়। কেননা এমন সমকামীও আছে যাদের ভাল লাগার অনেকটাই ইতর-রতিক, এদেরকে সামান্য চেষ্টাতেই পরিপূর্ণভাবে ইতরকামভাবাপন্ন করা যায়। অনেকে আবার স্পষ্টতঃই উভয়কামী*, উপভোগ করে দুটোই যখন যেটা মেলে। এরকম বৈসাদৃশ্য আছে বলেই সপ্তঅংশযুক্ত মানদণ্ডের (সেভেন পয়েন্ট স্কেলের) প্রবর্তন করেছেন ডঃ এ্যালফ্রেড কিনসী ও তাঁর সহকর্মীগণ। অর্থাৎ কিনা মানবসমাজের একদিকে রয়েছে পুরোপুরি ইতরকামী, এদের সংখ্যা ৫০%। অন্যদিকে অবিমিশ্রভাবে সমকামী, সংখ্যায় ৪% মাত্র। মাঝখানে যারা রইলেন তাদের সংখ্যা ৪৬%, অভিজ্ঞতায় এরা মিশ্রিত, সমরতি ও ইতররতি দুইই আস্বাদিত,কম বা বেশী বা সমান সমান। সপ্তমুখী স্কেলটা এই রকম :

০। ১০০% ইতররতি

১। প্রধানতঃ ইতররতি আর সমকামিতা প্রাসঙ্গিক অর্থাৎ কিনা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

২। প্রধানতঃ ইতররতি। সমকামিতা প্রাসঙ্গিক নয় আরও অধিক, কিন্তু যতই বেশী হোক না কেন, ইতররতিক অনুষ্ঠানের চেয়ে কম।

৩। ৫০% ইতররতি এবং ৫০% সমরতি।

৪। প্রধানতঃ সমরতি, যদিচ ইতরকামিতা সুস্পষ্ট।

৫। প্রধানতঃ সমরতি সেই সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ইতরকামিতা।

৬। ১০০% সমরতি।

প্রায়ই বলতে দেখি, সমকামীরা দুই প্রধান শ্রেণীতে বিন্যস্ত। একদল সক্রিয়, কার্মিক, সকর্মক, এটা কর্মবৃত্ত (এ্যাকটিভ) সমকামিতা। সমরতি নামক নাটকে এরা পুরুষের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে চায় কিংবা পায়ুরত অভিলাষী। আরেক-দল নিষ্ক্রিয়, ভৌগিক, অকর্মক, এটা ভোগবৃত্ত (প্যাসিভ) সমকামিতা। ঠিক বিপরীত এদের অভিলাষ অর্থাৎ তৃপ্তি শুধু নিষ্ক্রিয়তায় কিংবা স্ত্রীর ভূমিকায়।

---

* প্রায়শঃ ব্যবহৃত 'বাইসেক্সুয়্যাল' শব্দটি যথাযথ নয়, অশুদ্ধ। জীবজগতে বাইসেক্সুয়্যাল বলতে যা বোঝায় মানবকামিতায় ঠিক সেই অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে না।

কিন্তু এরূপ ভেদরেখা সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়, কারণ, যেটা বহুদৃষ্ট তার নাম পায়ুরত নয়, পারস্পরিক পাণিমেহনই। তা ছাড়া কে অগ্রণী আর কে নিক্রিয় এরূপ ভেদাভেদ বাস্তবে সাধারণতঃ পরিলক্ষিত হয় না। পরিবেশ অনুযায়ী বা প্রয়োজন মাফিক একই সমকামী কখন কার্মিক, কখন ভৌগিক। আসলে সঙ্গিযুক্ত কামানুষ্ঠানমাত্রই পারস্পরিক, তাই পুরোপুরি সক্রিয়তা কিংবা নিক্রিয়তা বলে কিছু নেই, যদিচ একজনে বেশী সক্রিয়।

দীর্ঘকাল—মাসের পর মাস, বছরের পর পর—সঙ্গপরশহারা ব্যক্তিদের অনেকেই (যেমন বন্দী, নাবিক) শেষ পর্যন্ত অতিষ্ঠ হয়েই সমলৈঙ্গিক সঙ্গীকেই ডেকে নেয়, এটা পরিবেশগত সমকামিতা। কারণটি কোথাও ক্ষুদ্র অঙ্গ, নারী ভীতি কিংবা, তীব্র ভৎসনা হেতু নারী পরিহার, একেও পরিবেশগত ফলাফল বলা যেতে পারে। এসব ক্ষেত্রে সমকামিতার শিকড় গভীরভাবে প্রোথিত নয়। অর্থাৎ কিনা যথার্থ সমকামিতার মত স্থায়ী বাধ্যতাজনিত আবেগ নেই, নারীকে কাছে পেলেই কিংবা ভুল ধারণা বা ভয় ভেঙ্গে গেলেই সমকামিতাকে ফিরিয়ে দেবে। পরিবেশগত সমকামিতার আরেক রূপ : প্রাসঙ্গিক সমকামিতা। কৌতূহল বশে কিংবা অভিজ্ঞতায় বৈচিত্র্যাস্বাদের জন্যে, পাকেচক্রে পুরুষের (বা নারীর) সঙ্গীনির্ভর তৃপ্তিলাভ এই পর্যায়ের। সমগ্র জীবনে এভাবে রতিপ্রাপ্তির সংখ্যাও আশ্চর্যরকমভাবে কম।

যৌনশাস্ত্রে সর্বাধুনিক সংযোজন : লিঙ্গ ভূমিকা (জেণ্ডার রোল)। এই ভূমিকা ভেদে সমকামীরা অধিকাংশক্ষেত্রেই স্বাভাবিক লিঙ্গ (নন-ইনভার্ট), কখনবা বিপর্যস্তলিঙ্গ (ইনভার্ট)। পুরোপুরি সমকামীকে কেউ কেউ ইনভার্ট বলেন, সমকামিতা অতএব ইনভার্সান বা কামবিপর্যয়। এটা শুদ্ধ নয়, কেননা সমকামীমাত্রই বিপর্যস্তলিঙ্গ নয়। স্বাভাবিকলিঙ্গ সমকামীদের লিঙ্গ ভূমিকা অপরিবর্তিত, শুধু কামপাত্র বদলে গেছে এই যা। আর দুটোর রংবদল হয়েছে ইনভার্ট সমকামীদের। ইনভার্ট সমকামী আবার দুই প্রকার, বিপর্যস্তলিঙ্গ পুরুষ সমকামী আর বিপর্যস্তলিঙ্গ মহিলা সমকামী। প্রথমোক্ত পুরুষ নিক্রিয়, চিত্ত নারীসুলভ এবং নিজেকেও নারীরূপে গণ্য করে, ফলে রতিলাভের আশা পুরুষের কাছেই। শেষোক্ত নারী সক্রিয়, প্রবলভাবাপন্ন, নিজেকে পুরুষ বলেই ভাবে, সুতরাং রতিঅভিলাষ জানায় নারীর কাছেই।

আরও দুটি প্রকারভেদের অনুল্লেখে এপ্রসঙ্গ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সমকামীরা সাধারণতঃ বয়স্কজনেই আগ্রহী, কখনবা অল্পবয়স্ক পাত্রে, এর নাম বালকামিতা বা পিডোফিলিয়া। দ্বিতীয়টি, লাক্ষণিক সমকামিতা। বিষণ্ণতা,

খেদোন্মস্থ বাতুলতা (ম্যানিক ডিপ্রেসন), চিত্তভ্রংশী বাতুলতা (সিজোফ্রেনিয়া) ইত্যাদি রোগের লক্ষণ হিসেবে সমকামিতার আবির্ভাব বিচিত্র নয়। বিচিত্র নয় সুরা কিংবা ঔষধের প্রভাবে সমরতি বাসনার নিদ্রাভঙ্গ।

শতকরা হার

কিনসী রিপোর্টে দেখব, বয়ঃসন্ধি থেকে বৃদ্ধকাল এই বয়সের পুরুষজাতির কামতৃপ্তির ৬'৩% অংশ আসে সমকামিতামূলক অনুষ্ঠান থেকে। অর্থাৎ মানবকামিতায় সমকামিতা সংখ্যালঘু হতে পারে তথাপি তাৎপর্যপূর্ণ। এবং পুরুষের অবস্থা যাই হোক না কেন—প্রতিটি বয়সের একক কিংবা বিবাহিত, যে কোন সামাজিক স্তরে, কল্পনাসম্ভব প্রতিটি পেশায় ও বৃত্তিতে, শহরের প্রত্যন্ত অংশে কিংবা গ্রামে—সমকামিতার ছাপ পড়েছে।

সমকামীদের যথার্থ সংখ্যানিরূপণ দুরূহ কর্ম। কিনসী রিপোর্টে শতকরা হার এই রকম: সমগ্র জনসমাজের শতকরা পঞ্চাশজন পরিণতবয়স্ক পুরুষ পুরোপুরি ইতররতিক এবং শতকরা ৪ জন পুরোপুরি সমরতিক, সুতরাং প্রায় অর্ধেকের মত (৪৬%) উভয়কামী। ম্যাগনাস হির্শফেল্ড দেখেছিলেন, পুরুষদের মধ্যে উভয়কামী ৩'৪%, ইতরকামী ৯৪'৩%, সমকামী ২'৩%। হ্যাভলক এলিসের মতে শতকরা ২-৫ জন পুরুষ সমকামী এবং ৪-১০% নারী সমকামী।

ইদানীং এটা সর্বজনস্বীকৃত, নারীরা পুরুষের চেয়ে কমই লিপ্ত হয় সমরতিক অনুষ্ঠানে। পুরুষের তুলনায় অর্ধেকেরও কম, প্রায় এক-তৃতীয়াংশের মত কম, অংশতঃ কিংবা পূর্ণতঃ উভয়ক্ষেত্রেই। কিনসী বলেছেন, ত্রিশের নীচে ২৫% এবং চল্লিশের নীচে ১৯% রমণী অন্য নারীদেহের সম্পর্কে এসেছে। এবং পুরোপুরি সময়ের জন্যে এরূপ কামাবেগে পীড়িত নারীর সংখ্যা ১-৩%।

নারীজগতে সংখ্যাল্পতার জন্যে কয়েকটি কারণও নির্দিষ্ট করা হয়েছে। যেমন, পুরুষের তুলনায় কম সমালোচনা, মাত্র কতিপয় দেশে স্ত্রী-সমকাম আইনতঃ নিষিদ্ধ এবং যেখানে নিন্দার্হ সেখানে কদাচ দণ্ডিত। শুধু সভ্য জগতে নয়, আদিম সমাজে এবং প্রাণিজগতেও মাত্রাতিরিক্তভাবে কম। কারণ, পুরুষরা, বিশেষ করে পুরুষপ্রাণীরা, সহজেই খেলা করতে পারে নিজ অঙ্গ নিয়ে। মনুষ্যজগতে অল্পদৃষ্টতার কারণ নারীতৃপ্তি অধিকাংশক্ষেত্রেই শুধুই সহজ ইন্দ্রিয়-উদ্দীপনার সমষ্টি নয়, এর সঙ্গে আরও কিছু উপাদান—মনোগত তৃপ্তি—যুক্ত থাকা চাই। অধিকন্তু উৎপত্তিগত কারণ এবং বাসনাগত বৈষম্যও দায়ী। পুরুষের প্রতি বিদ্বেষ, ভয়, ঘৃণা সঙ্গোপনে লুকিয়ে রাখতে চায়, সে নারীর রতিভাগ্য প্রায়ই পর্যবসিত হয় রতিজড়তায় কিংবা যৌনহীনতায় (আসেক্সুয়্যাল)।

পক্ষান্তরে নারী-ভয়ে ভীত, নারীর প্রতি শত্রুভাবাপন্ন, নারীবিদ্বেষী পুরুষ যৌনহীন নয়, সমকামী। পুরুষের যৌনবাসনা এত বেশী তীব্র, বিশেষ করে বয়ঃসন্ধিকালে ও নবযৌবনে, নিবৃত্তির যে কোন একটা পথ খুঁজে নেবেই, এবং পুরুষসঙ্গীও সহজলভ্য আর একবার সমকামিতার স্বাদ পেলে প্রায় অভিলাষী হয়, এবয়সে পুং-সমকামিতার প্রাচুর্যর কারণটি এখানেই। অপরদিকে, নারীর কামবাসনা এত জরুরী নয়, সহজেই শান্ত বা অবদমিত থাকে। পরিণতবয়সে কোন কোন নারী হয়ত অতিকামা, এরা সহজেই বিপরীতলৈঙ্গিক সঙ্গী খুঁজে পায়। কিন্তু উচ্চকাম পুরুষের ভাগ্য এত সুপ্রসন্ন নয়, সহজেই নারীসঙ্গ মেলে না এদের।

ইতিহাস

সমকামিতার চিহ্ন পড়ে আছে পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে, প্রতিটি মানবসমাজে, সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিকাশের প্রতিটি স্তরে। অর্থাৎ মানবজাতির মতই প্রাচীন। ফ্রান্সে গুহাঙ্কিত চিত্রাবলী এই সাক্ষ্যই দিচ্ছে যে পুরাতন প্রস্তর যুগেও ছিল। অর্থাৎ বয়সে বুড়ো পৃথিবীটার মতই বৃদ্ধ।

প্রামাণ্য নজির আছে প্রাচীনতম ঐতিহাসিক যুগেও—এ্যাসিরীয়, ব্যবিলনীয়, ইজিপ্টীয়, গ্রীসীয়, রোমক যুগেও। এমন কি প্রাচ্যেও, চীন জাপানেও পরিচিত ছিল। ৪৫০০ বছর পূর্বে ইজিপ্টে দেবতার কাছে সমর্পিত হয়েছে সমরতিক ভালবাসা। প্রাচীন গ্রীসীয় সভ্যতার অনুকূল পরিবেশে আশ্চর্যসুন্দর ব্যাপ্তি ঘটেছিল, শুধু যে অনুমোদিত ছিল তা নয়, ছিল বিবাহের চেয়ে বড়, গণ্য হত মহৎ প্রেমের আধার রূপে, এমন কি চরম আধ্যাত্মিক মূল্যও আরোপিত হত। স্পার্টান সমরচর্চা প্রতিষ্ঠার মূলে ছিল এই সমরতিক ভালবাসাই। ছড়িয়ে আছে গ্রীক-রোমক সাহিত্যেও, দৃষ্টান্তস্বরূপ প্লেটো, ভার্জিল, পেট্রনিয়স রচনাবলীর উল্লেখ করা যেতে পারে। অনেক রোমক সম্রাট সমরতিক আচরণে লিপ্ত ছিলেন। সাত শতাব্দী পরে প্রথম খ্রীষ্টীয় সম্রাট কনষ্টানটাইনের আমলে মৃত্যুদণ্ড উচ্চারিত হয় সমকামিতায়। এতদনুরূপ নিষিদ্ধ দণ্ডনীয় দৃষ্টিভঙ্গীর প্রথম বদল ঘটে নেপোলিয়নীয় যুগে। তথাপি বর্তমান যুগের পরিবেশ নিষিদ্ধ প্রতিকূল বলা যেতে পারে, পুরুষসমকামিতা (ক্বচিৎ কখন স্ত্রী-সমরতি) এখনও দণ্ডনীয়। অবশ্য গ্রেট ব্রিটেনে, এবং শুধু গ্রেট ব্রিটেনেই, উলফেনডেন কমিটির সুপারিশক্রমে এখন আর সমকামিতা (উভয়েই সাবালক এবং সম্মত এবং গোপনে অনুষ্ঠিত) আইনতঃ নিষিদ্ধ নয়, অর্থাৎ কিনা অনুমোদিত।

ব্যাপকতা

সমকাম ব্যাপারটা দুর্লভ নয়। কি প্রাণিজগতে, কি আদিম সমাজে, কি

সভ্যতার অন্দরমহলে সর্বত্রই অবাধ বিচরণ।

মানবযৌনতার একটি অবশ্যম্ভাবী অধ্যায়: সমকামিতা। অন্য পুরুষের (নারীর) নিবিড় সান্নিধ্য ন্যক্কারজনক মনে হতে পারে অনেক পুরুষের (নারীর) কাছেই। কিন্তু শৈশবের দিনগুলিতে কিংবা নবযুবাকালের শুরুতে যদি দৃকপাত করি, অহেতুক প্রীতির সম্পর্কে আবদ্ধ ছিল এমন অনেক পুরুষ (নারী) খুঁজে পাব এবং এই সম্পর্কের সঙ্গে শুধু প্রেমে পড়ারই তুলনা চলে। যথার্থতঃ সমলৈঙ্গিক ব্যক্তির আকর্ষণ কদাচ অনুভব করেনি যারা বলেন তারা কিন্তু সেই নায়ক-নায়িকাদের কথা ভুলে গেছে।

সেই এ্যারিষ্টটলের আমল থেকেই প্রাণিজগতে বিদিত। হ্যাভলক এলিস, এ্যালফ্রেড কিনসী, ফোর্ড ও বিচ, প্রমুখ গবেষকদের গ্রন্থ থেকে জানতে পারি—সমলৈঙ্গিক সান্নিধ্যে আসে প্রায় প্রতিটি স্তন্যপায়ী প্রজাতি, পুরুষ ও স্ত্রী উভয় প্রাণীই, যদিচ সংখ্যাগত বিচারে পুরুষপ্রাণীর তুলনায় স্ত্রীপ্রাণীরা নিতান্তই সংখ্যালঘু। এবং আনুপাতিক হারে এরূপ সম্পর্কস্থাপন ভিন্নলৈঙ্গিক সান্নিধ্যের ধারে কাছে ঘেঁষতে পারে না। মানুষ, মানুষের নিকটতম আত্মীয় নরাকার বানর (যেমন, শিম্পাঞ্জী, বেবুন) এবং সাধারণ বানর, এরা সবাই প্রাইমেট (এবং স্তন্যপায়ী) শ্রেণীভুক্ত। মানুষ বাদ দিলে যারা পড়ে থাকে তারা হল সাবহিউম্যান প্রাইমেট। প্রাণিজগতে এই মানবেতর স্তন্যপায়ী প্রাইমেট শ্রেণীভুক্ত প্রাণীদের মধ্যেই সমরতিক অনুষ্ঠান উল্লেখযোগ্যভাবে এবং সর্বাধিক হারে দৃষ্ট। প্রাইমেটের নীচে সাবপ্রাইমেট (এরাও স্তন্যপায়ী) প্রজাতি এবং এই গোত্রভুক্ত প্রাণীদের মধ্যেও, উদাহরণস্বরূপ ইঁদুর, খরগোস, কুকুর, বেড়াল, ছাগল, গরু, ঘোড়া, হাতী, সিংহ, সমলৈঙ্গিক কামানুষ্ঠান চোখে পড়বে।

চোখে পড়বে আদিম জগতেও। সাক্ষ্যপ্রমাণ ছড়িয়ে আছে ওয়েষ্টারমার্ক, ফোর্ড ও বিচ, কিনসী, মার্গারেট মিড প্রমুখ পণ্ডিতপ্রবরের রচনাবলীতে। সভ্য মানুষের মত, আদিবাসীদেরও সমকাম নিয়ে কম দ্বন্দ্ব নেই। কোন কোন আদিম সমাজে, সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত কিংবা দুর্লভ, অনুপস্থিতি বা দুর্লভদর্শনের কারণটি সেই একই, সুনির্দিষ্ট প্রতিকূল সমাজ-বিধি, নিন্দা ও শাস্তির ভয়। অর্ধেকেরও বেশী সমাজে কামনিবৃত্তির উপায় হিসেবে স্বীকৃত, সমাজ কোথাও নির্বিকার, ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে বিবাহপূর্ব সমরতি নিন্দনীয় নয়, কোথাও স্বাভাবিক আচরণরূপে গণ্য, এমন কি সামাজিক প্রথা হিসেবেও স্বীকৃত। সমাজ প্রতিষ্ঠিত সমকামীদের বলা হয় 'বেরডাশ' (BERDACHE), এরা নারীবেশে সজ্জিত, এদের ভূমিকা নারীকৃত্যপালন এবং পুরুষসঙ্গীর বিনোদন।

সমরতিক অনুষ্ঠানের নির্দিষ্ট খবর মিলেছে আদিবাসিনীদের মধ্যেও, তবে কিনা অতি অল্পক্ষেত্রেই দৃষ্ট। ব্যতিক্রম শুধুমাত্র একটি সমাজ—মোহেভ ইণ্ডিয়ান সমাজ যেখানে স্ত্রীসমকাম প্রকাশ্যে অনুমোদিত এবং পুরোপুরিভাবে সমরতি অভিলাষিণীর সংখ্যাও কম নয়।

সবচেয়ে ব্যাপক সভ্যজগতে। স্কুলে, হস্টেলে, কয়েদখানায়, সৈন্যবাহিনীতে এবং অন্যত্র এতই ব্যাপক যে একে অস্বভাবী বলা সাজে না। বরং বলা যেতে পারে সমকামিতামূলক আচরণ প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যেই নিহিত। সত্যি কথা বলতে কি, এটা এমন এক বিশিষ্ট আচরণ যা সমগ্র জনসমাজের প্রায় অর্ধেককে জড়িয়েছে। কিনসী রিপোর্টে দেখব, ৪৫ বছরের মধ্যে ৫০% পুরুষ এবং ২৮% নারী সমরতিক অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ। এবং বয়ঃসন্ধি থেকে বৃদ্ধকাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে তৃপ্তিযুক্ত—অন্ততঃ বারেকের তরেও তৃপ্তিলাভ করেছে সমরতিক অনুষ্ঠানে—পুরুষের ও নারীর সংখ্যা যথাক্রমে ৩৭% ও ১৩%।

এযাবৎ আলোচিত সংস্কৃতিগত, প্রজাতিগত, যৌনপ্রতিবেদনগত তথ্য থেকে আমরা কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি। প্রথমেই যেটা নজর কাড়বে সেটা এই : মানব সমেত প্রায় প্রতিটি স্তন্যপায়ী প্রাণীর মধ্যেই একটা জৈবিক প্রবণতা লুকিয়ে আছে বিপরীতমুখী যৌনতার প্রতি। একেই বলি, স্তন্যপায়ী-সুলভ উত্তরাধিকার। অর্থাৎ লিঙ্গনির্বিশেষে যে কোন সমর্থ উদ্দীপনায় (নর ও নারী যে কেউ উদ্দীপনার উৎস হোক না কেন) জাগ্রত হতে পারে সংবেদী ব্যক্তির কামভাব, ইতরকামিতা এবং সমকামিতা। সমরতিক উদ্দীপনায় সাড়া দেওয়ার ক্ষমতাটা অতএব জৈবিক মৌল ক্ষমতা বিশেষ।

দুই, এমন কোন মানবসমাজ নেই যেখানে ইতররতি অপেক্ষা সমরতি অধিকতর গ্রাহ্য, সমাদৃত। বস্তুতঃ মানব কিংবা মানবেতর প্রতিটি সমাজে প্রাপ্তবয়স্ক নরনারীর প্রধানতম অনুষ্ঠান ইতররতিই, সমরতি নয়।

তিন, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীতে পার্থক্য বিস্তর। সমাজ যতই নির্দয়, যতই কঠোর হোক না কেন, কতিপয় ব্যক্তি সমকামিতামূলক আচরণে লিপ্ত হবেই। মানুষীর চেয়ে মানুষরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ, প্রাণিজগতেও ঠিক তাই।

চার, প্রশ্ন উঠবে, জৈবিক মৌল উত্তরাধিকারই যদি হবে, তবে সমকামিতার প্রাচুর্য এত কম কেন ? জবাবে বলব, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নিষেধাবলীর মধ্যেই ক্ষমতাটি ছাই চাপা পড়ে। এই আমাদের সমাজের কথাই ধরুন না, সমকামিতা নিষেধিত, নিন্দনীয়, দণ্ডনীয়ও, এমন কি বিকৃতিরূপেও চিহ্নিত। ফলতঃ শতকরা হার অনেক কম।

সমকামীদের বৈশিষ্ট্য

অনেকের ধারণা সমকামী পুরুষদের গড়ন বলিষ্ঠ নয়, মেয়েলি মেয়েলি। চামড়া নরম, কণ্ঠস্বর মোলায়েম, এবং মনের দিক থেকে সুস্থিত নয়। এক কথায়, চলনে বলনে নারীসুলভ বৈশিষ্ট্য। এবং মহিলা সমকামীকে দেখলে পুরুষ বলেই ভ্রম হবে, কারণ, ঈষৎ রোমবৃদ্ধি, শক্ত মাংসপেশী, কর্কশ ভারী কণ্ঠস্বর, মুখব্রণ, এসবই পুরুষালি ছবি। কোনটাই ঠিক নয়, সমকামীরা আর পাঁচজন নরনারীর মতই। এবং মনের দিক থেকেও। তিল তিল বঞ্চনা দিয়ে গড়া দৈত্যবিশেষ কিংবা ভয়ঙ্কর অধঃপতিত ব্যক্তি, তাও নয়। এরা সাধারণ মানুষই, শুধু মানসলৈঙ্গিক বিকাশে বিড়ম্বিত এই যা। সমকামীরা নিজেদেরকে জাহির করে বিশেষ শ্রেণী—তৃতীয় প্রকৃতি—রূপে, দাবি করে উন্নত মানবজাতি রূপে। কিন্তু বাস্তবে দেখব, বিশেষভাবে নির্বাচিত উন্নত মানবগোষ্ঠী এরা নয়। কেননা সমকামীদের মধ্যে জ্ঞানীগুণীও যেমন আছে, তেমনি আছে সাধারণ মানুষ—এরাই তো সংখ্যায় অধিক—এবং নিকৃষ্ট অপদার্থ ব্যক্তিও যে কম তা নয়। বিস্ময়কর প্রতিভা ও অসাধারণ বুদ্ধিদীপ্তদের মধ্যে, উদাহরণস্বরূপ লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি, মাইকেল এ্যাঞ্জেলো, অস্কার ওয়াইল্ড, অধিকতর দৃষ্ট হলেও, সমগ্র সমকামী সমাজ কখনই এদের মত প্রোজ্জ্বল নয়।

পুরোপুরি সমকামীরা যথার্থই অপরিণত। বিপরীতলৈঙ্গিক ব্যক্তির কাছে প্রায়শঃ সঙ্কুচিত, ভীরু, লজ্জা পায়। প্রবল দীপ্ত পৌরুষের প্রশংসা করে, কেননা নিজেদের মধ্যে এগুণটির যে অভাব সবচেয়ে বেশী। কতিপয় সমকামী পুরুষের অনুরাগ অবশ্য মেয়েলি পুরুষে কিংবা নবযুবায়।

সমকামীরা দীর্ঘস্থায়ী আবেগজ সম্পর্ক স্থাপনে অপারগ অর্থাৎ এদের সম্পর্কটা অল্পকালের। সমকামী সঙ্গীদের মধ্যে একে অপরের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী, স্বাভাবিক স্বামীস্ত্রীর মত পরিপূরক নয়। হীনতাবোধহেতু উভয়েই স্পর্শকাতর এবং সহজেই পাপবোধ প্রতিভাত হয়, ফলে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা। তা ছাড়া নিজ ভূমিকার সুষ্ঠু তৃপ্তিদায়ক অভিনয় নেই। যেমনটি আছে স্বাভাবিক স্বামীস্ত্রীর। অধিকন্তু নিঃসঙ্গতাজাত, সমকামিতা তাই ইতররতি অপেক্ষা অধিকতর বাধ্যতামূলক। ইতররতির্ক ভালবাসার মত পূর্ণ ও সমগ্র নয় এবং পরিপূর্ণভাবে তৃপ্তিদায়কও না। ফলে হয়েছি কি, সমকামী পুরুষ সঙ্গীবদল করে প্রায়শঃ। সাধারণ স্বাভাবিক ও সুস্থকাম মানুষের ধারণা নেই, কী ভয়ঙ্কর নির্জনতার খাদে ডুবে থাকে সমকামীরা, কী বিপুল আবেগে তাড়িত হয় কামনিবৃত্তির জন্যে। মরুনির্জন হৃদয়ে সেক্সই একমাত্র সান্ত্বনা, তাই বার বার ধাবিত হয় সঙ্গীর সন্ধানে।

এবংবিধ কারণে সমকামীরা প্রায়ই অপরাধপ্রবণ ব্যক্তি হয়ে ওঠে। অন্যান্য কামবিকৃতির সঙ্গেও জড়িয়ে পড়তে পারে অবিমিশ্রভাবে—ধর্ষমর্ষকাম, প্রদর্শনকাম, নিরীক্ষণকাম, ঘর্ষণকাম, বসনকাম।

মানসসুস্থতাভেদে সমকামীরা পরিণতমানস কিংবা মনোরোগী, সিজোফ্রেনিয়া, বিষণ্ণতা, ইত্যাদি মনোরোগ। অপরিণত ব্যক্তি কিংবা নিউরোটিক। মনোবিকলনগ্রস্তদের কিংবা দুষ্ট অসুস্থ ব্যক্তিত্বের একটি দিক সমকামিতা। প্রসঙ্গতঃ বলে রাখা ভাল, সমরতিক অনুষ্ঠানে জড়িয়ে পড়া ব্যক্তিমাত্রই মনোরোগী নয়। সমাজের সম্ভ্রান্ত প্রয়োজনীয় ব্যক্তি থেকে সাধারণ অপ্রয়োজনীয় মানুষ, এরা সকলেই ভিড় করতে পারে এই সারিতে। অর্থাৎ অধিকাংশই সুস্থমানস এবং পরিণত ব্যক্তিত্বের অধিকারী।

মহিলা সমকামীদের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য কতিপয় বিচারে ভিন্ন। সমাজের সহনশীলতা হেতু স্ত্রীসমকাম দৃষ্টি আকর্ষক নয় এবং পাপবোধও পুরুষের মত তীব্র নয়। পুরুষদের তুলনায় মহিলা সমকামীদের শতকরা হার অনেক কম। সমগ্র অভিজ্ঞতা বিচারে অর্ধেক কম এবং তৃপ্তিযুক্ত অভিজ্ঞতায় এক-তৃতীয়াংশ কম। যৌন আবেগ দ্বারা প্রবলভাবে তাড়িত নয় পুরুষদের মত এবং যৌনতার তাগিদও পুরুষদের চেয়ে কম জরুরী। সুতরাং নারীর সমকামিতা কম বাধ্যতাজনিত এবং অনুষ্ঠান সংখ্যাও কম। পুরুষের মত অজস্র সঙ্গী খোঁজে না, অধিককালস্থায়ী সম্পর্ক স্থাপন করে একজনের সঙ্গেই অর্থাৎ সঙ্গীনারীর সঙ্গে এদের সম্পর্ক রীতিমত একনিষ্ঠ এবং দীর্ঘস্থায়ী। সমরতিক জীবনের আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য: অধিক অনুরাগ বিজড়িত, অল্পবৈচিত্র্য তথা ব্যভিচার। এবং পুরুষের চেয়ে অধিকতর তৃপ্তিদায়ক। নারীর মধ্যে সমকাম ব্যাপারটা প্রায়শঃ মানসিক আবেগের তৃপ্তিসাধন, শুধু নিবিড় আলিঙ্গনই যথেষ্ট, পুরুষের মত কামানুষ্ঠানসর্বস্ব নয়। সতর্ক ও সুবিবেচনাপূর্ণ জীবনযাপন করে, এমন কি বিয়ে-থাও করে। স্বামীর সঙ্গে যৌনসম্পর্ক মেনে নেয় অবশ্যই রতিজড়তা দিয়ে। এব্যাপারে সমকামী পুরুষ অসহায়, অক্ষম, অর্থাৎ পুরুষত্বহীন।

শাস্তিদানের বাস্তবতা, ধরা পড়ার আতঙ্ক, লজ্জাবোধ, হীনতাবোধ, পাপবোধ, এসব মিলে মিশে সমকামীদের অদ্ভুতচরিত্রের মানুষ করেছে এবং মানসতার দিক থেকেও নিশ্চয়ভাবে পীড়িত, কামাবেগের অপ্রতিরোধ্যতার জন্যে। এতদ্ব্যতীত আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে।

বিপরীতলিঙ্গের সঙ্গে তৃপ্তিদায়ক সম্পর্কস্থাপনকে যদি আবেগজ পরিণতির লক্ষণ হিসেবে ধরে নিই, সমকামীরা নিশ্চয়ই অপরিণত। এর জন্যে দায়ী

পিতামাতার ত্রুটি এবং এই ত্রুটিশোধনে আমাদের নিজেদের এবং শিশুর ব্যর্থতা। এটাই প্রথম বৈশিষ্ট্য।

সমকামীদের আরেকটি উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য অন্য পুরুষের (কিংবা নারীর) প্রশংসায় (কী সুন্দর, কী মনোহর ইত্যাদি) সতত সোচ্চার, স্বকীয় পুরুষসত্তায় (কিংবা নারীসত্তায়) এরা আশ্বস্ত নয়, সন্দেহ আছে বলেই এদের এই দুরবস্থা। প্রাক্-বয়ঃসন্ধিপর্বের বৈশিষ্ট্য: হিরো বা হিরোইনদের প্রতি দুর্বার আকর্ষণ। যে কোন কিশোরের কয়েকটি অতিপ্রিয় নায়ক থাকা স্বাভাবিক, স্কুলে উঁচু ক্লাশের ছেলে, শিক্ষক, খেলোয়াড়, অভিনেতা, বয়স্ক পুরুষ। প্রথমে মাতার, পরে শিক্ষিকা, বান্ধবীর, অন্যান্য আত্মীয়ার কিংবা নায়িকার ছবির প্রক্ষেপন ঘটে একে একে। তারপর ঘটে একাত্মতা। তখন কিশোর ও কিশোরী উভয়েই অনুকরণ করে প্রিয় নায়কনায়িকাদের, তাদের আচারআচরণ, বেশ-ভূষা, পরে অবশ্য এ-উৎসাহে ভাঁটা পড়বে ইতরকামিতায় উত্তরণের অতএব স্বকীয় সত্তায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। কোন কোন কিশোরকিশোরীর এপর্যায়ে উত্তরণ নেই সুতরাং সেই মানসিক অবস্থা থেকে যাচ্ছে যেখানে নারীরূপে কিংবা পুরুষরূপে অসম্পূর্ণ। এই হীনতাবোধের ফলেই সে বিপরীত-লৈঙ্গিক ব্যক্তি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, কারণ, তার ধারণা দয়িতের কাছে সে রমণীয় নয়, কাম্যও না। এবংবিধ কারণে জাত নিরাপত্তাবোধের অভাবে সঙ্গীর প্রতি একান্তনির্ভরতা অনেক বেশী, অন্ততঃ ইতরকাম ব্যক্তির চেয়ে বেশী।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য পারিবারিক। যেমন সমকামীরা প্রধানতঃ অসুখী পরিবারের সন্তান, অনুপযুক্ত পিতামাতার সন্তান। পিতামাতার দিন কাটে ঘোর অশান্তিতে, তীব্র কলহে স্বতন্ত্র জীবনযাপনা করছেন কিংবা বিবাহবিচ্ছিন্নতা, এসবই অসুখী গৃহকোণের পরিচয়।

সমকামীদের জীবনেতিহাস পর্যবেক্ষণে জানা গেছে, কতিপয় সুনির্দিষ্ট জীবনধারা শিশুকে সমকামিতার মুখে ঠেলে দেয়। অনুপযুক্ত পিতার কয়েকটি দৃষ্টান্ত: দুর্বল, মদ্যপ, চরিত্রহীন পিতা; পিতা উদাসীন, নিস্পৃহ, নির্বিকার; সন্তানে অতি অল্প ভালবাসা কিংবা প্রকৃতই শত্রুভাবাপন্ন; পিতার অকালমৃত্যু এবং প্রবাসী পিতা।

এরূপ পিতার সঙ্গে অতিশয় আবেগপ্রবণ কিংবা স্নেহানুরক্ত মাতার যোগাযোগ সোনায় সোহাগা, সমকামিতা প্রায় অনিবার্য। দেখা গেছে, মায়ের আদুরে ছেলেরাই সমকামী হয়। বস্তুতঃ অনেক সমকামী মায়ের একমাত্র সন্তান কিংবা কতিপয় ভ্রাতার মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ।

উৎস সন্ধানে

কালেভদ্রে সমরতিক অনুষ্ঠানের অভিজ্ঞতা হয়ত অনেকেরই আছে, তথাপি প্রায় সকলেরই মূল অনুরাগ দেখি ইতররতিতেই। প্রকৃতির নিয়মে, নারীর ভঙ্গিমা ও দেহসুষমা এতই চরম যে পুরুষ তাকে ফিরিয়ে দিতে পারে না। তথাপি এই পুরুষই (কিংবা নারী) অবহেলা ভরে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, সমকামিতায় আকৃষ্ট হয়েছে। কিন্তু কেন ?

অদ্যাবধি অনেক জবাব জমা পড়েছে উত্তরের খাতায়, যতই পড়ুক না কেন, দুটি প্রধান স্রোতে প্রবাহিত : সহজাত কিংবা অর্জিত। অর্থাৎ উৎস সন্ধানে বিশেষজ্ঞরা দুই শিবিরে বিভক্ত। একদল জোর দেন জন্মসূত্রে, সমকামিতা জন্মগত। হর্মোন, বংশগতি কিংবা অন্যান্য জৈবিক সূত্রই এর বনিয়াদ। জৈবিক সুতো দিয়ে গাঁথা কয়েকটি মালা : আপজাত্য, বংশগতি, এণ্ডোক্রিন (হর্মোন), ইন্টারসেক্স বিষয়ক মতবাদ।

আরেকদল পরিবেশবাদী, এঁরাই দলে ভারী। এঁদের মতে সমকামিতা অর্জিত কারণে লব্ধ। অর্থাৎ উৎপত্তির কারণটি জৈবিক সূত্র নয়, পরিবেশীয় প্রভাব : লালনপালন, শিক্ষাব্যবস্থা, সামাজিক বিধিনিষেধ। অর্থাৎ কিনা পরিবেশের সঙ্গদোষেই সমকামিতা পরিণত, পরিস্ফুট, একমাত্র বা প্রধানতম পথ হিসেবে। সুতরাং সমকামিতা ব্যাখ্যাত হয়েছে শিক্ষাগত কিংবা সামাজিক শর্তারোপ, লিঙ্গ ভূমিকা, ব্যক্তিত্ববিষয়ক কিংবা মানসলৈঙ্গিক মতবাদের আশ্রয়ে। এখন একে একে মতবাদ প্রসঙ্গ।

সমকামিতা জন্মগত, এই মতবাদের রবরবা ছিল ফ্রয়েডপূর্ব যুগে, তখন সকলেই সায় দিতেন। তাৎকালিক জার্মান বিশেষজ্ঞগণ উদাহরণস্বরূপ ক্রাফট-এবিং, ম্যাগনাস হির্শফেল্ড এবং হ্যাভলক এলিস, সবাই একবাক্যে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। এঁদের স্বপক্ষে যুক্তি ছিল তিনটি : অতিঅল্প বয়সেই, এই চার পাঁচ বছর বয়সেও সমকামী দেখতে পাব, দেখতে পাব নারীসুলভ বৈশিষ্ট্য অনেক পুরুষসমকামীদেহে এবং আরোগ্যলাভের সকল পথই রুদ্ধ।

ক্রাফট-এবিং প্রমুখ কতিপয় পণ্ডিতের ধারণায় সমকামিতার জনক আপজাত্যই (ডিজেনারেসন), যার মূল কথাটি হল হীনতাপ্রাপ্ত জার্মপ্লাজম। দুষ্ট, অসুস্থ, অধঃপতিত ব্যক্তিরাই সমকামী হয়। এযুক্তি ধোপে টিকল না। প্রতিটি বৈজ্ঞানিকই, দৃষ্টান্তস্বরূপ লোভেনফেল্ড, ফ্রয়েড, হির্শফেল্ড, ক্লিফোর্ড এ্যালেন, প্রতিবাদ করেছেন। কারণ অসাধারণ প্রতিভাধর ব্যক্তিও, যেমন লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি, সমকামিতার শিকার হতে পারেন। তা ছাড়া সমকামী ব্যক্তিরা সুস্থ,

এদের বুদ্ধি ও ক্ষমতা স্বাভাবিক, অতিউন্নত গ্রীসীয় জনসমাজে একদা সমাদৃত এবং আদিবাসীদের মধ্যেও ছড়িয়ে আছে। আর সবচেয়ে বড় কথা হল এদিয়ে সমকামিতার কোন কিছুই ব্যাখ্যা করা যায় না। আপজাত্যবাদ অতএব অসত্য।

বংশগতির সূত্র দিয়ে সমকামিতা ব্যাখ্যাত হয়েছে। গোল্ডস্মিট্ এবং অন্যান্য কয়েকজনের ধারণায় পুরুষ বা স্ত্রী সমকামী হচ্ছে ইন্টারসেক্স। প্রাণি-দেহে পুরুষ ও নারীর মধ্যবর্তী গৌণ চিহ্নরাজির আবির্ভাব ইন্টারসেক্স রূপে চিহ্নিত করে এবং পতঙ্গ জগতে, যেমন জিপসী মথ-এ, এমনটি সম্ভব হয়েছে গোল্ডস্মিটের গবেষণায়। যথার্থ জৈবিক বিচারে প্রাণিজ ইন্টারসেক্স আর মানব সমকামিতা এক নয়।

প্রাণিজগতের—প্রজাপতির রূপান্তর—উদাহরণ তুলে ধরে সমকামীদের বলা হয়েছে তৃতীয় প্রকৃতি—থার্ড সেক্স, ইন্টারমিডিয়েট সেক্স। লিঙ্গবিচারে এরা মধ্যস্থলে বিরাজিত এবং উভয়লিঙ্গেরই মানসবৈশিষ্ট্য পায়। পূর্ণ নর ও পূর্ণ নারীর মাঝখানে এর ঠাঁই করে নিয়েছে, অর্থাৎ কিনা পুরুষদেহে নারীমন কিংবা নারীদেহে পুরুষমন সংস্থাপিত। পুরুষদেহে নারীমন, এমতের পোষক হ্যাভলক এলিস। হির্শফেল্ড-কণ্ঠে প্রত্যয়ের সঙ্গে উচ্চারিত, সমকামীদের প্রবণতা ও বিরাগ গৌণ লক্ষণ মাত্র, মুখ্য জিনিসটা হচ্ছে মন—এটাই হল হির্শফেল্ডের 'ইন্টারসেক্স থিয়োরী' বা 'থিয়োরী অব বাইসেক্সুয়্যালিটি'। জৈবিক জগতের ইন্টারসেক্স অভিজ্ঞান মনুষ্যজগতে খাটে না, আর গোল্ডস্মিট্ এই ভুলই করে-ছিলেন। অর্থাৎ সমকামীরা ইন্টারসেক্স নয়। থার্ড সেক্সও না।

বলা হয়েছে, সমকামিতা বংশবাহিত ব্যাধি (টি. ল্যাঙ, ১৯৪০)। কিংবা পুরুষ-সমকামীরা বংশগতির দিক থেকে নারীই। সমর্থনে সবসময়ই উল্লেখ করা হয় এফ. জে. কালমান-এর সেই অতিখ্যাত গবেষণা (১৯৫২)—ভিন্ন যমজ অপেক্ষা অভিন্ন যমজে সমকামীদের সংখ্যা দ্বিগুণিত। এটা কিন্তু সবাই একবাক্যে মেনে নেয়নি, ডি. জে. ওয়েষ্ট, সি. এ্যালেন, জে. ল্যাঙ প্রমুখ গবেষকরাও দেখেছেন অভিন্ন যমজের একজন বিকৃতকাম হলেও অন্যজনে স্বাভাবিককাম, অধিকন্তু, এবিকৃতি প্রায়শঃ চিকিৎসাসাধ্য।

সম্প্রতি বলা হয়েছে বয়স্কা মাতার সন্তান, সবার শেষে বা অতিবিলম্বে আবির্ভূত সন্তান, ক্রোমোজোম অস্বভাবিতা হেতু সমকামবিকৃত হতে পারে। মনে রাখা দরকার, এধরনের ঘটনা মনোবৃত্তি বিচারেও সম্ভব। সবচেয়ে বড় কথা হল, নির্দিষ্ট কোন ত্রুটি—দুষ্ট জিন কিংবা ক্রোমোজোম অস্বভাবিতা নেই,

যেমনটি আছে বংশগত ব্যাধিতে। জিন মতবাদ যদি সত্য হত, সমকামীদের সন্তানসন্ততিরাও বাদ পড়ত না এবং আত্মীয়স্বজনে অস্বভাবিতার কিছু লক্ষণ দেখা দিত। এমনটি হয়না বলেই এথিয়োরী তলিয়ে গেল। তা ছাড়া, সমগ্র জনসমাজ থেকে প্রধানতঃ সমরতিক এরূপ সকল পুরুষকে ছাঁটাই করলেও পরবর্তী দশকের বংশধারায় সমকামিতা দেখা দেবে। মানব ইতিহাস সমকামিতা বিজড়িত থাকবেই।

আরেকটি মতবাদ এণ্ডোক্রিন সম্পর্কিত। সমকামিতা এণ্ডোক্রিন ব্যাধি বিশেষ, যার মূলে রয়েছে মাত্রাতিরিক্ত বিপরীত হর্মোন, যেমন পুরুষদেহে স্ত্রী-হর্মোনের আতিশয্য। শতকরা ষাটজন পুরুষসমকামীদেহে নারীসুলভ বৈশিষ্ট্য বিরাজিত দেখেছিলেন ম্যারানন আর হ্যাভলক এলিসের চোখে ধরা পড়েছিল নারী-সমকামীর পুরুষালি লক্ষণ। অর্থাৎ সমকামীকে নাকি দেখলেই চেনা যায়। হর্মোন থিয়োরী যতই জনপ্রিয় হোক, কালের দরবারে টিকল না। কেন তা বলছি:

সাম্প্রতিককালের প্রতিটি এণ্ডোক্রিন বিশেষজ্ঞরই এক রা—মানব সমকামিতা কখনও এণ্ডোক্রিন বিষয়ক অস্বভাবিতা নয়। কারণ দৈহিক পরীক্ষায় কোন অস্বভাবিতা চোখে পড়বে না। এণ্ডোক্রিন ব্যাধিতে প্রত্যাশিত লক্ষণাবলীও আশ্চর্যজনকভাবে অনুপস্থিত। এবং দেহবিচারে—শারীরস্থানীয় ও শারীরবৃত্তীয় —সমকামী ও ইতরকামী অভিন্ন। নৃতাত্ত্বিককুলও দৃঢ়তার সঙ্গে বক্তব্য রেখেছেন, সমকামিতার দৈহিক কোন প্রকাশচিহ্ন নেই। অতিঅল্পক্ষেত্রে অবশ্য বিপরীত-লৈঙ্গিক লক্ষণাবলী থাকলেও থাকতে পারে, আর এমনটি তো যে কোন স্বাভাবিক পুরুষের (বা নারীর) ক্ষেত্রেও সম্ভব। এক কথায়, পুরুষ (কিংবা নারী) সমকামীদেহে নারী (কিংবা পুরুষ) সুলভ চিহ্ন অনুপস্থিত। বস্তুতঃ এদেব স্বাতন্ত্র্য চেহারায় নয়, আচরণে (কামজ)।

দ্বিতীয়তঃ, হর্মোন পরীক্ষায় বহুবার অসত্য প্রমাণিত। বিপরীত হর্মোনের আধিক্য কখনই ধরা পড়েনি। অতি উচ্চমাত্রায় পুং-হর্মোন প্রয়োগে সমকামিতার দুর্মর আবেগে বাঁধ দেওয়া যায় না বরং আরও ক্ষুরধার, আরও প্রচণ্ড হয়ে ওঠে। অধিকন্তু স্ত্রীহর্মোন ইঞ্জেকশনে কোন পুরুষকে সমকামী বানানো যায় না। অতএব সমকাম ব্যাপারটা হর্মোনগত নয়, অন্য কিছু।

তৃতীয়তঃ, সংস্কৃতিমূলক, প্রজাতিমূলক এবং শারীরবৃত্তীয় সাক্ষ্য বিরুদ্ধ কথাই বলে। সম বা ইতর উভয় প্রকার উদ্দীপনায় সাড়া দিতে পারে অনেকেই, মানবেতর ও প্রাইমেট কুলেও এই একই হাল, এবক্তব্য রেখেছেন ফোর্ড ও

বিচ। কিনসীও সমর্থন করেছেন: স্তন্যপায়ীসুলভ উত্তরাধিকার। মানব সমকামিতা অতএব আর যাই হোক দুষ্ট বংশগতি নয়, হর্মোনজাতও নয়। জন্মগত প্রবণতার চেয়ে মূলতঃ শিক্ষাগত শর্তারোপই দায়ী। এক কথায়, সামাজিক, নৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রভাব এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাই তাকে প্রবৃত্ত করেছে সমকামিতায়।

অনেকেই বলেছেন, এবং কোন কোন পণ্ডিত এখনও বলে থাকেন, বহুদৃষ্ট এই বিকৃতি জন্মলগ্নেই জাত। কিন্তু এযাবৎ লব্ধ সাক্ষ্যপ্রমাণাদি মোটেই জোরদার নয়। মানবসমকামিতায় কিছুটা প্রকৃতিগত প্রবণতা থাকলেও থাকতে পারে, দুষ্ট বংশগতি বা হর্মোন বৈষম্যের ফলাফল কোনমতেই নয়। আধুনিক মনোবিদ্যার জনক ফ্রয়েড, নব্য এবং প্রাচীন ফ্রয়েডপন্থীগণ এবং আরো অনেকেই একবাক্যে নাকচ করে দিয়েছেন, জন্মগত যুক্তিগুলির (১৯৯ পৃষ্ঠা) অসারতা এবং চিকিৎসায় বিকৃতির শাপমোচন ঘটে এই সব প্রবল যুক্তিতে ভর দিয়ে। এক কথায়, যে যাই বলুক, অনেক প্রমাণ আছে, সমকামীরা জন্মায় না, তৈরী হয় পরিবেশের চাপে। পরিণতবয়সের সমকামজ আকর্ষণ নির্ধারিত হয় সেই শৈশবাবস্থার আবেগজ প্রভাব দিয়েই।

মানসব্যাখ্যা যার প্রাণ সেই মতবাদ একটি নয়, অনেক। কিন্তু একটি ব্যাপারে সকলেই একমত, পিতা কিংবা মাতার সঙ্গে শিশুর সম্পর্ক কোন কারণে বিড়ম্বিত এবং এরই জের টানতে হয় শিশুকে পরিণতবয়সে। অর্থাৎ সমকামিতার, এবং অন্যান্য বিকৃতকামিতারও, কারণটি লুকিয়ে আছে সেই শৈশবকালেই। একথাটি প্রথম হেঁকে বলেছেন ডাঃ সিগমুণ্ড ফ্রয়েডই এবং ইনিই মানসব্যাখ্যার প্রথম প্রবক্তা। ১৯০৫-এ, ফ্রয়েড বর্ণিত শৈশবকামিতাবাদ ও যৌনতার ক্রমবিকাশ (১৬৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) পর্যবেক্ষণে, এটাই প্রতীত হবে সমকামিতার দুই দশা। প্রথম দশার আবির্ভাব শৈশবে, মুখকামদশা পর্যায়ে শিশু মাতাকে সমলৈঙ্গিক জ্ঞানে ভালবাসে, পরে লিঙ্গজ্ঞান জন্মে, মাতাকে ভিন্নলৈঙ্গিক ব্যক্তি ভাবে, সমকামিতা বিদায় নেয়। দ্বিতীয় দশা সূচিত হয় বয়ঃসন্ধিকালে, ১২ থেকে ১৪ বছর বয়সে, তখন নারীসঙ্গ বর্জন করে ছোট ছোট দলে মিলেমিশে থাকে। কিছুকাল পরে এও চলে যাবে, ইতরকামিতার লাঞ্জনত্র আবির্ভাবে, দেহসচেতন হবে, সাজগোজ করবে, মেয়েদের প্রতি আকৃষ্ট হবে। অন্যথায় অর্থাৎ দ্বিতীয় কিংবা প্রথম স্তরে (মুখকামদশায়) আবদ্ধ মানুষ সমকামী। এক কথায়, ফ্রয়েডীয় মতের সার কথা এই: ইডিপাস কমপ্লেক্স হেতু সংবন্ধন কিংবা অজাচারেচ্ছা থেকে পলায়ন।

সমকামিতার আসল রহস্য লুকিয়ে আছে ব্যক্তিত্ব গঠনের ধারায়। কারো না কারো আদলে শিশু নিজেকে গড়ে তোলে। শিশু যাকে ভালবাসে, যার প্রতি মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে তারই ধাঁচে, প্রথমে মাতা, পরে পিতার অনুকরণে। সাধারণতঃ সমলৈঙ্গিক পিতা বা মাতার সঙ্গে একাত্মবোধ ঘটে। সচরাচর পিতার সঙ্গে বালকের নিবিড় একাত্মতা জন্মে, মাতার সঙ্গে বালিকার। ব্যাপারটা খুবই সহজ ও সুগম হয়ে উঠবে পিতা যদি স্নেহপ্রবণ, অনুকূল, উপযুক্ত হয়। পিতা নেই, পিতার উদাসীনতায় বা বৈরিতায় বালক পিতা থেকে সরে যায়, পিতার বিপরীত চরিত্রগুলি যথাসম্ভব পেতে চেষ্টা করে। ক্ষুব্ধ অসন্তুষ্ট শিশু উপযুক্ত ভালবাসার অভাবে মাকেই আঁকড়ে ধরে যার ফলে মায়ের সঙ্গে একাত্মবোধ করে এবং বালকের চরিত্র সৃষ্ট হয় নারীর অনুকরণে। পরিণতবয়সে পুরুষ তাই পুরুষেরই প্রেমে পড়ে। কিংবা পূর্বোক্ত ভয়, বেদনা সন্তানকে ভীরু করে, পুরুষত্বে আশ্বস্ত হতে দেয় না। এরূপ প্রতিকূল বা নেগেটিভ সম্পর্কের সঙ্গে অতিশয় স্নেহানুরক্ত মাতার যোগসাজসে সমকামিতা তাই অনিবার্য। এক কথায়, সমকামিতার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হবে, পিতা কিংবা মাতার প্রতি শিশুর সুস্থ মনোভাবে চিড় খেলেই—পিতৃবৈরিতায় কিংবা আসক্তিতে, মাতায় অতি অনুরাগে কিংবা শক্রতায়।

স্ত্রীসমকামিতার ক্ষেত্রেও ঠিক তাই। বলা হয়েছে, পুরুষের সংখ্যাল্পতা নাকি একটি কারণ। এটা সত্য নয়, কেননা, পুরুষ সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও এরা বিবাহ প্রত্যাখ্যান করত। এবং অবাধ মেলামেশার অজস্র সুযোগ ছড়িয়ে আছে তবুও কিনা শুধু সমলৈঙ্গিক আকর্ষণই এদের অনুভবে ধরা দেয়। অর্থাৎ কিনা সন্তান সুখ, বিবাহ সবই অস্বীকৃত থাকত, পুরুষরা যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ হত তবুও। প্রধানতম কারণটি হল পুরুষের সঙ্গে একাত্মতা কিংবা পিতৃবিরাগহেতু মাতৃআসক্তি, তখন চরিত্র গড়ে উঠবে পুরুষের আদলে। ফ্রয়েডের 'লিঙ্গ-ঈর্ষা', এ্যাডলার-এর 'পুরুষ বিদ্রোহ', ইয়ুং-এর এ্যানিমাসআশ্রয়ী নারী—এসবের কিছু কিছু সকল কিশোরীর মধ্যেই আছে। যার ফলে, অধিকাংশ বালিকাই আট ন বছর বয়সে পুরুষ সাজতে চায়, পুরুষ-পুরুষ খেলায় মেতে ওঠে। পরে অবশ্য এটা চলে যায়। কতিপয় ক্ষেত্রে এরূপ একাত্মতা থেকে যায়, এরা প্রায়ই সমকামী হয়ে ওঠে। সমাজে পুরুষের সুখসুবিধা ও উচ্চাসন হেতু নারীর ঈর্ষা এবং 'পুরুষ নোংরা আর নারী মহীয়সী', এরূপ দুষ্ট যৌনশিক্ষাও রমণীকে সমকামিতার কথা ভাবতে শেখায়।

ফ্রয়েড বর্ণিত নিউরোসিস থিয়োরীতে এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞের মানস-

ব্যাখ্যায় ঘোরতর প্রতিবাদ করেছেন কিনসী ও তাঁর সহকর্মীগণ। সমকামিতা-মূলক আচরণ এত ব্যাপক যে একে মনোবিকৃতি বা মনোরোগের লক্ষণ বলা যায় না। সমগ্র জনসমাজের (৪০%) এক-তৃতীয়াংশের অভিজ্ঞতা আছে, তবে কি ধরে নিতে হবে এরা সবাই মনোবিকারযুক্ত ?

তা ছাড়া ঐতিহাসিক, বিশেষতঃ প্রাচীন গ্রীসীয়, ব্যাপকতা এবং বর্তমান যুগের বিবিধ নিষেধের মাঝেও সমকামীদের অস্তিত্ব তথা সমরতিক অনুষ্ঠানের প্রাচুর্য নাকচ করে দিচ্ছে মানস ব্যাখ্যা। সমকামিতাকে অতএব নিউরোসিস বা সাইকোসিস বলা যায় না। এবং এটাই দেখিয়ে দিতে চায় সমকামিতা অস্বভাবী নয়, প্রকৃতিবিরোধীও না, বরং জৈবিক উত্তরাধিকার।

হর্মোন প্রকল্প, বংশগত সূত্র, নৈতিক অধঃপতন, নিউরোটিক বা মনোবিকৃত আচরণ, শৈশবে পিতামাতায় অতিআসক্তি কিংবা কামদশায় সংবন্ধন, এসবের কোনটাই কিনসী তথ্যের কাছে খাটে না। অপরদিকে কিনসী আহৃত তথ্যা-বলী আঙ্গুল তুলে দেখিয়ে দিচ্ছে: অন্তর্নিহিত শারীরবৃত্তীয় ক্ষমতা একথাই হেঁকে বলছে প্রতিটি ব্যক্তিই সমকামিতায় সাড়া দিতে পারে, যদি সুযোগ সুবিধা মেলে এবং সমরতি-বিরুদ্ধ শর্তাবলী কার্যকরী না থাকে। যে কোন সমর্থ উদ্দীপনায় সাড়া দেওয়ার ক্ষমতা প্রতিটি স্তন্যপায়ী প্রাণীর মৌল শারীর-বৃত্তীয় ক্ষমতা।

সমকামিতা প্রসঙ্গে কিনসীর মতটি এই রকম। কোন একটি আকস্মিক ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রথম সমরতিক অভিজ্ঞতা জন্মে তারপর এ-অভিজ্ঞতার ছাঁচে মানুষ শর্তাবদ্ধ হয়, তখন হয় গ্রহণ কিংবা বর্জন। কেননা যৌন আচরণে—সমরতি বা ইতররতি যাই হোক না কেন—পক্ষপাত জন্মে মনোগত শর্তারোপের ফলেই, অভিজ্ঞতার (ভালমন্দ অনুভূতি) মাধ্যমে কিংবা সমাজের চাপে (শাস্তি, নিন্দা)।

কিনসী কথিত প্রথম সূত্রটি নর ও নারী প্রত্যেক্যেই সমকামিতায় অংশ গ্রহণ করতে পারে, এনিয়ে দ্বিমত নেই। মতানৈক্যের অবকাশ আছে দ্বিতীয় সূত্রে। যেমন: এ্যান্থনি ষ্টর বলেছেন, সমকাম ব্যাখ্যায় আকস্মিক সান্নিধ্য এবং সরল শর্তারোপ যথেষ্ট নয়।

সমকামিতা হচ্ছে ব্যক্তিত্ব সমস্যার একটি লক্ষণ, ক্লারা টম্পসন প্রবর্তিত মতবাদের বক্তব্যটি এই। ব্যক্তিত্ববিষয়ক ভয়ঙ্কর গোলযোগ, নারীভীতি, বয়স্কজনোচিত দায়িত্ববহনে গুরুভার, সমাজ বা গুরুজনের উপেক্ষা, সমলৈঙ্গিক ঘৃণা বা প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা, এসবের সামাল দিতে গিয়ে সমকামিতার আশ্রয়।

এ যেন বাস্তব থেকে পলায়ন, অনেকটা সিজোফ্রেনিয়া রোগীর পাণিমেহনের মত।

অনুরূপভাবে সামাজিক শিক্ষারোপ তথা সামাজিক প্রতিক্রিয়াও দায়ী হতে পারে। অর্থাৎ সমাজগত শিক্ষাবৈষম্যের ফসল হচ্ছে সমকামিতা। এসম্বন্ধে বক্তব্য রেখেছেন অনেকেই। প্রথম শুনি ড্যানিস বৈজ্ঞানিক, জে. ডবল্যু. স্মিট-এর ইনস্টিংক্ট ইম্প্রিন্টিং থিয়োরী (১৯৫২), সমকামিতা হচ্ছে ২।৩ বছর বয়সের অম্ভাবী ছাপ। ১৯৫৮-এ ব্রাউন বললেন, সমাজগত শিক্ষাবৈষম্যই দায়ী (সোস্যাল লার্নিং থিয়োরী)। মানুষ যে সমরতি ও ইতররতিতে সমানভাবে সাড়া দিতে পারে, এটা জন্মগত বাইসেক্সুয়্যাল প্রবণতার জন্যে নয়, মূলে আছে সমাজগত শিক্ষারোপই।

আরেকটি সগোত্র মতবাদ, জেণ্ডার রোল ইনভার্সান, বাংলায় যৌন বিপর্যয়। এটা বলতে বুঝি বিপরীতলৈঙ্গিক চিন্তাধারা, অনুভূতি এবং আচরণ। একটা উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। পুরুষ নিজেকে নারীর মত অনুভব করছে, ভাবনাচিন্তাও তদনুসারী, এমনকি নারীকর্মসমূহও পরিপাটিরূপে নিষ্পন্ন, তখন বলব এই পুরুষের যৌন বিপর্যয় ঘটেছে। নারীর সঙ্গে একাত্মবোধ, নারীর জন্যে পক্ষপাত, এবং নারীর ভূমিকায় অংশগ্রহণ—এসবই যৌন বিপর্যয়ের অপরিহার্য অঙ্গ। সুতরাং মনোগত এবং আচরণগত গুণাবলীই যৌন বিপর্যয় নির্ণায়ক মানদণ্ড, নারীর সঙ্গে শারীরস্থানীয় সাদৃশ্য ও নারীসুলভ দৈহিক বিকাশ নয়। যৌনতার দিক থেকে বিপর্যস্তলিঙ্গ ব্যক্তিরা সবাই এক নয়। কেউ ইতররতিক, কেউবা সমরতিক। কেউ স্বরতিক, কেউবা অল্পকামী কিংবা রতিবিহীন। অল্প কয়েকজন বসনকামী কিংবা বিপরীতকামী।

আমরা জানি, প্রচলিত ধারণানুযায়ী উভলিঙ্গতা নয়, লিঙ্গনিরপেক্ষতাই বৈশিষ্ট্য এবং জন্মলগ্নেই জেনেটিক লিঙ্গ নির্ধারিত। অতএব পুরুষ (মেল) কিংবা নারী (ফিমেল) হয়েই শিশু জন্মায়। তারপর জেনেটিক লিঙ্গের কাঠামোয় কয়েক পল্লা পারিপার্শ্বিক (সমাজ-শিক্ষা-দীক্ষা) প্রভাবের প্রলেপ পড়বে, এটাই তাকে পুরুষভাবাপন্ন (ম্যাসকুলাইন) কিংবা স্ত্রীস্বভাবা (ফেমিনিন) হতে শেখাবে। স্বাভাবিক ক্ষেত্রে এবংবিধ প্রক্রিয়ারাজি অব্যাহত এবং সুন্দরভাবে গ্রথিত থাকে, ফলে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বালক শুধু যে পুরুষাকৃতি লাভ করে তা নয়, পুরুষভাবও পায়, পুরুষবৎ আচরণ করে এবং নারীকে ভালবাসার পাত্রীরূপে গ্রহণ করে। গোলমাল যদি কোথাও ঘটে থাকে, প্রাগুক্ত ছকটাও বদলে যাবে। যেমন স্বাভাবিকলিঙ্গ সমকামিতায় ভালবাসা সমর্পিত হবে ভুল কামপাত্রে। আর বিপর্যস্তলিঙ্গ সমকামিতায় ভুলটা শুধু কামপাত্রে নয়, লিঙ্গ

ভূমিকাতেও, তাই নিজেকে নারীরূপে (কিংবা পুরুষরূপে) নিবেদন করে পুরুষ-পাত্রের (কিংবা নারীপাত্রের) কাছে।

বাকী রইল পরিবেশগত সমকামিতা প্রসঙ্গ, যার শিকড় গভীরভাবে প্রোথিত নয়, অভাবে স্বভাব নষ্ট আর কি! কে না জানে, বিপরীতলৈঙ্গিক সঙ্গীর অভাবে সমলৈঙ্গিক তৃপ্তিলাভে মনটা আকৃষ্ট হতে পারে। তাই না সমকামিতা এত ব্যাপক স্কুলকলেজে, ছাত্রাবাসে, ধর্মীয় সংস্থায় কিংবা যেখানেই সঙ্গীর অভাব সেখানেই। শিক্ষাপ্রভাবে (সমরতিক বন্ধু গর্বের ; কোন শাস্তি নেই), সাধু-সন্ন্যাসীদের বাধ্যতামূলক ব্রহ্মচর্যে এবং যুদ্ধপ্রবণ জাতির (শিখ, আফগান) মধ্যে সমকামিতা গজিয়ে উঠে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই, একথা এডওয়ার্ড ওয়েষ্টার-মার্ক-এর।

নারীকৃত বিদ্রূপ বা বিরূপ সমালোচনায়, ত্বরিতস্খলনের ভয়ে, ক্ষুদ্রঅঙ্গের গ্লানিতে সমকামে আসক্ত হওয়া বিচিত্র নয়। কখন মনোরোগের, বিশেষ করে সিজোফ্রেনিয়া, বিষণ্ণতা রোগের, লক্ষণ। সুরা বা ঔষধে আসক্তি আরেকটি কারণ, সুস্থ অবস্থায় যে আবেগ (সমকাম) দমিত থাকে সেটাই ছাড়া পায় নেশার ঘোরে।

সমকামিতা নির্ণয়

সমকামীদের দেখে চেনা যায় না, চেনা যায় জিজ্ঞাসাবাদে আর স্বীকারোক্তিতে। সার্থক লক্ষণ হিসেবে সর্বাগ্রেই নজর কাড়বে বিপরীতলৈঙ্গিক আকর্ষণের অভাব কিংবা সমলৈঙ্গিক আসক্তি। এক পুরুষের কথাই ধরা যাক, নারীর প্রতি অনিচ্ছা, উদাসীনতা, আগ্রহের অভাব প্রথমেই বলে দেবে ব্যাপারটা কেমন যেন গোলমেলে আর এর সঙ্গে যদি দেখা যায় পুরুষসান্নিধ্যে কামনার জোয়ার খেলছে এক সমকামীর দেখা পাব নিশ্চিত।

ইতররতিক কামানুষ্ঠানের ইতিহাসও এব্যাপারে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। কখন, কতবার মিলন, মিলনে সক্ষমতা (অঙ্গদৃঢ়তা বা অংশগ্রহণ), তৃপ্তি এবং সর্বোপরি রতিশেষের মনোভাব—এসবই জেনে নিতে হবে। পুরুষ মিলনে অক্ষম, নারী রতিজড়। অতিঅল্পসংখ্যক মিলন, তৃপ্তি যদি বা মেলে তাও বহুকষ্টে। টেনসন কমে না, বৃদ্ধিই পায়। রতিশেষে দৈহিক অসুস্থতা, বমিবমিভাব, মানসিক অস্থিরতা, নার্ভগত অসুবিধা। এবংবিধ প্রতিটি ঘটনাই অঙ্গুলি প্রসারিত করে সমকামিতার প্রতি। আরেকটি সহায় সমকামিতামূলক স্বপ্নদর্শন।

এবং পুরুষ ডাক্তারের কাছে পুরুষের অকারণ আসা যাওয়া থেকেও সন্দেহ জাগে। আমার দেখা এক রোগীর কথা বলছি, যৌনদুর্বলতার নামে প্রষ্টেটগ্রন্থি

মর্দন করাতে আসত, দুবারের পর আমার সন্দেহ প্রকাশ করি, তখন থেকে সে উধাও। হয়ত অন্য কোন ডাক্তারের শরণাগত।

সমকামিতা ও বিবাহ

মানবজাতির যা কিছু দুষ্ট, বর্জ্য, পতিত, তার আবর্তন সবসময়ই রোধ করতে চায় প্রকৃতি, এটা নাকি বিশেষভাবে প্রকটিত সমকামীদের বিবাহে। সাধারণতঃ এদের সন্তান হয় না আর যদিওবা হয়, সে সন্তান অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিম্নমানের, অধঃপতিত। অর্থাৎ কিনা সুপ্রজনবিদ্যার বিচারে এরূপ বিবাহ ভয়ঙ্কর।

প্রাচীন শাস্ত্রকারগণের, যেমন ম্যাগনাস হির্শফেল্ড, ধারণায় সমকামীদের বিবাহ সবসময়ই বিপজ্জনক। অধিকাংশ বিবাহ বন্ধ্যা এবং সন্তানেও এদোষ বর্তাবে অর্থাৎ কিনা সন্তানের মুখ চেয়েই এদের বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। বর্তমানে এযুক্তি খাটে না। কেননা এদের বিবাহে বিরুদ্ধতার আসল সূত্রটি বংশধারা নয়, দাম্পত্যশান্তির অভাব, মিলনে এদের যে ঘোর অনীহা!

সমকামীরা সাধারণতঃ অবিবাহিত। ক্বচিৎ কখন বিবাহিত, এদের সংখ্যা খুব কম নয়। হির্শফেল্ডকৃত পরিসংখ্যান বলে ১৬%। অর্থাৎ কিনা ৮৪% সমকামী অবিবাহিত।

চিকিৎসকের নির্দেশ বিনা প্রধানতঃ সমকামীদের বিবাহ শুধু যে ঘোর অনুচিত তা নয়, নিদারুণ অপরাধও বটে। আশ্চর্য ব্যাপার, তবুও কিনা বিবাহিত সমকামী চোখে পড়বে। কয়েকটি বিশেষ উদ্দেশ্যে এই বিবাহ। যেমন:

সমকামিতা নামক আবেগের সমাধি রচনা করার উদ্দেশ্যে, এরা ভাবে বিয়ের পর স্ত্রীর প্রতি অনুরাগ সঞ্জাত হবে, ধীরে ধীরে এবং আপনাআপনিই। কখন বিবাহিত হতে বাধ্য হয় আত্মীয়কুটুম্ব বন্ধুবান্ধবের মুখ বন্ধ করার জন্যে। কখন ঘর বাঁধবার লোভে (এক্ষেত্রে সঙ্গিনী যদি জেনে শুনে রাজী হয় আপত্তি নেই), কখনবা পণের লোভে। কতিপয় ক্ষেত্রে অবশ্য বিবাহ ঘটে সমকামীদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারেই, অর্থাৎ কিনা বিবাহপূর্বে নরনারীর অন্তভবে ধরা পড়ে নি, বিবাহের পরই নর বা নারীর কাছে প্রথম অনুভূত—পুরুষ নিজেকে অক্ষম দেখে কিংবা অতিশয় ঘৃণা বা বিরাগে ভর দিয়ে মিলন আর নারীর কাছে পুরুষসঙ্গ ন্যক্কারজনক, ভাল লাগে না, সহ্য করতে পারে না পুরুষের নিবিড় সান্নিধ্য।

সবশেষের সমস্যাটি হল, প্রধানতঃ ইতররতিক ব্যক্তিরা কী করবে? নিশ্চয়ই বিবাহিত হবে। অর্থাৎ সমকামিতা রাঙান পূর্ব অভিজ্ঞতায় বিবাহ অসিদ্ধ নয়।

১৩। প্রদর্শনকাম ও নিরীক্ষণকাম

তিলমাত্র দৈহিক সম্পর্ক নেই, তথাপি রতিতৃপ্তি সম্ভব, বিলসনকামিতা আর ঈক্ষণকামিতার মাধ্যমে। বিলসনকাম হচ্ছে প্রকাশ্যে গোপনাঙ্গ প্রদর্শন, আমি এর নাম রেখেছি প্রদর্শনকাম, ইংরেজীতে একেই বলা হয় এক্সিবিসনিজম। আইনের চোখে অশ্লীল আচরণ, ইনডিসেন্ট এক্সপোজার।

সচরাচর উত্থিত অবস্থায়, কখনবা শিথিল, পুরুষাঙ্গ প্রদর্শিত হয় এক বা একাধিক পথচারীকে। পথচারীরা সাধারণতঃ নারীই, যে কোন বয়সের নারী, শতকরা পঞ্চাশজনের বয়স ষোলর নীচে অর্থাৎ স্কুলকন্যারাই এই প্রদর্শনের লক্ষ্য। কয়েকটি স্থান বিলসনকামীদের খুবই প্রিয়, এরা প্রায়ই জমায়েৎ হয় বাগানে ময়দানে, নির্জন গলিতে, রেলের কামরায়, স্কুলপ্রাঙ্গণে। কখন বেছে নেয় উন্মুক্ত স্থান কিংবা জনবহুল প্রকাশ্য স্থান। যেমন চলন্ত রেলযাত্রীদের প্রতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে রেল লাইনের ধারে যায়, এমন কি থিয়েটার, ধর্মোপাসনা-স্থল, পূজাপ্রাঙ্গণও বাদ যায় না।

শিস দিয়ে, কাশি দিয়ে, অশ্লীল শব্দ উচ্চারণে, মিষ্টি বা পয়সা ছুঁড়ে দিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তারপর প্রদর্শন। কিন্তু শুধু প্রদর্শনই যথেষ্ট নয়, যাকে দেখাবে তার মুখেচোখে প্রতিক্রিয়া-চিহ্ন অবশ্যই অঙ্কিত হবে। লজ্জা ভয় আড়ষ্টতা, দুহাতে চোখ বুঁজে শিউরে ওঠা, ভীতিবিহ্বল বিস্ফারিত নয়ন, রক্তিমাভ মুখে ঘৃণা বিরক্তি আতঙ্কর ছবি, কিংবা ত্রস্ত হরিণীর মত ভীতচকিত-পদে পলায়ন—এবংবিধ প্রতিক্রিয়ারাজিই তাকে প্রবলভাবে উত্তেজিত করবে, এনে দেবে তৃপ্তি। স্খলন বা উত্থান হলেই ত্বরিতগতিতে আত্মগোপন। কিংবা পাণিমেহন, প্রদর্শনশেষের আরেকটি বহুদৃষ্ট ঘটনা। বিশেষভাবে লক্ষণীয়, এরা প্রদর্শনেই ক্ষান্ত, কখনও নারীকে কোন প্রস্তাব করে না, কোন দাবি-দাওয়া নেই, এদের প্রত্যাশা শুধু আবেগজ প্রতিক্রিয়া—শক, বিহ্বলতা, ঘৃণা, আতঙ্ক। অর্থাৎ বিলসনকামীদের মূল বৈশিষ্ট্য এই, এদের আনন্দ চক্ষুরাগেই —নারীমুখের প্রতিক্রিয়া দর্শনেই। রতিতৃপ্তির উৎস এটাই এবং পূর্বোক্ত প্রতিক্রিয়ার তীব্রতা ও মাত্রাভেদে তৃপ্তিলাভ কখন পূর্ণ, কখন অপূর্ণ। প্রসঙ্গতঃ বলে রাখা ভাল, সম্মত নারীকে গোপনাঙ্গ প্রদর্শনে কোন আগ্রহ নেই এদের।

এই বিকৃতি দুর্লভ নয়, অপেক্ষাকৃত অল্পদৃষ্ট বলা যেতে পারে। কেননা সমগ্র যৌন অপরাধের মধ্যে এটাই বহুদৃষ্ট, প্রায় এক-তৃতীয়াংশের মত। পুনঃপুনঃ আবৃত্ত, শাস্তি এবং চিকিৎসা সত্ত্বেও। এবং এব্যাপারে সমকামিতার পরেই এর স্থান।

প্রদর্শনকর্ম মূলতঃ পুরুষেরই ব্যাপার, নিজ আগ্রহ এবং অন্যে উত্তেজিত হবে, এই দুই কারণে। মেয়েরাও প্রদর্শন যে না করে তা নয়, তবে পুরুষের অনুরোধে। নারীকৃত প্রদর্শনের উদ্দেশ্য পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণ, উত্তেজনা আনয়ন। কদাচ নিজ তৃপ্তিসাধন নয় এবং নিজ উত্তেজনার জাগরণও না। অতএব বুঝতে কোন অসুবিধা নেই মহিলা বিলসনকামী কেন সাতিশয় দুর্লভ। প্রখ্যাত মনোবিদ্ ডাঃ ক্লিফোর্ড এ্যালেন মাত্র একজন রোগিণীর সাক্ষাৎ পেয়েছেন। অর্থাৎ প্রধানতঃ পুরুষরাই বিকৃত এবং এই বিকৃতি শুধু যে পুরুষপ্রধান তা নয়, ইতর-রতিকও বটে। ক্বচিৎ কখন সমরতিক, যেমন স্কুল শিক্ষকের বালকের প্রতি প্রদর্শন।

গোপনাঙ্গ প্রদর্শন ব্যাপারটা অপেক্ষাকৃত ব্যাপক। প্রাণিজগতের শৃঙ্গারপর্বে কিছু না কিছু প্রদর্শন ছড়িয়ে আছে। ছড়িয়ে আছে মানবজগতেও এবং এটা এতই ব্যাপক যে নিরীক্ষণ আর প্রদর্শনকে সভ্যতার অবদান বললে ভুল হয় না (ক্লিফোর্ড এ্যালেন)। এবং সহজ প্রবৃত্তিরূপেও গণ্য করা যেতে পারে (ষ্টর)। মানবপ্রকৃতিতে এদের শিকড় এত গভীরে চলে গেছে যে, শিক্ষালব্ধ আচরণ বলে মনেই হয় না। বস্তুতঃ প্রতিটি শিশুই প্রদর্শনকামী—নিজ অঙ্গ নিয়ে খেলা করে, অপরকে দেখায়, গর্ববোধ করে এবং বড়দের অঙ্গও দেখে।

শিশুরা প্রায়ই দেখায়। বয়স্ক শিশুরা স্কুলে এবং অন্যত্র। কারণ, স্বকামজ তৃপ্তি আছে পুরুষাঙ্গ দর্শনে এবং পুরুষাঙ্গ মাপে পুরুষত্বব্যঞ্জক মর্যাদা। অভ্যাসটা পরিণত বয়সেও থেকে যায়। নিজ অঙ্গে অসীম আগ্রহ এবং অপরের অঙ্গ দর্শনে উত্তেজনাবোধ, এদুই ঘটনা থেকে পুরুষদের সাধারণতঃ এধারণাই জন্মে অন্যেও অনুরূপভাবে উত্তেজিত হবে। এই বিশ্বাসের জের টেনেই অনেক পুরুষ গোপনাঙ্গ প্রদর্শন করে নিজ স্ত্রীকে, পরনারীকে, এবং পুরুষকে (সমকামী)। পুরুষদের কিন্তু বুঝতে কষ্ট হয়, কখনবা নিরাশ হয়, কেন স্ত্রী বা অন্য নারী সাড়া দেয় না। পক্ষান্তরে নারীরা, এমন কি স্ত্রীও, পুরুষকে ভাবে নোংরা, ইতর, বিকৃত। নারীও গোপনাঙ্গ প্রদর্শন করে মাঝে মধ্যে, তবে কিনা পুরুষকে আকৃষ্ট করতে। বোঝা গেল, প্রদর্শনের গূঢ় উদ্দেশ্য নিজ আগ্রহ আর আহ্বান আর উত্তেজনাবোধ এবং এই উত্তেজনার কারণটি হল নারী জাগ্রত হবে এই প্রত্যাশা। কদাচিৎ উত্তেজনার হেতু নারী প্রতিক্রিয়া। এমনটি সম্ভব যথার্থ প্রদর্শনকামিতায়। ত্রাসিত নারীমুখে আতঙ্ক, হতচকিত অবস্থা বা অন্য মানসিক প্রতিক্রিয়া দেখে

বিলসনকামী উত্তেজিত হয়, তৃপ্তি পায়, সমবেদী প্রতিবেদন সূত্র অনুযায়ী।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্টই বোঝা গেল, গোপনাঙ্গ প্রদর্শনের বাসনা স্বাভাবিক এবং প্রায় প্রতিটি পুরুষের হৃদয়ে লুকিয়ে আছে। কিন্তু এই একই স্বাভাবিক বাসনা যখন হবে চরম, আবেশমূলক কিংবা বাধ্যতাজনিত, বিকৃত-পদবাচ্য হতে বাধ্য। বাসনা ব্যাধিত, কামানুষ্ঠান বাধ্যতাজনিত, কদাচ স্বেচ্ছাকৃত নয়, এই আবেগ এমন একটা ভ্রান্ত বদ্ধ ধারণা দিয়ে তাড়িত এবং এতই বিহ্বলদায়ক যে সমস্ত বিধিনিষেধ (শিক্ষা, দীক্ষা) খড়কুটোর মত ভেসে যায়।

বিলসনকাম এমন এক বিকৃতি যার উপস্থিতি সমাজকে ক্লিষ্ট করে না। ব্যতিক্রম শুধু একটি কুফল, শিশুরা ভীতসন্ত্রস্ত হতে পারে ভয়ঙ্করভাবে। এবং বিবাহিত জীবনও পীড়িত হয় না, যথার্থতঃ প্রদর্শনকামীরা বিবাহিত এমন অনেক ঘটনার নজির আছে, বিবাহিত জীবনে এরা সুখী, রতিব্যাপারে ঘটন-মাত্রা বা তৃপ্তি কোনটারই ঘাটতি নেই।

ম্যাগনাস হির্শফেল্ডের ধারণায় প্রদর্শনকাম অঙ্গীয় ত্রুটিগত কিংবা মানস ত্রুটিগত। প্রথম ক্ষেত্রটিতে প্রদর্শনকাম দেখা দিতে পারে রোগের লক্ষণ হিসেবে, যেমন বার্ধক্যসুলভ বুদ্ধিভ্রংশ (সিনাইল ডিমেনসিয়া) রোগ, মৃগিরোগ, ভয়ঙ্কর মনোরোগ বা নার্ভরোগ। হঠাৎ দেখা দিতে পারে বৃদ্ধ বয়সে, তখন বলি বুড়োকে ভীমরতিতে ধরেছে। কারণ, এক বা একাধিক, যথা, মস্তিষ্কস্থিত পরিবর্তনের ফলে নিষেধপ্রভাব (ইনহিবিসন) হ্রাস পায় কিংবা বুদ্ধিভ্রংশ রোগ কিংবা বার্ধক্যসুলভ জরা বা প্রৌঢ়সন্ধি (চেঞ্জ অব লাইফ)। তা ছাড়া বৃদ্ধ বয়সে শৈশবোচিত আচরণ খুবই স্বাভাবিক। আর মানস ত্রুটির মূল কথাটিও তো এই : শৈশবাবস্থার প্রত্যাবৃত্তি (ইনফ্যান্টাইল রিগ্রেসন)।

দীর্ঘস্থায়ী মনোরোগীরা, মৃগিরোগীরা, বৃদ্ধজনেরা গোপনাঙ্গ প্রদর্শন করতে পারে। এরা কেউই প্রকৃত প্রদর্শনকামী নয়। কারণ শুধু প্রদর্শনেই ক্ষান্ত নয় এরা, আরও এগিয়ে যায়—কথা বলে, প্রস্তাব রাখে, দেহসম্পর্কস্থাপনের চেষ্টা করে। এবং এদের প্রদর্শন আবেগতাড়িত, বাধ্যতামূলক, আবেশজ ক্রিয়া নয়।

হ্যাভলক এলিসের কাছে এক্রটি জন্মগত এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই মানস অস্বভাবিতা বা ব্যাধি বিজড়িত। চিহ্নিত করেছেন যৌন প্রতীকতার বিশেষ লক্ষণ হিসেবে। বিকৃত শৃঙ্গার ভিত্তিক প্রতীক ক্রিয়া। কেননা প্রদর্শনকামী মনে করে দর্শিত নারীর 'আবরণমোচন' করছে, অবশ্য মনে মনে। কশাঘাতের প্রতীক পরিণতির সঙ্গে অনেকটা মিল আছে, যদিচ বিলসনকামী দুর্বল আর কশাকামী প্রবল যৌনতার মানুষ।

যে যাই বলুক, প্রদর্শনকামের মূল উৎস মানসিক। এটা জন্মগত নয়। সঞ্জাত, সেই শৈশবেই। কখন সরাসরি প্রতিবর্তী ক্রিয়ার ফলাফল। শিকড় কখন আরও গভীরে। যেমন, অটো ফেনিকেল প্রমুখ কট্টর ফ্রয়েডপন্থীদের ধারণায় এটা হচ্ছে উপস্থচ্ছেদ অস্বীকৃতি। প্রদর্শনপূর্বক এই দাবি রাখছে তার পুরুষাঙ্গ আছে এটা সবাই মেনে নিক। কিংবা এই অভিলাষ ব্যক্ত করছে মেয়েরাও প্রমাণ করুক তাদেরও পুরুষাঙ্গ আছে।

আরেকদলের মতে, এটা হচ্ছে পুরুষত্ব প্রতিষ্ঠার আদিম উপায় বিশেষ। নারীর প্রতিক্রিয়া তাকে আশ্বস্ত করে, নিজেকে পুরুষরূপে অনুভব করায়, নারীর ভালবাসা অর্জন করতে না পারুক, ভীতচকিত ত্রাসিত করার মত ক্ষমতা সে ধরে। অর্থাৎ কিনা স্বকীয় পুরুষত্বে ঘোর অনিশ্চিত বলেই এমনটি করে। একজন তো সরাসরি বলেছেন, এরা প্রায় অনিবার্যভাবেই দুর্বল, স্বামীরূপে নিজ ক্ষমতায় সন্দিগ্ধ। প্রদর্শনব্যাপারটা তাই পুরুষত্ব প্রকাশের সবচেয়ে নির্লজ্জ, সবচেয়ে আদিম উপায়।

নিরীক্ষণকাম

নারীসঙ্গবর্জিত তৃপ্তিলাভের আরেকটি উপায়ঃ ঈক্ষণকাম বা ঈক্ষণরতি। যে কাম দর্শন সম্পর্কিত তাকেই বলি ঈক্ষণকাম। অর্থাৎ রতিলাভের জন্যে দর্শন উদ্দীপনাই যথেষ্ট। ইংরেজীতে একেই বলা হয় অবজার্বেশনিজম, ভয়্যুরিজম, স্কোপ্টোফিলিয়া। প্রথম দুটির বাংলা প্রতিশব্দ ঈক্ষণকাম, আরও সহজ করে বলা যেতে পারে নিরীক্ষণকাম। এবং শেষোক্ত শব্দটির জন্যে চক্ষুরাগই সুন্দর, আরও সুন্দর ভবভূতি বর্ণিত 'তারামৈত্রী'।

নিরীক্ষণকামীদের আদর করে বলা হয় 'পিপিং টম', যাদের আনন্দ শুধু দর্শনেই। দৃশ্যটা কিন্তু নৈসর্গিক নয়, কামজ। এবং উদ্দেশ্য একটিই, রতিতৃপ্তি। দর্শনব্যাপারে এদের অন্বিষ্ট, বিপরীতলৈঙ্গিক ব্যক্তির কামস্থান, বিশেষ করে গোপনাঙ্গ, নগ্নদেহ কিংবা বিবস্ত্র হচ্ছে এই দৃশ্য, কখনবা কামানুষ্ঠান, আশ্লেষ, শৃঙ্গার, মৈথুন, এমন কি শুধু মানব নয়, মানবেতর প্রাণীদেরও। এই উদ্দেশ্যে উদ্যানের পর উদ্যান চষে বেড়ায় শৃঙ্গাররত মানবমিথুন দর্শনের লোভে, কিংবা অন্ধকার রাস্তায় বা ছাদে ঘুরে বেড়ায় আলোকিত শয্যাগৃহে দৃষ্টিপাতের আশায়। অথবা হোটেলে বা নিজগৃহে গোপন ছিদ্রর সামনে ঠায় বসে থাকে। বিরলসংখ্যক কয়েকজন নিষ্ক্রিয়, এরা চায় অন্যে তাকে যুক্ত অবস্থায় দেখুক। ক্বচিৎ কখন, নিজ চক্ষে দেখতে চায় পরপুরুষ কর্তৃক নিজস্ত্রী সংস্থতা হচ্ছে।

শুধু দর্শনেই হৃদয়ে কামভাব সঞ্চিত হয়, এটা সত্য। এজাতীয় কামজ

নেত্রপ্রীতির বিশেষ ভক্ত পুরুষরাই। সাক্ষী? সাক্ষী কিনসী রিপোর্ট, ৬৫% পুরুষ কবুল করেছে অন্য ব্যক্তির কামানুষ্ঠান দেখার কথা এবং নিরীক্ষণের বাসনা ৮৩% পুরুষের। দর্শন উদ্দীপনা দিয়ে পুরুষরা সহজেই উদ্দীপ্ত হতে পারে, নিরীক্ষণের যৌন সার্থকতা এখানেই। অনুরূপভাবে নারীরা জাগ্রত হয় না বলেই মহিলাদের মধ্যে নিরীক্ষণ ব্যাপারটা কদাচিৎ দৃষ্ট।

সত্যি কথা বলতে কি, কামজ নেত্রপ্রীতি অতিশয় ব্যাপক। নগ্নিকাদেহ কিংবা বিপরীতলৈঙ্গিক ব্যক্তি বা প্রাণীকে যুক্ত অবস্থায় দর্শনের সুযোগ হেলায় নষ্ট করবে, এমন পুরুষ হাতে গোনা যায়। বস্তুত: অধিকাংশ পুরুষই থমকে দাঁড়াবে, দৃষ্টিপাত করতে ভুল করবে না যদি সুযোগ মেলে, বিশেষ করে লুকিয়ে চুরিয়ে। এজাতীয় অনুরাগের আরেকটি পরিচয় রতিকালে অন্ধকারের পরিবর্তে আলোর পক্ষপাত। তা ছাড়া ক্যাবারে নাচে স্ট্রিপটিজ দৃশ্যাবলী এবং রতি-বিহারের অঙ্গভঙ্গী যথার্থই প্রদর্শিত কিংবা অনুসৃত (যেমন হোলি উৎসবের বিকৃত কদর্য অঙ্গভঙ্গী) হয় এমন প্রমোদ অনুষ্ঠান চিরকালই পুরুষের প্রিয় এবং এর সবচেয়ে বড় খদ্দের পুরুষরাই। সাহিত্য-নাটক, সিনেমা-থিয়েটারের যৌন-উত্তেজক দৃশ্যে পুলকিত হয় পুরুষদর্শকরাই।

মোট কথা, নিরীক্ষণব্যাপারটা এতই ব্যাপক যে, একনিঃশ্বাসে রতিবিকার রূপে চিহ্নিত করা যায় না, যতক্ষণ না মানবজীবনে এটাই একমাত্র পথ হয়ে দেখা দিচ্ছে। অর্থাৎ চরম পর্যায়ে উন্নীত হবে, সুরতপ্রসঙ্গ বাদ পড়বে, একটা বাধ্যতাজনিত আবেগজ ক্রিয়াতে পর্যবসিত হবে, এসব হলেই বুঝবেন আপনি এক বিকৃতকামীর মুখোমুখি হয়েছেন। প্রদর্শনকামিতার মতই এটা পুরুষপ্রধান এবং ইতররতিক। মহিলা নিরীক্ষণকামীর কতিপয় ঘটনার দৃষ্টান্ত আছে কিনসী রিপোর্টে, এটা অবশ্য ব্যতিক্রম।

ম্যাগনাস হির্শফেল্ড এবং হ্যাভলক এলিস যতই ওকালতি করুন না কেন, নিরীক্ষণকাম জন্মগত নয়, একে শিক্ষালব্ধ আচরণ বলাই সঙ্গত। অর্থাৎ কিনা এটা অর্জিত এবং সেই শৈশবোচিত অবলোকন বাসনা থেকেই উদ্ভূত। প্রতিবর্তী ক্রিয়াই ফলাফল। কিন্তু মনঃসমীক্ষকদের ধারণায় ঘটনাটা এত সরল নয় আরও জটিল, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এটা হচ্ছে মানস প্রতিক্রিয়া। এঁদের মতে এটা হচ্ছে পূর্বানুসরণ, সেই আদিম দৃশ্যেরই পুনরাবৃত্তি, অর্থাৎ পিতামাতার মিলনদৃশ্য অবলোকনের পুনরাভিলাষ। কিংবা উপস্থচ্ছেদ অস্বীকৃতি প্রয়াস। যথার্থত: প্রতিটি শিশু শুধু যে বিলসনকামী তা নয়, নিরীক্ষণকামীও বটে, শুধু নিজ অঙ্গ দেখায় না, অপরের অঙ্গও দেখে, দেখে মিলনদৃশ্যও।

ব্যথার প্রদীপ জেলে রতিপূজা সমাপ্ত, এরেই বলি ধর্ষমর্ষকাম। দয়িতজনকে ব্যথা যে দেয় সে ধর্ষকামী এবং প্রিয়জনের কাছ থেকে ব্যথা পেতে যার আনন্দ সে মর্ষকামী। রতিভুবনে এদুটি যথাক্রমে ধর্ষকাম ও মর্ষকাম রূপে বিদিত।

এই মাত্র উল্লেখ করা শব্দ দুটি প্রায়ই যুগলবন্দী—ধর্ষমর্ষকাম—রূপে ব্যবহৃত হয়। কেননা এটা অনেকদিন ধরেই জানা আছে, কোন একটি কার্যক্রমে যৌন-আগ্রহ যদি জাগ্রত হয়, ঠিক বিপরীত কার্যক্রমেও উদ্দীপ্ত হবে। যৌনরুচি বা যৌন আচরণের দিক থেকে, পুরুষ মুখ্যতঃ ধর্ষকামী এবং নারী মর্ষকামী। তথাপি এটাই সাধারণতঃ চোখে পড়বে যে এদুটি ধারণা একমুখী, অর্থাৎ একই ব্যক্তিতে লীন হয়ে আছে। যেমনটি ছিল সেই দুই আদি পুরুষে, যাঁদের নামে চিহ্নিত হয়েছে এই বিকৃতিদ্বয়।

মার্কুইস দে স্যাদে, জন্ম প্যারিসে, ২রা জুলাই ১৭৪০। মৃত্যু ২রা ডিসেম্বর, ১৮১৪। উচ্চবংশীয় অভিজাত এই ফরাসীর মুখ্য অভিলাষ ছিল কর্তৃত্ব এবং ব্যথা দেওয়া, যার প্রতিফলন শুধু ব্যক্তিগত জীবনে নয়, রচিত গ্রন্থাবলীতেও। তাই না এঁর নামেই নাম রাখা হয়েছে এই বিশেষ কামনার (স্যাডিজম)। অনুরূপভাবে মর্ষকাম (ম্যাসোসিজম) নামটি এসেছে প্রাচীন জার্মানবংশীয় ব্যারন, কেভালিয়র লিওপোল্ড ভন স্যাকার-ম্যাসো (১৮৩৬-১৮৯৫) থেকে। ইনিও একজন ঔপন্যাসিক ছিলেন যাঁর রচনাবলীতে প্রথম বর্ণিত হয়েছে এই বিশেষ বিকৃতিটি। এঁর আনন্দ বশ্যতার কাছে আত্মসমর্পণে এবং নিগৃহীত হতে। তথাপি স্যাকার-ম্যাসোও নির্দয় হতেন এবং নিগৃহীত হতেন দে স্যাদেও। আবার অন্য বিকৃতির সঙ্গেও এদের পরিচয় ছিল, যেমন দে স্যাদের মুগ্ধচিত্ততা ছিল পায়ুকামে এবং স্যাকার-ম্যাসোর ফার-এ।

যৌনতার কষ্টিপাথরে ধর্ষকামিতার (কিংবা মর্ষকামিতা) রূপটি খাঁটি নয়, কিছু না কিছু মর্ষকামিতার (কিংবা ধর্ষকামিতার) খাদ মেশান আছে। নেতি নেতি বিচার করলে দেখব, এদুটি রূপ একই আদিম আবেগের বিকাশ, কখন পজিটিভ, কখন নেগেটিভ। সুতরাং ধর্ষমর্ষকাম বলাই সঙ্গত। নিটোল মুক্তার মত কেউ পুরোপুরি ধর্ষকামী নয়, মর্ষকামীও না। বস্তুতঃ উভয়ের মধ্যে বিভাজক

রেখা টেনে দেওয়া সম্ভব নয়। একারণে ক্রেফ্টনজিং, হ্যাভলক এলিস প্রমুখ কতিপয় পণ্ডিতের পছন্দ ব্যথনকাম (এ্যাল্গোল্যাগ্নিয়া) শব্দ ব্যবহারে, এরই সক্রিয় অবস্থাটা হল ধর্ষকাম, নিক্রিয়তায় মর্ষকাম। অর্থাৎ কিনা এদুটি বিপরীত গুণবাচক অবস্থা নয়, একে অন্যের পরিপূরক, পরস্পর সম্পর্কিত।

ধর্ষমর্ষকামিতায় মানুষের আগ্রহ খুবই ব্যাপক, কী জীবনে, কী যৌনতায়, কী সাহিত্যে, সর্বত্রই প্রতিফলিত। সাহিত্যে প্রথম পদধ্বনি শুনি দে স্যাদে ও স্যাকার-ম্যাসো প্রণীত রচনাবলীতে, তারপর সাহিত্যের অন্যান্য শাখাতেও। সুইনবার্ণ-এর 'ডলোরেস' কবিতা তো এরই স্তবগাথা। ছড়িয়ে আছে কোনান ডয়েল-এর ছোট গল্পেও। কিনসী রিপোর্টে দেখব অশ্লীল পুস্তকরাজির অনেক-গুলিই এই ধরনের। যৌনতার রং লাগানো ভায়োলেন্স নাটকের জনপ্রিয়তা তো ঈর্ষণীয়।

এজাতীয় প্রবৃত্তি আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই খুঁজে পাব। খুঁজে পাব, পূর্বেই বলেছি, স্বাভাবিক সুস্থ যৌনজীবনে, অবশ্যই অল্পমাত্রায়। ধর্ষমর্ষকাম-মূলক উপচার অসংখ্য দম্পতিকে উত্তেজিত করে, বলা যেতে পারে সুরত অভিমুখী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। বস্তুতঃ শারীরবৃত্তীয় লেভলে সকল মানবিক আবেগই সম্পর্কিত, যেমন ভালবাসার সঙ্গে ব্যথা। যেমন, চরম উত্তেজনা ও ব্যথার প্রকাশচিহ্ন প্রায় কাছাকাছি—স্খলনকালে কোন কোন পুরুষ গোঁঙায়, চিৎকার করে, দুমড়ে মুচড়ে যায়, যেন তীব্র ব্যথায় কাৎরাচ্ছে।

এপ্রসঙ্গে কিনসী রিপোর্টের আরও বক্তব্য আছে। বেত্রাঘাত, প্রহার, উৎপীড়ন কিংবা অন্য কোন উপায়ে ব্যথা দেওয়া যায় এমন সব ঘটনার কল্পনায় কেউ কেউ উত্তেজিত হয়। এদের মধ্যে অতি অল্পই নারী, অধিকাংশই পুরুষ, কারণ ফ্যান্টাসি বা কল্পনায় পুরুষরাই সমধিক উত্তেজিত এবং এরূপ কাহিনী শ্রবণ বা পাঠের প্রতিক্রিয়াও ফ্যান্টাসিতুল্য। কিন্তু আশ্চর্য কাণ্ড, মানস থেকে দৈহিক ক্ষেত্রে নেমে এলে উভয়েই সমান। যে নারী পুরুষের তুলনায় অতি অল্পসংখ্যক উদ্দীপনায় সাড়া দেয়, সেই নারীই প্রবলভাবে জাগ্রত বা উত্তেজিত হবে পুরুষের পীড়নে, তাড়নায়, প্রহারে, দংশনে, শৃঙ্গারকালে বা রতিকালে। প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয়, ফ্রয়েডও বলেছেন, নারীকে জয় করার জন্যে পুরুষকে কিছুটা ধর্ষকামী হতে হয়। এবং হ্যাভলক এলিসও একটি সুন্দর জৈবিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবংবিধ কার্যকলাপের।

দম্পতিরা প্রায়ই সেই খেলা খেলে যেখানে একজন আধিপত্য বিস্তার করছে, অন্যজনে বশ্যভাবে মেনে নিচ্ছে কিংবা সুরতপূর্বে উভয়ে উভয়কে

উত্ত্যক্ত করছে, পীড়ন করছে। এ-খেলা দে স্যাদের কশাঘাত কিংবা স্যাকার ম্যাসোর অবমাননা থেকে ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু উভয়েরই উৎস এক। জৈবিক বিচারে, হ্যাভলক এলিস একেই বলেছেন, 'মক ফাইটিং', কপট যুদ্ধ, আমরা বলি প্রণয়কলহ। অর্থাৎ কিনা এটা হচ্ছে রাগবৃদ্ধির উপায়বিশেষ।

মানবজগতের এই ধারা বিবর্তিত হয়েছে প্রাণিজগৎ থেকে, প্রাণিজ শৃঙ্গারের স্বাক্ষর। প্রণয়িনীকে ব্যথা দিয়ে আনন্দ পাওয়াটা আদিম প্রথার অনুসরণ। এটা তাই পুরুষকামজীবনে স্বাভাবিক, অবশ্য সকল কালেই সংযত অবস্থায় থাকে। ব্যথা দেওয়াটা যেন ভালবাসারই অঙ্গ, নারী তাই কুপিতা হওয়া দূরে থাক, পুলকিতাই হয়। মানুষ চায় পীড়ন করতে, মানুষী চায় পীড়িত হতে— এটা অতএব স্বাভাবিক। ইউরোপীয় কাব্যে (ওভিড), ভারতীয় কামশাস্ত্রে (কামসূত্রে) ও মুস্লিম 'সুরভিত কানন'-এ, কোথাও নিন্দিত নয়। প্রণয়দংশন, মনুষ্যজগতে প্রায়ই ঘটে, বিশেষ করে চরম মুহূর্তে। প্রাণিজগতেও—বিড়াল, ঘোড়া, গাধা।

হ্যাভলক এলিসের ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে মানবশৃঙ্গার হচ্ছে প্রাণিজ উত্তরলব্ধি। রতিতৃপ্তির জন্যে অংশতঃ প্রয়োজনীয় শর্ত : পুরুষের কাছে নারী বশীভূত থাকবে। কপট যুদ্ধ তাই শৃঙ্গারেরই অপর নাম। সভ্য পুরুষ প্রধানতঃ বীর্য বলবত্তা দিয়েই নারীকে জয় করে নেয়। আদিম জগতেও তাই, হয়তবা আরও কিছুটা স্থূল। এঁর দুঃখ, মনুষ্যজগতে যেটা বিকৃত সেটাই কিনা প্রাণিজগতে স্বাভাবিক। যেমন, রতিকালে বা রতির অব্যবহিত পরে ক্ষতবিক্ষত হতে হয় অনেক পুরুষ প্রাণীকেই (মাকড়সা, মৌমাছি)। মনুষ্যজগতে সাদীয়কামের শিকার নারী, প্রাণিজগতে পুরুষ।

তুলনামূলক বিচারে, বিশেষভাবে লক্ষণীয় নরনারীর মধ্যে শারীরস্থানগত পার্থক্যসমূহ। এবং রতিবিহারে অংশগ্রহণের বিভিন্নতা—সক্রিয়ভাবে অঙ্গ-প্রবেশ করানোর প্রয়োজনীয় ভূমিকা পুরুষের কাছে স্বীকৃত এবং অপেক্ষাকৃত বা পুরাপুরি নিষ্ক্রিয় থাকতে পারে নারী। কাজে কাজেই, পুংস্ত্ব-র (ম্যাস্‌কুলিনিটি) সঙ্গে ধর্ষকামের এবং স্ত্রীত্ব-র (ফেমিনিনিটি) সঙ্গে মর্ষকামের কিছুটা সম্পর্ক আছে। এবং এটা একরকম ধরেই নেওয়া হয়েছে, পুরুষালি লক্ষণ হচ্ছে ধর্ষকাম (উপরিউক্ত কারণ দুটি অংশতঃ দায়ী। মুখ্যতঃ মনোগত কারণেই এমনটি হয়েছে) আর পুরুষের কাছে এটা হচ্ছে স্বাভাবিক আক্রমণমূলক আচার-আচরণের ব্যাপ্তি। এবং মর্ষকাম মূলতঃ নারী চরিত্রের লক্ষণ, কোন কোন মনোবিদের ধারণায়, পুরুষ কর্তৃক প্রবিষ্ট হওয়ার বাসনা, গর্ভধারণের ক্লেশ,

সন্তানপালনের ঝক্কি ঝামেলা, এসবই প্রকৃতিগত বিচারে মর্ষকামমূলক। মহিলা মনোবিদ্‌ হেলেন ডুশ দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন : রতিপ্রস্তুতির মানসিক শর্ত হিসেবে কিছুটা মর্ষকাম প্রয়োজন।

ধর্ষকামিতার চিহ্ন পড়ে আছে প্রায় প্রত্যেকটি পুরুষেরই হৃদয়ে এবং অনেক জাতি আবার ধর্ষকামী রূপে চিহ্নিত। যেমন, রোমকগণ ধর্ষকামী ছিল। প্রাচীন এ্যাজটেকগণ ধর্ষকামী জাতি হিসেবে বিখ্যাত। এবং ধর্ষকামোন্মাদনা প্রশমিত হয় যুদ্ধে।

এরূপ একটা আবেগ সবসময়ই যে খারাপ তা নয়। চরিত্রগঠনেও ভূমিকা আছে। নারীর মাতৃত্ব, সেবা, শিক্ষাদান, ত্যাগ, এসবেরই মধ্যে লুকিয়ে আছে মর্ষকাম। তেমনি পুরুষের দুঃসাহসিক অভিযান; বলদর্পী খেলাধুলা যেমন বক্সিং, কুস্তি, রাগবী; সার্জারী, কর্তৃত্ব, সংস্থা-গঠনে উঁকি দিচ্ছে ধর্ষকাম।

সূক্ষ্ম সংজ্ঞাগত বিচারে শুধু ব্যথাজড়িত ব্যাপারেই ধর্ষমর্ষকাম প্রযোজ্য, যদিচ ব্যাপক অর্থেরও চল আছে। এমন অনেক মানবসম্পর্ক আছে যেখানে শারীরিক যাতনা বলতে কিছুই নেই তবুও কিনা ধর্ষমর্ষকামমূলক। যথার্থতঃ সেই সব সম্পর্কে এই বিশেষণটি প্রয়োগ করা যেতে পারে যেথায় আক্রমণাত্মক আচরণ প্রবলভাবে প্রকটিত কিংবা একজন দারুণ প্রভুত্বপিয়াসী, অন্যজনে লক্ষণীয়ভাবে বশ্য। এরূপ একটি বিরাট ক্যানভাসে চিত্রিত হলে, আদর্শ পরিণত অবস্থার পরশ পায়নি এমন প্রতিটি মানবসম্পর্কে উঁকি দিতে পারে ধর্ষমর্ষকামিতা। এবং অনেক কামবিকৃতির বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক বিষয়বস্তুও বটে। যেমন, অনেক বস্তুকামিতায় ধর্ষমর্ষকামের উপাদান খুঁজে পাব। প্রদর্শনকামী পুরুষের আচরণ নারীকে আতঙ্কিত করে অর্থাৎ কিনা নারীর প্রতি পুরুষের ব্যবহার ধর্ষমর্ষকামমূলক। এক কথায়, ব্যথা নয়, সর্বময় কর্তৃত্ব কিংবা চরম বশ্যতাই এই বিকৃতির গভীরে।

ধর্ষকাম কখন রতিপ্রারম্ভিক, কখন কামগন্ধ নাহি তায়। কখনবা সুরত-বর্জিত, আপনাতে আপনি শেষ, অর্থাৎ শুধু ধর্ষণের জন্যেই ধর্ষণ। যে রূপেই দেখা দিক না কেন, এর প্রাণভোমরা সেই আক্রমণমূলক প্রবৃত্তিই এবং এই আক্রমণের লক্ষ্যস্থল প্রধানতঃ নারী, কখন পুরুষ, ক্বচিৎ কখন বালকবালিকা কিংবা প্রাণী। তাৎকালিক পূর্ণ তৃপ্তি মিললেও, অর্থাৎ কিছুকালের জন্যে প্রশমিত থাকলেও এই আবেশ পুনরাবৃত্ত হবে তখন এর রূপটি বাধ্যতাজনিত।

বিকৃত বাসনারে লয়ে সদাই বিব্রত এই হেতু কষ্ট পাচ্ছে, চরম অস্বস্তিতে দিন গুজরান করছে, শুধু সেই জন্যেই ডাক্তারের কাছে যায়। কিন্তু অনেকেই এরূপ

বাসনার বিলুপ্তি বা পরিবর্তন চায় না, চায় না সঙ্গতি বা অবদমন। স্ত্রী বা প্রণয়িনীর কাছে যদি মেলে ভাল, নইলে বেশ্যা তো আছেই। প্রসঙ্গতঃ বলে রাখি, রতিব্যাপারে ধর্ষকামী (কিংবা মর্ষকামী) হলে জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও বলপ্রয়োগ করবে, নির্দয় ও রূঢ় হবে (কিংবা হাসিমুখে বঞ্চনা, লাঞ্ছনা, নিপীড়ন মেনে নেবে) তা নয়। এটাই নিয়ম হিসেবে ধরে নিতে পারি, এরূপ বৈশিষ্ট্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখব শুধু কামজীবনেই।

ডাঃ ম্যাগনাস হির্শফেল্ড রচিত 'সেক্সুয়্যাল এনোম্যালিজ এ্যাণ্ড পার্ভার্সানস' গ্রন্থে কতিপয় প্রকারভেদ চোখে পড়বে : যথা, মানস ধর্ষকাম, প্রতীক ধর্ষকাম, যথার্থ ধর্ষকাম। কোথাও দৈহিক যাতনা নেই, কেবলি মনে মনে ছবি এঁকে যাওয়া, এটা মানস ধর্ষকাম। পাণিমেহনকালে অথবা রতিকালে, কল্পনার আকাশে ডানা মেলে দেয়, মনশ্চক্ষে দেখে নারীধর্ষণ, নারী লুণ্ঠন, বন্দুক দাগা কিংবা অস্ত্রদ্বারা আঘাত, এমন কি হত্যাও। এই সব নিষ্ঠুর দৃশ্যাবলী চোখের সামনে ভেসে ওঠে কিংবা রক্তচিন্তায় মগ্ন মানস ধর্ষকামী। যথার্থ ধর্ষকামীর সঙ্গে এদের তফাৎ শুধু কৃত্যবিচারে আর নিষেধপ্রভাবের মাত্রাভেদে।

সঙ্গিনীতে সর্বময় কর্তৃত্ব ইত্যাদি প্রতীক ক্রিয়ারূপে চিহ্নিত হতে পারে, এটা প্রতীক ধর্ষকাম। অক্ষতযোনি সহবাসের বাতিকগ্রস্ত পুরুষ একটি উদাহরণ। এক্ষেত্রে রতিব্যাপার প্রায় ধর্ষণের কাছাকাছি। তা ছাড়া রতি-অনভিজ্ঞ নারীর লজ্জা, সঙ্কোচ, চোখের জলে মিনতি ও ব্যথা, এসবই পুরুষের আক্রমণ প্রবৃত্তি জাগিয়ে দিতে যথেষ্ট।

প্রকৃত ধর্ষকামে আছে যথার্থ ব্যথা বা আঘাত, আশ্চর্য কাণ্ড, হত্যার মত অতি নিষ্ঠুর কর্মও। কশাঘাত, নারীনিতম্বে ছুরিকাঘাত, ব্লেড বা অন্য কিছু দিয়ে ক্ষতকর্ম, বক্ষোদেশে পিন ফুটিয়ে রক্তদর্শন ইত্যাদি নিষ্ঠুরতাই এদেরকে তৃপ্ত বা শান্ত করে। প্রত্যেক প্রকৃত ধর্ষকামীর কার্যধারা স্বতন্ত্র এবং বিশেষ, যেমন কশাকামী রক্তদর্শনে প্রীত নয় এবং রক্তদর্শন-অভিলাষী কশাঘাত করবে না কোনদিন। এবং এই বিশেষ কার্যকলাপই এদের রতিবাসনা জাগ্রত করে কিংবা উত্থান এনে দেয়, তারপর মিলিত হয়, কখনবা মিলিত হওয়ার অবকাশ নেই অর্থাৎ উত্থানের পরই স্খলন। এরই এক বিশেষ সংস্করণ : হত্যাকাম। এরূপ ধর্ষকামী পুনঃপুনঃ যৌন অপরাধে, হিংস্র ভয়ঙ্কর কার্যকলাপে, এমন কি হত্যাকর্মেও অকুণ্ঠিত। 'বোষ্টন কণ্ঠরোধকারী' একটি চরম দৃষ্টান্ত, বোষ্টনবাসী এই ব্যক্তির কাজই ছিল কণ্ঠরোধপূর্বক হত্যা এবং ভাবতেও অবাক লাগে শুধু কামতৃপ্তির জন্যেই এহেন নিষ্ঠুরতা।

আধুনিক যুগের প্রখ্যাত ব্রিটিশ মনোবিদ্ ডাঃ ক্লিফোর্ড এ্যালেন তিনটি প্রধান শ্রেণীতে বিন্যস্ত করেছেন। এক, নিছক নিষ্ঠুরতা। সম্পূর্ণরূপে কামগন্ধহীন, কোনরকম যৌন অনুভূতি নেই কোথাও। কয়েকটি উদাহরণ দিই। শাস্তিমূলক ধর্মীয় অনুষ্ঠান—আগুনে পুড়িয়ে মারা। নির্দয়ভাবে প্রাণিহত্যা। গণহত্যা—ইহুদীনিধন। সেই ফিল্ম ও সাহিত্য যার মুখ্য উপজীব্য হিংস্রতা, বীভৎস ভায়োলেন্স। যুদ্ধ।

দুই, যৎকিঞ্চিৎ কামাবেগ বিজড়িত নিষ্ঠুর আচরণ। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে শিক্ষক কর্তৃক বেত্রাঘাত। স্ত্রীর প্রতি নির্দয় আচরণ। নারীর কেশকর্তন। জামাকাপড়ে কালি ছিটিয়ে দেওয়া, সিগারেটের আগুনে কাপড় পুড়িয়ে দেওয়া। প্রায়শঃ পুরুষত্বহীনতার সঙ্গে যুক্ত, কল্পনাতেই এত অধিক রতিশক্তি ব্যয়িত যে অবশিষ্ট বলতে যা থাকে তাই দিয়ে সুরতব্যাপার অসম্ভব।

তিন, পূর্ণ তৃপ্তির জোয়ার বইয়ে দেয়, এমন নিষ্ঠুরতা। অনুষ্ঠানকালে বা শেষে উত্থান, স্খলন। শুধু কল্পনায় এরা সন্তুষ্ট নয়, বাস্তবে রূপ দিতে চায় মনের ইচ্ছাকে, এরাই নারীকে আহত করে সবচেয়ে বেশী, যেমন রাস্তায় যেতে যেতে হঠাৎ নারীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, কিলচড়ঘুঁসি দিয়ে আঘাত করে। কোন আক্রোশবশতঃ নয়, প্রত্যাখ্যাত বলেও না, এমনিই আচমকা আক্রমণ। এই গোত্রভুক্ত ধর্ষকামের একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত হত্যাকাম।

প্রশ্ন উঠতে পারে, আমাদের প্রায় প্রত্যেকের মধ্যেই কিছুটা ধর্ষকাম আছে, তা হলে আমরা সবাই সাদীয় খুনী নই কেন? এপ্রশ্নের জবাবে বলা যেতে পারে, হত্যার জন্যে শুধু ধর্ষকামমূলক অনুভূতি যথেষ্ট নয়, আরও বিশেষ কিছুর প্রয়োজন। মনোবিকারযুক্ত ব্যক্তিত্ব আর তীব্র প্রবল ধর্ষকাম, এদুয়ের সমাবেশই মানুষকে করে সাদীয় খুনী। অর্থাৎ কিনা এরা কেউ সুস্থব্যক্তিত্ব বা পরিণত-বুদ্ধি নয়, এরা সবাই অসুস্থ, অস্বভাবী, মনোরোগী।

নেভিল হীথ এবং পিটার কুরটেন, ঐতিহাসিক দুই খুনীর নাম। এদের কার্যকলাপের অতএব হত্যাকামের চারটি বৈশিষ্ট্য। প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পর্যায়কাম। এরা প্রায়ই শান্তশিষ্ট, ভদ্র মার্জিত, হঠাৎ নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। দুই, তখন মেতে উঠবে নানাবিধ হিংস্র ঘটনায়—অস্ত্রাঘাত করবে, কর্তন করবে, ক্ষতবিক্ষত করবে কিংবা দংশনপূর্বক রক্তপান অথবা কণ্ঠরোধপূর্বক হত্যা। বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নারীর বিশেষ বিশেষ অঙ্গে (গোপনাঙ্গে, বক্ষোদেশে, পায়ুদেশে) আঘাত। তিন, সুরতপ্রচেষ্টা প্রায়শঃ উপেক্ষিত।

নারীকে আক্রমণ করার পর কখন উত্থান স্খলন ও গভীর তৃপ্তি। চার, তারপর আশ্চর্যরকমের সুস্থতা, যতদিন না পরবর্তী আবেগ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে।

প্রসঙ্গতঃ বলে রাখি, পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত এজাতীয় বীভৎস ঘটনাবলী যথার্থ হত্যাকাম নয়। কারণ, প্রকৃত হত্যাকাম সুদুর্লভ। এবং একাধারে উপায় ও উদ্দেশ্য দুয়েরই সমাবেশ ঘটে হত্যাকামে, এক্ষেত্রে শুধু হত্যা করেই তৃপ্তি, স্বতন্ত্রভাবে কামতৃপ্তির প্রয়োজন নেই, অর্থাৎ সুরতের বদলা হচ্ছে হত্যা। অপরদিকে, প্রথমোক্ত নারীহত্যার কারণটি হচ্ছে উদ্দেশ্যসিদ্ধির উপায় বিশেষ, কখন লুণ্ঠন, কখন পাশবিক ধর্ষণ, কখনবা দুটোই, তারপর সাক্ষীসাবুদ লোপের জন্যে হত্যা। সবচেয়ে বড় কথা হল, হত্যাকামের চতুর্বিধ বৈশিষ্ট্যরাজিও লক্ষণীয়ভাবে অনুপস্থিত।

ভয়ঙ্কর অপরাধীরূপে ধর্ষকামের যে ছবি ফুটে ওঠে সেটা কোটিকে গুটিক বলাই ভাল। সাতিশয় আঘাতপ্রাপ্ত বা ভয়ঙ্করভাবে আঘাত করেছে এমন ঘটনা বহুদৃষ্ট নয়, যদিচ ছোটখাট কালশিটে, নখের আঁচড়, মৃদু প্রহার প্রায়ই দেখব। স্ববিরোধী হলেও এটা সত্য, ধর্ষকামী (এবং মর্ষকামী) সদাই সজাগ, প্রণয়িনীকে আঘাত করতে চায় না (কিংবা আহত হতে)। ধর্ষকামমূলক (এবং মর্ষকামমূলকও) কল্পনা ও আচরণ হচ্ছে জ্বালানি কাঠবিশেষ যা দিয়ে বৃহত্তর কামাগ্নি প্রজ্বলিত হয়। এরা কিছু পরিমাণে নিষেধ-প্রভাবিত। সাধারণ উপচার এত মৃদু ও শান্ত যে এদিয়ে এদের চিত্ত ভরে না, তাই তো ডাক পড়ে এসব বিশেষ উপচারের, যৌনতাকে তীব্রতর ও অধিকতর মাদকতা-করে তুলতে। এক কথায়, এদের রতিশক্তি সীমিত পর্যায়ের, কারণ, ধর্ষমর্ষকাম-বিজড়িত উপাদানসমূহের দমন বা সন্তুষ্টিবিধান করতে হবে সর্বাগ্রেই। ব্যথার মধ্য দিয়ে অনেকেরই কামজ অনুভূতি তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। কেউবা রতিপ্রাপ্ত শুধু এরই সহায়তায়। শুধুমাত্র তখনই বিকৃত হবে যখন এজাতীয় বাসনা চরম অতিশয়িত কিংবা সহবাসের নামগন্ধ নেই।

মর্ষকাম

সাধারণতঃ নারীরাই অধিক মর্ষকামী। শুধু নারী নয় পুরুষরাও মর্ষকামী হতে পারে। এটা কখন ইতররতিক, কখনবা সমরতিক। ধর্ষকামিতার তুলনায় মর্ষকামিতার সামাজিক তাৎপর্য খুবই কম। কারণ এব্যাপারে অন্য কেউ জড়িয়ে পড়ে না, যা কিছু সবই নিজেরে লয়ে ভাবনা। বশ্যতাই এই ভাবনার কেন্দ্রবিন্দু। অর্থাৎ কিনা বশ্যতা নামক আবেগকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে মর্ষকামিতা।

এর রূপটি কখন দৈহিক, ধর্ষকাম-এর ঠিক বিপরীত—প্রিয়জনের আঘাত,

প্রহার, আক্রমণ, পীড়ন হাসিমুখে সহ্য করা। এটাই যখন কল্পনায় ডানা মেলে দেবে কিংবা প্রতীক ক্রিয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে মানস বা প্রতীক মর্ষকামের দেখা পাব। প্রথমোক্ত মর্ষকামী মনে করে সে যেন চেন দিয়ে আবদ্ধ, দ্বিতীয়টির উদাহরণ গর্বিত মিসট্রেস-এর কাছে ভৃত্যবৎ আত্মসমর্পণ। শুধু আহত, লাঞ্ছিত, অপমানিত, অত্যাচারিত, বন্দী বা শৃঙ্খলিত হওয়া নয়, অন্যান্য ব্যাপারেও মর্ষকামিতার মোহর পড়েছে। যেমন, প্রভুভৃত্য সম্পর্ক, মর্যাদাহানি, ক্রীতদাসত্ব, বশ্যতা, অধীনতা, বন্দীদশা, স্বাধীনতা হীনতার চিন্তা, আত্মনিগ্রহ, চরম ত্যাগ।

মর্ষকামিতার শ্রেণীবিন্যাস প্রধানতঃ তিনটি। ধর্মীয়। নারীসুলভ। এবং কামজ। প্রথমোক্ত মর্ষকামের নিদর্শন ছড়িয়ে আছে প্রতিটি ধর্মেই : চরম আত্মনিগ্রহ কিংবা চরম ত্যাগ কিংবা চরম শাস্তি। ইউরোপীয় স্কোপস্কি নামক ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আনন্দ অণ্ডচ্ছেদে আর জেস্যুইটদের আনন্দ কশাঘাতে। আমাদের দেশে দেখব কণ্টকশয্যায় সাধুসন্ন্যাসী কিংবা চড়ক গাজনের শলাকা-বেধ ইত্যাদি নির্মম দৈহিক যাতনা অথবা অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠান।

নারীসুলভ মর্ষকাম। ক্রাফট-এবিংই প্রথম চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন নারীর বৈশিষ্ট্য নিষ্ক্রিয়তায়, সহনশীলতায়। তখন থেকেই স্ত্রীত্বসূচক লক্ষণরূপে গণ্য হয়ে এসেছে। অর্থাৎ কিনা মর্ষকামিতা নারীসুলভ (২১৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। যথার্থতঃ রতিবাসনার সঙ্গে মর্ষকামিতার নিবিড় সম্পর্ক নারীর মধ্যে প্রায়শঃ দৃষ্ট, এমন কি প্রথম রাগমোচনের প্রামাণ্য নজিরও আছে, পুরুষ কর্তৃক প্রবলভাবে ও নিষ্ঠুরভাবে গৃহীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে (ডাঃ যোয়ান ম্যালিসন)। বাস্তবেও এমন নারীর সন্ধান পাব যে কিনা পুরুষের কাছে নিগৃহীত হতে চায়, প্রহার বা নির্দয় ব্যবহার চাই পূর্ণভাবে জাগ্রত হওয়ার জন্যে, শুধু তাই নয় রাগমোচনের শর্ত হিসেবেও।

কিন্তু সেই নারী দুর্লভ যে প্রেমের ছলে নিদয় হবে, পুরুষকে প্রহার করবে কিংবা পুরুষের সঙ্গে নিষ্ঠুর আচরণ বা নির্মম ব্যবহার করবে নিজ রতিপ্রাপ্তির জন্যে। চাবুক বা ছড়ি হাতে নারীর ধর্ষকামী রূপটি সাধারণতঃ পুরুষের কল্পনা-মাফিক কিংবা খদ্দেরের মনঃতুষ্টির জন্যে। কখন আত্মরক্ষার্থে অর্থাৎ ভয় পেয়েছে বলেই এমনটি করতে বাধ্য হয়েছে। ক্বচিৎ কখন পুরুষকে প্ররোচিত করতে পারে যার ফলে পুরুষ শেষ পর্যন্ত বলপ্রয়োগ করবে এবং এই বলাত্মক উপচারই নারীর কাছে উত্তেজক। প্রসঙ্গতঃ বলে রাখা ভাল, যথার্থ ধর্ষকামী নারী পুরুষের সঙ্গে একাত্মবোধ করে এবং এভাবে প্রকাশ পায় এদের সুপ্ত সমকামিতা।

নারীসুলভ মর্ষকামিতা নারীর জীবনধারণেরই একটি অঙ্গ। সরাসরি কোন বিকৃতকাম নয়, কোন নিউরোসিসও না। যথার্থতঃ সমকামিতা প্রসঙ্গ বাদ দিলে নারীর কামবিকৃতি ব্যাপারটা স্পষ্ট নয়। বাধ্যতাজনিত কোন আবেগ পর্যায়-ক্রমে আবির্ভূত নয়, বলা যেতে পারে এটা একটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিশেষ যার ধারাবাহিকতা বড় একটা ছিন্ন হয় না। যেমন মদ্যপ স্বামীর দুর্ব্যবহারে অতিষ্ঠ হলেও তাকে ছেড়ে চলে যায় না ; বুদ্ধিমতী কন্যা বেশ্যাবৃত্তি করে এবং শত চেষ্টা সত্ত্বেও স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারে না—এসবই মর্ষকামিতার প্রভাব।

অপরদিকে পুরুষের মর্ষকাম এক বিশেষ নিউরোসিস যা কিনা মাঝে মধ্যে দেখা দেয় পর্যায়ক্রমে। এবং পুরুষ স্বেচ্ছায় সেই পরিবেশ রচনা করে যেখানে সে অত্যাচারিত, অবমানিত, শৃঙ্খলিত। এটা স্পষ্টতঃই কামবিষয়ক, যার চরম বিকাশ উত্থানে, শেষ স্খলনে। এক কথায়, নারীসুলভ মর্ষকামের সঙ্গে পুং-মর্ষকামের পার্থক্য বিস্তর।

এত কথা বলার অর্থ এই নয় যে মেয়েদের জীবনে কামজ মর্ষকামিতা গরহাজির। হাজিরা দিলেই এইমাত্র উল্লেখ করা পুং-মর্ষকামের গুণাবলী নারীর ভূষণ হবে।

প্রভুত্ব বনাম বশ্যতা ; স্বাধীনতা বনাম ক্রীতদাসত্ব ; দারুণ ক্ষমতা বনাম চরম অসহায়তা—এই সব বৈপরীত্যই ভিত গড়েছে ধর্ষমর্ষকামের এবং এব্যাপারে •ব্যথা গৌণ। কেমন করে এহেন অবস্থায় মানুষ পুলকিত হয় সেটা জানার জন্যে শৈশবাবস্থায় আক্রমণ প্রবৃত্তির উদ্ভবতত্ত্ব খতিয়ে দেখতে হবে।

ফ্রয়েডীয় ধারণায়, আক্রমণ ও কাম, এই দুই সহজাত প্রবৃত্তিকে সঙ্গী করে প্রতিটি শিশু জন্ম নেয়। কোন একটি কারণে, যেমন ভালবাসার অভাবে, আক্রমণমূলক প্রবৃত্তিটি স্বাভাবিক পথ থেকে সরে গেলেই ধর্ষকামিতার সাক্ষাৎ মিলবে। শৈশবকালীন মুখকামদশা ও পায়ুকামদশার সঙ্গে সম্পর্কিত। ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষকদের মতে মর্ষকামের মূলে রয়েছে লিঙ্গ-ঈর্ষা। এটা হচ্ছে বালিকা-বয়সের প্রতিক্রিয়া—পুরুষাঙ্গের মত সম্পদ নেই এই দুঃখিত আবিষ্কারের প্রতিক্রিয়া।

আরেকদল মনোবিদের বক্তব্য : বাল্যাবস্থায় জাত হীনতাবোধ ও পাপবোধ যদি থেকেই যায় কামবিকৃতি দেখা দেবে। এটা বিশেষ করে প্রতীত হবে ধর্ষমর্ষকামে। এজাতীয় আচরণে হীনতাবোধের ভার লাঘব হয় এবং মর্ষকামে পাপবোধ প্রশমিত হয়। শৈশবে বালক ও বালিকা উভয়কেই হীনাবস্থার, যা কিনা মর্ষকামিতারই নামান্তর, মধ্য দিয়ে যেতে হয়। এথেকে নারীর নিষ্কৃতি

নেই, এটাই পরিণত বয়সে নারীর ভূষণ হয়ে দেখা দেবে। পুরুষকে কিন্তু এঅবস্থা থেকে উত্তীর্ণ হতেই হবে, যদি সে সম্পূর্ণ পুরুষ হতে চায়।

স্ত্রী-মর্ষকাম প্রসঙ্গে, অন্যে (বিশেষ করে হেলেন ডুশ ও মেরী বোনাপার্ট) যে যাই বলুক, ক্যারেন হর্নি দৃঢ়তার সঙ্গে বক্তব্য রেখেছেন, এটা মূলতঃ প্রতিবর্তী ক্রিয়া। সামাজিক কাঠামো বা সংস্কৃতি দিয়ে শর্তবদ্ধতার চিহ্ন। যেমন জারের আমলে রুশী নারীদের অনুভবে স্বামীর ভালবাসা ধরা পড়ত না প্রহৃত না হওয়া পর্যন্ত। বর্তমানে সেই নারীই কিনা স্বাধিকার সচেতন, কিছুটা আক্রমণমুখীও বটে।

নর ও নারী উভয়ের ক্ষেত্রেই দেখব, মর্ষকামে দুটি ধারা লীন হয়ে আছে, একটি অনুমতি, আরেকটি শাস্তি। মর্ষকামী ব্যক্তিমাত্রই নিজ যৌনতার ভার নিতে চায় না, অথরিটি—প্রভু বা রাণীর হাতে সমর্পণ করে। এভাবে শৈশবে ফিরে যেতে চায়, যেখানে কোন সিদ্ধান্ত বা দায়িত্বের ভার নেই অথচ সুখানুভব আছে। অথরিটি তাকে সাজা দেয়, শাস্তি পেলে মনে করে পাপবোধ থেকে মুক্ত, হীনতাবোধের গ্লানি কাটিয়ে আত্মমর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত। একই সঙ্গে বাসনারও অভিষেক এবং এভাবেই কামানুষ্ঠানের অনুমতি মেলে। প্রকৃতপক্ষে, মেয়েরাও কল্পনায় দেখে : কৈশোরে প্রহৃত বা তাড়িত হচ্ছে, এটাই যৌবনে প্রকাশিত ধর্ষণের রূপ ধরে। বলাত্মক উপচার বা বলপূর্বক মিলন, বলবান পুরুষের কাছে আত্মসমর্পণ, এরূপ ফ্যান্টাসি বয়স্ক রমণীরাও দেখে (কখনবা বাস্তব জীবনেও ঘটে) এবং এভাবে অনুমতি মেলে কামজ ব্যসনের।

মর্ষকামের আরেকটি দিক লক্ষণীয়। এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করতে চায় যেখানে সঙ্গী প্রবলভাবে প্রভুত্বভাবাপন্ন অর্থাৎ নিজেকে বিপন্মুক্ত মনে করছে এই ভেবে যে তাকে কিছু করতে হবে না। পাপবোধ ও হীনতাবোধ থেকে নিষ্কৃতিলাভপ্রয়াস ছাড়াও রতিব্যাপারে নিরাপত্তা তার কাম্য, এটা সম্ভব সঙ্গীর হাতে সব ভার তুলে দিয়ে।

অপরদিকে ধর্ষকামী ব্যক্তি সঙ্গীকে কোন সুযোগই দেবে না, নিজেই সব ভার নেবে। বস্তুতঃ এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি করবে, সঙ্গিনী যেখানে পুরোপুরি অসহায়, আক্রমণকারীর সম্পূর্ণ দয়া-নির্ভর, এবং নিজে যা খুশি করতে পারবে, তা সঙ্গিনী চাক আর নাই চাক। যখনই সঙ্গিনীতে পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে ধর্ষকামীর যৌন অভিলাষ পূরিত হবে, কেননা তখন আর সঙ্গিনী তাকে ভয় পাচ্ছে না (এই তীব্র কর্তৃত্ববোধের পিছনে রয়েছে অন্তর্নিহিত দুর্বলতাবোধ এবং এই দুর্বলতাই ধর্ষকামের পরিপূরক ঘটনা)।

আপাত-আক্রমণমূলক আচরণ সত্ত্বেও ধর্ষকামী ব্যক্তি সতত উৎকণ্ঠিত থাকে সঙ্গিনী যেন ব্যথায় পুলকিত হয় (মর্ষকামে দয়িত যেন অবমাননায় আনন্দিত)। অর্থাৎ কিনা এদের মুখ্য বাসনা আঘাত নয়, কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা ; প্রহার বা অন্যান্য নিষ্ঠুরতা হচ্ছে উপচার মাত্র যা দিয়ে রতিতৃপ্তির অনুকূল পরিবেশ রচনা করা সম্ভব।

কাজে কাজেই, মর্ষকামী ও ধর্ষকামী, উভয়েরই প্রধান অসুবিধা, এরকম একটা করুণ অবস্থায় ভয় পাবে না, আনন্দ লাভ করবে এমন একজন বিশ্বাস-যোগ্য ব্যক্তিকে খুঁজে পাওয়া। এরা তাই বাধ্য হয় বেশ্যাগমনে। বেশ্যালয়ে অন্ততঃ ঘৃণাভরে কেউ মুখ ফেরাবে না, যেমনটি করে স্ত্রী বা প্রণয়িনী।

১৫। বস্তুকাম

বস্তুকাম হচ্ছে সেই কামবিকৃতি যেখানে যৌনতার আকর্ষণ সমগ্র ব্যক্তি নয়, ব্যক্তির অংশবিশেষ, যেমন গোপনাঙ্গ বাদ দিয়ে দেহের কোন বিশেষ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। কিংবা ব্যক্তিসম্পর্কিত কোন জড় বস্তু অথবা প্রতীকী কোন ক্রিয়া। অর্থাৎ বস্তুকাম নামক ভূষণটি তখনই ব্যক্তিবিশেষে প্রযোজ্য হবে যখন তার ভালবাসা কোন জড় বস্তুতে সমর্পিত যেমন নারীর বেশবাসে (দস্তানা, বিশেষ রংয়ের জামা, পুরনো ধাঁচের জুতো) কিংবা নারীর কোন বিশেষ দ্রব্যে (ভেলভেট, ম্যাকিনটস)। কিংবা তার কামভাব গোপনাঙ্গ ব্যতীত নারীদেহস্থ কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গে, যেমন পুরু ওষ্ঠাধর, ঘন কেশদাম। কোথাও দেহের বিকৃতি চরম আকর্ষক, উদাহরণস্বরূপ পঙ্গু রমণী, বিকলাঙ্গদেহা, ক্রাচপরিহিতা খঞ্জপাদ নারী কোন কোন পুরুষের কাছে বিহ্বলদায়ক। কচিৎ কখন এটা আচারমূলক, অতিশয় বিরলক্ষেত্রে নারীর কোন বিশেষ কার্যকলাপ—ধূমপান, কাশি—পুরুষকে জাগ্রত করতে পারে।

বস্তুকামের ইংরেজী প্রতিশব্দ ফেটিশিজম শব্দটির জনক ফরাসীদেশীয় এ্যালফ্রেড বিনেট (১৮৮৮)। 'কামজ প্রতীকতা' ব্যবহার করেছেন প্রথমে ইউলেনবার্গ, পরে হ্যাভলক এলিস। কালের দরবারে ফেটিশিজমই টিকে গেল, একমাত্র কারণ এই যে এটা যেমন সর্বজনগ্রাহ্য তেমনি জনপ্রিয়। এই শব্দটি এসেছে 'ফেটিশ' থেকে যার অর্থ ম্যাজিক বা ভক্তির বস্তু। আদিতে ব্যবহৃত হত শুধুই জড় বস্তুতে, বস্তুতঃ আদিবাসীদের ধারণায় কোন কিছু ম্যাজিক গুণের অধিকারী হলেই পূজিত হবে। বর্তমানে এই অর্থ ব্যাপকতর হয়েছে, অহৈতুক পূজিত বস্তুতে বা ব্যক্তিতে আরোপিত। প্রেমিক প্রেমিকার সঙ্গে এমন সব কাণ্ডকারখানা করে, মনে হবে সে যেন ম্যাজিকগুণান্বিতা, এটাই স্বাভাবিক, তথাপি বস্তুকামিতার লক্ষণ নয় কদাচ। কিন্তু এই ম্যাজিকই যখন সমগ্র ব্যক্তির বদলে তা সঙ্গিনীর কোন অংশে, দেহাতীত কোন বস্তুতে কিংবা কোন প্রতীকী পরিবর্তে ধর্ষকামীর ...েত, প্রকৃত বস্তুকামের উদাহরণ হবে। যথার্থই, ম্যাগনাস হির্শফেল্ড পাচ্ছে না (এ... বস্তুকাম হচ্ছে একপ্রকার বিশেষ রতি-পৌত্তলিকতা।

এই দুর্বলতাই ... র কামপাত্র নারী, কিন্তু নারীনির্বিশেষে সকলেই নয়। শতসহস্র রমণীর

মধ্যে একটি কি দুটি রতিজাগানিয়া। এই একটি দুটির নিশ্চয়ই এমন কিছু আছে যা পুরুষকে উদ্দীপ্ত করে। এই আকর্ষণ-বিন্দুকে বলা যেতে পারে কাম-উদ্দীপনা, যার কেন্দ্রস্থল কখন ঘন কুন্তল, কখন কারুকার্যকরা মুখভঙ্গী, দেহজ কোন বৈশিষ্ট, কোন বিশেষ পোশাক বা রূপচর্যা। এটাই যখন কামপাত্রী থেকে বিচ্যুত হয়ে নারীকে সরিয়ে দেবে, নিজেই তাৎপর্যের দিক থেকে প্রবল হয়ে উঠবে, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উত্তেজনার ভূমিকা নেবে, বস্তুকামের দেখা পাব। উদাহরণস্বরূপ এ্যাপ্রন বস্তুকামীর কথা ধরা যাক। ইনি শুধু সেই নারীর প্রতি আকৃষ্ট যে এ্যাপ্রন পরিহিতা। এটা যদি সে চুরি করতে পারে বা চেয়ে নিতে পারে, সোনায় সোহাগা, কেননা তার যৌন অনুভূতিতে আগুন ধরিয়ে দেবে এই এ্যাপ্রনই। পাণিমেহনকালে এটা সে দেখবে, স্পর্শ করবে, অনুভব করবে গায়ে চাপিয়ে। এ্যাপ্রন যদি না মেলে এসবই কল্পনা করবে। কিন্তু যে কোন এ্যাপ্রনে হবে না, পুরুষের এ্যাপ্রন নিষ্ফল। পুনর্বার স্মরণ করিয়ে দিই, কোন বিশেষ যৌন উদ্দীপনা, তা সে যতই অদ্ভুত হোক না কেন, স্বাভাবিক হতে বাধ্য, যদি নারীকে সঙ্গীরূপে ডেকে নেয় এবং শেষ পর্যন্ত মধুরেন সমাপয়েৎ হয়। অর্থাৎ স্বাভাবিক সুরতে গড়িয়ে না গেলেই, কামাবেগ বিচ্যুত বা নিষেধিত হলেই অস্বভাবী গন্ধ ভেসে আসবে।

বহুবিধ প্রকারভেদ সম্ভব। যেমন, মাত্রাভেদে মাইনর কিংবা মেজর। সচরাচর মাইনর রূপটি চোখে পড়বে, ক্বচিৎ কখন মেজর। অল্পস্বল্প বস্তুরতির সহাবস্থান বহুদৃষ্ট, এটা সুস্থ, এর নাম স্বাভাবিক বস্তুকাম। আবার এটাই অতিশয়িত হয়ে স্বাভাবিক যৌনসত্তাকে গ্রাস করতে পারে, এটা অস্বভাবী, একে বলব বিকৃত বা ব্যাধিত বস্তুকাম। এই একই বস্তুকাম তখনই বিকৃত হবে যখন রতিবস্তু বা ফেটিশ সেই উত্তেজনার সামিল হবে যা প্রাপ্ত হওয়া যায় সমগ্র ব্যক্তিকে কাছে পেলে কিংবা যোনিজাত অনুভূতির সম্পূর্ণ বদলা হবে অর্থাৎ সুরতসমান হবে।

ভ্রূণাকারে বস্তুকাম প্রত্যেক পুরুষেরই হৃদি স্থাপিত। মাইনর ফেটিশিজম অর্থাৎ অল্পমাত্রায় বস্তুকাম যতটা দুর্লভ মনে করি ততটা নয়, অন্ততঃ পুরুষের কামজীবনে তো নয়ই। কিছু পরিমাণে স্বাভাবিকও বটে, কেননা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে প্রেমপ্রণয় ব্যাপারে। একজন তো হেঁকেই বলেছেন, অতি আধুনিক প্রেম বস্তুকামেরই প্রকাশচিহ্ন, যদি বিজ্ঞাপনে বিশ্বাস করতে হয়। তা ছাড়া, প্রাথমিক ও গৌণ যৌনচিহ্নসমূহের আকর্ষক প্রভাব স্বাভাবিক বস্তুকামেরই উদাহরণ। অর্থাৎ যৌন আকর্ষণ বলতে যা বুঝি সেটা তো

প্রায়শঃ নারীদেহভিত্তিক। বক্ষ, চুল, চক্ষু ইত্যাদি নারীর কোন বিশেষ কিচার যাতে পুরুষের মনোযোগে কেন্দ্রীভূত হয়েছে তাকেই এক অর্থে রতিবস্তু বলা যেতে পারে। রতিউত্তেজনায় নতুন মাত্রা যোগ করার উদ্দেশ্যে অনেক পুরুষ নারীকে অনুরোধ জানায় বিশেষ সজ্জা বা বিশেষ প্রসাধন—সুরভি বা পুষ্প ব্যবহারে। পুরুষের আকর্ষণে ঘৃতাহুতি দেবে এমন সব কিছুই নারীর ফ্যাশনে প্রতিফলিত। এসবই স্বাভাবিক। তবে, যাই করুক না কেন, এসবই প্রিয়-জনকে বেষ্টন করেই শাখা বিস্তার করবে। কিন্তু বিকৃত আকর্ষণে প্রিয়জনকে সম্পূর্ণরূপে সরিয়ে দিয়ে নিজেই নিজের অভিষেক সম্পন্ন করে।

যথার্থ বস্তুকাম অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইতররতিক। কখন সমরতিক, মাথার চুল, বিশেষ রংয়ের বা বিশেষ কাপড়ের ট্রাউজার্স এবং পুরুষাঙ্গ অনেক সমকামীর কাছে আকর্ষণীয় রতিবস্তু। কখনবা অন্যান্য বিকৃতির—প্রদর্শনকাম, সমকাম, নিরীক্ষণকাম, বসনকাম, শবকাম—সঙ্গে যুক্ত।

পূর্ণতা বিচারে বস্তুকাম কখন পূর্ণ, কখনবা অপূর্ণ। সম্পূর্ণ বস্তুকামে সমগ্র ব্যক্তি বাদ দিয়ে রতিবস্তুর অভিষেক, এখানে রতিবস্তুই যথেষ্ট, নারীর কোন প্রয়োজন নেই। প্রতীক বস্তুতেই সন্তুষ্ট, কামপাত্রে কোন অভিলাষ নেই, এরূপ বস্তুকাম শুধু যে সম্পূর্ণ তা নয় প্রকৃতও বটে। অপরদিকে নারীর প্রয়োজন আছে, প্রয়োজন আছে রতিবস্তুরও, এমনটিও সম্ভব, এটা অংশতঃ বা অপূর্ণ বস্তুকাম।

পার্শিয়্যালিজম এক প্রকার বস্তুকাম যার কেন্দ্রস্থল দেহেরই কোন অঙ্গ যেমন চুল, বক্ষ, নিতম্ব, উরু, পদ, গুলফ্, পাণি। পূর্বেই বলেছি, এটা হচ্ছে মূল যৌনতার অংশতঃ আবেগ বা সহচর আবেগ বিশেষ, অর্থাৎ এই সব আকর্ষণ মানুষকে সুরতমুখী করে। অন্যথায়, সুরতবর্জিত চরম আকর্ষণে, বস্তুকামে রূপান্তরিত হয়, হির্শফেল্ড প্রমুখ কতিপয় পণ্ডিত একেই বলেছেন পার্শিয়্যালিজম। এরূপ প্রকারভেদ অনাবশ্যক, কেননা এটা আসলে দেহজ বস্তুকামেরই নামান্তর।

রতিবস্তু যখন অলভ্য, কল্পনায় সঙ্গলাভ করে অনেক বস্তুকামীই। এর নাম মানস বস্তুকাম। এটাই আবার অল্পমাত্রায় দেখা দিতে পারে রতিকালীন ফ্যাণ্টাসি রূপে। বস্তুরতিক কল্পনায় ডানা মেলে দেবে এমন পুরুষও বাস্তবে আছে, নইলে এদের রতিপ্রাপ্তি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

দুর্লভ পিগম্যালিয়নিজম বস্তুকামেরই বিশেষ সংস্করণ, এখানে কামভাব প্রস্তরমূর্তিতেই নিবেদিত। জীবন্ত প্রাণের বদলে নির্জীব প্রস্তরেই যত অনুরাগ!

বস্তুকামের উপকরণ শুধু যে চিত্রবিচিত্র তা নয়, মরশুমী ফুলের মতই অজস্র।

অন্তহীন এই সম্ভার বস্ত্রালঙ্কারাদি হতে পারে, হতে পারে বিশেষ কোন বস্তু বা দেহের কোন অঙ্গ। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রেই এটা হচ্ছে প্রিয়জনের বদলি বিশেষ, অংশবিশেষের বা সমগ্রভাগের। এটা সাধারণতঃ নারীসুলভ, সমগ্রভাবে নারীভাবের প্রতীক কিংবা স্ত্রীলিঙ্গত্বের চিহ্নবিশেষ।

সাধারণতঃ বিপরীতলিঙ্গ অর্থাৎ নারী ব্যবহৃত বস্তুসামগ্রীরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ, বিশেষ করে সেইসব বেশভূষা যা দিয়ে নারীরূপ প্রকটিত হয়ে ওঠে যেমন কাঁচুলি। উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি, অন্তর্বাস (আণ্ডারওয়্যার, ব্রীফ), সায়া, পেটিকোট, ব্লাউজ, রুমাল, মোজা, টুপি, দস্তানা, জুতা, সাঁতারের পোশাক। এবং এসবের উপাদানগত বৈশিষ্ট্যও থাকতে পারে, অর্থাৎ সিল্ক, চামড়া, রবার, প্লাস্টিক, নাইলন, ফার, ভেলভেট, সাটিন, পালক ইত্যাদি কোন একটিতে চরম দুর্বলতা দেখা দিতে পারে। দুর্বলতা থাকতে পারে বিশেষ কোন রঙে, যেমন কালো সায়া, লাল মোজা।

বস্তুকামের আশ্রয়স্থল হতে পারে নারীদেহেরই কোন অঙ্গ। কয়েকটি দৃষ্টান্ত : মাথার চুল, চোখ, মুখ, নাক, ওষ্ঠাধর, বক্ষ, হাত, পা, নখ, আঙুল, যৌনকেশ। পুরু ওষ্ঠাধরের কেস বিবরণী আছে আমার অন্য বই 'পুরুষত্ব এবং পুরুষত্বহীনতা'-য়।

দেহস্থ কেশরাজিরও মানবরতিতে ভূমিকা আছে, তাই যদি হয় বস্তুকামীরাই বা বাদ যাবে কেন ? পিগটেল কেশগুচ্ছ, তাম্রবর্ণ বা স্বর্ণাভ কেশ, আজানুলম্বিত ঘন কেশদাম এদেরকে আকৃষ্ট করতে পারে। আমি এক পুরুষকে জানি, যিনি শুধু ঘন কুঞ্চিত কৃষ্ণ কেশদাম দেখেই সঙ্গী নির্বাচন করেছিলেন। বিবাহের কয়েক বৎসর বাদে কয়েকটি সন্তান প্রসবের পর পুরুষের কামভাব আর জাগে না। কী ব্যাপার, না সেই ঘন কুন্তল নেই, কেশপাশ ক্ষীণস্রোতা নদীর মতই। এরূপ শর্তাধীন পুরুষত্বের আরেকটি ঘটনা রতিকালে স্ত্রী পরচুলা পরবে। কচিৎ কখন নারীজীবনেও। পুরুষের গোঁফদাড়ি রতিবস্তু হয়ে দেখা দিতে পারে, নারীর অনুরাগ তখন শ্মশ্রুযুক্ত পুরুষে, ইউরোপীয় মহিলার শিখ বিবাহের কারণটি হয়ত এখানেই। সবশেষে কেশকর্তন প্রসঙ্গ। পুরুষকে মাঝে মধ্যে নারীর চুল কাটতে দেখা যায় বা শোনা যায়, এরাই কেশকর্তক নামে খ্যাত। এক্ষেত্রে বস্তুকামিতায় ধর্ষকামের ছোঁয়া লেগেছে। সংগ্রাহকদের যেমন আনন্দ নতুন ডাকটিকিট আহরণে, এদেরও আনন্দ তেমনি নারীর কেশকর্তনে। সুযোগ পেলেই কেশগুচ্ছ (পিগটেল) কেটে নয়, সযতনে রেখে দেয়, এমনি এদের মনের গড়ন।

প্রখ্যাত দার্শনিক ডেকার্তের প্রবল অনুরাগ ছিল তির্যকদৃষ্টিবিশিষ্ট রমণীতে। অনুরাগ কোথাও বক্রনয়না, কুব্জা বা ক্রাচপরিহিতা রমণীতে। অর্থাৎ কিনা কামভাব আরোপিত হতে পারে শুধুমাত্র বিকৃত রূপে বা আকৃতিতে। টেরা, খোঁড়া, কুঁজো ইত্যাদি দৈহিক বিকৃতি কিংবা শ্বেতী, পোড়া, বসন্তর দাগে বিকৃত এবং এর চেয়েও বীভৎস রূপ কোন কোন পুরুষের কাছে চরম আকর্ষণীয়।

উৎস সন্ধানে ফিরে যেতে হবে সেই অতি শৈশবেই। ফ্রয়েডপূর্ব যুগে যা ছিল সাপেক্ষ প্রতিবর্তী ক্রিয়া বিশেষ, সেটাই ফ্রয়েডপরবর্তীকালে মানস প্রতিক্রিয়া রূপে চিহ্নিত। মুষ্টিমেয় আরেক দলের মতে এত্রুটি জন্মলগ্নেই জাত, অর্থাৎ কিনা এটা জন্মগত।

বস্তুকাম নিয়ে প্রথম গবেষণার দুর্লভ কৃতিত্ব অ্যালফ্রেড বিনেট-এরই। বস্তুতঃ ইনিই প্রথম দেখিয়ে দেন, বস্তুকাম সৃষ্টিতে প্রথম রতিঅভিজ্ঞতার কী প্রচণ্ড প্রভাব। প্রথম রতিজাগরণের সঙ্গে যে বস্তু বিজড়িত সেটাই কিনা বস্তুকামের জনক, এসিদ্ধান্তে প্রথম উপনীত হন বিনেটই। শৈশবে কিংবা বয়ঃসন্ধিকালে, প্রতিবর্তী ক্রিয়ার সূত্র ধরেই। এটাই 'প্রথম রতিঅভিজ্ঞতার ফসল' মতবাদ রূপে খ্যাত।

আকস্মিকভাবে হঠাৎ যৌনচেতনার উন্মেষ ঘটতে পারে: মাতার সিল্ক-কোমল বেশবাস অনুভবে, ভগিনীর অন্তর্বাস-ব্রা দর্শনে, শিক্ষয়িত্রী বা অন্য কোন রমণীর বক্ষদর্শনে, বিছানায় রবারক্লথের গন্ধে বা স্পর্শে বালকচিত্ত (৫।৬ বছর বয়সে) চঞ্চলিত, পুলকিত হতে পারে। তাৎকালিক সুখাবেশ যদি বিশেষ ছাপ রেখে যায়, সেটাই পরিণতবয়সে উঁকি দেয়। শুধু শৈশবে নয়, বয়ঃসন্ধিকালের কোন সুখস্মৃতিও এরূপ শর্তের জনক হতে পারে।

প্রথম অভিজ্ঞতা চিরকালের জন্যে অঙ্গীভূত হয়ে গেল মানুষটির যৌনতায়। তারপর সেই পুরুষ আজীবন মুগ্ধ থাকবে এবং এটাই খুঁজে ফিরবে প্রতিটি কামোত্তেজনার সময় এবং রতিতৃপ্তির জন্যে এটাই অপরিহার্য হয়ে উঠবে। এক কথায়, শৈশবে এমন এক অবস্থায় সৃষ্ট যা থেকে মনে হবে এটা আসলে শিক্ষাগত শর্তারোপ, শর্তাবদ্ধ আচরণ। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, অন্তর্মুখী ব্যক্তিরা অল্প সময়ে, অল্পসংখ্যক প্রয়োগে সহজেই শর্তাবদ্ধ হয়ে ওঠে এবং বস্তুকামী (এবং অন্যান্য বৈকৃতকাম) মাত্রই অন্তর্মুখী।

পুংলিঙ্গতা এবং অন্তর্মুখীনতা এবং শর্তারোপ, এসব কার্যকারণ মানুষকে বস্তুকামী করে তোলে—এব্যাখ্যা যথেষ্ট নয়, সম্পূর্ণও না। কারণ, অনেক পুরুষই স্মৃতির পাতা হাতড়ে এরূপ তাৎপর্যময় ঘটনা খুঁজে পেতে পারে, কই এরা

তো সবাই বস্তুকামী নয়। তা ছাড়া মানুষটিকে ছেড়ে বস্তুকেই বা বেছে নেব কেন, এপ্রশ্ন ক্রাফট-এবিং-এর।

কিন্তু আধুনিক যুগের গবেষক কিনসী ও তাঁর সহকর্মীগণ সমর্থন জানিয়েছেন পূর্বোক্ত মতবাদে। এঁদের বক্তব্যটা এই রকম। সমগ্র নারীদেহ বা দেহেরই বিশেষ কোন অংশ দর্শনে পুরুষ (ইতররতিক) জেগে ওঠে। যৌন আকর্ষণের কেন্দ্রস্থল গোপনাঙ্গ থেকে যতই দূরে সরে যাবে, যেমন মাথার চুল, আঙুল, পা, ফেটিশ-এর চেহারাটি ততই স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এরূপ সংজ্ঞা অস্পষ্ট। কেননা এজাতীয় প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধযুক্ত শর্তারোপেরই নামান্তর। এমন কি সেই সব দেহাতীত বস্তুতেও—যা কিনা সম্পূর্ণরূপে নারীদেহ থেকে অপসারিত, যেমন মোজা, জুতো—কামভাব জেগেছে, এও সেই মানস শর্তারোপেরই ঘটনা।

সত্য, যখন সহজেই ও গভীরভাবে প্রভাবিত হতে পারে, সেই বাল্যকালে ও নবযৌবনে, অভিজ্ঞতাও তাৎপর্যময় ঘটনা স্মৃতি রেখে যেতে পারে। কিন্তু ব্যাপারটা এতই বহুল দৃষ্ট যে প্রায় প্রতিটি পুরুষই এরসে বঞ্চিত নয়। তাই যদি হবে, বস্তুকাম এত দুর্লভ কেন? একারণে রোহলেডার, হির্শফেল্ড, হ্যাভলক এলিস প্রমুখ মহারথীদের ধারণায় বস্তুকাম জন্মসূত্রেই অর্জিত। হির্শফেল্ড বলেছেন এটা হচ্ছে অনুকূল ব্যক্তিজীবনে আপতিক ঘটনাবিশেষ। অর্থাৎ বস্তুকামের দুটি অপরিহার্য অংশ। একটি প্রবণতা, এগুণটি সহজাত, বংশবাহিত। অন্যটি পারিবেশগত যে কোন প্রভাব। হ্যাভলক এলিসের কথায় বস্তুকামের ভিত্তি যে জন্মগত এটা নিশ্চয়ই বলা যেতে পারে এবং প্রথম জীবনের আকস্মিক শক্ কিংবা কোন ভাবানুষঙ্গ দ্বারা নিশ্চিতভাবে জাগ্রত।

এঁরা যতই জয়গান করুন না কেন, জন্মগত মতবাদে আজ আর কেউ বিশ্বাসী নয়। প্রায় সকলেরই আস্থা মনোগত মতবাদে। মানস ব্যাখ্যাতা হিসেব প্রথমেই (১৯২৮) যিনি এগিয়ে এসেছিলেন তাঁর নাম সিগমুণ্ড ফ্রয়েড। উপস্থচ্ছেদ গূঢ়ৈষা-ই ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যার সার কথা। এই আদিম মৌল ভীতি আমাদের প্রত্যেকেরই অন্তরে ঘুমিয়ে আছে, এটাই ভয়ঙ্করভাবে প্রকটিত বস্তুকামীতে। একদা শিশু কল্পনায় প্রতিভাত, পুরুষের মত নারীর বুঝি পুরুষাঙ্গ আছে। তারপর একদিন দেখে নারীর—যেমন বোনের—পুরুষাঙ্গ নেই, এটা তখন শেলসম বাজে, উপস্থচ্ছেদভীতির সত্যতায় আতঙ্কিত, তাই। তা ছাড়া বালকের কাছে তার নিজ অঙ্গ গর্ববিশেষ। কিন্তু সদাই ভীত হারানোর ভয়ে, পিতামাতারা যে অঙ্গহানির ভয় দেখিয়েছে। এহেন সময়ে এই আবিষ্কার তার বোনও অঙ্গহীন, ফলে ভয়টা আরও জাঁকিয়ে বসে, হয়ত তারও একদিন এই

দুরবস্থা হবে। নিষ্কৃতিলাভপ্রয়াসে, শেষ পর্যন্ত, অন্য কোন বস্তুতে পুরুষাঙ্গের গুণাবলী আরোপিত করে বসে। এক কথায়, ফ্রয়েডীয় ধারণায়, রতিবস্তু হচ্ছে নারীদেহ থেকে হারিয়ে যাওয়া সেই অঙ্গের ভাবমূর্তি। সমর্থনে বলা হয়েছে, যোনিতে বৈরাগ্য বা অসীম ঘৃণা বস্তুকামীদের চরম বৈশিষ্ট্য।

ফেনিকেল, ষ্টেকেল প্রমুখ বহু মনোবিদ্ ফ্রয়েড বর্ণিত উপস্থচ্ছেদভীতি অক্ষরে অক্ষরে মেনে নেয়নি। এটা হচ্ছে বয়স্থ যৌনতা থেকে পলায়ন, ফেলে আসা কামদশায় প্রত্যাবর্তন, একেই ডবল্যু স্টেকেল (১৯৪০) বলেছেন মানস-লৈঙ্গিক শৈশবাবস্থা। কখন মাতা বা ভগিনীর বস্তুসামগ্রী নিয়ে অজাচারমূলক প্রতীককল্পনা, এরূপ আবেশজ চরিত্রলক্ষণই বস্তুকামীকে সংগ্রাহক করে তোলে।

এ্যান্থনি ষ্টর-এর ধারণা করতে আনন্দ রতিবস্তু দিয়ে নারীকে সরিয়ে দেওয়া যায়, অংশতঃ বা পূর্ণতঃ। বাধ্যতামূলক এই অনুষ্ঠানের গভীরে আছে বাস্তবে নারীর সঙ্গে পূর্ণ তৃপ্তিদায়ক সম্পর্কস্থাপনে অপারগতা। শৈশবে জাত নারী-ভীতি এখনও (পরিণত বয়সেও) অপসারিত হয়নি বলেই এই দুরবস্থা। এঁর মতে রতিবস্তু আসলে পুরুষত্ববিষয়ক আশ্বাসদাতা। অন্যান্য বিকৃতদের মতই, বস্তুকামীরা যৌন অপরাধে জর্জরিত ও রতি-অক্ষমতার ভাবনায় ক্লিষ্ট, ফলে পুরুষত্বহীনতার আতঙ্কও প্রবল। কাজে কাজেই এদেরকে এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করতে হয় বা খুঁজে নিতে হয় যার উপস্থিতি পুরুষত্ব ব্যাপারে নিশ্চিন্ততা এনে দেবে। মনোবিদ্গণের মতে রতিবস্তুর মূখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে শঙ্কাহরণ। (রতি) ভয় তাড়াবার কৌশল, পুরুষত্ব নিশ্চিতকরণে অভিনব পন্থা। পুরুষাঙ্গের প্রতীক ভেবে উপস্থচ্ছেদ উৎকণ্ঠার উপশম ঘটে, অতএব প্রতিটি রতিবস্তুই স্ত্রীদেহী পুরুষাঙ্গের ছদ্মবেশী প্রতিমূর্তি, এধারণা (ফ্রয়েডীয়) ঠিক নয়। কিন্তু এটা যে আশ্বাসদাতা, এব্যাপারে সবাই একমত।

কার্যকারণ বারিধি সেঁচে মুক্তোর মত উজ্জ্বল কয়েকটি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়বে। প্রথমেই উল্লেখ্য, এটা আশ্চর্যরকমের পুরুষালি বিকার। আবির্ভাবের উর্বর ক্ষেত্র অনুপস্থিত বলেই নারী জগতে বস্তুকাম অস্বীকৃত। নারীর অঙ্গোত্থান নেই, নেই পুরুষত্বহীনতার ভয়, কাজে কাজেই কোন প্রয়োজন নেই সেই ফেটিশের যা কিনা পুরুষাঙ্গের উপস্থিতি স্মরণ করিয়ে দেয় কিংবা পুরুষত্বের আশ্বাসদাতা। তা ছাড়া ভালবাসা ও বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা নারীর কাছে নিতান্তই ব্যক্তিগত পর্যায়ে সীমিত থাকে এবং কামানুষ্ঠানে পুরুষের মত ফ্যাণ্টাসি অপরিহার্য নয়। তবুও বলে রাখা ভাল নারীও এই বস্তুকামের শিকার হতে পারে, তবে কিনা অতি দুর্লভ। এই একটি দুটি বিরল ব্যতিক্রমের কথা বাদ

দিলে বস্তুকাম ব্যাপারটা পুরুষদেরই কুক্ষিগত। কারণ, দর্শন ইত্যাদি কামজ উদ্দীপনায় পুরুষের সংবেদনশীলতা অধিকতর এবং পুরুষরা সহজেই শর্তাবদ্ধ হয় অভিজ্ঞতা দিয়ে এবং অভিজ্ঞতা বিজড়িত বস্তুসমূহে। তা ছাড়া উত্থান আনয়ন এবং সেই উত্থান জিইয়ে রাখার দায়িত্ব পুরুষেরই। এবংবিধ কারণে, বস্তুকাম নামক বিকৃতি আশ্চর্যরকমের পুরুষপ্রধান।

বস্তুকামীরা সাধারণতঃ ভীরু ব্যক্তি, নিজেদের সঙ্কুচিত করে রাখে, কারুর ক্ষতি করে না। অবশ্য রতিবস্তু সংগ্রহ করতে গিয়ে আশ্রয় নিতে পারে চৌর্যবৃত্তির, কখনবা ধর্ষমর্ষকামের, যেমন কেশকর্তন। অনেকেরই মধ্যে আবেশজ চরিত্রলক্ষণসমূহ প্রকটিত, যেমন, কঠোরতা, অনমনীয়তা, খুঁটিনাটি ব্যাপারে অতিসতর্কতা, নোংরার ভয়, সঞ্চয়প্রবণতা। কালেভদ্রে কোন কোন বস্তুকামী পাকা মজুতদার হয়ে ওঠে, বিস্ময় উদ্রেক করবে এদের সংগ্রহশালা, সঞ্চিত দ্রব্যের মধ্যে আছে অজস্র জুতো, হরেক রকমের দস্তানা, রাশি রাশি অন্তর্বাস, কেশগুচ্ছ ইত্যাদি। এসবই কিন্তু নারীর, কখন কোন এক বিশেষ নারীর, কখনবা একের পর এক অজস্র নারীর। সংগ্রহ করে চেয়ে চিন্তে, না পেলে চুরি করে, জবরদস্তি করতেও পেছপা নয়। একেই ডাঃ ষ্টেকেল বলেছেন 'হারেম কাল্ট'। সংগ্রহশালায় যতই নতুন সামগ্রী জমা পড়বে ততই কল্পনায় অন্ত নারীর প্রতীক আনন্দ পাবে। প্রসঙ্গতঃ জানাই, সাধারণ সংগ্রাহক এবং সঞ্চয়ী বস্তুকামীর সম্পর্কটা কৌতূহলোদ্দীপক। কোন কিছু সংগ্রহ করা অস্বভাবী নয় এবং সংগৃহীত প্রতিটি দ্রব্যেই যৌন অর্থ খুঁজতে যাওয়া বৃথা। ডাকটিকিট, মুদ্রা ইত্যাদি বস্তু ফেটিশ নয়, তথাপি তাৎপর্যের দিক থেকে কিছুটা কামগন্ধী (অচেতন মনের), অর্থাৎ স্বকামিতার গন্ধ আছে : অন্য লোকের নেই, আমার আছে এই অহঙ্কার। কিন্তু কেউ যদি মজুত করে পর্বতপ্রমাণ নগ্নচিত্র, অযুত অশ্লীল গ্রন্থ (কিংবা পূর্বোক্ত রতিবস্তু) এবং রতিব্যাপারে অক্ষম, সে নিউরোটিক, অস্বভাবী, বিকৃত।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য, গোপনে বিকৃত উপায়ে কামচরিতার্থতাহেতু অধিকাংশই বিব্রত বোধ করে কিংবা পাপবোধ তাড়িত। পাপবোধের কুয়াশায় এমনই জড়ান যে যৌনবাসনা অবদমিত—প্রায় নেই বললেই চলে। এরা তাই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে বিপরীতলিঙ্গদেহী, বিশেষ করে গোপনাঙ্গ, থেকে।

বস্তুরতি অভিলাষী পুরুষদের পাপবোধ একটু বেশী, দয়িতের কাছে স্বাভিলাষ বর্ণনা তাই এদের কাছে লজ্জাকর, এবং কষ্টকরও বটে। যদিবা কোনমতে ব্যক্ত করতে পারে গোপন বাসনা, যেমন কোন বিশেষ পোশাক বা সুরভি, নারী

সেটা অস্বভাবী রূপে গণ্য করে। এসবে নারীর কোন আগ্রহ নেই, হয়ত একারণেই পুরুষের দাবিতে নির্বিকার, উদাসীন। এমন কি উল্টোটাও ভেবে নেয়, পুরুষ তাকে ভালবাসে না, ভালবাসে তার পোশাক-আশাককে। কিন্তু যে নারী রতিঅভিজ্ঞ নিশ্চয়ই সে পুরুষ-মনস্তত্ত্বের খবর রাখে, উপলব্ধি করতে পারে ব্যাপারটা। আর ঘরণী যদি অপারগ হয়, স্বভাবতঃই পুরুষরা ঘরকে বাহির করবে। বারবধূদের এখানেই জিত এবং পুরুষের এবংবিধ বাসনা মেটাতে এবং অন্যান্য বিকৃত রুচির পরিবেশনায় এরা পেছপা নয় বলেই এদের ব্যবসা এত তেজী।

কোন বিশেষ সাজে কিংবা অন্যভাবে প্রিয়া তার কাছে আসুক এবং এভাবে প্রমাণ করুক সে কামনারই প্রতিমূর্তি, পবিত্রতার (মাতার) ছবি নয়। এসবই শর্তাধীন পুরুষত্ব। অর্থাৎ কিনা এক্ষেত্রে রতিবস্তু হচ্ছে সেই হাতিয়ার যার প্রয়োগে কামীজন নিশ্চিত হতে পারে যে কামবাসনা পূর্ণ চাঁদের মত বিকশিত হবে এবং যথেষ্ট রতিশক্তি ফিরে পাবে। কামজ মাদুলি হিসেবে ব্যবহৃত, মৃদু বস্তুকামের স্নিগ্ধ এই রূপটিই বহুদৃষ্ট।

অল্পদৃষ্ট হচ্ছে যথার্থ বস্তুকামীরা যাদের রতিতৃপ্তিলাভ সীমিত কিংবা রতি-অক্ষমতা সম্পূর্ণ অর্থাৎ কিনা পুরুষত্বহীন। এদের রতিপ্রাপ্তি এমন এক বস্তুর—এটাই রতিবস্তু নামে খ্যাত—সান্নিধ্যে, যার আবেদন স্বাভাবিক মানুষের কাছে এরূপ তাৎপর্যপূর্ণ নয়। রতিবস্তুর ধর্মই হল কামপাত্রীকে সর্বতোভাবে বিচ্যুত করা এবং রতিবস্তুর সান্নিধ্যই এদের যৌনতার নিবৃত্তি ঘটায়। শুধু আগ্রহভরে নিরীক্ষণ বা অনুভব কিংবা হস্তকৃত উপচার (পীড়ন, মর্দন)। কখন ওষ্ঠাধর, দেহ বা জননেন্দ্রিয় দিয়ে স্পর্শ করে। কখনবা এসবই ঘটে যায় মনে মনে। এতেই এদের তৃপ্তি, স্খলন ও রাগমোচন।

বৈকৃতকামে যেটা ফেটিশরূপে আখ্যাত, সেটাই অর্থাৎ নারীর বেশবাস, বসনভূষণ, দেহের কোন অঙ্গ স্বাভাবিক ব্যক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করে, বাসনা জাগায়, তারপর সঙ্গী যদি স্বাগত জানায়, এই আগ্রহ ব্যাপ্ত হয় সমগ্র ব্যক্তিতে, বিশেষ করে গোপনাঙ্গে। বস্তুকামীতে এই ব্যাপ্তি বন্ধ, প্রতিহত কেননা রতিবস্তুলাভেই আগ্রহ তার থেমে যায়, বিকশিত না হয়ে আবেশজভাবে স্থিরবদ্ধ থাকে রতিবস্তুতেই এবং বলাই বাহুল্য সেই অনুভূতি এনে দেয় যা কিনা সুরতসমান।

১৬। বসনকাম ও বিপরীতকাম

বসনকাম হচ্ছে ভিন্নলৈঙ্গিক বসন পরিধান এবং সুনিশ্চিতভাবে কামগন্ধযুক্ত। অর্থাৎ বসনকামীরা নারীর ছদ্মবেশে পুরুষ কিংবা পুরুষের ছদ্মবেশে নারী এবং এহেন ছদ্মবেশের উদ্দেশ্য অবশ্যই রতিজ।

ম্যাগনাস হির্শফেল্ড কর্তৃক কামজগতে প্রথম প্রবর্তিত ১৯১০-এ এবং ইনিই এর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছেন। সমকামিতা ও অন্যান্য কামবিকৃতি থেকে স্বতন্ত্র-রূপে প্রথম প্রমাণিত এবং বিজ্ঞানসম্মত প্রথম পূর্ণাঙ্গ আলোচনার ('দি ট্রানস্‌-ভেষ্টাইটস' গ্রন্থ) অসামান্য কৃতিত্ব এঁরই। 'ট্রান্স' মানে বিপরীত এবং 'ভেষ্টিস' মানে বসন, সুতরাং 'ট্রান্সভেষ্টিজম'-এর অর্থ বিপরীত সাজে ভূষিত হওয়ার একটা আবেগ, এটা দুর্মর এবং বাধ্যতাজনিত। বাংলায় এরই নামকরণ করেছি বসনকাম। আরেকটি সমার্থক শব্দ ক্রশ-ড্রেসিং। 'ইয়নিজম' রূপেও খ্যাত। অল্পব্যবহৃত এশব্দটি ফরাসী ঐতিহাসিক ব্যক্তি কেভালিয়র ডি'ইওন দ্য বুমণ্ট-এর নামানুসারে সৃষ্ট এবং এর জনক হ্যাভিলক এলিস, ১৯২৮-এ। প্রায় একই অর্থে 'লিঙ্গ ভূমিকা বিপর্যয়'-এর চলন সাম্প্রতিককালের। কথাটি অর্থবহতায় আরও ব্যাপক, ঘটনাবিন্যাসে আরও নিষ্ক্রিয়, বিপরীতলিঙ্গের সঙ্গে একাত্মতা আছে ঠিকই তবে কিনা আরও সমগ্রভাবে, আরও পরিপাটিভাবে এবং শেষোক্ত ঘটনারই একটি বিকাশ, বিপরীত বসন পরিধানের অভিলাষ। অর্থাৎ কিনা বসনকামীদের কেউ কেউ বিপর্যস্তলিঙ্গ।

বিপরীতমুখী বেশবিন্যাস অল্পমাত্রায় ভীষণ ব্যাপক, বিশেষ করে রমণীকুলে। বস্তুতঃ পুরুষ অপেক্ষা মেয়েরাই অধিক আগ্রহী, বিশেষ করে শৈশবে। পরিণত বয়সেও বিপরীতলৈঙ্গিক বেশভূষা ধারণ করে মেয়েরা, পুরুষরাও। কিন্তু যথার্থ বসনকামী না হলে পুরুষরা সচরাচর নারীবেশে সজ্জিত হয় না, অবশ্য ফ্যান্সি ড্রেস, মাস্কারেড পার্টি, বল নাচ ইত্যাদি উৎসব বা প্রমোদ প্রসঙ্গ বাদ দিতে হবে।

উৎসবের অঙ্গ কিংবা বিলাসব্যসনের উপকরণরূপে নারীবেশে পুরুষ দেখা যায়। অনুরূপভাবে পুরুষবেশধারিণী নারীরও দেখা পাব যাত্রাভিনয়ে, রঙ্গমঞ্চে, ক্ষেতখামারে, ফ্যাক্টরিতে বা অন্যত্র। এরূপ ভেকধারীকে কেউ

বসনকামী বলবে না। জিন স্ল্যাকস পরলেই নারী যেমন বিকৃত নয় তেমনি সুস্থ সেই স্কচম্যান যে কিল্ট পরে। কারণ, বিপরীতলৈঙ্গিক বসন পরিধানের অভিলাষ পৌনঃপুনিক নয়, এবং বাধ্যতামূলকও না। তা ছাড়া এরা কেউই সমাজতঃ ভিন্নলৈঙ্গিক ব্যক্তির সঙ্গে একাত্মতা চায় না এবং বিপরীতলৈঙ্গিক ভূমিকাগ্রহণে আগ্রহী নয়। অতএব, বসনকাম শুধুই ভেকবদল নয়, আরও কিছু। এই আরও কিছুর মধ্যে আছে কামজ উদ্দেশ্য বা তৃপ্তি এবং বিপরাত-লৈঙ্গিক ব্যক্তির সঙ্গে একাত্মতা কিংবা ভূমিকাগ্রহণ। বস্তুতঃ অধিকাংশ বসনকামীরই বৈশিষ্ট্য : বিপরীত সাজে স্বস্তির নিঃশ্বাস এবং নিজেকে সহজ মনে হয়। জড়তা কেটে গিয়ে একটা স্বতঃস্ফূর্ততা আসে, জাগে স্বভাবিতাবোধ আর স্বাচ্ছন্দ্যবোধ। বস্ত্রপরিধানের সংবেদজ অভিজ্ঞতা, বসনস্পর্শসুখ এবং আয়নায় দর্শন—এসবই তাকে পরিতৃপ্ত করে, কামসুখসমান পুলক এনে দেয়।

যে নারীর রূপের প্রশংসায় পঞ্চমুখ কিংবা গুণে মন ভোর সেই নারীর অনুকরণে এরা সজ্জিত হয়। নিখুঁত এদের সাজগোজ, কোন আদর্শ পুরুষ বসনকামীর আলমারী মেয়েদের সবরকম পোশাক পরিচ্ছেদে ঠাসা, সেই সঙ্গে যাবতীয় আনুষঙ্গিক উপকরণও।

নির্জন গোপনে সাজগোজ করে, তারপর শুধু আয়নায় নিজেকে দেখেই খুশি। কিংবা আবেগ তাড়িত হয়ে কিছুক্ষণের জন্যে রাস্তায় পদচারণা, বিশেষ করে রাত্রে। স্বাভাবিক বেশে এদের কামভাব জাগে না, ধরতে গেলে একরকম পুরুষত্বহীনই। অপরদিকে রূপান্তরিত বেশবিন্যাসে উত্থান স্খলন। কোথাও রতিতৃপ্তি নেই, নেই কোন উত্থান স্খলন, শুধু ভেকবদলেই সন্তুষ্ট, এরা অযৌন বসনকামী।

বসনকামীদের মধ্যে বহুদৃষ্ট অভ্যাসটি এই : পুরুষ নারীবেশে সজ্জিত এবং পাণিমেহন, প্রায়শঃ আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে। স্ত্রীপোশাকের অনুভূতি আর নারীদেহস্পর্শ হেতু সুখানুভব এদের কাছে তুল্যমূল্য। অর্থাৎ বেশভূষার সংবেদজ অনুভূতি কামভাব জাগায়।

এক কথায়, বেশভূষার অনুকরণ রতিবাসনারই আরেক রূপ। নারীবেশে সুপ্তিস্খলন, স্বতঃস্খলন, এমন কি জীবনে প্রথম উত্থান, এসবের কথা বলেছেন ম্যাগনাস হির্শফেল্ড।

বিপরীতলৈঙ্গিক বেশ পরিধানে মানসলৈঙ্গিক কামতৃপ্তির কথা বলেছি। এবারে বলি মানস তৃপ্তির কথা। ভিন্নলৈঙ্গিক একাত্মতাবোধের ফলে সমাজ-ব্যবস্থায় বিপরীত লিঙ্গের জন্যে নির্দিষ্ট ভূমিকাগ্রহণেও তৎপর হতে দেখা যায়।

এদেরই কেউ তাই বেশভূষায় সন্তুষ্ট নয়, মেয়েদের নামে ডাকা পছন্দ করে, সংসারে মেয়েদের কাজকর্ম করে, এমন কি নারীসুলভ বৃত্তি গ্রহণেও পেছপা নয়।

বসনকামের মাত্রাভেদ আছে অনেক। প্রকারভেদও কম নেই। কেউ শুধু স্বপ্ন দেখেই ক্ষান্ত। এদের বাসনা ক্ষীণস্রোতা, বাস্তবে রূপায়িত হওয়ার মত প্রবল নয়, শুধু মনে মনেই, সবই দেখে মনশ্চক্ষু দিয়ে। নিজেকে কল্পনা করে নারীরূপে এবং এতে ঘৃতাহুতি দেয় পোশাক পরিচ্ছদই। অতিশয় মোহিনী নারীর কল্পনা বহুদৃষ্ট, তার সঙ্গে নিজের পছন্দমত যা খুশি করবে, এই মানসকল্পনাই রূপ পায়, যখন নিজেকে আয়নায় দেখে নারীবেশী এবং এই বেশে নিজের ছবিটি সতত চোখের সামনে ভাসে। শুধু অভিলাষে সন্তুষ্ট নয় কেউ কেউ, এরা চায় যথার্থ বেশভূষা পরিধান। কখন এবাসনা পৌনঃপুনিক, অনবরত বাধ্যতামূলক। কখনবা মাঝে মধ্যে উদিত।

সাজসজ্জার সমগ্রতা ও স্থায়িত্ব ভেদে বসনকামিতা কখন অংশতঃ, অস্থায়ী। কখন স্থায়ী, পূর্ণ। অংশতঃ বসনকামিতায় বস্তুকামিতাই প্রবল, বাইরের সাজগোজ পুরুষের মতই, কিন্তু ভিতরে লুকিয়ে আছে মেয়েদের পোশাক, যেমন ব্রা, কর্সেট, এমন কি প্যান্টি-ও। পূর্ণ বসনকামীদের বেশভূষায় বিপরীত-লিঙ্গের নিখুঁত ছবি। পরিবর্তিত ভূমিকায় মাঝে মধ্যে অভিনয়, যেমন সন্ধ্যায় বাড়ীতে, সপ্তাহশেষে কিংবা বিশেষ অনুষ্ঠানে, এটা হল অস্থায়ী। সকল কর্মে ঘরে বাইরে শয়নে-স্বপনে-জাগরণে সকল সময়েই, সর্বাবস্থাতেই বিপরীত লিঙ্গের সঙ্গে একাত্মতাস্থাপনে স্থায়ী রূপটি ফুটে উঠবে।

বসনকামীরা সাধারণতঃ নারীবেশে পুরুষ কিংবা পুরুষবেশে নারী। অর্থাৎ অনুকরণকারীরা শুধু যে বিপরীতলৈঙ্গিক তা নয়, প্রাপ্তবয়স্কও বটে। অতিবিরল ক্ষেত্রে অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক-বালিকা কিংবা শিশু বেশও কাম্য। সাধারণতঃ নারীরাই বালকবেশী হতে চায়, এটা দুর্লভ। এদেরকে বলা হয় বালবসনকামী (ইনফ্যান্টোসেক্সুয়্যাল ট্রান্সভেষ্টাইট)।

সমগ্র জনসমাজে বসনকামীদের প্রকৃত সংখ্যা কত, এটা বলা বড় শক্ত, কেননা এরা সবাই গোপনে বেশভূষা করে, তবুও মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে, ১%-এর একটু কম থেকে ৩%-এর মধ্যে। এই স্বল্পসংখ্যক মানবসমাজ আবার চারটি প্রধান শ্রেণীতে বিন্যস্ত: ৩৫% ইতররতিক, ৩৫% সমরতিক, ১৫% উভরতিক, বাদবাকীর অধিকাংশই স্বরতিক এবং অল্প কয়েকজন অযৌন (ম্যাগনাস হির্শফেল্ড)। অধিকাংশ বসনকামীই ইতররতিক, বিবাহিত, সন্তানের জনক, যথারীতি মিলিত হয়। কখন ঔষধ বা নেশার ঘোরে এমনটি

করে। কেউ নারী সাজে শুধু মিলনের সময়, অন্যথায় অতৃপ্তির বেদনা কিংবা অপৌরুষের গ্লানি। অল্পকয়েকজন সমরতিক। উভয়কামীর পছন্দ বলিষ্ঠ নারী বা কমনীয় পুরুষ। ক্লিফোর্ড এ্যালেন, ষ্টেকেল প্রমুখ মনোবিদ্‌গণের দৃঢ় ধারণা বসনকামীমাত্রই সমকামী, কম বা বেশী, স্পষ্টতঃই প্রকাশ্য কিংবা প্রচ্ছন্ন, গভীরভাবে অবদমিত। মুষ্টিমেয় কয়েকজন অযৌন বসনকামী, এদের তৃপ্তি নারীর বেশভূষায়, নারীসুলভ বৃত্তিতে। কামভাব নেই কোথাও, প্রায়শঃ পুরুষত্বহীন। কিংবা স্বরতিক, স্বকামের গন্ধ আছে তাই সুন্দর করে তুলতে চায় নিজেকে, নিজেকে ভালবাসে সবচেয়ে বেশী।

বসনকামের রূপটি কখন একক, নিজ আলোকে দীপ্ত। কখন আত্মপ্রকাশ করে যুক্তভাবে, অন্য কোন কামবিকৃতির সঙ্গে, এই মাত্র উল্লেখ করা স্বকাম ও সমকাম তো আছেই, আর আছে বস্তুকাম, প্রদর্শনকাম, ধর্ষমর্ষকাম। কেউ প্রদর্শনকামের আশ মিটিয়ে নেয় বিপরীত বসনে, পোশাক পরিচ্ছদ দেখিয়ে ভালবাসা অর্জনের চেষ্টা স্পষ্ট। অন্য কেউ পায় ধর্ষমর্ষকামিতায়, আঁটসাট চেপে ধরা পোষাকে। কখন বস্তুকামিতাই প্রবল যেমন, অংশতঃ বসনকামিতায়। প্রসঙ্গতঃ বলে রাখি, বসনকাম বস্তুকামিতারই অনুরূপ, তবে বস্তুকামিতা ছাড়িয়ে আরেক ধাপ এগিয়ে গেছে, বিপরীত সাজে যৌনতার জাগরণ ও মুক্তি (এই একই পোশাক বস্তুরতিরূপে গণ্য হবে বস্তুকামিতায়)। কখন তীব্র মর্ষকাম-বাসনা বিজড়িত। কখনবা আত্মহত্যার সঙ্গে। নারীবেশে সজ্জিত হয়ে আত্মহত্যা করে, ক্বচিৎ কখন আত্মহত্যার অনুকরণে ব্যর্থ প্রচেষ্টা, গলায় দড়ি দেওয়া।

অন্যান্য কামবিকৃতির মতই, বসনকামীদের অধিকাংশই পুরুষ এবং ইতররতিক। মজার কথা এই যে, বিপরীত সাজের সুযোগ মেয়েদেরই বেশী এবং নারীরা প্রায়ই পুরুষের মত সাজগোজ করে কিন্তু বাধ্যতাজনিত নয় এবং কাম উদ্দেশ্যে নিয়োজিতও না। প্রধানতঃ পুরুষদেরই বিকৃতি হওয়ার কারণ হিসেবে প্রথমেই বলব, নারীর কাছে বসনকামের উদ্দেশ্য পুরুষের মত এক নয়, ভিন্ন। দ্বিতীয়তঃ, প্রথম দু তিন বছরে ছেলেদেরকে প্রায়ই মেয়েদের সাজে সাজান হয়, এথেকে একটা ছাপ থেকে যেতে পারে। তৃতীয়তঃ, নারীর চেয়ে পুরুষ অতি সহজেই শর্তাবদ্ধ হয় যৌন অভিজ্ঞতা দিয়ে, অভিজ্ঞতাকালীন কামপাত্রে ও কামপাত্র সম্পর্কিত বিবিধ বস্তুতে।

অধিকাংশ বসনকামীরই কামভাব আছে, যদিচ অন্যান্য বিকৃতির মতই লিবিডো বা কামশক্তি প্রায়শঃ দুর্বল। তথাপি বহু বসনকামী বিবাহিত, পুত্রকন্যা

নিয়ে সংসারজীবন নির্বাহ করে। এরা দাম্পত্যজীবনে সুখী এবং সন্তানের পিতামাতাও। এদের কাছে ভেকবদল পুরুষত্ব প্রতিষ্ঠার একটি উপায় বিশেষ যা দিয়ে তীব্র উত্তেজনা জাগে, পুরুষত্বে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়, নিজেকে অনেক বেশী পুরুষ মনে হয় এবং আত্মপ্রত্যয় বহুগুণিত। এমন কি স্ত্রীর পোশাকেও পুরুষকে মিলিত হতে দেখা গেছে, অর্থাৎ কিনা এদের পুরুষত্ব শর্তাধীন। কখন কেন অনেক ক্ষেত্রেই এটা পাণিমেহনের প্রস্তুতিপর্ব। কখনবা কামচেতনা-হীন, এরা অযৌন শ্রেণীভুক্ত (২৩৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

বিপরীতমুখী বেশবিন্যাস যেমন প্রাচীন তেমনি ব্যাপক। প্রাচীনত্বের নিদর্শন হিসেবে বলা যেতে পারে এঅভ্যাস সভ্যতা-প্রাচীন এবং এলাগ্যাবুলাস নামক রোমক সম্রাটের আনন্দ ছিল বসনকামে। আর ব্যাপকতা? ছড়িয়ে আছে পৃথিবীর সর্বত্রই, শুধু বুড়ো পৃথিবী নয়, নতুন পৃথিবীতেও। শুধু সভ্য নয়, আদিম জগতেও।

একদা বেশ ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল কতিপয় আদিম সমাজে এবং এখনও ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে আদিবাসীদের মধ্যে। বহুপত্নীক সমাজে সর্দার কিংবা অন্য কোন গণ্যমান্য ব্যক্তির স্ত্রীর সমান মর্যাদাপ্রাপ্ত। অনেক জায়গাতেই ম্যাজিক শক্তির অধিকারী এই হেতু বসনকামীরা শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত।

কোথাও সহ্য করা হয় এই মাত্র, আপত্তির কোলাহল নেই। কোথাও সম্পূর্ণরূপে অনুমোদিত, ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের অঙ্গীকার রূপে স্বীকৃত, যেমন, মোহেভ, ডাকোটা প্রভৃতি দক্ষিণ আমেরিকার ইণ্ডিয়ান সমাজে, এস্কিমো, মেলানেসিয়ান ও পলিনেসিয়ানদের মধ্যে এবং নাইজেরিয়ার কিছু অংশে। পুরুষ বসনকামীরা 'BERDACHE' রূপে খ্যাত, এরা নারীর মত সাজগোজ করে, মেয়েলি কাজকর্ম করে, এমন কি পুরুষকে সঙ্গদানও। অর্থাৎ আদিম সমাজে অনুমোদিত সমকামিতার বহুদৃষ্ট রূপটি এই বসনকামই।

সভ্য সমাজের দৃষ্টি সর্বত্রই ভ্রূকুটিকুটিল। শতাব্দীর পর শতাব্দী প্রভূত নিন্দা অপযশ সত্ত্বেও কতিপয় ঐতিহাসিক ব্যক্তির সন্ধান পাব যাদের আনন্দ ছিল বসনকামে। ইতিহাসবিশ্রুত পুরুষদের মধ্যে আছেন, প্রিন্স ফিলিপ যিনি ডিউক অব অরলেন্স ও চতুর্দশ লুই-এর ভ্রাতা; ফ্রান্সের সম্রাট তৃতীয় হেনরী; ফরাসীদেশীয় লর্ড যাজক কূটনীতিবিদ ফ্রাঙ্কোয়া ডি চয়জি; কেভালিয়র ডি'ইয়ন দ্য বুমন্ট। এতালিকায় মহিলাদের নামও সংযোজিত: ইংল্যাণ্ডের জেমস বেরী, লেডি এস্থার ষ্ট্যানহোপ; আমেরিকার আর্মি সার্জন মেরী ওয়াকার, নিকোলাস ডি রেয়লান।

যার নাম নিয়ে ইয়নিজম শব্দটি রচিত, অষ্টাদশ শতাব্দীর সেই ফরাসী রাজ-পুরুষের নাম কেভালিয়র ডি'ইয়ন দ্য বুমণ্ট (১৭২৮-১৮১০)। জীবনের অধিকাংশ সময়ই নারীবেশে অতিবাহিত এমন পুরুষদের মধ্যে সর্বাধিক খ্যাত ইনিই। শেষ জীবনে পঞ্চদশ লুই-র গোপন সংবাদদাতা এবং মহিলা রাষ্ট্রদূত, কর্মস্থল ছিল লণ্ডনে, সেখানেই ১৮১০-এ মারা যান, তখন শবব্যবচ্ছেদে জানা যায় ইনি আসলে নারীবেশী পুরুষ ছিলেন।

হ্যাভলক এলিস বর্ণিত জেমস বেরী-র ঘটনা সত্যই চমকপ্রদ (১৭৯৫-১৮৬৫)। সারাজীবন পুরুষরূপে পরিচিত, এই স্কচ মহিলা ১৮ বছর বয়সে ইংলিশ আর্মি মেডিক্যাল ডিপার্টমেণ্টে যোগদান করেন হসপিট্যাল এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট হিসেবে এবং নিজ কর্মদক্ষতায় ইনস্পেক্টর জেনারেল পদে উন্নীত হন। ১৮৬৫-তে মৃত্যুর পর বিরাট হৈ-চৈ, তখন যে আসল লিঙ্গ প্রকাশিত!

মনে হতে পারে, বসনকামিতা বুঝি অবৈধ। না, তা নয়। যদি না অঙ্গ প্রদর্শিত হয়, যদি না শালীনতা ভঙ্গ হয়, বসনকাম বৈধ।

অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে বসনকামের কারণটি মনোগত। অন্যদল, বিশেষ করে প্রবীণ ও প্রাচীনপন্থীরা বলেন, না এটা জন্মগত। আরেকদলের, এঁরা নবীন, ধারণায় মানসসামাজিক ব্যাখ্যাই সঙ্গত।

প্রথমেই জৈবজেনেটিক বা জন্মগত মতবাদ প্রসঙ্গ। এমতবাদের মূল সুরটি হল জৈবিক সূত্রে লব্ধ কিংবা বংশগতিমূলক প্রবণতা কাজ করছে। একথা অনেক বিশেষজ্ঞই বহুকাল ধরেই বলে আসছেন, যদিচ সমর্থনে অতিঅল্প তথ্যই সংগৃহীত হয়েছে। উভলিঙ্গ নিয়ে সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে, নারী কিংবা পুরুষরূপে একাত্মতা তথা প্রতিষ্ঠা এবং লিঙ্গভূমিকা সম্বন্ধে প্রত্যয়, এদুটির মূলে আছে শৈশবকালীন অভিজ্ঞতা, সামাজিক শিক্ষা, মানসগঠন। শারীরস্থানীয় বা জৈবিক অসঙ্গতি নয়। বর্তমান আলোকের পরিপ্রেক্ষিতে জন্মগত মতবাদ অচল।

মানসসামাজিক ব্যাখ্যা সাম্প্রতিককালের। শিক্ষাগত শর্তারোপ (লার্নিং প্রসেস) সূত্র ধরেই উদ্ভূত, তবে এক বিশেষ ধরনের অপরিবর্তনীয় শিক্ষা, শিক্ষাকাল জীবনের প্রথম দুতিন বৎসর মাত্র। এরই নাম ইমপ্রিণ্টিং প্রসেস। অর্থাৎ বসনকাম হচ্ছে এক প্রকার আচরণ যা কিনা অর্জিত এবং যৌন বিপর্যয় সম্পর্কিত (২০৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রথম ২।৩ বৎসর বয়সে বিপরীতলৈঙ্গিক বসন পরিধানের অভিজ্ঞতাযুক্ত। এই বয়সে এই যে ছাপ থেকে গেল এটাই পরিণতবয়সে বসনকামের কায়া ধরে দেখা দেয়। কন্যাকামী

মাতা পুত্রকে কন্যাবেশে সজ্জিত করে—চুল বড় করে রাখা, মেয়েদের মত সাজগোজ প্রভৃতি ব্যাপারে পিতামাতারা (বিশেষ করে মায়েরা) মনোযোগী হয়, সুবোধ বালককে বাহবা দেয় প্রশংসা করে, এমন কি শাস্তিবিধানও বিদ্রোহী সন্তানে। প্রসঙ্গতঃ বলে রাখি, পুরুষরাই যে অধিক বসনকামী হয় তার একটি কারণ প্রথম জীবনে প্রায়ই মেয়ে সাজে বালকরাই।

মনোগত ব্যাখ্যা মনোবিশ্লেষণমূলক, শিশুর সঙ্গে মাতার সম্পর্কই যার বনিয়াদ। যদিচ ফ্রয়েড স্বয়ং এব্যাপারে মুখ খোলেননি, অনুগামীদের বক্তব্য এই—উপস্থচ্ছেদ সম্পর্কিত উৎকণ্ঠাই নাম ভূমিকায়। মনোজগতের গভীর স্তরে দেখব, যথার্থতঃ নিজেকে নারীর সঙ্গে একাত্মতাবোধ করছে এবং এব্যাপারে পিতার চেয়ে মাতার সঙ্গে একাত্মতাই অধিক। মাতা যদি প্রভুত্বশালিনী হয়, সন্তান বসনকামী হয় না।

বিপরীত সাজে শিশুকে বিশেষ শর্তারোপের দিকে ঠেলে দেওয়া হয়, একথা ক্লিফোর্ড এ্যালেন মানতে রাজী নন। এঁর ধারণায়, বসনকামিতার মূল শিকড়টি প্রোথিত আছে সমকামিতায়, কয়েকটি শিকড় ছড়িয়ে গেছে বস্তুরতি এবং প্রদর্শনরতির দিকে, এটা অবশ্য গৌণ। বসনকামীমাত্রই সমকামী, কম বা বেশী। নিজেকে কামপাত্রের (অর্থাৎ নারীর) সঙ্গে একাত্মতা বোধ করে আর এই নারী সচরাচর মাতা কিংবা মাতৃস্থানীয়া। এটা অতএব মূলতঃ সমকামিতাই। বসনকামী নারীবেশী পুরুষ ইতররতিক আচরণে তৃপ্তি পেতে পারে, পেলেও এরা পোশাকের দিক থেকে সমকামী, কারণ, গ্রহণ করেছে শুধু পোশাকই, মাতার ব্যক্তিত্ব নয়।

ফ্রয়েড, ষ্টেকেল, কার্ল আব্রাহাম, ফোরেল, ক্লিফোর্ড এ্যালেন প্রমুখ কতিপয় প্রখ্যাত মনোবিদ্‌গণের ধারণায় বসনকামিতার প্রতিটি ঘটনাই সমকামিতার উদাহরণ, প্রচ্ছন্ন কিংবা প্রকাশ্য। প্রসঙ্গতঃ বলে রাখি, একদা বসনকাম সমকামিতারই প্রকারভেদ রূপে গণ্য ছিল ক্রাফট-এবিং পূর্ব যুগে এবং ক্রাফট-এবিং স্বয়ং এই মতের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

সত্য কথা বলতে কি, এদুটি ঘটনা সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন এবং স্বতন্ত্র। প্রথম প্রতিবাদ করেন ম্যাগনাস হির্শফেল্ড, সমকামিতা থেকে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র অধ্যায়। এটা হচ্ছে মানস উভলিঙ্গতা, দেহে পুরুষ কিন্তু নারী। স্বতন্ত্র স্বীকৃতি দিয়েছেন হ্যাভলক এলিসও, এঁর কাছে এটা হল যৌন প্রতীকতা এবং বস্তুরতি ও স্বরতি-র সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত।

কিনসী ও তাঁর সহকর্মীগণ দৃঢ়তার সঙ্গে হেঁকে বলেছেন, বসনকামিতা

কদাচ একপ্রকার সমকামিতা নয়। কারণ সমগ্র বসনকামীদের মধ্যে অধিকাংশই ইতররতিক, প্রধানতঃ কিংবা একমাত্র। অর্থাৎ সামান্য অংশই সমকামী, কোন কোন পুংসমকামী অবশ্য নারীবেশে সজ্জিত হয়, এখানে বস্ত্রপরিধানের প্রভাব পড়ে অন্যেতে, নিজে পায় না বস্ত্রপরিধানের আনন্দ। অধিকাংশরই আনন্দ সমকামিতা বর্জনে। বহু সমকামীদের মধ্যে এক-আধ জন হয়ত বসনকামী, অনুরূপভাবে বৃহদসংখ্যক বসনকামীদের অতি অল্প কয়েকজন সমকামিতায় আচ্ছন্ন।

গবেষক মনোবিদ্ ড্যানিয়েল ব্রাউন দেখেছেন বিপর্যস্তলিঙ্গদের মধ্যে বসনকামিতা প্রায় অনিবার্য কিন্তু উল্টোটি সত্য নয়। অধিকাংশ বসনকামীই সমকামী নয় এবং বিপর্যস্তলিঙ্গও না। শুধু নারীর পোশাকে জীবনভোর সংবন্ধন, এই একমাত্র দুর্বলতা যদি বাদ দিই অধিকাংশ পুরুষ-বসনকামীই যৌনব্যাপারে পুরুষালির পরিচয় রাখে, অর্থাৎ এরা বিবাহিত, সন্তানের জনক এবং জীবনযাপনাও স্বাভাবিক।

বিপরীতকাম

পৃথিবীতে এমন ব্যক্তিও আছে যাদের অভিলাষ নারীর সঙ্গে চির-একাত্মতা। এবং এটা এতই চরম ও প্রবল, এতই ভয়ঙ্কর ও সর্বগ্রাসী যে শুধু বেশবাসে সুখ নাহি। পুরোপুরি নারী হতে চায়, প্রকৃতির ভুল শোধন করতে চায়। এরা তাই ডাক্তার থেকে ডাক্তারের পরামর্শপ্রার্থী হয় এই আশায় যদি কেউ অপারেশন করে লিঙ্গ পরিবর্তনে সহায়তা করে। এই যে অভিলাষ—নিজ লিঙ্গ পরিবর্তনের চরম বাসনা—এরই নাম রেখেছি বিপরীতকাম। ইংরেজীতে বলা হয় ট্রান্সসেক্সুয়্যালিজম। 'যৌন বিপর্যয়' সম্পর্কিত অথচ আরও বিশেষভাবে নির্দিষ্ট এবং আরও অধিক অর্থবহ এই বিপরীতকাম। বিপর্যস্তলিঙ্গ (ইনভার্ট) কোন পুরুষ অপারেশনের আশ্রয়ে পুরুষত্বসূচক চিহ্নরাজি উপড়ে ফেলতে চায় সে নিশ্চয়ই বিপরীতকামী (ট্রান্সসেক্সুয়্যালিষ্ট)।

এবিকৃতি নিঃসন্দেহে পুরুষপ্রধান। অর্থাৎ পুরুষদের মধ্যেই সমধিক দৃষ্ট এবং এরা অনিবার্যভাবেই ক্রোমোজোমীয় পুরুষ। প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত: ক্রিশ্চিন জরগেনসন; রবার্ট কাওয়েল; এপ্রিল এ্যাশলে। রঙ্গমঞ্চে নারীর ভূমিকায় অবতীর্ণদের মধ্যেও বিপরীতকামী খুঁজে পেতে পারি।

অনেকেরই ধারণা, বসনকামেরই চূড়ান্ত রূপ বিধৃত আছে বিপরীতকামীর অঙ্গে অঙ্গে। কেউ বলেন, না, শুধু বিপরীতলৈঙ্গিক একাত্মতা হেতু একাসনে

বসান ঠিক নয়, বিস্তর ফারাক আছে বলেই এদুটি ভিন্ন, সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র অধ্যায়। প্রধানতঃ তিনটি পার্থক্য চোখে পড়বে।

বিপরীতকামীরা সাধারণতঃ পুরুষই, কচিৎ কখন নারী, প্রায় সকলেই বয়সে তরুণ, তবে হতেই হবে এমন কোন কথা নেই। পুরুষ বিপরীতকামীরা প্রায় সততই নারীবেশে সজ্জিত থাকে সত্য, কিন্তু এই বেশভূষা বসনকামের মত রতিব্যাপারে কোন ইন্ধন যোগায় না, শুধু ছদ্মবেশে সহায়তা করে। দ্বিতীয়তঃ, শুধু মানসিক ও সামাজিক মূল্যবোধ নিয়ে সন্তুষ্ট নয়, এ্যানাটমি অর্থাৎ শারীর-সংস্থানেরও বদল চায়। যা কিছু পুরুষত্বজ্ঞাপক সে-সবই ঘৃণ্য, পরিত্যাজ্য। শুধু মনের বা সমাজের দিক থেকে নয়, দেহের দিক থেকেও পরিপূর্ণভাবে নারী হতে চায়। সতত প্রার্থনা : কনভার্সান অপারেশন, অর্থাৎ শারীরস্থানীয় লিঙ্গ পরিবর্তন। তৃতীয়তঃ, এদের মনো নামক সমুদ্র গভীরভাবে কলোল্লিত, সংঘাতময়, বসনকামীদের চেয়ে সহস্রগুণে বিক্ষুব্ধ। বসনকামী যদি হয় নিউ-রোটিক (বায়ুরোগগ্রস্ত), এরা তবে সাইকোটিক (বাতুলতাগ্রস্ত)। বিপরীত-লৈঙ্গিক পরিবর্তনের ফ্যান্টাসি সিজোফ্রেনিয়া রোগের প্রারম্ভিক লক্ষণ হিসেবে প্রায়শঃ দৃষ্ট এবং এহেন ভ্রান্তির কথা যারা বলে তারা অনিবার্যভাবেই সাইকো-টিক। দেহস্থ পুরুষালিচিহ্নে বিরক্ত আর মনে মনে নারীর অনুভূতি, এদুয়ের টানাপোড়েনে নিয়ত চঞ্চল, সদাই অস্থির। পুরোপুরি নারী হওয়ার জন্তে একটা আবেশজ আবেগ নিশিদিন কুরে কুরে খাচ্ছে। এসবেরই ফলাফল তীব্র মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত, আত্মহত্যা এবং স্বহস্তে নিজ অঙ্গ ছেদনও বিচিত্র নয়। বস্তুতঃ এহেন বিকৃতিমাত্রই ভয়ঙ্কর মানসলৈঙ্গিক অসুস্থতা রূপে বিবেচিত এবং বিপরীতকামীরা মাঝে মধ্যে বাতুলতা রোগে আক্রান্ত (বিশেষ করে সিজোফ্রেনিয়া)।

১৯৫৩-এ প্রচণ্ড আলোড়ন, সংবাদজগতে শিরোনাম ক্রিশ্চিন জরগেনসন। প্রায় ২৫ বছর পুরুষরূপে অতিবাহিত করার পর নারীরূপে পরিচিত হওয়ার তীব্র বাসনায় কাতর হয়ে পড়েন, তারপর কনভার্সান অপারেশন করান ডেনমার্কে। এক্ষেত্রে চিকিৎসার অঙ্গরূপে ব্যবহৃত হয়েছিল এস্ট্রোজেন হর্মোন (অণ্ডগত ক্ষয়িষ্ণুতা), ইলেকট্রোলিসিস (মুখরোম চিরতরে বিলুপ্তিসাধন), পুরুষাঙ্গকর্তন ও অণ্ডদ্বয় ছেদন, এবং প্লাষ্টিক সার্জারির আশ্রয়ে অণ্ডকোষ ভগোষ্ঠবৎ অঙ্গে রূপান্তরিত এবং পেরিনিয়মে ছিদ্র তথা কৃত্রিম যোনি নির্মাণ।

তবে কি এটাই ধরে নেব লিঙ্গ পরিবর্তন বাস্তবেরই ঘটনা? না, যথার্থ লিঙ্গ পরিবর্তন কখনই সম্ভব নয়। আমরা কাগজে যেটা পড়ি, মুখরোচক গল্প

হিসেবে লোকমুখে যেটা শুনি, সেটা চেঞ্জ অব সেক্স নয়, ডিস্কভারি অব সেক্স। চেঞ্জ অব সেকেণ্ডারি সেক্স প্রাণিজগতে মাঝে মধ্যে চোখে পড়লেও, মানবসমাজে অসম্ভব। কারণ, মানবসেক্স নির্ধারিত হয় জন্মলগ্নে, জেনেটিক সূত্রের হাত ধরে এবং এই ক্রোমোজোমীয় লিঙ্গ অপরিবর্তনীয়। অপারেশনে লিঙ্গ পরিবর্তন হয় না, হয় শুধু গৌণ যৌন চিহ্নাবলীর বর্জন আর পরিবর্তন। সোজা কথা, আমার আপনার মত একজন শারীরস্থানীয় বিচারে স্বাভাবিক সুস্থমনা পুরুষের লিঙ্গ-পরিবর্তন কোনমতেই সম্ভব নয়।

সম্ভব শুধু পূর্ণ-ক্লীব কিংবা অর্ধ-ক্লীবদের ক্ষেত্রে, তবে কিনা পরিবর্তন অপেক্ষা আবিষ্কারের ঘটনাই গুরুত্বপূর্ণ। যৌবনকালে হঠাৎ বিপরীতলৈঙ্গিক পরিবর্তন-রাজি দেখা দিল, সংবাদপত্রে তখন হৈ চৈ। আসলে কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়, যে লিঙ্গ এতদিন অজ্ঞাত ছিল সেটাই কিনা আজ প্রকাশিত, এক্ষেত্রে প্রয়োজন মত বর্জন আর পরিবর্তনের আশ্রয়ে ক্লীব বা অর্ধক্লীবকে প্রার্থিত লিঙ্গ ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। ক্বচিৎ কখন, এজাতীয় অপপ্রয়াস দেখি শারীর-স্থানীয় বিচারে স্বাভাবিক পুরুষেও, এরা অবশ্যই অসুস্থমনা এবং এমনটি সম্ভব কনভার্সান অপারেশনেই। সেই একই বর্জন (পুরুষাঙ্গ আর অণ্ড) আর পরিবর্তন (পেরিনিয়মে কৃত্রিম যোনি রচনা) এখানেও। অর্থাৎ কিনা এটা লিঙ্গ পরিবর্তন নয়, বরং কতিপয় সেকেণ্ডারি সেক্সচিহ্নের বিলোপসাধন। তারপর যুক্ত হয় এস্ট্রোজেন হর্মোন এবং প্রায়শঃ মনশ্চিকিৎসা যাতে নতুন অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।

প্রথমাবস্থায় বিপরীতকামীদের অভিযোগ—একটা অদ্ভুত পরিবর্তনের তরঙ্গ ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে এবং লিঙ্গটা যেন ক্রমশঃ বদলে যাচ্ছে। কিংবা অনুভব করছে বিধিদত্ত এই যৌনতা ভুল, দৈহিক প্রকাশ অস্বভাবী। ভুল সেক্স তার দেহে, এই একটি অনুভূতি খেলে যাচ্ছে সারাদিনমান, তাই না ডাক্তারকে কাতর অনুরোধ জানায় চিকিৎসার আশ্রয়ে এই স্বতঃস্ফূর্ত পরিবর্তন ত্বরান্বিত করতে। আর যদি মনে করে কিছুই স্বাভাবিকভাবে ঘটবে না, একটা অপারেশন করা হোক।

লিঙ্গপরিবর্তন অভিলাষী ব্যক্তিরা শুধু যে ডাক্তার থেকে ডাক্তারের কাছে ধরনা দেয় তা নয়, এদের মানসিক অবস্থা সর্বাধিক শোচনীয়, যেমন করুণ তেমনি রঙীন।

মনে হতে পারে বিপরীতকামিতার রহস্য বুঝি জেনেটিক ক্লীবদের মধ্যেই ছড়িয়ে আছে। এটা ঠিক নয়, কেননা, এর আসল ভিত্তিপ্রস্তর জন্মলগ্নে নয়

আরও পরে স্থাপিত, শৈশবের প্রথমাবস্থায়। প্রথম দুতিন বছরে, শিশুর সঙ্গে পিতামাতার সম্পর্কই নির্দেশ দেবে। তারপর দুই শিবিরে বিভক্ত। একদলের ধারণায়, এটা মনোবিশ্লেষণমূলক, সমকামিতা যার নিউক্লিয়স। ডাঃ ক্লিফোর্ড এ্যালেন বলেছেন, সমকাম, বসনকাম ও বিপরীতকাম এসবই গভীরভাবে সম্পর্কিত। একপ্রকার ভয়ঙ্কর মানসলৈঙ্গিক অসুস্থতা যার মূলে আছে সমকাম আর বসনকাম। প্রসঙ্গতঃ বলে রাখা ভাল, বিপরীতকামীমাত্রই বসনকামী নয় এবং সমকামীও না।

আরেকদল 'যৌন বিপর্যয়' মতবাদে বিশ্বাসী (১৬৭ পৃষ্ঠা এবং ২০৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। বিপর্যস্তলিঙ্গদের কেউ কেউ লিঙ্গপরিবর্তনে অভিলাষী। এরাই বিপরীতকামী। অর্থাৎ কিনা যৌন বিপর্যয়ের একটি চরম দৃষ্টান্ত বিপরীতকাম। এবং লিঙ্গভূমিকা সম্পর্কিত অসঙ্গতির মোকাবিলায় চরম ব্যর্থতাই প্রকটিত।

বালকামিতা

শুধুই বালকবালিকার প্রতি কামজ প্রীতির নাম বালকামিতা। ইংরেজীতে বলা হয় পিডোফিলিয়া কিংবা ইনক্যাপেন্টাসেক্সুয়্যালিটি। সুখের কথা এটা অল্পদৃষ্ট। এবং অল্পবয়স্কর প্রতি বাধ্যতাজনিত আকর্ষণ যাদের অনুভবে তারা সংখ্যায় খুবই কম। এদের বাসনা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পূরিত হয় কল্পনায়। কতিপয় ব্যক্তির ক্ষেত্রে অবশ্য রূপায়িত হতে চায় রক্তমাংসর অনুভবে। তথাপি বলাৎকার কিংবা যৌন ঘনিষ্ঠতাহেতু দেহের ক্ষতিসাধন অতিশয় দুর্লভ। সাধারণতঃ মৌখিক প্রস্তাব, আলিঙ্গনচুম্বনাদি কিংবা নিজ অঙ্গ প্রদর্শন করানোতেই কামনার নিবৃত্তি। কখন বালিকার অঙ্গ নিয়ে খেলা করার প্রবল আবেগ, কখনবা বালিকাকে দিয়ে নিজ অঙ্গে হস্তক্ষেপ করানো। ডাঃ হির্শফেল্ড বর্ণিত একটি ঘটনা : এক হাতে স্কুলকন্যা ধৃত, অন্য হাত পাণিমেহনে নিয়োজিত, বালিকার অজ্ঞাতসারেই। যথার্থ সহবাস বলতে যা বোঝায় সেটা ইদানীং বিরল এবং বালক-বালিকায় ধর্ষণও বহুদৃষ্ট নয়।

অধিকাংশ বিকৃতির মতই এটাও পুরুষপ্রধান। অর্থাৎ কিনা শুধু পুরুষ নয়, নারীতেও খুঁজে পাব। বালকামিতা যে সব সময়ই ইতররতিক হবে তা নয়, সমরতিকও হতে পারে। যেমন, সমকামী পুরুষ অপ্রাপ্তবয়স্ক কোন ব্যক্তিকে কামপাত্র হিসেবে নিয়োজিত করতে পারে। কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, বালকের সুন্দর মুখখানি সমকামী-হৃদয়ে নারীকে মনে করিয়ে দেয়। কিংবা শৈশবে নিজে যা ছিল বা হতে চেয়েছিল সেই বালককেই ভালবাসে, প্রশংসা করে।

বালকামিতার বিষয়বস্তু সকলক্ষেত্রেই বালকবালিকায় মুগ্ধচিত্ততার বিবরণ নয়, কখন সখন রতিজ শর্তরূপে দেখা দিতে পারে। অর্থাৎ কিনা পুরুষের অঙ্গোত্থান এবং নারীর পুলকলাভ সম্ভব শুধু কিশোরী কিংবা অল্পবয়স্ক যুবাতেই। যথার্থতঃ কোন কোন নারী বয়সেতে অনেক ছোট এমন পুরুষের রতি-অভিলাষিনী কিংবা পাণিপ্রার্থিনী এবং বড় একটা বালকবালিকার সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে চায় না।

যতই অদ্ভুত মনে হোক না কেন, সুস্থ স্বাভাবিক পুরুষকেও বালকবালিকা সংসর্গে লিপ্ত হতে দেখা গেছে। কামাঙ্কুশবিদ্ধতা, বার্ধক্য, সুরা, প্রধানতঃ এতিনটি কারণেই। আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি অভাবের তাড়নায় একটি বিকল্প ব্যবস্থা রূপে। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়তৃপ্তির সকল দ্বারই রুদ্ধ, তখন সহজলভ্য এই পথের আকর্ষণই দুর্নিবার হয়ে ওঠে কোন কোন ব্যক্তির কাছে। সারাজীবন সংযত থেকেও হঠাৎ বৃদ্ধবয়সে এরূপ আচরণ বিচিত্র নয়, কারণটি খুব সম্ভবতঃ মস্তিষ্কস্থিত শিরাউপশিরার সঙ্কোচন যার ফলে মস্তিষ্কে রক্তের যোগান সীমিত কিংবা কোন ব্যাধির প্রকোপে মস্তিষ্ক ক্ষতিগ্রস্ত, উভয়বিধ ক্ষেত্রেই আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা লোপ পায় বলেই এই বিপর্যয়। আর বিচারবুদ্ধি আচ্ছন্ন হতে পারে সুরাপ্রভাবে, তখন এসবই স্বাভাবিক। মোটামুটিভাবে সুস্থ পুরুষের ক্ষেত্রে এইমাত্র উল্লেখ করা প্রসঙ্গ তিনটি বাদ দিলে অন্যান্য ক্ষেত্রগুলি বাধ্যবাধকতা এবং একান্তনির্ভরতা বিজড়িত, অতএব বিকৃত, অসুস্থ, অস্বাভাবিক।

প্রথম দৃষ্টিতে মনে হতে পারে, অতিশয় কামভারে পীড়িত বলেই এমনটি করে বসে। না, ব্যাপারটা তা নয়। বয়স্থ নরনারীর সঙ্গে সম্পর্কস্থাপনে এরা অপারগ, কণামাত্র তৃপ্তির সন্ধান পায় না এবং নিম্নোক্ত কারণেই এমনটি ঘটে। এক, স্বতঃসিদ্ধ প্রাধান্য। নিজ পুরুষত্বে অনিশ্চিত, কাজে কাজেই আশ্বস্ত হতে চায় এব্যাপারে। অন্যথায় পুরুষত্ব ফিরে পাবে না, রতিসক্ষম হবে না। এরা তাই এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করতে চায় যেখানে সে নিজেই সর্বশক্তিমান, সঙ্গীর উপরে পুরোপুরি প্রভুত্ব তারই। অল্পবয়স্ক কামপাত্রে এসবই লভ্য এবং বিনা প্রযত্নে। কারণ, বালকবালিকারা ছোট দুর্বল, সহজেই আত্মসমর্পণ করে এবং কামীজনের শ্রেষ্ঠত্বেও কোন সন্দেহ বা প্রশ্ন তোলে না।

দুই, বয়স্থা নারীভীতি। মাতৃপ্রভাব থেকে মুক্ত নয় এমন পুরুষের কাছে পরিণত নারী মাত্রই বিপজ্জনক, ভয়ঙ্করী, উপস্থচ্ছেদ সম্ভাবনাপূর্ণ। এভয় দূর করার সহজ উপায় কামপাত্রীর বয়সটা বদলে নেওয়া।

তিন, প্রীতিলাভের সহজ উপায়। বালিকারা সহজেই মুগ্ধ হয়, দাবিদাওয়া সামান্য, অল্পেই তুষ্ট। ছোটখাট উপহার বা সামান্য অর্থের বিনিময়ে রাজী। সহজেই অনুরাগপ্রীতি ঢেলে দেয় এবং সেই সম্মান বা শ্রেষ্ঠত্বের আসন দেবে যা সে পায়নি বা অর্জন করতে পারেনি বয়স্থা নারীর কাছে।

চার, শৈশব অভিজ্ঞতা—পুনরাবৃত্তি কিংবা প্রত্যাবৃত্তি। শৈশবে সমবয়স্কদের সঙ্গে কামকলার অভিজ্ঞতা অনেকেরই আছে। এঅভিজ্ঞতায় ফিরে যাবে (প্রত্যাবৃত্ত) সেই জন, যে কখনও যৌনতার পরিণত প্রকাশের মুখ দেখেনি।

কিংবা মৃত্যু, বিরহ, অসুস্থতাহেতু বয়স্ক সম্পর্কে ছেদ পড়লে বালিকার প্রতি আকর্ষণ অসম্ভব নয়। ডাঃ ম্যাগনাস হির্শফেল্ডের ধারণায় বালকামিতা হচ্ছে একপ্রকার মানসলৈঙ্গিক শৈশবাবস্থা। অর্থাৎ শিশুরা যখন সমবয়স্কদের সঙ্গে ক্রীড়াচ্ছলে কামচর্চা করত, শৈশবকামিতার সেই দশাই অপরিবর্তিত রয়ে গেছে। ডাঃ ক্লিফোর্ড এ্যালেনের মতে, এরা এমন এক পরিবেশে মানুষ, ইডিপাস কমপ্লেক্স-এর সুষ্ঠু সমাধান হয়নি এবং এরই ফলাফল পরিণত কামপাত্র স্বাভাবিক কামাবেগের পরিপন্থী।

প্রায় সকলেই একরকম ধরে নিয়েছে, কামার্থে নিয়োজিত বালকবালিকা ক্ষতিগ্রস্ত হতে বাধ্য। এমন কি এও বলতে শুনেছি, সকল কামবিকৃতির মূল কথাটি শিশুকে কামকলায় প্রলুব্ধ করাতেই। এসবই অতিশয়োক্তি। কেননা এরূপ সংসর্গমাত্রই ক্ষতিকর নয়।

বয়স্কজনের কামজ ঘনিষ্ঠতায় স্নেহঅনুরাগের চিহ্ন খুঁজে পায় না, অত্যাচারীর আক্রমণই দেখে। আতঙ্কিত, ভীতচকিত হয়ে ওঠে। একটা মানস-দৈহিক আলোড়ন ঘটে, ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আবেগজ ক্ষতিসাধনের সম্ভাবনা যথেষ্ট।

পরবর্তীকালে সবাই নিউরোসিস-এর শিকার হবে, এটাও ভ্রান্ত। কারণ, অধিকাংশ বালকবালিকাই সুন্দরভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, কোন অসুবিধার মুখোমুখি হয় না। মেরী বোনাপার্ট, ক্লিফোর্ড এ্যালেন থেকে শুরু করে প্রায় প্রতিটি মনোবিদ্‌গণের ধারণা তো এই।

অবশ্য এটাও সত্য যে পুনঃপুনঃ কামপ্রচেষ্টা শিশুকে বিরূপ শর্তাবদ্ধ করতে পারে। যেমন, শিশুচিত্তে রতিজ বাসনার অকালবোধন, পরিণত বয়সে শৈশব অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি। কচিৎ কখন রতিজড়তা, বিশেষ করে নিকট আত্মীয়স্বজনের অত্যাচারে।

এক কথায় বলা যেতে পারে, ক্ষয়ক্ষতির দিক থেকে বালকামিতার দৈহিক অনিষ্ট কদাচিৎ ভয়ঙ্কর। কিন্তু মানসবিচারে, ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এব্যাপারে তাই সমাজের রক্ষণশীল বক্তব্য পুরোপুরি সঙ্গত এবং সমাজব্যবস্থা আরও কঠোরভাবে ঢেলে সাজাতে হবে, শুধু বালিকার জন্যে নয়, বালকের ক্ষেত্রেও।

প্রৌঢ়কামিতা

বয়সেতে অনেক বড় এমন ব্যক্তিকে কামপাত্র হিসেবে ব্যবহার করারই গালভরা নাম প্রৌঢ়কামিতা। ইংরেজীতে একেই বলা হয় জেরোন্টোফিলিয়া

কিংবা জেরোণ্টোসেক্সুয়্যালিটি। এটা প্রধানত: ইতররতিক, কখনবা সমরতিক।

এঘটনা অতিশয় বিরল নয়, মাঝে মধ্যে চোখে পড়বে। বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা-র সঙ্গে আমরা সবাই অল্পবিস্তর পরিচিত, শুধু বাস্তবজগতে নয়, সাহিত্যেও। টাকাপয়সার দাপটে কোন বৃদ্ধ না হয় তরুণীর সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধতে পারে। আর অনুরাগভরে কোন তরুণী যখন বৃদ্ধকেই বরণ করে নেবে কিংবা অল্পবয়স্কার পছন্দ প্রৌঢ় সঙ্গী, তখন? তখন সাক্ষাৎকার ঘটবে এহেন প্রৌঢ়কামিতার সঙ্গেই।

বৃদ্ধরা তরুণীর অনুরক্ত হতে পারে, জানি। এও জানি, যুবকযুবতীদের অনুরাগ তো বৃদ্ধ-বৃদ্ধাতে নয়, আর এটাই যদি কখন সত্য হয়ে ওঠে, অবশ্যই প্রৌঢ়কামিতার দৃষ্টান্তস্থল রূপে গণ্য হবে। এক্ষেত্রে অতিবয়স্কতাই একমাত্র কামশর্ত, যার ফলে বৃদ্ধ রমণীতেই পুরুষ পোটেন্ট এবং অধিকবয়স্ক পুরুষ বিনা যুবতীর রতিতৃপ্তি অসম্ভব।

আমার কেস ডায়রীতে লিপিবদ্ধ এক যুবকের ইতিকথা: সফল রতি-আস্বাদন শুধুমাত্র অধিকবয়স্কা রমণীতেই এবং কমবয়সী যুবতীতে ঘোর অনীহা। ডা: ম্যাগনাস হির্শফেল্ড দেখেছিলেন: ২২ বছরের এক ইঞ্জিনিয়রের বহু পুত্রকন্যাসমেত ৬৩ বছরের এক বিধবার পাণিগ্রহণ; ১৯ বছরের এক কর্মীর সঙ্গে ৬৫ বছরের এক নারীর ভালবেসে বিবাহ; আরেকজনের যত কিছু রতিজ কল্পনা সব তার মাতামহীকে কেন্দ্র করেই। বৃদ্ধা রমণীকে যুবার আক্রমণ এবং কোন যুবকের অতিবয়স্কা রমণীর কুক্ষিগত হওয়ার ঘটনা হয়ত আপনাদের কেউ কেউ শুনেছেন। এসবই অতিবয়স্ক পাত্রপাত্রীর প্রতি আকর্ষণ, অতএব প্রৌঢ়কামিতারই নিদর্শন।

অন্যান্য বিকৃতির মত এরও উৎস সেই শৈশবে। পিতা কিংবা মাতা কিংবা কোন বয়স্কজনে শিশুর তীব্র সংবন্ধনই এর হেতু। এটাই যৌবনে প্রতিবিম্বিত হয় অধিকবয়স্কজনের প্রতি দুর্বার আকর্ষণে।

ঘর্ষণকাম

ফরাসী ভাষায় 'ফ্রটার' একটি ক্রিয়াপদ, যার অর্থ ঘর্ষণ। এবং এথেকে সৃষ্ট হয়েছে 'ফ্রটিউরিজম'। সুতরাং ফ্রটিউরিজম বলতে অন্য কাউকে ঘর্ষণপূর্বক তৃপ্তিলাভই বোঝায়। এতো গেল ব্যুৎপত্তিগত বিচার। কামগত বিচারে এটা হচ্ছে এটা এক বিশেষ কামবিকৃতি, বাংলায় যার নাম রেখেছি ঘর্ষণকাম।

ভিন্নদেহে পুরুষাঙ্গ ঘর্ষণের বাধ্যতাজনিত আবেগই এর বৈশিষ্ট্য। ইনডিসেন্ট এ্যাসল্ট আরেক নাম।

ঘর্ষণকামীরা জন-অরণ্যে মিশে যায়, যেখানে বহুজনের ঠেলাঠেলি যেমন যাত্রাদিস্থানে, দেবালয়াদিতে, কোন পর্বোপলক্ষে বা বক্তৃতাসভায়। কিংবা ভিড়ের মধ্যে লুকিয়ে থেকে, ট্রেনে-ট্রামে-বাসে, কখনবা লিফ্‌টে, সাবওয়েতে এরা মেয়েদেরকে স্পর্শ করতে চায়। এদের লক্ষ্যস্থল প্রধানতঃ নারী নিতম্ব কিংবা স্ত্রীদেহের কোন অংশ যার বস্তুরতিক আকর্ষণ অসীম।

সাধারণতঃ আর পাঁচটা কামবিকৃতির সঙ্গে যুক্ত। এককভাবেও বিদ্যমান, তখন কিন্তু ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়—সমাজতঃ, যদি না তীব্র বাধ্যতাজনিত আবেগ বিজড়িত। এবং বিবাহতঃ, যদি না অস্খলনহেতু বন্ধ্যাত্ব ঘনিয়ে আসে। আমি এরূপ একজন বিবাহিত ঘর্ষণকামীর সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম। ইনি আমার কাছে এসেছিলেন বিকৃতির গ্লানিদগ্ধ হয়ে নয়, সন্তানহীনতার বেদনায়। শেষ পর্যন্ত এসমস্যার সমাধান ঘটেছিল কৃত্রিম পরবীর্যযোগ (আর্টিফিসিয়াল ইনসেমিনেসন) পন্থার আশ্রয়ে।

শারীরবৃত্তীয় তথ্যরাজি একথাই বলে, নিবিড় সান্নিধ্যে এরূপ একটা আবেগ (ঘর্ষণ) আসতে পারে এবং এটাই আর এক ধাপ তির্যক ভঙ্গীতে এগিয়ে যেতে পারে যাকে বলি ঘর্ষণকাম। তরুণতরুণীদের পরস্পর গাত্রঘর্ষণে (হেভি নেকিং পেটিং) পুরুষের স্খলন অনুরূপ ঘটনা। স্পর্শন, মর্দন, প্রহণন, বিমর্দন, লঘু আঘাত এসই স্পার্শন উদ্দীপনার রকমফের, আর কে না জানে রতিব্যাপারে স্পর্শ-এর মত জাদু আর কারও নেই। ফ্রয়েড তাই একে সহচর প্রবৃত্তি বা অনুষঙ্গ আবেগের মর্যাদা দিয়েছেন। সম্ভবতঃ জৈবিক সার্থকতাও আছে, যেমন, অন্য কেউ তার দেহে লঘু স্পর্শ বা আঘাত করুক এবাসনা প্রাণীদেরও, বিড়ালের ঘর্ষণ প্রবৃত্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এই প্রবৃত্তি যথার্থই বিকৃত হবে যদি কামানুষ্ঠানহীন যজ্ঞ সমান হয়।

শৈশবের সেই বাসনা—আদর করবে, জড়িয়ে ধরবে, স্নেহভরে স্পর্শ করবে, হস্তদ্বারা লঘু আঘাত করবে, এক কথায় ঘর্ষিত হওয়ার বাসনা পরিণত বয়সেও উঁকি দিতে পারে। এবং দিয়েও থাকে অনেকেরই কামজীবনে। কিন্তু সব সময়ই এই অনুষঙ্গ আবেগ মিলন নামক মহা-আবেগের প্রতি ধাবমান। আর ধাবিত না হয়ে যদি প্রাধান্য বিস্তার করে, সেই রতিবর্জিত নাটকেরই নাম ঘর্ষণকাম।

শবকাম

এযাবৎ আলোচিত তথ্য থেকে এটা স্পষ্ট যে কামানুষ্ঠানের নায়ক নায়িকারা

জীবন্ত ব্যক্তিই, কতিপয় ক্ষেত্রে পাশার দানটা উল্টে যেতে পারে, যেমন জড় অচেতন বস্তু কিংবা মৃত ব্যক্তি। প্রথমটি বস্তুকাম, ২২৪ পৃষ্ঠায় আলোচিত। দ্বিতীয়টি শবকাম। শবকাম হচ্ছে মৃতজনে কামজ আকর্ষণ। ইংরেজীতে একেই বলা হয় নেক্রোফিলিয়া। কামপাত্র হিসেবে মৃত ব্যক্তির ব্যবহার খুবই দুর্লভ এবং কখনও সুস্থ ব্যক্তিতে দেখা যায়নি।

এই কামবিকৃতি সাতিশয় প্রাচীন। মানবজাতির মতই প্রাচীন। অতি প্রাচীন মিশরেও এমন ঘটনার উল্লেখ করেছেন হেরোডোটাস।

শবকামিতার প্রকাশ সবসময়ই চরম নয়, অর্থাৎ মৃতা কলেবরে কামানুষ্ঠান রূপে চিহ্নিত নয় প্রতিটি ক্ষেত্রেই। কখন পুরুষত্ব তথা রতিক্ষমতার শর্ত রূপে প্রকাশিত। কখন মানসকল্পনায় মুখরিত, কখনবা বাস্তবে সংঘটিত।

শর্তাধীন পুরুষত্বের একটি বিচিত্র স্রোত শবকামিতার খাদে প্রবাহিত অর্থাৎ মৃত্যু সম্পর্কিত। শবানুগমনে কেউ তীব্র উত্তেজনাবোধ করে। কেউবা শবানুগমনের পর পোটেন্ট। কিংবা স্ত্রীর মৃত্যুর পর অথবা পিতামাতার কেউ গত হলে। কখন পুরুষের তৃপ্তি স্ত্রীর শববৎ নিশ্চলতায়: মৃতবৎ চুপটি করে শুয়ে থাকবে, কথাটি কবে না। কিংবা পালঙ্কে শ্বেতবস্ত্রে আচ্ছাদিতা, মুদিতাক্ষী, নিশ্চলা, যেন অন্তিম শয়নে শায়িতা। একটু ব্যতিক্রম হলেই পুরুষটি অক্ষমতায় ভেঙ্গে পড়বে। বিবর্ণ চেহারা, শবাধারে শায়িতা, শবাচ্ছাদনবস্ত্রে ভূষিতা, এভাবে ফরাসী বারবনিতার মৃতারূপে দেহদান করার কথা বলেছেন ডা: ক্লিফোর্ড এ্যালেন। কেউ পাণিমেহনে আনন্দ পায় শুধু সমাধিক্ষেত্রেই, অন্যজনে শুধু ঘুমন্ত নারীতেই রতিসক্ষম, এরূপ একাধিক ব্যক্তির সন্ধান পেয়েছিলেন ডা: হির্শফেল্ড।

যথার্থ বাস্তবে রূপায়িত হলেই শবদেহ সংগ্রহের প্রবল বাসনায় (আবেশজ এবং বাধ্যতামূলক) পীড়িত হবে, তখন হয় চুরি করবে, না হয় হত্যা। চুরি করে মর্গ, সাময়িক শবাগার, এ্যানাটমি শিক্ষায়তন থেকে। কিংবা কবরখানা থেকে মাটি খুঁড়ে বার করে সদ্য সমাধিস্থ মৃতদেহ। এমন কি নারীকে হত্যা করতেও অকুন্ঠিত। এটা কিন্তু হত্যাকাম নয়, কারণ শুধুমাত্র হত্যাকর্মে এদের আনন্দ নেই। শবদেহে কামোপভোগেই আনন্দ, এটা অতএব শবসংগ্রহের উপায়বিশেষ।

কচিৎ কখন পরিবেশ বা সুযোগসুবিধাও এব্যাপারে সহায়তাহস্ত প্রসারিত করে দিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করতে পারি, সাধু সন্ন্যাসী, যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকদের, যারা কামানার কলুষ দিয়ে শবদেহ অপবিত্র করতে পারে। করতে

পারে নারী প্রত্যাখ্যাত রতিবঞ্চিত কুৎসিতদর্শন পুরুষও। প্রসঙ্গতঃ স্মরণ করিয়ে দিতে চাই প্রখ্যাত ভাস্কর-সাহিত্যিক রচিত সেই অমরকাহিনী যার মুখ্য উপজীব্য এই একই।

ক্বচিৎ কদাচিৎ অভাবে স্বভাব নষ্ট হতে পারে, জানি। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শবকামীরা কেউ সুস্থমস্তিষ্ক নয়, বিকৃতকাম তো বটেই। এবং ডাক্তারের কাছে যায় কদাচিৎ। কার্পমান বলেছেন এরা সচরাচর সাইকোটিক, প্রায়শঃ মৃগিরোগগ্রস্ত। কেউ উন্মাদ, কেউবা বাধ্য করে এমন পীড়নকর আবেশিক বায়ুগ্রস্ত।

উৎপত্তি বিশ্লেষণে দেখব, শবকাম হচ্ছে বস্তুকামিতার দুর্লভ প্রকারভেদ কিংবা চরম সাদীয় রতির (ধর্ষকাম) ঘটনা কিংবা উভয়ের সংমিশ্রণ (বস্তুকাম-ধর্ষকাম) কিংবা বাধ্যতাজনিত আবেশজ অনুষ্ঠান। বস্তুরতিক উৎসটি প্রবল সম্ভাবনাময়। বস্তুকামিতার সংজ্ঞায় বলে কামপাত্রের বদলি রূপে দেখা দিয়েছে কোন বস্তু, যা স্বাভাবিক পুরুষের কাছে স্বাভাবিক কামচেষ্টার জন্যে সম্পূর্ণরূপে অনুপযুক্ত। এবং সবাই স্বীকার করবেন মৃতা নারী স্বাভাবিক কামপাত্রী নয়। অন্যদিকে চরম সাদীয় ঘটনার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কারণ, শবদেহের অসহায় অবস্থা—নির্বাক, নিরুত্তর, প্রতিরোধহীন—কোন কোন মানুষকে উত্তেজিত করতে পারে। ধর্ষকামীদের কিন্তু যৌন আগ্রহ লোপ পায় কামপাত্রীর মৃত্যুতে।

মলমূত্রকাম

কোন কোন ব্যক্তির অস্বভাবী আগ্রহ দেহনিঃসৃত ক্লেদে, ঘর্ম, মল, মূত্র ইত্যাদিতে। প্রাণিজগতে মূত্রর সঙ্গে যৌনতার বস্তুরতিক সম্পর্ক সুবিদিত এবং স্বাভাবিক। মানবজগতেও দেখব প্রণয়িনীর মুখের লালা বা খাদ্যগ্রহণে উত্তেজনা জাগতে পারে, আকর্ষণ থাকতে পারে মল কিংবা মূত্রে। যৌন উত্তেজনা জাগে মল কিংবা মূত্রত্যাগ দর্শনে অথবা মলমূত্র গন্ধে, এটা হল মূত্র-কাম (ইউরোল্যাগনিয়া) কিংবা মলকাম (কপ্রোফিলিয়া)। কল্পনায় দেখছে, কখনবা বাস্তবে, প্রণয়িনী তার দেহে মূত্রত্যাগ করছে, এতেই তৃপ্ত। এমন কি স্খলনও হতে পারে, বলেছেন ক্রাফট-এবিং। কখনবা প্রণয়িনীদেহে মূত্রত্যাগ করে উত্তেজনায়।

পায়ুকাম

রতিবিচারে নর ও নারীর পায়ুদেশ অতীব সংবেদনশীল। গোপনাঙ্গ ও পায়ুদেশের নার্ভসংস্থান যে একই, এই হেতু। আমরা জানি, পায়ুদেশের

সঙ্কোচন-প্রসারণে পুরুষাঙ্গ এবং যোনিমুখে কম্পন অনুভূত হবে, রাগমোচনের সময় পায়ুদেশ সঙ্কুচিত প্রসারিত হয়। তা ছাড়া নর ও নারী উভয়েই তৃপ্তি পেতে পারে গুহ্যদ্বার ও তদেকদেশীয় মাংসপেশীর উদ্দীপনায়। কাজে কাজেই অধোরত ব্যাপারটা নরনারীর জীবনে দেখা দিতে পারে।

মনে হতে পারে, পায়ুরত বুঝি সমকামীদেরই একমাত্র আশ্রয়স্থল, না তা নয়, কেননা মাত্র ২০% পুরুষ-সমকামী এর ভক্ত। ইতররতিক পুরুষদের মধ্যেও, এমন কি বিবাহিত স্বামীস্ত্রীদের মধ্যেও, কদাচিৎ দৃষ্ট, শতকরা ১%-এরও কম। কতিপয় পুরুষের কাছে স্বাভাবিক মিলন অপেক্ষা বিমার্গমেহনই লোভনীয়, হেতুটি কখন জন্মনিয়ন্ত্রণ, কখন বৈচিত্র্যসাধন। কখনবা উপস্থচ্ছেদ ভীতির প্রতিকার—এদের কাছে অঙ্গপ্রবেশ ভয়ঙ্কর, যোনিভীতি প্রবল। কিংবা শৈশবাবস্থার মত মলত্যাগরোধক আনন্দর সঙ্গে সেক্সকে জড়িয়ে ফেলে। মাঝে মধ্যে বৈচিত্র্যের খোরাক যোগায় যে পায়ুকাম, সে-পায়ুকাম অস্বভাবী নয়। আর পৌনঃপুনিক, বাধ্যতামূলক, আবেশজ ক্রিয়া হলেই কামবিকৃতি পর্যায়ভুক্ত হবে।

পশুমেহন

দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর মত মানবেতর কোন প্রাণীকে সঙ্গী করতে পারে মানুষ। কামশাস্ত্রে এটাই তির্যকমেহন রূপে খ্যাত। আরও সহজ করে বলা যেতে পারে পশুমেহন (বিষ্টিয়্যালিটি) কিংবা প্রাণীসংসর্গ (এ্যানিম্যাল কন্ট্যাক্ট)।

কামপাত্র হিসেবে পশু ব্যবহারের চলন দেখি ইতিহাসের শুরু থেকেই। প্রাচীন আইনশাস্ত্র ও দণ্ডসংহিতায় প্রায়শঃ উল্লেখিত, প্রাণীসংসর্গ হেতু শাস্তি-বিধান কী কঠোর, কী ভয়ঙ্কর ছিল। ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সাম্প্রতিককালেও, এবং নৃজাতির প্রতিটি শাখা প্রশাখায়, শুধু অসভ্য আদিম জগতে নয়, সভ্য সমাজেও।

মৈথুন কিংবা অন্য কোন উপায়ে কামতৃপ্তির উদ্দেশ্যে পুরুষ যে-পশুকে ডেকে নেয় সে-পশু কৃষিকর্মে নিয়োজিত কোন প্রাণী (যেমন, গরু), কিংবা পশু-পালকদের কোন প্রাণী (যেমন, ছাগল, ভেড়া, শূকর), অথবা সযত্নে পালিত কোন পশু (যেমন কুকুর, বেড়াল, খরগোস)। ক্বচিৎ কখন ঘোড়া, গাধা কিংবা অন্য কোন প্রাণী।

নারীদের মধ্যেও প্রাণীসংসর্গের (যেমন কোন প্রাণী, প্রধানতঃ কুকুর, বেড়াল কর্তৃক মুখমেহন) নজির আছে, তবে কিনা দুর্লভ। ব্যতিক্রম শুধু বেশ্যাগৃহে, যেখানে খদ্দেরের মনস্তুষ্টির জন্যে সম্মত নারীর দেখা মিলবে।

শুধু যথার্থ সংসর্গ নয়, মনশ্চক্ষু দিয়েও পশুমেহনের অভিজ্ঞতা সম্ভব, অর্থাৎ মনে মনেও পশুমেহনের ছবি আঁকা চলে। মৈথুনরত পশুদর্শনে অনেকেই উত্তেজিত। নারীকে কোন প্রাণী ধর্ষণ করছে এরূপ প্রতীক কল্পনা অতিপরিচিত। মানবকল্পনায় প্রাণী হচ্ছে সভ্যতার শতেক নিগড় দিয়ে শৃঙ্খলিত নয় এমন মুক্ত যৌনতার প্রতীক। তা ছাড়া ধর্ষকামগন্ধী যৌনতায় নানাবিধ প্রাণীর ব্যবহার সম্ভব।

পশুমেহন ব্যাপারটা সমগ্র জনসমাজে সাতিশয় অল্পদৃষ্ট। শহরে দুর্লভ। অধিকাংশ ঘটনাই গ্রামে গঞ্জে। প্রধানতঃ চাষী ও পশুপালকদের মধ্যেই সীমিত। এবং নারী অপেক্ষা পুরুষদের মধ্যেই অধিক: শতকরা ৮ জন পুরুষের, বিশেষ করে বয়ঃসন্ধিকালে এবং প্রায় ৩% নারীর অভিজ্ঞতা অনুরূপ (কিনসী)।

প্রধানতঃ পরিবেশ এবং সুযোগসুবিধাই মানুষকে পশুমৈথুনকামী করে তোলে। পশুদের সঙ্গে অতিপরিচিতি এব্যাপারে ঘৃণা ভয় দূর করে দেয়। আর সেই সঙ্গে কামনিবৃত্তির অন্য পথগুলি রুদ্ধ, সোনায় সোহাগা। কাজে কাজেই পশুমৈথুন অভিলাষী পুরুষরা প্রায়ই পশুপালক ও কৃষিজীবী, নারী কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত, কিংবা নারীর কাছে আদরণীয় নয় কিংবা মেয়েদের মন গলাতে পারে না। এরা প্রায়শঃ অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন কিংবা মানসক্রটিযুক্ত পুরুষ যেমন জড়ধী, বোকা। কখনবা কুৎসিতদর্শন কিংবা বিকলাঙ্গ পুরুষ। হ্যাভলক এলিস যথার্থই বলেছেন: 'আদিবাসী ও চাষীদের মধ্যেই বহুদৃষ্ট। গ্রামীণ জীবনের ফলাফল। গেঁয়ো চাষীর কদভ্যাস বিশেষ।' কেউ আবার হাত বাড়িয়েছে, মুখ পুড়িয়েছে বলাই ভাল, অন্ধ সংস্কারের বশবর্তী হয়ে, যেমন পশুমেহনে রতিবাহিত ব্যাধির নিরাময় সম্ভব। কেউবা নেশার ঘোরে, কেননা সুরাপ্রমত্ত মানুষের পক্ষে সবই সম্ভব।

যে যাই বলুক, উৎস যাই হোক, এহেন উপায়ে তৃপ্তিলাভের ঘটনা প্রায়শঃ নান্যেব গতিরন্যথা গোছের। অর্থাৎ এটা হচ্ছে বিকল্প চরম উপায়, যার শরণ নিয়েছে একরকম মরিয়া হয়েই এবং তৃপ্তিলাভও চলে যাওয়া গোছের, মানবযৌনতায় পশুমেহন তাই ক্ষণস্থায়ী এক অধ্যায়, ক্ষণপ্রভার মত দেখা দিয়েই মিলিয়ে যায়। সবচেয়ে বড় কথা হল তির্যকমেহন স্বাভাবিক। কারণ, মানসজৈবিক বিচারে স্তন্যপায়ীসুলভ আচরণেরই একটি ছবি। তা ছাড়া প্রাণিজগতে এক প্রজাতিভুক্ত প্রাণীর সঙ্গে অন্য প্রজাতিভুক্ত প্রাণীর মিলন বহুদৃষ্ট ঘটনা।

কামবিকৃতি হচ্ছে একপ্রকার জঘন্য পাপাচার বিশেষ, তাই কি দুর্জনের সংশোধন শুধু কারাগারেই সম্ভব? নাকি মানব-আবেগের একটি প্রয়োজনীয় প্রকারভেদ রূপে মেনে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ, একদা গ্রীক সভ্যতা যেমন সমকামিতাকে মঙ্গলকর উপাদান রূপে গ্রহণ করেছিল, ঠিক তেমনি। কিংবা এটা হচ্ছে মারাত্মক ব্যাধি, ভয়ঙ্কর অসুস্থতা, সুতরাং চিকিৎসার জন্যে পাগলাগারদে পাঠানই ভাল। না, কোনটাই পুরোপুরি সত্য বা হিতকর নয়।

দুর্জন, পাপী, বিকৃত রূপে চিহ্নিত করা এবং শাস্তি দেওয়া, এসবেরই অর্থ চিকিৎসার দরজা বন্ধ করে দেওয়া। মানবসমাজে বহিষ্কৃত, ব্রাত্য, স্খলিত এবং একটি ঘৃণ্য স্বতন্ত্র জাতি, কাজে কাজেই চরম শাস্তি পাওয়ার যোগ্য, এটা ভুল। কারণ, অদ্যাপি কোন সমকামী কিংবা অন্য বিকৃতিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে কারারুদ্ধ করে, চরম শাস্তি দিয়ে ভাল করা যায়নি। তা ছাড়া, কদাচ স্বেচ্ছাকৃত নয় যে কর্ম তাকে অপরাধই বা কী করে বলি? অর্থাৎ কিনা শাস্তি না দিয়ে চিকিৎসা করতে হবে।

সমাজকে অবশ্য রক্ষা করতেই হবে। তাই বলে সাধারণ জেলখানায় বিকৃতিযুক্ত ব্যক্তিকে ধরে রাখা উচিত নয়। একেই পাপবোধ ও হীনতাবোধের ভারবহনে ক্লিষ্ট, তায় কারাগারে বা পাগলাগারদে বন্দী জীবন, ফলে বিকৃত অনুষ্ঠান হ্রাস পাওয়া দূরে থাকে, আরও বৃদ্ধি পাবে। কারণ পাপবোধ ও হীনতাবোধের আরও ভার বইতে হবে, যার ফলে বিকৃতি আরও দৃঢ়মূল হবে, আরও পুনরাবৃত্ত হবে এবং কৃত্রিম অপরাধী সৃষ্টি করা হবে। অতএব শাস্তিদান, জেলখানা এসবই বৃথা।

বারবার সেক্স অফেন্স এমন একটি সমস্যা যার সন্তোষজনক সমাধান নেই। যৌন অপরাধে দণ্ডিত ব্যক্তিদের মধ্যে নিষিদ্ধ অথচ দণ্ডার্হ কর্মে পুনরায় লিপ্ত হয় মাত্র ৩%। যৌন অপরাধে অপরাধী এমন বিকৃতকামিতার মধ্যে বহুদৃষ্ট হচ্ছে প্রদর্শনকাম। এর পরেই বালকামিতা। এহেন অপরাধীকে প্রায়শঃ নিবৃত্ত করা যায় না মনঃসমীক্ষা বা এজাতীয় অন্য চিকিৎসায়। বিকল্প উপায় হিসেবে চেষ্টা করা হয় যৌনতার দমন, কখন অণ্ডচ্ছেদনে, কখন হর্মোন প্রয়োগে।

কামবিকৃতির চিকিৎসায় ক্যাস্ট্রেশন অর্থাৎ অণ্ডচ্ছেদনও করা হয়েছে, বিশেষ করে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়াতে আর জার্মানীতে। মনের ভাবখানা এই যে, অণ্ডচ্ছেদনের ফলে কামাবেগ হ্রাস পাবে তখন আবেগতাড়িত কামবিকৃতি লোপ পেতে বাধ্য। কিন্তু বাস্তবে দেখব এমনটি ঘটে না। কারণ, সমকামিতা বালকামিতা প্রভৃতি বিকৃত পন্থা শুধু যে নিছক কামতৃপ্তির উপায় তা নয়, অন্যান্য অভিলাষও পূরিত হয় যেমন সঙ্গলাভের ব্যাকুলতা, প্রশংসালাভের প্রয়োজনীয়তা, আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠা। যৌনতা হ্রাসে এজাতীয় আবেগজ বাসনা প্রভাবিত হয় না। তা ছাড়া কতটা যৌন শক্তি হ্রাস পায় সেটাও বিবেচ্য, কেননা অণ্ডদ্বয় বাদ দিলেও বাসনা জাগে, উত্থান হয়, তৃপ্তি পায় অর্থাৎ অপরাধ নিবৃত্ত হয় না। আজ আর তাই নামগন্ধ করে না কেউ অণ্ডচ্ছেদ নামক বর্বর পদ্ধতিটির।

অপারেশন বাদ দিয়ে হর্মোনেও কাজ চলে, এর নাম মেডিক্যাল ক্যাস্-ট্রেশন। অণ্ডদ্বয়ের কার্যক্ষমতা দাবিয়ে রেখে পুরুষের যৌন শক্তি হ্রাস করা যায়, উচ্চমাত্রায় স্ত্রীহর্মোন প্রয়োগে। বসনকাম, সমকাম, প্রদর্শনকাম, নিরীক্ষণ-কাম ইত্যাদি বিকৃতিতে কার্যকরী পরিমাণটি হল প্রতি-দিন ১০-১৫ মিলিগ্রাম ষ্টিলবেষ্ট্রল বড়ি। এতে শুধু যৌন আবেগেই ভাঁটা পড়ে তাই প্রতিটি ক্ষেত্রেই সফলপ্রদ নয়। আর কাজ যদি বা হল, গুরুতর উপসর্গ (ব্যথাময় বক্ষঃস্ফীতি, মেদবহুলতা, বমনভাব ইত্যাদি) হেতু হর্মোন চিকিৎসা বন্ধ করতে হয়। তাই না কিনসী বলেছেন এটা হচ্ছে ম্যাল্‌প্র্যাকটিশ অর্থাৎ হর্মোন চিকিৎসা আর হাতুড়ে চিকিৎসায় খুব বেশী তফাৎ নেই। প্রসঙ্গতঃ বলে রাখা ভাল, মহিলাদের কামাবেগ স্তিমিত করে দিতে পারে এমন কোন ওষুধ নেই, যদিচ নরয়েষ্টরয়েড জাতীয় ঔষধ চেষ্টা করে দেখা উচিত।

অনেকে কেন, প্রায় সবাই চিকিৎসিত হতে চায় না। বিকারপ্রাপ্তদের অনেকেই মনে করে চিকিৎসা বলে কিছু নেই। কিংবা চিকিৎসা কদাচ ফলবতী নয়, কিংবা কিইবা প্রয়োজন চিকিৎসার। বিকৃতিরে লয়ে এরা এতই মগ্ন যে, পরিহারের বাসনা জাগে না কভু, অপিচ জীবনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছে, এরা স্বভাবতঃই ডাক্তারের কাছে যায় না, যদি না বাধ্য হয়। যথার্থতঃ কেউ কেউ বাধ্য হয়েছে চিকিৎসিত হতে। ম্যাজিষ্ট্রেট পাঠিয়েছে, কিংবা দণ্ডিত হয়েছে কিংবা আত্মীয়স্বজন ধরে বেঁধে নিয়ে এসেছে। কখন নিয়ে যায় স্ত্রী, পুরুষত্বহীনতা বা বিচিত্র অভ্যাসে আতঙ্কিত হয়ে।

স্বেচ্ছা-চিকিৎসার জন্যেও কেউ কেউ এগিয়ে আসেন, কল্পনার অত্যাচারে

অতিষ্ঠ হয়ে কিংবা আবেগের তাড়নায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে চিকিৎসকের শরণ নিতে দেখা গেছে। অস্বভাবী বিকৃত বোধে নিজেকে ধিক্কার দেয়, উৎকণ্ঠা, বিষণ্ণতা, অনিশ্চিত ভাবনায় ক্লিষ্ট, মর্মাহত, এমন কি আত্মহত্যার চেষ্টায় ব্যর্থ, তখন।

চিকিৎসারম্ভে রোগীর ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জেনে নেওয়াই নিয়ম—স্মরণযোগ্য শৈশবকাল থেকে বর্তমান বয়স পর্যন্ত প্রতিটি খুঁটিনাটি, বিশেষ করে যৌনতার ইতিহাস। বিষণ্ণতার উত্তাল প্রবাহ, আত্মহত্যার ব্যর্থ প্রচেষ্টা, রতিবাহিত ব্যাধির আতঙ্ক (এই হেতু সমকামিতা বিচিত্র নয়)—এসবই। সেই সঙ্গে উদ্দীপক অবস্থার—পরিবেশগত, বয়সোচিত, ব্যাধিগত উদ্দীপনা এবং সুরাদোষ—যোগাযোগ আছে কিনা খতিয়ে দেখা হয়। খতিয়ে দেখা হয় দৈহিক সুস্থতা ও নার্ভতন্ত্র, বিশেষ করে এণ্ডোক্রিন ও গোপনাঙ্গের সুস্থতা। এক কথায়, চিকিৎসার পূর্বে স্থিরনিশ্চয় হতে হবে অঙ্গীয় কোন ত্রুটি কিংবা উদ্দীপক কোন অবস্থা সম্বন্ধে।

অস্বভাবী ঘটনার সাময়িক ফলাফল হিসেবে বিকৃতির আবির্ভাব বিচিত্র নয়। যৌন তৃপ্তির দ্বার রুদ্ধ, আবেগ তখন নিম্নগামী, স্মৃতির সিঁড়ি ভেঙ্গে ভেঙ্গে নীচে নামে। অর্থাৎ কিনা একদা পরিত্যক্ত পথই বেছে নেবে। যেমন স্ত্রীর গর্ভাবস্থায় স্বামী হয়ত বালকবালিকায় আকৃষ্ট। কিংবা স্ত্রীর মৃত্যুতে হয়ত প্রথম প্রদর্শনকামী। অতএব অবরুদ্ধ ইন্দ্রিয়কে যদি উন্মুক্ত করা যায় বিকৃতি লোপ পাবে।

বার্ধক্যে সুস্থ স্বাভাবিক উপায়ে রতিতৃপ্তির অভাব ঘটে প্রায়শঃই, তদুপরি আছে প্রৌঢ়সন্ধিসুলভ উপসর্গ, রক্তসংবহন ও নার্ভতন্ত্রের ব্যাধি, জরাসুলভ বিষণ্ণতা এবং অন্যান্য মানস বিপর্যয়—এসব প্রতিক্রিয়াহেতু প্রদর্শনকাম, সমকাম ইত্যাদি বিকৃতি প্রথম দেখা দিতে পারে পলিতকেশ বৃদ্ধের জীবনে।

ব্যাধিত হতে পারে এণ্ডোক্রিনতন্ত্র, রক্তসংবহনতন্ত্র ও নার্ভতন্ত্র। সাধারণতঃ প্রাপ্তবিকার ব্যক্তিদের হর্মোন লেভেল স্বাভাবিকই থাকে, সুস্থ থাকে এণ্ডোক্রিন-তন্ত্র। বিশিষ্ট ব্যতিক্রম, এ্যাড্রিনোজেনিট্যাল ভিরিলিজম, এহেন রোগাক্রান্ত সমকামীর আড্রিনাল গ্রন্থি অপারেশন করে বাদ দিলে শতকরা পঞ্চাশ জনই ইতরকামী হয়ে উঠবে।

মস্তিষ্কজাত ব্যাধি বা আঘাত মানুষকে, বিশেষ করে বৃদ্ধ পুরুষকে, বিকৃত-কামিতার মুখে ঠেলে দিতে পারে। এর জন্যে মানুষ দায়ী নয়, কারণ এটা অনিচ্ছাকৃত এবং অনায়ত্ত, ব্যাধি হেতুই এমনটি করেছে। এমনটি ঘটে শিরাসঙ্কোচনহেতু মস্তিষ্কে রক্তাভাবে, নার্ভতন্ত্রের অঙ্গীয় ত্রুটিতে (টিউমার,

ডেমেনসিয়া, জি-পি-আই), চিত্তভ্রংশে। এসকল ক্ষেত্রে অবশ্য অন্যান্য লক্ষণাবলী উপস্থিত থাকবে, যথা, সাম্প্রতিক ঘটনায় স্মৃতিভ্রংশ, আচারআচরণে বিশৃঙ্খলা ও অসংলগ্নতা, জড়তা, আড়ষ্টতা ইত্যাদি বাগ্‌দোষ।

আরেকটি নার্ভগত ত্রুটি (অঙ্গীয় নয়) বিষণ্ণতা। বিষণ্ণতার নৈরাশ্যময় প্রবাহে মানুষ আবেগতঃ পশ্চাদগামী হয়ে পড়ে, অধিক নির্ভরশীল হয়ে ওঠে, অন্য মানুষের সঙ্গে সম্পর্কস্থাপনে অপারগতা দেখা দেয়, অর্থাৎ শৈশবকালীন কামদশা ফিরে আসে এবং তাৎকালিক মনঃসৃষ্টি ও অভ্যাসে নিমগ্ন হয়ে পড়ে। অতএব, বিষণ্ণতার দেখা যদি মেলে, শুরুতেই বিষণ্ণতার চিকিৎসা, কারণ বিষণ্ণ কুয়াশা সরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিকৃতি অদৃশ্য হবে।

সঙ্গদোষে মানুষ নষ্ট হতে পারে, তেমনি সুরাদোষে বিকৃতিযুক্ত। বিবেকের আচ্ছন্নতা ও বিচারবুদ্ধির নিম্নগামিতা ঘটিয়ে মানুষকে প্রমত্ত করায় বিকৃত কামানুষ্ঠানে, কাজে কাজেই সুরাপরিহার সর্বাগ্রেই বাঞ্ছনীয়।

বিকৃতকামিতার চিকিৎসায় সাফল্যের প্রথম সূত্রটি হল এদেরকে গণ্য করতে হবে অসুস্থ ব্যক্তি রূপে, বিকৃত, স্খলিত (ডিজেনারেট) দুঃশ্চরিত্র নয়। এদের এই অসুখের জন্যে প্রধানতঃ পরিবেশগত উৎসই দায়ী, মানসলৈঙ্গিক বিবর্তনের ধারা কোথাও ব্যাহত, রুদ্ধ, কোথাও অসম্পূর্ণ। অর্থাৎ কোন রোগের জন্যে রোগী যেমন দায়ী নয়, বিকৃতকামরাও তেমনি দায়ী নয় তাদের কার্যকলাপের জন্যে। এটা জোরের সঙ্গেই বলা যেতে পারে, স্বেচ্ছানির্বাচনের ফলাফল নয়, নিজের অলক্ষিতেই কখন এসে হানা দিয়েছে, অনেকটা স্বপ্নাবিষ্টের মতই। সত্য সত্যই, ধর্ষকামে কিংবা সমকামে প্রবল ঘৃণা কিন্তু শেষমেশ সেই ঘৃণিত পথেই পা বাড়াতে হয়, উপায় নেই, আবেগজ নিষ্কৃতিলাভ ব্যাপারটা এতই জরুরী।

সফলতার দ্বিতীয় সূত্র, একটি সুষ্ঠু কার্যকরী পদ্ধতি নির্বাচন। কেননা কামবিকৃতির চিকিৎসায় বহুবিধ মত ও পথের সমাবেশ ঘটেছে। প্রধান কয়েকটির নাম বলছি : ভেষজ চিকিৎসা। ব্যাখ্যা ও শিক্ষাদান। পরিবেশ ও জীবিকাবদল। অভিভাবন (সাজেসান)। সাইকোথেরাপি, মনঃসমীক্ষণ ও মনশ্চিকিৎসা। শর্তারোপ, চেষ্টিতবাদ চিকিৎসা (বিহেভিয়ার থেরাপি)। ভয়ঙ্কর বিকৃতিতে সাইকোথেরাপি কিংবা শর্তারোপই বাঞ্ছনীয়। অল্পমাত্রায় বিকৃতদের জন্যে প্রথম চারটিই যথেষ্ট, শুধু ব্যাখ্যায় আর আশ্বাসনেই কাজ মেলে। প্রসঙ্গতঃ বলি, অপ্রাপ্তবয়স্ক বিকৃতকামীদের অধিকাংশই সাড়া দেয় চিকিৎসায়—ব্যাখ্যা, সৎপথে ব্যাপৃত রাখা এবং মানস নিরাপত্তায়।

ভেষজ চিকিৎসার চারটি হাতিয়ার : হর্মোন। ট্রাঙ্কুইলাইজার। বিষণ্ণতা-নাশক দ্রব্যাদি। শান্তকারক দ্রব্যাদি (সিডেটিভ)। সরাসরি বিকৃতির চিকিৎসায় হর্মোন ব্যর্থ, যেমন পুং-সমকামিতায় পুং-হর্মোন নিষ্ফল, অপিচ কামাবেগ স্ফীত হতে পারে। শুধুমাত্র কামাবেগ দমনে স্ত্রী-হর্মোন, বিশেষ করে ষ্টিলবেষ্ট্রল, বড়ি প্রায়শঃ ব্যবহৃত। বিষণ্ণতার করুণ মলিন মুখখানিতে হাসি ফোটায় সদ্য এ্যান্টিডিপ্রেসেণ্ট ঔষধাদির নিয়মিত প্রয়োগে এবং বিষণ্ণতা নির্ভর বিকৃতি যে চিকিৎসাসাধ্য তা পূর্বেই বলেছি। সঙ্কটকালে ট্রাঙ্কুইলাইজার কিংবা সিডেটিভই সখার মত পাশে এসে দাঁড়াবে। তা ছাড়া উত্তেজিতভাব প্রশমনেও কার্যকরী। অভিভাবন পন্থায় সিডেটিভ (ফিনোবার্বিটোন কিংবা সোডিয়াম এমিট্যাল) অবশ্য ব্যবহৃত, এটাকে জোরদার করার উদ্দেশ্যে।

ট্রাঙ্কুইলাইজার ইত্যাদি ভেষজ চিকিৎসায় এবং ইলেকট্রিক শক (ই-সি-টি) কিংবা অন্যান্য ফিজিক্যাল থেরাপি দিয়ে বেশী আশা করা যায় না, এতে হয়ত উৎকণ্ঠা প্রশমিত হবে, কামাবেগ কিছুটা স্তব্ধ হবে, সাময়িক সঙ্কটকাল হয়ত ঘুচে যাবে, মেজাজ উৎফুল্ল হবে, কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী পাপবোধ ও হীনতাবোধ দূরীভূত হবে না। এবং অন্য মানুষের সঙ্গে সম্পর্কও অসুন্দর অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। শেষোক্ত অভীষ্ট দুটি সিদ্ধ হবে মনোবিশ্লেষণে।

ব্যাখ্যা ও শিক্ষাদান দিয়ে চিকিৎসা শুরু করাটা শুভ আরম্ভ। প্রথমেই সুযোগ দিতে হবে, যার ফলে রোগী নিজ অভিলাষ ব্যক্ত করবে, রতি-অভ্যাসের বিশদ ও পূর্ণ আলোচনা করবে, যদিচ বিকৃতকামীর পক্ষে স্বীকার ও প্রকাশ করাটা খুবই শক্ত। এতে শুধু যে চিকিৎসকের সুবিধা হয় তা নয়, রোগীরও মনের বোঝা হাল্কা হয়ে যায় এবং এভাবে রোগনিরাময়ে সহায়তাহস্ত প্রসারিত করে দেয়। তারপর ব্যাখ্যা ও শিক্ষাদান।

আপনি একা নন, আরও অনেকেরই এমন যাতনা এবং অন্য মানুষও সহ্য করতে পারে, এভাবে বুঝিয়ে দেওয়া এবং সেই সঙ্গে উপসর্গের যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যারও প্রয়োজন আছে। গুহ্যদেশ, বালক, বস্তুরতি, এসব বিচিত্র বস্তুর ব্যাখ্যা এদেরকে আশ্বস্ত করে। অধিকন্তু পজিটিভ মূল্যও প্রতিভাত হবে যার ফলে বিকৃতকাম ব্যক্তি এটাকে গ্রহণ করবে, পাপবোধ-হীনতাবোধের সঙ্গে না জড়িয়ে মেনে নেবে, এবং মানিয়ে নেবে।

কিন্তু শুধু স্বীকৃতি আর বুদ্ধিদীপ্ত অন্তর্দৃষ্টি প্রতিষ্ঠা যথেষ্ট নয় বিকৃতধারা পরিবর্তনের জন্যে। কারণ বিকৃতি হচ্ছে মানবসম্পর্ক স্থাপনে ব্যর্থতা, অংশতঃ বা পূর্ণতঃ। বিকৃতি রাতারাতি অদৃশ্য হবে যদি বিকৃতকাম প্রেমে পড়ত্তে

পারে। বয়স্কা নারীর সঙ্গে প্রণয়ের উদ্দেশ্যে যতটুকু পরিণতি চাই তা নেই। এটা যখনই করায়ত্ত হবে, ভালবাসতে পারবে। কাজে কাজেই চিকিৎসার উদ্দেশ্য হবে দুর্বল হৃদয়ে মানস নিরাপত্তার ঢেউ বইয়ে দেওয়া।

এমন ক্ষেত্রও আছে যেখানে ব্যক্তিকে বদলানোর চেয়ে পরিবেশ কিংবা জীবিকা বদলে ফল মেলে। যেমন বালকামী পুরুষের স্কুলে শিক্ষকতা নিষিদ্ধ। সমকাম-মুগ্ধ যুবকের নৌবাহিনীতে কিংবা নারীবিবর্জিত পরিবেশে থাকা অনুচিত। অর্থাৎ বিকৃতকামিতার অনুকূল পরিবেশ কিংবা উদ্দীপক ঘটনা, এসবই পরিহার করতে হবে।

মনশ্চিকিৎসা প্রবর্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অভিভাবন পদ্ধতি অচল হয়ে পড়েছে, ইদানীং বড় একটা ব্যবহৃত হতে দেখি না। কিন্তু একে বাদ দিলে একটি মূল্যবান পদ্ধতি বরবাদ হয়ে যায়। বসনকাম, সমকাম এই সব গুরুত্ব-পূর্ণ অসুস্থতায় কার্যকরী না হলেও অল্পমাত্রার নিউরোসিসে কাজ হয়, সামান্য ইনহিবিসন জাত ঘটনায় অল্পেই সারে, যেমন পুরুষত্বহীনতায় দুষ্ট চক্র ভেঙ্গে দিয়ে। সাধারণতঃ জাগ্রত অবস্থায়, অর্থাৎ সম্মোহিত না করেই, এক ঝাঁক অভিভাবন ঢেলে দেওয়া হয়, সেই সঙ্গে ব্যাখ্যা আর শিক্ষাদান। কখনবা সম্মোহিত অবচেতন মনে, এই যে গভীর অভিভাবন, এটাই একদা প্রাচীন মনোবিদ্ চিকিৎসকগণের প্রিয় ছিল, এরই নাম হিপনোসিস বা সংবেশন পদ্ধতি। নার্কো-এন্যালিসিস এরই আরেকটি প্রকারভেদ, এখানে ঘুম পাড়ানো হয় ঔষধ দিয়ে।

মনঃসমীক্ষণ

আমরা জানি নিউরোসিস সাইকোথেরাপিতে বা মনশ্চিকিৎসায় সারে। কামবিকৃতি নিউরোসিস পর্যায়ভুক্ত, সুতরাং এই একই চিকিৎসা আরোগ্যলাভ এনে দেবে। শুধু একটাই যা অসুবিধার, স্বাভাবিক মিলনে তৃপ্তি পাবে, এটা ভাবতে রোগীর কষ্ট হয় কিংবা অসম্ভব মনে করে। অতএব যে কোন বিকৃতির চিকিৎসায় রোগীকে প্রতিনিয়ত ও ক্রমাগত আশ্বস্ত করতে হবে, স্বাভাবিক মিলনে সেও সক্ষম এবং অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে তৃপ্তি পাবে বিকৃতির চেয়ে ঢের বেশী।

প্রধানতঃ শৈশবাবস্থায় জাত আবেগজ শর্তারোপ ও মানসিক নিষ্পেষণই মানুষকে বিকৃতকাম করে। অতএব বিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে চিকিৎসা করার সময় শৈশবকালীন বিষময় প্রভাবগুলি মুছে ফেলতে হবে। এটা সম্ভব মনশ্চিকিৎসায়। মনশ্চিকিৎসাও বহুবিধ শাখাপ্রশাখায় পল্লবিত, এদের মধ্যে

মনোবিশ্লেষণমূলক পদ্ধতিই সর্বাধিক নির্বাচিত এবং ইনহিবিসন বিতাড়নই এ-চিকিৎসার মূল লক্ষ্য।

সাইকোএন্যালিসিস অর্থাৎ মনঃসমীক্ষণ বলতে শুধুই যে ফ্রয়েড এবং তাঁর অনুগামীদেরই পথ বুঝব তা নয়, পরন্তু ইয়ুং, হর্নি, আলেকজেণ্ডার, ফ্রেঞ্চ এবং অন্যান্য মনোবিদ্ কর্তৃক প্রবর্তিত ধারাসমূহও অন্তর্ভুক্ত।

রোগী শুধু উপসর্গ চিন্তা করবে এবং যা মনে আসবে তাই বলবে, এজাতীয় 'অগভীর বিশ্লেষণ' মাঝে মধ্যে হয়ত সফলতা এনে দিতে পারে কতিপয় বিকৃত-কামিতায়, যেমন বস্তুকামিতায়। এপন্থায় ব্যর্থতা এত বেশী যে 'গভীর বিশ্লেষণ'-এর ডাক পড়ে সর্বত্রই, বিশেষ করে সমকামিতা, ধর্ষকামিতার মত গুরুতর কামবিকৃতির চিকিৎসায়। শেষোক্ত পদ্ধতির ধারা এক গোষ্ঠী থেকে অপর গোষ্ঠীতে ভিন্ন। যেমন 'অবাধ ভাবানুষঙ্গ' পন্থায় (চুপচাপ বসে থাকা রোগীর মনোমাঝে যা ভেসে উঠবে সবই অকপটচিত্তে ব্যক্ত করবে) একদলের অনুরাগ। আরেকদল চায় শৈশবাবস্থার পুনর্গঠন। কতিপয় মনোবিদের আস্থা স্বপ্নবৃত্তান্ত বিশ্লেষণে, অন্য কেউ বিশ্বাসী সংক্রমণমূলক (ট্রান্সফারেন্স) অবস্থার বিশ্লেষণ।

কয়েক মাস বা বৎসর ব্যাপী নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে পুনঃপুনঃ যেমন সপ্তাহে একবার সিটিং পড়ে। শান্ত নির্জন ঘুম ঘুম পরিবেশে রোগীকে বলতে দেওয়া হয়, যা মনে আসবে তাই বলবে, তা সে যতই অসংলগ্ন, যতই উদ্ভট হোক না কেন। এই বক্তব্য বিশ্লেষণ করবে এবং তারই ব্যাখ্যা রাখবে রোগীর আছে এবং পুনঃপুনঃ যুক্তি পরামর্শ দিয়ে বিশ্বাস করাবে। এভাবে অতীতের ভার লাঘব, স্বকীয় মূল সমস্যায় অন্তর্দৃষ্টি এবং মানসতার পুনর্গঠনে সহায়তা করবে। আরও সোজা করে বলতে পারি, অন্তর্নিহিত পাপবোধ হীনতাবোধ, ভয়ভাবনা, উৎকণ্ঠা উদ্বেগের কারণগুলি আলোকিত করতে পারলেই ইনহিবিসন খসে পড়বে। এবং যে-ইনহিবিসন তার যৌনতাকে পঙ্গু বিকৃত করে রেখেছে সেই ইনহিবিসন পরিহারে সমর্থ হলেই সে মুক্ত মানব, তখন সে ফিরে পাবে পরিণত যৌনতা, বয়স্ক প্রেম ও সুস্থ মানবসম্পর্কস্থাপনে ক্ষমতা।

মানস চিকিৎসার মূল লক্ষ্য নারী ভীতি পরিহার, বিকৃতকামিতায় আগ্রহ দমন নয়। কারণ সমস্যাটা বিকৃত প্রীতি নয়, নারী থেকে পলায়ন। দ্বিতীয়তঃ, তাকে আশ্বস্ত করতে হবে, বর্তমানের এ-ধারাই চলবে, আরও ভাল করে, আরও সুষ্ঠু ভাবে, পাপবোধবর্জিত হবে এই হেতু। সেই সঙ্গে তাকে নারীসঙ্গও পেতে হবে। মানবসম্পর্কের একটা সুন্দর দিককে মুছে ফেললে চলবে না,

এক সম্পর্ক অপর সম্পর্কের পরিপূরক হবে এই ভাবে, শেষমেশ এটাই হয়ত আরও পূর্ণতা আরও রমণীয়তা এনে দেবে। উদাহরণস্বরূপ, সমকামীকে প্রথমে উভয়কামী হতে হবে, শেষে ইতরকামী।

প্রায় প্রতিটি কামবিকৃতির ক্ষেত্রেই মনঃসমীক্ষণ প্রযোজ্য। শুধু এতিনটি নিষিদ্ধক্ষেত্র না থাকলেই হল। যেমন, হর্মোন লেভেল স্বাভাবিক না থাকলে মানস চিকিৎসা ব্যর্থ। দ্বিতীয়তঃ, সুরাজাত উদ্দীপক কারণটি না থাকাই বাঞ্ছনীয়। এ্যালকোহল স্পষ্ট সমকামিতায় সুরাবর্জন অবশ্যকর্তব্য। তৃতীয়তঃ, বৃদ্ধ বয়সে এবং প্রগাঢ় প্রৌঢ়ত্বেও, মনশ্চিকিৎসায় ফল মিলবে না, যদি দেখি আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা কিংবা মস্তিষ্ক ব্যাধিত (রক্তাভাব, চিত্তভ্রংশ, পক্ষাঘাত)।

যথার্থ প্রয়োগক্ষেত্র থাকা সত্ত্বেও ব্যাপক মনঃসমীক্ষণের প্রধানতম অন্তরায় তিনটি। দীর্ঘ কাল। বহু অর্থব্যয়। উপযুক্ত চিকিৎসকের অভাব। সফল মনঃসমীক্ষণের স্বাদ পেতে পেতে কয়েক বৎসর গড়িয়ে যায়, গড়ে এক বৎসর তো বটেই। কিন্তু কেন? এ-প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত জবাব রাখি, সেই বাল্যকালেই যে আবেগ প্রতিষ্ঠিত সেটা পরিবর্তিত হয় ধীরে, অতি ধীরে। সকল বিকৃতি-সমূহের মধ্যে সমকামিতার পরিবর্তন সবচেয়ে দুরূহ, অতএব দীর্ঘকাল সাপেক্ষ। আর অর্থ? এত কাল ধরে যে বিশেষ চিকিৎসা তার খরচ যে বিপুল হবে তা সহজেই অনুমেয়। এবং মনোরোগবিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের অপ্রতুলতাহেতু মনশ্চিকিৎসা আরও বেশী অসুবিধাজনক। আমাদের মত গরীব দেশে সকলের পক্ষেই এত ব্যয়বহুল চিকিৎসা কি সম্ভব? তাই দু চারটে যাও বা বিকৃত-কামের দেখা পাই তাদের আর গতি হয় না, অসীম যাতনায় দিন যাপনা একমাত্র সান্ত্বনা! শুধু আমাদের দেশে নয়, অতি উন্নত পাশ্চাত্ত্য দেশেও। এরই সমাধান বিহেভিয়ার থেরাপি।

চেষ্টিতবাদ চিকিৎসা

এযাবৎকাল মনঃসমীক্ষণই একমাত্র চিকিৎসা পদ্ধতিরূপে গণ্য ছিল। ইদানীং মিলেছে বিহেভিয়ার থেরাপি বা চেষ্টিতবাদ চিকিৎসা। বিকৃতকামের সর্বাধুনিক চিকিৎসা এটাই।

সেই প্রতিবর্তী ক্রিয়াই, পাভলভ যার জনক, চেষ্টিতবাদ চিকিৎসার মূল সূত্র। এবং শিক্ষাগত শর্তারোপ (লার্নিং প্রসেস) বিষয়ক নব নব আবিষ্কার এর অবলম্বন। এটা আর কিছুই নয়, পুনঃপুনঃ শিক্ষা আর উপদেশ দিয়ে কিংবা নানাবিধ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পুনঃশর্তারোপ। একটি শর্ত (যেমন সমলৈঙ্গিক পাত্র কিংবা বস্তুরতি কিংবা শুধুই প্রদর্শন) ভেঙ্গে দিয়ে আরেকটি শর্তের (স্বাভা-

বিক কামচেষ্টা) পুনঃপ্রতিষ্ঠা। প্রধানতঃ ছটি বিভিন্ন উপায়ে এটা সম্ভব, এদের মধ্যে জে. উলফ প্রবর্তিত সিসটেমিক ডিসেনসিটাইজেসন পদ্ধতিটি সমধিক প্রচলিত। এর পরেই এভার্সান থেরাপি দ্বিতীয় স্থানাধিকারী এবং মূলতঃ কামবিকৃতির চিকিৎসায় নিয়োজিত।

মানস চিকিৎসায় একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় 'কণ্ডিশনিং'—বিহেভিয়ার থেরাপিরও আদি পুরুষ। কণ্ডিশনিং অর্থাৎ শর্তারোপ দিয়ে বিকৃত আবেগ নিষেধিত করা যায়। সমকামী কিংবা বস্তুকামীকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজী করানো যেতে পারে ক্রমশঃ শর্তহ্রাসে এবং পুনঃশর্তারোপে। যেমন, কোন মহিলা সেজেগুজে সং না সাজলে পুরুষের রতিক্ষমতা সুপ্ত থাকে, এখন এই বস্তুরতির অল্পে অল্পে ক্ষয় সম্ভব। তেমনি সমকামীকে উৎসাহিত করা যেতে পারে অবাধ মেলামেশায়, নারীর সঙ্গে মিশবে পুরুষরূপে এবং পুরুষের সঙ্গে সমান ভিত্তিতে। এক কথায়, শর্তাবোপের প্রথম পদক্ষেপ হবে, বিকৃত পরিবেশ থেকে আস্তে আস্তে রোগীকে সরিয়ে নিয়ে আসা, অনেকটা শিশুকে স্তন্যদান ক্রমশঃ হ্রাস করার মত। পদ্ধতিটি সময় সাপেক্ষ এবং কার্যকরীও নয় প্রতিটি ক্ষেত্রে। এসমস্যার সমাধান করতে গিয়ে যা পেলাম তার নাম এভার্সান থেরাপি।

সর্বাধুনিক এভার্সান থেরাপিও এই একই শর্তাবোপ তবে কিনা আরও ব্যাপক, আরও প্রত্যক্ষ, আরও প্রগাঢ়। অর্থাৎ কিনা শর্তারোপই এচিকিৎসার পাশুপাত অস্ত্রবিশেষ। এই উদ্দেশ্যে অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সরাসরি আঘাতের পর আঘাত করা হয় প্রতিষ্ঠিত শর্তাবদ্ধ প্রতিবেদনে যেমন সমলৈঙ্গিক কামপাত্রে, বস্তুরতিতে। উত্তেজক বস্তুটি শেস পর্যন্ত ঘৃণ্য বিরক্তিকর হয়ে ওঠে, পদ্ধতিটি তাই এভার্সান থেরাপি রূপে খ্যাত। এক পুরুষ সমকামীর কথাই ধরা যাক। ঔষধ খাইয়ে, ইঞ্জেকশন দিয়ে বমির পর বমি করান হয় কিংবা ইলেকট্রিক শক দেওয়া হয়, এই সময়ে সমকামিতামূলক উত্তেজক ছবি, স্লাইড, ফিল্ম দেখান হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে, স্বাভাবিক অবস্থায়, যখন সুস্থতা ফিরে আসবে, ইতরকামিতামূলক (অর্থাৎ সুন্দরী নারীর) ছবি, ফিল্ম প্রদর্শিত হয়। সমগ্র ব্যাপারটা ৫।১০ বার পুনরাবৃত্ত। এভাবে প্রতিষ্ঠিত শর্ত ভঙ্গ করা হয়, এরই ফলাফল পুরুষে ঘৃণাভাব। এবং দেখা দেয় এক নতুন শর্ত—নারীতে আগ্রহ।

বিকৃতকামিতার চিকিৎসা সহজেই কার্যকরী হয় না। বিকৃতকামীরা যেন একটা অনাক্রম্যতা নিয়ে জন্মেছে, চিকিৎসায় সাড়া দিতে চায় না, বাধার পর

বাধা সৃষ্টি করে চলে, প্রতিহত করে চলে চিকিৎসকের সকল প্রচেষ্টা। কিন্তু চেষ্টিতবাদ চিকিৎসা প্রবর্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছবিটা এতটা ম্লান নয়, অবস্থা অনেক পরিবর্তিত। প্রায় প্রত্তিটি বিকৃতিই চিকিৎসিত হয়েছে এই পদ্ধতিতে। উল্লেখযোগ্য সীমিত সাফল্য দেখা গেছে সমকামিতায়, আশাপ্রদ ফলাফল মিলেছে বস্তুকামিতায়, বসনকামিতায়, প্রদর্শনকামিতায়। বস্তুত: বিপরীতকাম প্রসঙ্গ বাদ দিলে অন্য সব বিকৃতির চিকিৎসায় এভার্সান থেরাপিই প্রধান আশ্রয়স্থল, বলতে দ্বিধা নেই, প্রথম পদ্ধতিরূপে মনোনীত হওয়ার যোগ্য।

মনঃসমীক্ষকদের দাবী এই ফললাভ স্থায়ী নয়। তা ছাড়া অসুবিধাও আছে অনেক। অন্যান্য বদলি নিউরোটিক উপসর্গ দেখা দেয়। এবং শুধু লাক্ষণিক চিকিৎসায় উপসর্গ ছাই চাপা পড়ে মাত্র। অধিকন্তু রোগীর অসুস্থ ব্যক্তিত্ব, মানবসম্পর্ক স্থাপনে অক্ষমতা, এসবই অচিকিৎসিত থেকে যায়। একারণে এঁরা সহযোগী পদ্ধতির মর্যাদা দিতে রাজী, স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বনির্ভর পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতিরূপে নয়।

প্রতিবাদের ঝড় যতই তীব্র ও ব্যাপক হোক না কেন, বিহেভিয়ার থেরাপি আজ প্রতিষ্ঠিত, একে হটানো যাবে না, থাকবার জন্যেই এসেছে। বস্তুত:, পদ্ধতিটি ক্রমশঃই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে, কেননা সাফল্যহার মোটামুটিভাবে আশাপ্রদ। অতিঅল্প সময়ের মধ্যেই কার্যকরী এবং খরচও কম। যে যাই বলুক, আমরা একে স্বাগত জানাব। অল্প ব্যয়ে, অল্প কালের মধ্যে আশাপ্রদ সাফল্য, অতএব আমাদের মত নির্ধন দেশেও ছড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে।

বিবাহ

ক্বচিৎ কখন কামবিকারযুক্ত ব্যক্তিকে বিবাহিত হতে দেখা গেছে। প্রতিকারের আশায় বিবাহ অন্যায়। মারাত্মকরকমের ভুল। কারণ আগে চিকিৎসা পরে বিবাহ। কামস্বভাবিতায় প্রত্যাবৃত্ত না হওয়া পর্যন্ত বিবাহ নৈব নৈব চ।

নিষ্কৃতিলাভপ্রয়াসে সমকামীকে বিবাহিত হতে দেখেছি স্বয়ং। এটা তো আর নিরুদ্ধ আবেগ বা ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ থাকার ঘটনা নয় যে বিবাহে বিকৃতির উপশম ঘটবে। বরং আরও অশান্তি ঘনিয়ে ওঠে। বিকৃতকাম ব্যক্তিরা প্রায়শঃ অক্ষম ফলে স্ত্রীরা বঞ্চিত, অসুখী। বিবাহ দূরে থাক, বিবাহেতর সংসর্গের পরামর্শ দেওয়াও ক্ষতিকর।

অনুরূপভাবে বস্তুকামীরা বিবাহিত হয় আরোগ্যলাভের আশায় কিন্তু মিলনে অসহায়। এক কথায়, স্বাভাবিক কিংবা প্রায় স্বাভাবিক যৌনতা ফিরে না আসা পর্যন্ত বিবাহ নিষিদ্ধ।

কখন মিলন বিধেয় ?

এব্যাপারে রায় দেওয়াটা বড় শক্ত। অংশতঃ সফলতায় আরোগ্যলাভ ত্বরান্বিত ; এবং ব্যর্থতায় বিলম্বিত, রোগীর আত্মপ্রত্যয় নষ্ট হবে, পাপবোধ আর হীনতা-বোধ জাঁকিয়ে বসবে। সুতরাং চিকিৎসককে সিদ্ধান্ত নিতে হবে অতিশয় সতর্কতার সঙ্গে। মনে রাখবেন, বিবাহেতর মিলন প্রসঙ্গে মনোরোগবিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শই শেষ কথা।

এব্যাপারে নজর কাড়বে দুটি চিন্তাধারা। পুরোপুরি ইতররতিক ভাবনায় আশ্বস্ত না হওয়া পর্যন্ত এবং শৃঙ্খলিত নিষেধপ্রভাবের মুক্তিজনিত আনন্দে বিহ্বল না হওয়া পর্যন্ত সম্পূর্ণ রতিবিরতির উপদেশ দিয়ে থাকেন একদল। অন্যদলের বক্তব্য সক্ষমতার প্রত্যয় সর্বশরীরে শিহরন ধরিয়ে দেবে তখনই রোগী ব্রতী হবে রতিবিহারে এবং চেষ্টা চালিয়ে যাবে অংশতঃ সফলতায়, এমন কি ব্যর্থ হলেও।

উভয় পদ্ধতিতেই সাফল্যের মুখ দেখেছেন ডাঃ ক্লিফোর্ড এ্যালেন। আমরা মনে করি, ইতররতির জন্যে রোগীর সর্বাঙ্গীন প্রস্তুতির আবির্ভাবই বলে দেবে মিলন লগ্নটি সমাগত। অর্থাৎ বাসনা প্রবল, নারীই কামপাত্র, কামচেষ্টা যথার্থই রতিবিহার, তখন আর মিলিত হতে বাধা কোথায় ? এবং মিলনশয্যা রচিত হবে প্রচলিত আসনভঙ্গী, সাধারণ উত্তানকভঙ্গী (নারী নীচে, পুরুষ উপরে) দিয়েই। প্রসঙ্গতঃ বলে রাখি, অস্বাভাবিক চিত্রবিচিত্র ভঙ্গী সাধারণতঃ মানস-অস্বভাবিতারই (অচেতন) পরিচয়, এমন কি প্রকাশ্য বিকৃতকামিতারও ; এদেরকে উৎসাহিত করতে হবে পূর্বোক্ত স্বাভাবিক ভঙ্গীতে। অর্থাৎ কিনা স্বভাবিতা আনয়নে আসনভঙ্গীরও একটা ভূমিকা আছে। প্রথমে প্রচলিত ভঙ্গীতে অঙ্গপ্রবেশ তারপর কামকলা উপভোগ, এভাবে বিকৃতিযুক্ত ব্যক্তিকে ধীরে ধীরে আকৃষ্ট করা যায় স্বাভাবিক ভঙ্গীতে।

আরোগ্যসম্ভাবনা

বয়স, স্থায়িত্ব, বুদ্ধি, নিষ্কৃতিলাভের বাসনা, সামাজিক প্রবণতা ইত্যাদি ভেদে আরোগ্যসম্ভাবনা কোথাও উজ্জ্বল, কোথাওবা ম্লান। অল্পবয়স্ক, অল্পঅভিজ্ঞ, অস্বাভাবিক যৌনতায় হাতেখড়ি অল্পদিনের, সুস্থ হওয়ার বাসনা প্রচণ্ড এবং বুদ্ধিমান, এদের মুক্তির সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল। অপরদিকে বয়সটা গড়িয়ে গেছে প্রৌঢ়ত্বের দিকে, ৩৫ এর বেশী, অভিজ্ঞতা অধিকতর, অভ্যাসটা দীর্ঘকালের এবং স্বাভাবিক জীবন ফিরে পাওয়ার, অতএব চিকিৎসিত হওয়ার, তিলমাত্র বাসনা নেই—এহেন বয়স্ক, অভিজ্ঞ, দুঃখবাদী, অল্পবুদ্ধিযুক্ত বিকৃতকাম ব্যক্তির চিকিৎসা

যে দুরূহ তা শুরুতেই বোঝা যায়। চিকিৎসার ইচ্ছা আছে কিন্তু মনঃসমীক্ষণ বা অন্য চিকিসার সুযোগ নেই, নেই সঙ্গতি, এদের অবস্থাও সঙ্গীন। যথার্থ ধর্ষকাম এবং অন্যান্য ভয়ঙ্কর বিকৃতির চিকিৎসাও ক্ষীণ সম্ভাবনাযুক্ত। কাম-বিকৃতি প্রায়শঃ সিজোফ্রেনিয়া যুক্ত, এবং শুরুতেই সিজোফ্রেনিয়ার চিকিৎসারম্ভ না হলে আরোগ্যসম্ভাবনা ক্ষীণতম হয়ে পড়ে। এরূপ আরেকটি ক্ষেত্র সুরাদোষে দোষী বিকৃতকাম।

সমকামিতা

বিকৃতিসমূহের মধ্যে সমকামিতা প্রসঙ্গ বহু বিতর্কিত, কাজে কাজেই চিকিৎসা-ব্যাপারটাও যে বিতর্কমূলক হবে তাতে আর সন্দেহ কী! যেমন একদল বিশেষজ্ঞের বক্তব্য, যেহেতু এটা জন্মগত, এর কোন চিকিৎসা নেই। ক্রাফট-এবিং, হির্শফেল্ড প্রমুখ বিরাট বিরাট জার্মান মনীষীদের ধারণা তো এই এবং যথার্থ সমকামীকে এঁরা কখন ভাল হতে দেখেন নি। এঅভিজ্ঞতা ডাঃ হ্যাভলক এলিসেরও। তা ছাড়া সমকামিতা যদি রোগ না হয়, চিকিৎসায় কি ফল মিলবে? তাই না হ্যাভলক এলিস বলেছেন, সমকামীকে ইতরকামী করার প্রচেষ্টা যেমন অন্যায় তেমনি অনৈতিক, ইতরকামীকে সমকামী করার মতই। এমন কি ডাঃ সিগমুণ্ড ফ্রয়েড-এরও বক্তব্য, এটা মানুষের করায়ত্ত নয়, সমকামীকে তাই মানুষের সঙ্গে এবং সমাজের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে হবে।

অপরদিকে পরিবেশবাদীরা হেঁকে বলেছেন সমকামিতা নিশ্চয়ই চিকিৎসা-সাধ্য। ডাঃ ক্লিফোর্ড এ্যালেনের দাবি, অন্যান্য নিউরোসিসের মতই সারে, অবশ্য সমকামীরা যদি চায় তবেই। ডবল্যু ষ্টেকেল আশাবাদী, ১০০% সমকামীর পক্ষেও ইতররতিক আস্বাদন সম্ভব। ডঃ এলবার্ট এলিসের মতে চিকিৎসা সার্থক হবে যদি হয় নিউরোটিক উপাদান বিজড়িত এবং পুরোপুরি একাসক্তচিত্ত।

সবচেয়ে সময় লাগে এবং অন্যান্য বিকৃতির তুলনায় কষ্টসাধ্য, বয়স্ক মানব-সম্পর্ক স্থাপনই চিকিৎসার মূল লক্ষ্য, এই হেতু। পুরুষদের তুলনায় মহিলারা সহজেই সাড়া দেয়। রোগযুক্ত সমকামিতার চিকিৎসা আশাতীতভাবে সাফল্যপ্রদ, যেমন সিজোফ্রেনিয়া (চিত্তভ্রংশী বাতুলতা), বিষণ্ণতা, এ্যাড্রিনো-জেনিট্যাল ভিরিলিজম। বিকৃত ব্যক্তিত্বে (নারীভাবাপন্ন কিংবা বিপর্যস্তলিঙ্গ) এবং অসামাজিক প্রবণতায় (সুরাদোষ) ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

মানস চিকিৎসা মোটের উপর নৈরাশ্যজনক। বিহেভিয়ার থেরাপিতে আশার আলো আছে। হর্মোন চিকিৎসা অসার্থক। কিন্তু দুশ্চিকিৎস্য ক্ষেত্রে

এর মূল্য আছে, কামাবেগ কমিয়ে দিয়ে শান্ত রাখতে সহায়তা করে। আরোগ্য-লাভের আশায় বিবাহ কদাচ নয়।

দুষ্টকর্ম বা পাপকর্মের সঙ্গে সমকামিতাকে একাসনে বসান ঘোরতর অন্যায়। যথার্থ সমকামীকে মেনে নিতে হবে। এদেরকে সাহায্য করতে হবে পাপবোধ ও হীনতাবোধ বিসর্জনে, যাতে সমাজের আর পাঁচজন মানুষের মত নিঃশ্বাস নিতে পারে অকুণ্ঠিতচিত্তে। সত্য কথা বলতে কি, শুধু সমকামিতা কেন, যে কোন যৌন আচরণেই, একান্ত ব্যক্তিগত, নির্জন নিভৃতে অনুষ্ঠিত দুই প্রাপ্তবয়স্কের আচরণে কোন খবরদারি করার অধিকার নেই কারুরই। কিন্তু শালীনতা ও ব্যক্তিস্বাধীনতা যখনই লঙ্ঘিত হবে—অত্যাচার, ধর্ষণ, বালকামিতা, প্রকাশ্যে—সমাজের চোখ রাঙাবার অধিকার আছে। এক কথায়, সংযম ও শাসন সবই ইতরকামিতার মত বিবেচিত হবে।

বালকামিতা

শাস্তি না দিয়ে চিকিৎসা করাই সঙ্গত। এই উদ্দেশ্যে প্রথমেই কারণ নির্ণয়। বৃদ্ধ বয়সে হঠাৎ কেউ যদি বিকৃত পথে ধাবিত হয়, যেমন বালকামিতায় কিংবা প্রদর্শনকামিতায়, কারণটি প্রায়শঃ মস্তিষ্কে রক্তাভাব কিংবা অন্য কোন অঙ্গীয় ত্রুটি (২১০ পৃষ্ঠা)। অল্প বয়সে ব্যাপারটা বাধ্যতাজনিত আবেগ বিজড়িত, এক্ষেত্রে মনশ্চিকিৎসাই শ্রেয়ঃ, কারাদণ্ড নয়।

বসনকামিতা

মৃদু বসনকামিতায় মানস চিকিৎসার শরণ নেওয়া যেতে পারে। ভয়ঙ্কর ও প্রতিষ্ঠিত ক্ষেত্রে মূল্যহীন, কেননা সর্ববিধ মনোচিকিৎসা ব্যর্থ। সমগ্র জীবনে একটিরও মুক্তি দেখে যেতে পারেননি ডাঃ কেনেথ ওয়াকার, ডাঃ হ্যারি বেঞ্জামিন। ডাঃ ড্যানিয়েল ব্রাউনের মতে এচিকিৎসা কঠিন, দুঃসাধ্য, সামান্যতম পরিবর্তনও সম্ভব নয়, নির্বাসন তো দূরের কথা। অর্থাৎ বসনকামে মনোচিকিৎসা প্রধানতঃ ব্যর্থ। এবং বিপর্যস্তলিঙ্গ রোগীও সুস্থ হয়নি কোন চিকিৎসায়।

বিপরীতকামিতা

পরিবর্তনসাধক অপারেশন ইংল্যাণ্ড এবং আমেরিকায় নিষিদ্ধ অতএব ভারতেও। তা ছাড়া এসমস্যার সমাধান সার্জারী নয়, মানস চিকিৎসাই, যদিচ ব্যর্থতাই একমাত্র ফলাফল, তবুও মনোগত অন্তর্দ্বন্দ্বের কিছুটা উপশম তো সম্ভব। আর মনোচিকিৎসা যেখানে প্রত্যাখ্যাত, এস্ট্রোজেন হর্মোনই অগতির গতি।

প্রতিকার

দুষ্ট বংশদোষে সন্তান দুষ্ট হবে, অতএব বিকৃতকাম ব্যক্তির সন্তানসন্ততিও বিকৃত

হবে, এই সুবাদে বিবাহ বন্ধ রাখার কিংবা বাধ্যতামূলক বন্ধ্যকরণ অপারেশনের রেওয়াজ আছে। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় যে, বংশগতিমূলক বারণোপায় ব্যবস্থার অবলম্বনে বিকৃতকামিতা নির্মূল করা যায় না।

বরং সেই প্রতিকার ব্যবস্থা নিশ্চয়ই কার্যকরী যেখানে জনকজননীর বিজ্ঞতা আর সহিষ্ণুতা সন্তানে সঞ্চারিত হতে দেবে না পাপবোধ ও হীনতাবোধ, সমলৈঙ্গিক পিতামাতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠবে, যার ফলে অস্বভাবী যৌনতার অভিজ্ঞতা যারপরনাই হ্রাস পাবে।

নার্সারীতেই কামবিকৃতির বীজ বপিত হয়, প্রতিকার ব্যবস্থার শুরু অতএব সেই শৈশবকালেই। যৌনতার দিক থেকে স্বাভাবিকভাবে সুন্দরভাবে গড়ে ওঠার সবচেয়ে ভাল পরিবেশ সুস্থ সুখী গৃহকোণ আর স্বভাবী, মরমী পিতামাতা। পিতামাতার কেউ যদি অকালে গত হন উপযুক্ত অভিভাবকের (যেমন খুড়ো, খুড়ি) যোগান দিতে হবে, যাকে বেষ্টন করে লতিয়ে উঠবে শিশুমন।

আমরা জানি, অস্বভাবী যৌনতার অধিকাংশরই উৎস অসুখী গৃহ। সমকামিতা সৃষ্টির একটি বড় কারণ, বিপরীতলৈঙ্গিক পিতা বা মাতায় সম্প্রীতির অভাব, শত্রুতা, বিদ্বেষ, ঘৃণা। বসনকাম এবং বিপরীতকাম এবং লিঙ্গবিপর্যয় —একটি ঘটনারও স্বাভাবিক লিঙ্গে রূপান্তর সম্ভব হয়নি, এসব ক্ষেত্রে চিকিৎসার চেয়ে প্রতিকার সব সময়ই ভাল। এটা অতএব খুবই প্রয়োজনীয় শিশুকে স্বাভাবিকভাবে গড়ে ওঠার সুযোগ দিতে হবে এবং অনুকূল পরিবেশের দাক্ষিণ্য।

মাতা শিশুকে স্তন্যপান করাবে অবশ্যই, সযতনে এবং ভালবাসার সঙ্গে, এবং স্বীয় চিত্তবৃত্তির কোন বিকৃতি না ঘটিয়ে। স্তন্যদান করবে পুরো ছ মাস, তারপর আস্তে আস্তে কমিয়ে দেবে। শেষে একেবারেই পাট চুকিয়ে দেবে, কঠোর হস্তে শিশুকে কাঁদিয়ে ভাসিয়ে নয় স্তনবৃন্তে তিক্ত প্রলেপ মাখিয়েও না। স্তন্যদানের পূর্বে অন্য খাদ্য দেবে যা শিশুর পেট ভরিয়ে দিতে যথেষ্ট, তখন শিশু নিজের থেকেই ছেড়ে দেবে স্তন্যপানের অভ্যাস।

দন্তোদ্গমের সময় চর্বণ উপযোগী কঠিন খাদ্য দিতে হবে, ফলে দংশনমূলক কার্যকলাপ অন্য সুস্থ খাতে প্রবাহিত হবে। যে শিশু দংশন করে তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিবৃত্ত করতে হবে, আঘাতের বদলা আঘাত দিয়ে নয়। মলমূত্রত্যাগ ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা উচিত নয়। কোষ্ঠবদ্ধতায় মৃদু জোলাপ দেওয়াই সঙ্গত।

জৈবিক লিঙ্গ অনুযায়ী শিশু মানুষ হবে। শিশু যেন সব সময়ই নিজ লিঙ্গ অনুযায়ী বেশভূষা পড়ে এবং আচরণ ধারাও যেন তদনুসারী হয়। উৎসাহ দিয়ে কিংবা জোর করে, বিশেষ করে ২।৩ বছর বয়সের ছেলেকে মেয়েদের পোশাক পরানো কিংবা মেয়েদের আচরণে অভ্যস্ত করানো সত্য সত্যই বিপজ্জনক।

দেহ সম্বন্ধে সচেতনতা একদিন জাগবে, শিশু তখন প্রশ্ন করবে, এবং সেই জিজ্ঞাসার, হোক যৌন প্রশ্ন তবুও, উত্তর দিতে হবে শান্ত অবিচলিত চিত্তে। শিশুদের যৌন আগ্রহে, এমন কি যৌনতার প্রকাশেও, কোন মন্তব্য বা শাসন নয়, অধিকতর সহনশীলতাই বাঞ্ছনীয়।

পাঁচ ছ বছরে পা দেওয়ার পূর্বেই সব কিছু ঘটে যায়, একারণে শৈশবেই গুরুত্ব দেওয়া হয় সর্বাধিক। তথাপি শর্তারোপ বিচারে কোন বয়সই বেশী নয়, কাজে কাজেই, লক্ষ্য রাখতে হবে শিশু যেন স্বাভাবিক সাহচর্য পায় স্কুল-জীবনে এবং তার পরেও। সহশিক্ষামূলক স্কুলই ভাল এবং স্কুলে কোন বেত্রাঘাত, কঠোর দৈহিক শাস্তি বাঞ্ছনীয় নয়। লক্ষ্য রাখুন, স্কুলশিক্ষক, স্কাউট-মাষ্টার কিংবা ভৃত্য কর্তৃক শিশু যেন নিগৃহীত বা ধর্ষিত না হয়। প্রমাণ আছে, পরিণত জীবনে কোন প্রভাবের ছায়া পড়ে না, তবুও অকালে যৌন জাগরণ বন্ধ থাকুক, এপ্রচেষ্টা ভাল বই মন্দ নয়।

বয়ঃসন্ধিকাল বিষম কাল। পিতামাতাকে বুদ্ধিমত্তা ও সতর্কতা, সহৃদয়তা ও বিবেচনার সঙ্গে সন্তানকে হাত ধরে এই কালটুকু পার করে দিতে হবে। যথাযথ যৌনতার জ্ঞান বিলিয়ে এবং অসুস্থ যৌনতার সান্নিধ্যের হাত থেকে রক্ষা করে। কিশোরীর প্রতি নওল কিশোরের আগ্রহ স্বাভাবিক এবং একজন নবযুবক যে কিশোরীর মুগ্ধ দৃষ্টি কেড়ে নেবে, এটা আর আশ্চর্য কী! নিষেধের ললিত বাণী না শুনিয়ে এদেরকে উৎসাহিত করতে হবে সমাজ জীবনে, খেলাধূলায়, সর্বত্রই অবাধ মেলামেশার জন্যে। একত্রে মেলামেশার আরেকটি সহজ উপায় সহশিক্ষামূলক স্কুল। বালক বালিকাবেশে সজ্জিত, বালিকায় অনাগ্রহ, বালিকার সঙ্গে কথা বলে না, এসবই রোগজনক এবং চিকিৎসার প্রয়োজন।

যৌবনপ্রাপ্তির পর বন্ধুবৎ আচরয়েৎ। অবাধ মেলামেশার সুযোগ করে দিতে হবে। এবং সর্বোপরি আর্লি ম্যারেজে অর্থাৎ যুবকযুবতীদের ২০-২৪ বয়সের বিবাহের জন্যে উৎসাহ দান। শুধু উৎসাহ নয় সহায়তাহস্ত প্রসারণও কাম্য।

চতুর্থ পর্ব

সমাজ ও যৌনতা

১৯ / গর্ভপাত ঃ সমাধান কোন পথে ?

একদা সন্তান ছিল বিধাতার আশীর্বাদ, যেন ঈশ্বর প্রেরিত। কিন্তু সেই অযোধ্যা নেই, সেই রামও নেই। সন্তান আজ কিনা দুঃসহ ভার বিশেষ, নির্ভার হওয়ার একটি উপায় গর্ভপাত (অধিক বিলম্বে শিশুহত্যা)।

শতকরা দশটি গর্ভ যেমন করে অকালে আপনাআপনি ঝরে যায়, তেমনি করে এগর্ভপাত স্বতঃস্ফূর্ত নয়, স্বেচ্ছাকৃত। ঋতুবন্ধের পর ২৮ সপ্তাহ মধ্যে একটা কিছু প্রয়োগ করার পর যে গর্ভপাত ঘটে তারই কথা বলছি। এটা আবার দু রকমের, বৈধ আর অবৈধ। শুধুমাত্র গর্ভিণীর প্রাণরক্ষার্থে (ভারতীয় পেনাল কোড ৩১২ নং ধারা দ্রষ্টব্য) এটা বৈধ (থেরাপ্যুটিক), বাদবাকী আর সবই অবৈধ (ক্রিমিনাল)। প্রথমটি আইনের স্বীকৃতিধন্য, ডাক্তারেরা তাই এগিয়ে আসে, ফলে মৃত্যুহার খুবই কম এবং ব্যাধিগ্রস্ততা প্রায় শূন্য। দ্বিতীয়টি আইনতঃ দণ্ডনীয়, সুতরাং লুকিয়ে চুরিয়ে অসুন্দর পরিবেশে অনুষ্ঠিত, যার ফলে মৃত্যুহার অনেক বেশী, আরও ভয়াবহ দুর্ঘটনা, মারাত্মক ব্যাধিগ্রস্ততা এবং গুরুতর কুফল।

নিখিল নীল বিশ্বে কত শত কোটি গর্ভ যে অন্ধকারে পাত হয়, কেউ তা জানে না। আলোয় যেটা আসে সেটা ভগ্নাংশমাত্র। মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে সমগ্র গর্ভের এক পঞ্চমাংশ থেকে এক চতুর্থাংশ নষ্ট করা হয়। এবং শান্তিলাল শাহ কমিটি-র রিপোর্টে (১৯৬৭) জানা গেছে, মহীশূরে প্রতি হাজার গর্ভে ৭৯টি এবং বাংলাদেশে প্রতি হাজারে ৪৫টি গর্ভ অবৈধভাবে নষ্ট হয়। হাসপাতালে ডাক্তার দেখে কিছু বিপন্না রমণীকে, পুলিশ ও করোনার দেখে কিছু মৃত্যুকে, বিপুলসংখ্যক গর্ভঘাতিনী কিন্তু অজ্ঞাতকুলশীল থেকে যায়। বিগত পঞ্চাশ বছরে এসংখ্যা বিপুলভাবে স্ফীত হয়েছে এবং এবিপুলতার অর্থ সমাজের প্রতিটি স্তরেই খুঁজে পাব গর্ভপাতকে।

মনে হতে পারে এটা বুঝি আধুনিক সভ্যতার অবদান, একটা নতুন সমস্যা বুঝি ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে। ব্যাপারটা মোটেই তা নয়। কারণ, মনের মাধুরী মিশিয়ে একটি মানুষ আর একটি মানুষীকে নিয়ে যেদিন ঘর বেঁধেছে সেদিন থেকেই এর দেখা পাব। নৃবিজ্ঞানীরা বলেন, ছটি মহাদেশের প্রতিটি আদিম সমাজে একদা চলন ছিল গর্ভপাতের এবং এখনও অনেক আদিবাসী গর্ভপাত

কিংবা শিশুহত্যার আশ্রয় নিতে দ্বিধা করে না। অতএব মানুষের ইতিহাস যতই পুরনো হোক না কেন গর্ভপাতের বয়স তার চেয়ে কম নয়।

সভ্যতার শুরুতেও এসমস্যা মানুষকে ভাবিয়েছে। তখন মানুষ পথ বেঁধে দিয়েছে অজস্র গ্রন্থি দিয়ে, কিংবা ছাড়পত্র দিয়েছে সানন্দে, কিংবা সহ্য করেছে নীরবে। পাঁচ হাজার বছর আগে, প্রাচীন চৈনিক সভ্যতায় পারদ-এর গর্ভনাশক গুণটি জানা ছিল, চলন ছিল ঐতিহাসিক মিশরে, সাড়ে তিন হাজার বছর পূর্বে রচিত 'এবার্স প্যাপিরাস' গ্রন্থে গর্ভঘ্ন দুটি ফর্মূলা আছে। অন্যদিকে গর্ভপাতজন্য মৃত্যুদণ্ডের বিধান দেখি এসিরীয় সভ্যতায়, এবং পারস্য, ইহুদী ও হিন্দু আইনে গর্ভাপাতন নিষিদ্ধ কর্ম রূপে চিহ্নিত।

প্রাচীন গ্রীসের কীর্তিখ্যাত মনীষীগণ, উদাহরণস্বরূপ এ্যারিষ্টটল[১] এবং প্লেটো[২], সামাজিক এবং আর্থিক কারণে গর্ভপাতের বিরোধিতা করেন নি। অর্থাৎ গ্রীক সভ্যতা গর্ভপাতের পরিপন্থী ছিল না। এবং প্রাচীন রোমক সাম্রাজ্যেও অনেকটা তাই।

রোমক সভ্যতার পর খ্রীষ্টীয় সভ্যতা, এবং এসভ্যতা যতই তার শাখা-প্রশাখা মেলে দিয়েছে, গর্ভপাত প্রসঙ্গে পাপ বা অপরাধ-বোধ ততই দৃঢ়মূল হয়েছে। গর্ভস্থ ভ্রূণে আত্মা নামক নতুন ভাবনার আমদানি করেছে এবং একটি আত্মাকে হত্যা করার প্রশ্ন তুলেছে এই খ্রীষ্টধর্মই। এমন একটি ভাবনা জনমানসে প্রতিষ্ঠিত করার কৃতিত্ব শুধু খ্রীষ্টধর্মেরই নয়, অন্যান্য ধর্মও সমান অংশীদার, শিন্টো এবং বৌদ্ধধর্ম বিশিষ্ট ব্যতিক্রম। এভাবে একদা যেটা ছিল সামাজিক প্রথা সেটাকে ধর্মই প্রধানতঃ নিষিদ্ধ করেছে, হত্যা অতএব পাপাচার এই জুজু দেখিয়ে।

কিছুকাল পূর্বে প্রায় সর্বত্রই এবং বর্তমানে বেশ কয়েকটি দেশে গর্ভপাত করাটা অপরাধ কর্ম রূপে বিবেচিত, যদি না গর্ভিণীর প্রাণরক্ষার্থে অনুষ্ঠিত হয়। অন্যদিকে বাস্তব জগতে দেখব আইনের ভ্রূকুটি উপেক্ষিত, ধর্ম তুচ্ছ, গোপন অন্ধকারে গর্ভপাত হচ্ছে আকছার। লোকেরা এখন আর ক্রাইম বলে না, বলে এটা অফেন্স নয়, ডিফেন্স। এটা হচ্ছে, পবিত্র, আত্মরক্ষামূলক অতএব সংস্কাররূপী বা অপবিত্র আইনের বলার কিছু নেই।

বলতে কোন দ্বিধা নেই, সর্বকালীন এবং সর্বজনীন ঘটনার একটি সুন্দর

১। আদর্শ রাষ্ট্রে গর্ভপাত হবে বৈধ।

২। জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যর্থ করে যার জন্ম সেই গর্ভের বিনাশ বিধিসঙ্গত

উদাহরণ এই গর্ভপাতই। প্রশ্ন জাগবে, এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে নিশ্চিহ্ন করা কি সম্ভব? ইতিহাসের সাক্ষ্য থেকে বলতে পারি, না কোনমতেই সম্ভব নয়। আর উচিতও নয় তা, কারণ, শুনতে আশ্চর্য লাগলেও হিতকারী কিছু গুণ এই গর্ভপাতেরই অঙ্গে অঙ্গে জড়িয়ে আছে (প্লন ও বার্টেলস)।

দেশজ রীতিনীতি ও সমাজব্যবস্থা এবং তত্রত্য নীতিবিদ্যা ও আইনভেদে গর্ভপাত কখন অনুমোদিত, কখন দণ্ডিত। স্থানকাল ভেদেও গর্ভপাত বিষয়ক ধারণা ভিন্ন, কালের কথা পূর্বেই বলেছি, এখন দেশের কথা বলি। অতি সামান্য কারণে গর্ভনাশ করা হয় পূর্ব ইউরোপে। পক্ষান্তরে অনেক সভ্য দেশেও ধর্ষণ, অত্যাচার প্রভৃতি মানবিক এবং সামাজিক কারণও যথেষ্ট নয়। এমন কি আদিম সমাজেও অনেকটা এই রকম। কোথাও গুরুতর অপরাধ, তীব্রভাবে নিন্দিত। কোথাও অনুমোদিত, এমন কি অবশ্যকর্তব্যরূপেও বিবেচিত হয়েছে, দক্ষিণ আমেরিকার 'মোটাকো' সম্প্রদায়ের প্রথম গর্ভ পাত করাই নিয়ম।

নতুন পৃথিবীতে গর্ভপাত প্রসঙ্গে যে তিনটি মনোভাব প্রকট হয়ে উঠেছে তাদের একটিকে আমরা সবাই চিনি। পুরনো পৃথিবীর সেই কঠোর নিষ্করুণ মনোভাব, যা প্রবলভাবে গর্ভপাতের বিরোধিতা করে এসেছে। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় মনোভাব—অংশতঃ উদার এবং পূর্ণতঃ উদার মনোভাব—সম্পূর্ণরূপে নতুন পৃথিবীর সৃষ্টি। গর্ভপাতের প্রশ্নে, অতএব, সমগ্র পৃথিবী তিনটি শিবিরে বিভক্ত। ভীরু সংরক্ষণশীল আর মধ্যপন্থী আর সাহসী চরমপন্থী।

সংরক্ষণশীল ভীরু শিবিরে যারা জমায়েৎ হয়েছে তারা সবাই উটপাখির মত মুখ ঢুকিয়ে রাখতে চায়। পরিবর্তনশীল সমাজের নতুন নতুন সমস্যাগুলির সঙ্গে মোকাবিলা করার সাহস এদের নেই। চোখ বুঁজে এদের ধারণা করতে ভাল লাগে: যা আছে তাই ভাল। সনাতন নীতি পরিবর্তন করা কি সাজে?

ধর্মীয় শুদ্ধি কিংবা জনসংখ্যাবৃদ্ধিপ্রয়াস, এই দুই কারণে এরা গর্ভপাতের ঘোর বিরোধী। শুধুমাত্র ডাক্তারী কারণে, অর্থাৎ গর্ভাবস্থায় কিংবা প্রসবকালে মাতার গুরুতর ক্ষতি বা প্রাণসংশয় হতে পারে, গর্ভপাত বৈধ। ইউরোপের কয়েকটি দেশে (বেলজিয়ম, পর্তুগাল, স্পেন, মাল্টা, প্রজাতন্ত্রী আয়র্ল্যাণ্ড), লাতিন আমেরিকা ও আফ্রিকার অধিকাংশ দেশে এবং এশিয়া ও ওসিয়ানিয়ার (বার্মা, ইন্দোনেশিয়া, দক্ষিণ ভিয়েতনাম, ফিলিপাইন) অনেকগুলি দেশে এই নিয়ম।

চরমপন্থীরা সত্যই দুঃসাহসের কাজ করেছে নারীকে তার বাসনামত গর্ভপাতের অধিকার দিয়ে। বিস্ময়কর মহাকাশযানের পথিকৃৎ যে দেশ সেই

রাশিয়া-ই এব্যাপারে প্রথম প্রবর্তক, নিষিদ্ধমূলক গর্ভপাত আইনের বিলোপ-সাধন ঘটিয়েছে ১৯২০-এ। তারপর মহাজনের পথ অনুসরণ করেছে ইউরোপের আরও কয়েকটি দেশ, যেমন, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরী, পোল্যাণ্ড, যুগোশ্লাভিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া। এবং গর্বের কথা এশিয়া-ও পিছিয়ে নেই, জাপান গর্ভপাতের কালিমা তুলে নিয়েছে। চরম উদারতার ফলাফল আরও কয়েকটি অতি সভ্য ও অতি উন্নত দেশকে মুগ্ধ করেছে। সত্তর দশকে প্রজাতন্ত্রী চীন, প্রজাতন্ত্রী জার্মান, সুইডেন, ডেনমার্ক, ফিনল্যাণ্ড, আমেরিকার চারটি রাষ্ট্র (আলাস্কা, হাওয়াই, নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন), এসব দেশের নারীরা তাই স্বেচ্ছা-গর্ভপাতের অধিকারিণী। আশ্চর্য কাণ্ড, এই দলে আছে টিউনিসিয়া-ও, প্রথম ঐশ্লামিক রাষ্ট্র। সম্প্রতি ভিড়েছে সিঙ্গাপুর, অতি সম্প্রতি ফ্রান্স এবং অষ্ট্রিয়াও। প্রসঙ্গতঃ বলে রাখা ভাল, এই সব দেশগুলিতে সাধারণতঃ তিনমাসের মধ্যেই এরূপ গর্ভপাত করা হয় এবং কারণটা যাই হোক না কেন, নারীর অনুরোধ গর্ভপাতের জন্যে যথেষ্ট এবং এগর্ভপাত সম্পূর্ণরূপে বৈধ।

অতি সীমিত আর অতি উদার, এই দুই চরম মতবাদের মাঝে রয়েছে মধ্যপন্থী দেশগুলি, এখানে ডাক্তারী কারণ ব্যতিরেকেও গর্ভপাত সম্ভব। বহুবিধ সামাজিক আন্দোলনের পথিকৃৎ সুইডেন অংশতঃ উদার মতবাদের প্রথম প্রবক্তা (১৯৩৮), এর দেখাদেখি স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার অন্যান্য দেশগুলি, নরওয়ে, ডেনমার্ক এপথে এসেছে। গর্ভিণীর প্রাণ এবং স্বাস্থ্য রক্ষার্থে, জন্মগত কিংবা বংশগত কারণে বিকৃত শিশু নিষ্কৃতিলাভপ্রয়াসে, মানবিক কারণে (ধর্ষণ, ইনসেষ্ট বা অত্যাচার, পনেরোর নীচে গর্ভ) এবং সামাজিক-আর্থিক কারণে (যেমন, বহু প্রসবিনী, অল্প ব্যবধানে গর্ভ, অধিক সংখ্যক সন্তান) গর্ভপাত এখানে সিদ্ধ।

আইসল্যাণ্ড, ফিনল্যাণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড, এবং পশ্চিম জার্মানীতে এরকম একটা উদার নীতির চলন আছে।

গ্রেট ব্রিটেনও এই দলে নাম লিখিয়েছে, ১৯৬৮, ২৭ এপ্রিল-এ। তারপর কমনওয়েলথ অন্তর্ভুক্ত কিছু দেশ এগিয়ে এল—সিঙ্গাপুর, ভারত, জাম্বিয়া, সাইপ্রাস, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া। গর্ভপাত নীতি সবচেয়ে উদার সিঙ্গাপুরে, এর পরেই ব্রিটেনে।

মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে বর্তমানে পৃথিবীর অর্ধেক মানুষ বাস করে সেই দেশে গর্ভপাত যেখানে সামাজিক-ডাক্তারী কারণে সিদ্ধ কিংবা বাসনা-মাত্রই সম্ভব। প্রসঙ্গতঃ বলি, এই গর্ভপাত অবৈধ ছিল প্রতিটি রাষ্ট্রেই, ১৯১২-এ।

গর্ভপাত নামক নাটকের কুশীলব দুজন, কোন একটি কারণে অনাগত জীবনের বিরুদ্ধে একজন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, একে বলা যাক গর্ভঘাতিনী (Abortionee), অন্যজনে সেই ষড়যন্ত্রে সহায়তা-হস্ত প্রসারিত করেছে কোন একটি উপায়ের আশ্রয়ে, ইনি গর্ভপাতক (Abortionist)। এই নাটকের প্রারম্ভে আছে উদ্দীপন বিভাব, গর্ভপাতচিন্তার উৎস ; সঞ্চারী হচ্ছে গর্ভপাতন ক্রিয়ার একটি উপায়। এখন, গর্ভপাতের কারণ, গর্ভঘাতিনী, গর্ভপাতক, গর্ভপাতের উপায়, এই চারটি বিষয়ের আলোচনা করব।

প্রথমেই কারণ বিচার। মানবেতিহাসে অজস্র কারণ লিপিবদ্ধ আছে কিন্তু প্রত্যেকটিই একটি বিশেষ গুণ দ্বারা চিহ্নিত। কারণটি যাই হোক না কেন, গর্ভঘাতিনীর কাছে সেটা অপ্রতিরোধ্য, এবং এতই শক্তিশালী যে তার পানে ধাবিত হওয়া ছাড়া নান্যেব গতিরন্যথা। সুতরাং গর্ভপাতকে বলা যেতে পারে অনন্যগতি নারীকৃত অবশ্যসম্পন্ন একটি ক্রিয়া।

প্রাণের চেয়েও প্রিয় যে সন্তান সেই যদি কখন অপ্রিয় হয়, হবে তিনটি কি চারটি প্রধান কারণে, যেমন অর্থগত, স্বাস্থ্যগত, ব্যক্তিগত, লজ্জাগত কারণে এমনটি হতে পারে, তখন গর্ভপাতের প্রশ্ন প্রায়ই জাগে। সত্যি বলতে গর্ভপাতনের সবচেয়ে বড় কারণ এই অবাঞ্ছিত গর্ভই।

রমণীচিত্ত বিশ্লেষণে দেখা যাবে, অপ্রিয় এই অনুভাবের জন্যে মোটামুটিভাবে ৩০% ক্ষেত্রে আর্থিক দুরবস্থাই দায়ী, ২৮% ক্ষেত্রে অধিক সন্তান সংখ্যা, ২৫% ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সুখসুবিধার লালসা, ১৭% ক্ষেত্রে বিবিধ সমস্যা।

বৈধ সন্তান এবং অবৈধ সন্তানে ভেদজ্ঞান যতদিন প্রবল থাকবে, গর্ভপাতের পরমায়ুও ততদিন। বস্তুতঃ অধিকাংশ গর্ভপাতে আত্মরক্ষার করুণ মিনতিই স্পষ্ট। কুমারী গর্ভ নিন্দিত, পরপুরুষকৃত গর্ভ কিংবা প্রোষিতভর্তৃকার গর্ভ গ্লানিকর, সপত্য বিধবা সমাজের কলঙ্ক, এবংবিধ ক্ষেত্রে গর্ভপাত বিনা নান্য পন্থাঃ, এগর্ভপাত কি আত্মরক্ষামূলক নয়? আর্থিক দুরবস্থায় এবং দুর্বল স্বাস্থ্যের অজুহাতে কেউ যদি গর্ভনাশে অভিলাষ জানায়, এই একই আত্মরক্ষামূলক মনোভাবের পরিচয় পাব।

লজ্জা-মান-ভয় অপেক্ষাও আর্থিক দুর্গতি গর্ভপাতের বহুদৃষ্ট কারণ, এর পরেই স্বাস্থ্যগত কারণ। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিই : স্ত্রী রোজগেরে কিংবা এখনও ছাত্রী কিংবা তার স্বাস্থ্য বড়ই দুর্বল। স্থানাভাব, স্বল্প আয়, সন্তানের শিক্ষাব্যয়। অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে গর্ভ, অধিক সন্তান, স্তন্যদানকালে গর্ভ।

এত দুর্বল স্বাস্থ্য নিয়ে গর্ভভার কি সইবে? সবে বিয়ে করেছি এখনই গর্ভ, কী লজ্জার! কিংবা সুখভোগের আশায়, যেমন, সবে বিয়ে করেছি, এখনও বছর পেরোয়নি। তিন-চারটি এসে গেছে আরেকটি বোঝায় ভেঙে পড়ব—সংখ্যা-নিয়ন্ত্রণ গর্ভপাতের একটি বড় কারণ। আরেকটি বড় কারণ ব্যর্থনিয়ন্ত্রণ, অর্থাৎ অনির্ভরযোগ্য পদ্ধতি।

আদিম সমাজেও গর্ভপাত আছে এবং সেই কারণগুলি প্রায় সভ্য সমাজের মতই। এখানেও দারিদ্র্য আছে, আছে স্থানাভাব। খাদ্যাভাবে বা খাদ্যের জোগান কমে যাবে, এভয়ে গর্ভপাত করায় অনেক আদিবাসী, দৃষ্টান্ত, পশ্চিম আফ্রিকার যাযাবর জাতি এবং হটেনটট সম্প্রদায়। অনেক আদিম সমাজেই সমগ্র গর্ভাবস্থায় এবং স্তন্যদানকালে মিলন নিষিদ্ধ, এরূপ দীর্ঘকালব্যাপী রতি-বিরতি পুরুষকে উন্মনা করবে নিশ্চয়ই তখন হয়ত স্বামীর ভালবাসা হারাতে হবে—গর্ভপাতের একটি আশ্চর্য-সুন্দর কারণ! একটি ঘটনাস্থল: ফিজি দ্বীপপুঞ্জ। আবার, নিছক সংখ্যানিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যেও অর্থাৎ তিনটির বেশী সন্তান বা গর্ভ হলেই নাশকতামূলক কার্যকলাপ অনেক সমাজেই বৈধ। এমন কি যোনিমুখ ঢিলেঢালা হয়ে যাবে বা মূলাধার অক্ষত থাকবে না, এমন একটা যৌন উদ্দেশ্যও কার্যকরী থাকতে পারে। কখন আরও সামান্য কারণে, যেমন নাচতে অসুবিধা হবে এই অজুহাতে লেসু-দ্বীপপুঞ্জবাসিনী গর্ভ নষ্ট করায়। কখনবা এটাই অবশ্যকর্মরূপে বিবেচিত, যেমন, দক্ষিণ আমেরিকার 'মোটাকো' সম্প্রদায়ে প্রথম গর্ভ ঈশ্বরকে নিবেদন করাই নিয়ম। মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে, আদিম গর্ভপাতের কারণ প্রধানত: তিনটি: এক, অটুট দেহ সৌন্দর্য ও অক্ষত যৌনমাধুরী উপভোগ। দুই, বাধ্যতামূলক রতিবিরতি পরিহার। তিন, নির্দায়, নির্ঝঞ্ঝাট, স্বাধীন জীবনযাপন।

এবারে গর্ভঘাতিনী প্রসঙ্গ। মরিয়া সেই নারী, যার গর্ভে অবাঞ্ছিত সন্তান, এই একটি কথার আঁচড়েই গর্ভঘাতিনীর বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে। সাধারণত: তিন ধরনের নারী গর্ভনাশা পথে পা বাড়ায়। এক, কুমারী, বিধবা, সাম্প্রতিককালে বিবাহবিচ্ছেদকারিণী। দুই, পরপুরুষগামিনী বিবাহিতা স্ত্রী বা প্রোষিতভর্তৃকা। তিন, সন্তানবতী স্ত্রী আর সংখ্যাবৃদ্ধি চায় না। মনে হতে পারে এদের মধ্যে কুমারী (কিংবা বিধবা) মায়েরাই বুঝি, এবং এরকম মনে হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়, এর আশ্রয় নেয় সবচেয়ে বেশী। না তা নয়, বিবাহিতা রমণীরাই সংখ্যা-গরিষ্ঠ, ডেনমার্কে সমগ্র গর্ভঘাতিনীর মধ্যে শতকরা ৭৬ জন বিবাহিতা, চিলিতে শতকরা ৮৫, জাপানে শতকরা ৬০, এবং আমেরিকায় শতকরা ৫৫। বয়স্কা

এবং বিবাহিতা রমণীরাই সর্বাধিক পরিমাণে গর্ভপাত করায়, কারণ সংখ্যা-নিয়ন্ত্রণের এবং ব্যর্থ জন্মনিয়ন্ত্রণের সমস্যা এদেরই বেশী। উঁচু মহলে অর্থাৎ আর্থিক-সামাজিক উচ্চ স্তরে জন্মনিয়ন্ত্রণের রেওয়াজ সবচেয়ে বেশী, এখানে কোন কারণে ব্যর্থ হলেই গর্ভপাতের ডাক পড়বে নিশ্চিত। সবার নীচে অশিক্ষিত, দরিদ্র এবং নিম্ন সমাজের বাসিন্দা, এখানে কি জন্মনিয়ন্ত্রণ কি গর্ভপাত কোনটাই নেই। এদুয়ের মাঝে, মধ্যবর্তী স্তরে যাদের বসবাস, যাদের সামাজিক-আর্থিক স্তর ক্রমবর্ধমান, তারাই কিন্তু গর্ভপাতের বড় খদ্দের। এদের কাছে জন্মনিয়ন্ত্রণের সবচেয়ে বড় উপায়, কখনবা একমাত্র উপায়, এই গর্ভপাতই। প্রসঙ্গতঃ বলি, রমণীরা প্রথমবারে ভয় পায়, পাপ-পুণ্য বা নীতি-দুর্নীতির অন্তর্দ্বন্দ্বে বাধা আসে, কিন্তু একবার গর্ভপাত করালে সাহস বাড়ে, মনের ভয়ও ভেঙ্গে যায়, দ্বিতীয়-তৃতীয়বারে অবলীলাক্রমে 'গর্ভপাতক'-এর দ্বারস্থ হয়।

গর্ভঘাতিনীর শিরে যতই অভিশাপ, যতই নিন্দা বর্ষিত হোক না কেন, সে যে সংখ্যানিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য নিয়েই এর শরণ নিয়েছে তাতে কোন ভুল নেই। এনিষ্ঠুরতা তার সংগ্রামী মনেরই পরিচয়। অর্থাৎ গর্ভপাতের অর্থই হল সংখ্যানিয়ন্ত্রণের পথে পা বাড়িয়েছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় গর্ভপাত ছাড়া অন্য পথের নিশানা জানে না কিংবা যেটা জানে সেটা নির্ভরযোগ্য নয়।

গর্ভনাশ-অভিলাষিণীর মনোবাসনা পূরণই যাদের পেশা তাদেরকে বলি গর্ভপাতক। প্রধানতঃ তিনটি দলে এরা বিভক্ত। এদের মধ্যে ডিগ্রীধারী এম. বি. ডাক্তার সবচেয়ে কুলীন। দ্বিতীয় সারিতে, এরাই দেখি দলে ভারী, রয়েছে অর্ধশিক্ষিত বা 'সেমিস্কিল্ড' নর-নারী : নার্স, ডাক্তারী দোকানের সেলস-ম্যান, কিংবা ডাক্তারী জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি, যেমন কবিরাজ, ডিগ্রীহীন রেজিষ্টার্ড ডাক্তার, হাতুড়ে ডাক্তার। 'আন-স্কিল্ড' বা অশিক্ষিত লোকেরও অভাব নেই এরা তৃতীয় শিবিরভুক্ত। এসব লোকেদের হাতিয়ার, পেটপোড়া শিকড়বাকড় থেকে সেবনীয় ঔষধ, অনশন থেকে দৈহিক পীড়ন, ইত্যাদি।

সবশেষে গর্ভনাশ-প্রচেষ্টা প্রসঙ্গ। শতাব্দীর পর শতাব্দী জানা অজানা কত না বিষ (পারদ, সীসা, আর্সেনিক, ফসফরাস, কুইনাইন, আরগট) নিয়োজিত, কল্পনাসম্ভব প্রতিটি যন্ত্র (গাছের শিকড়, কুরুশ কাঁটা, শলাকা) প্রবিষ্ট এবং প্রতিটি 'ম্যানুভর' বা প্রক্রিয়া ব্যবহৃত। মোটামুটিভাবে বলতে পারি, প্রধানতঃ তিনটি উপায়ে গর্ভ নষ্ট করা হয়, কোন কিছু খেয়ে, কিংবা যোনিমধ্যে কোন কিছু প্রবেশ করিয়ে কিংবা বাইরে থেকে কিছু প্রয়োগ করে। এবং এব্যাপারে আদিম ও সভ্য সমাজে বেশ মিল আছে। আদিম সমাজের তুকতাক (ম্যাজিক)

আমাদের নেই, পরিবর্তে আছে বিজ্ঞানসম্মত অপারেশন, বাদবাকী আর সাই এক।

শেষোক্ত পদ্ধতিটি, অর্থাৎ বাইরে থেকে কিছু প্রয়োগ করে গর্ভনাশ প্রচেষ্টা আদিম সমাজেই সমধিক প্রচলিত, তবে সভ্য সমাজে দুর্লভ নয়। অতিরিক্ত দৈহিক পরিশ্রম (ভারী জিনিস তোলা, লম্ফঝম্প), উঁচু জায়গা থেকে গড়িয়ে পড়া বা লাফ দেওয়া, তলপেটে চাপ দেওয়া কিংবা কিল ঘুঁসি মারা কিংবা গরম প্রলেপ দেওয়া—ভাবখানা এই যে গর্ভস্থ ভ্রূণকে কোনমতে একবার শিথিল করতে পারলেই হয়, তারপর সুড়সুড় করে বেরিয়ে আসবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এমনটি হয় না, শুধু আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হওয়াই সার।

দ্বিতীয় পদ্ধতিটির নাম সেবনীয় ঔষধ। বাজারে অজস্র ঔষধ ছড়িয়ে আছে, এদের প্রধান উপকরণগুলি এই: আরগট, কুইনাইন, এপিয়ল এবং কড়া জোলাপ। গর্ভমুক্তিকামী রমণীরা প্রথমেই হাত বাড়ায় এখানে। কারণ, নিজে নিজেই চেষ্টা করতে চায় এবং স্বল্পব্যয়ে কার্যসিদ্ধিলাভের প্রয়াস আরেকটি কারণ। শেষোক্ত কারণে আর্থিক ও সামাজিক বিচারে নিম্নস্থানীয় ব্যক্তিরাই অধিক পরিমাণে গর্ভঘ্ন (Abortifacient) ঔষধের পক্ষপাতী।

পরিসংখ্যান বিষয়ক তথ্যে জানা গেছে, ঔষধাদি প্রয়োগে শতকরা ৭ থেকে ১৪, গড়ে ৯% ক্ষেত্রে গর্ভপাতন সম্ভব। এবং কোন কোন মানিনী বনিতাও সাফল্যের দাবী করেন। এঁদেরকে কয়েকটি তথ্য স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। প্রথমতঃ এটা হয়ত বিলম্বিত ঋতু পরিষ্কারের ঘটনা, আদৌ গর্ভস্রাব নয়। দ্বিতীয়তঃ, পূর্বোক্ত সৌভাগ্যবতীদের কেউ কেউ হয়ত স্বতঃস্ফূর্তভাবেই চ্যুতগর্ভ হতেন, ঔষধ ব্যবহারে এই কালটা শুধু এগিয়ে এসেছে এই যা। তৃতীয়তঃ, লেড, আর্সেনিক প্রভৃতি মারাত্মক বিষক্রিয়ায় সমগ্র দেহ কাতর, গর্ভপাত এরই পরিণতি। শিশুর সহ্যশক্তি কম বলেই প্রথমেই মারা যায় এবং শিশু অচিরেই বেরিয়ে আসে। চতুর্থতঃ, সংখ্যাবিপুলতাই বলে দিচ্ছে যথার্থ গর্ভঘ্ন ঔষধ বলে কিছু নেই। বস্তুতঃ এমন কোন সেবনীয় ঔষধ নেই যা মায়ের ক্ষতি না করে অবাঞ্ছিত গর্ভের মুক্তি এনে দিতে পারে। এবং এ. এফ. গুটমেকার, এফ. জে. টাশিগ আদি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ডাক্তারের অভিমতও এই।

ঔষধ প্রয়োগে হালে পানি না পেলে কিছু প্রবেশ করিয়ে দেয় যোনিমধ্যে। এজাতীয় প্রচেষ্টা কখন স্বয়ংকৃত, তখন দুঃসাহসে ভর দিয়ে নিজে নিজেই কোন রাসায়নিক দ্রব্য (যেমন পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট), কোন শিকড়বাকড়, কোন শক্ত দ্রব্য (কাঠি, কুরুশ কাঁটা) দিয়ে খোঁচাখুঁচি করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই

অনুকৃত। একটা শলাকা, যেমন সাউণ্ড, ডাইলেটর, জরায়ুমধ্যে প্রবেশ করিয়ে পানমুচি ভেঙ্গে দেয় ডিগ্রীহীন ডাক্তার, নার্স কিংবা কবিরাজ। কিংবা শক্ত ক্যাথিটার দিয়ে জরায়ু অভ্যন্তরে রাসায়নিক সংমিশ্রিত জলীয় দ্রব্য প্রবেশ করিয়ে দেয়। কিংবা ডিগ্রীধারী ডাক্তার কর্তৃক বিজ্ঞানসম্মত অপারেশন। শেষোক্ত পদ্ধতিটি মন্দের ভাল, তবুও ক্ষতির সম্ভাবনা যে সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত তাই বা বলি কেমন করে?

বাদবাকী প্রতিটি উপায়ের পথে পথে কণ্টক যে ছড়ানো তা নিশ্চিত। জরায়ুভেদ, যোনিক্ষত প্রভৃতি মারাত্মক ক্ষত, প্রাণঘাতী রক্তপাত, ভয়ঙ্কর বীজাণুদূষণ, এমন কি মৃত্যুর হিমশীতল পরশ, কোনটাই অঘটন নয়। আবার প্রাণে যদি বাঁচে তো, ব্যাধিগ্রস্ততার (বন্ধ্যাত্ব, স্থায়ী শ্রোণীপ্রদাহ ইত্যাদি) বোঝা বয়ে বেড়ায়। ক্ষয়-ক্ষতির বিচারে, অপারেশনমূলক পদ্ধতি শতগুণে শ্রেয়ঃ, কিন্তু যে অসুন্দর পরিবেশে ঢিলেঢালাভাবে এঅপারেশন করা হয়, এবং চোরাপথে অপারেশন করলে এমনটি হবেই, তাতে কিছু কিছু ক্ষতি গর্ভ-ঘাতিনীকে স্পর্শ করতে পারে। এবং করতেও দেখেছি অনেক ক্ষেত্রে।

প্রাণের মায়া এদেরকে বেঁধে রাখতে পারে নি, স্বাস্থ্যহানি, ব্যাধিগ্রস্ততা প্রভৃতি নানান দুর্ঘটনায় গর্ভপাতের পথ কণ্টকাস্তীর্ণ জেনেও ক্ষান্ত হয়নি, এরা এগিয়েই গেছে, এগিয়ে যাওয়া ছাড়া আর যে কোন পথ নেই। সেই আবহমান কাল থেকেই, সভ্যতার আদি ও প্রথম যুগ থেকেই। শাস্তির ভয় দেখিয়ে, একদা সত্য সত্যই মৃত্যুদণ্ডের মত চরম শাস্তিবিধান ছিল, কিংবা আইন করে এটা বন্ধ করা যায় নি। সমাজব্যবস্থা যতই কঠোর হোক না কেন, আইন যতই রক্তচক্ষু হোক না কেন, গর্ভপাত হচ্ছে বা হবে। সমগ্র কাল ধরে, সসাগরা পৃথিবীই তার সাক্ষী। মাঝখান থেকে যত দুঃখভোগ সবই কিনা নারীর: উজাড় করা অর্থব্যয়, মর্মান্তিক কষ্ট স্বীকার, অজস্র লোকনিন্দা, দুঃসহ ব্যাধিগ্রস্ততা, শোচনীয় মৃত্যু। সেই হতভাগিনীকে শোষণ করবে এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী, 'এ্যাবর্সনিষ্ট' যাদের নাম। হাতুড়েদের হাতে পড়ে কত শত প্রাণ অকালে ঝরে যাবে কিংবা শিকার হবে ব্যাধিগ্রস্ততার। আর সমাজ-আইনের কথা শুনে কোন সুবোধ বালিকার গর্ভ যদি সযত্নে লালিত হয়, সেই সন্তান ঘৃণা বা অনাদরই কুড়ুবে, পরিবারে আনবে আকাশজোড়া কলঙ্ক, কিংবা প্রজাভারে ক্লিষ্ট সংসার আরও দুর্বিষহ হয়ে উঠবে। এর কি কোন প্রতিকার নেই? এদুঃসহ যাতনা মানুষ আর কতকাল বয়ে বেড়াবে?

সমাধানের একটি সুন্দর পথ বর্তমান আইনের পরিবর্তন, যার ফলে গর্ভ-

পাতের নিষিদ্ধক্ষেত্র আরও সঙ্কুচিত হবে এবং প্রয়োগক্ষেত্র হবে উদার, বিস্তৃত এবং বিশাল। প্রথমে রাশিয়া, তারপর একে একে অনেক দেশই আইন পরিবর্তনের যৌক্তিকতা স্বীকার করে নিয়েছে, অতি সম্প্রতি ভারতীয় আইনের জনক গ্রেট ব্রিটেনও।

যে আইন নারীকে রক্ষা করতে প্রতিশ্রুত, যে রাষ্ট্রের কর্তব্য নারীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিধান, সেই আইন আর সেই রাষ্ট্রই কিনা নারীকে বাঘের মুখে ঠেলে দিয়েছে। নারী কেন এত বেপরোয়া তার হদিশ রাখে না, সংশোধন দূরে থাক, উল্টে কিনা একগাদা শাস্তির ফর্দ তুলে ধরেছে। নিষেধ করেছে তাই না এটা অবৈধ। তাই না সৎ অভিজ্ঞ ডাক্তারে গর্ভপাত থেকে শত হস্ত দূরে থাকতেই ভালবাসে। এতে যে দাঁও-শিকারী ডাক্তার বা হাতুড়েদেরই প্রশ্রয় দেওয়া হয় এবং ফলাফল হিসেবে চরম বিপদের মুখোমুখি হতে হয় অবাঞ্ছিত গর্ভমুক্তি-কামিনীকে, এটা কি কেউ ভেবে দেখেছে? অর্থাৎ যে আইন রক্ষাকবচ দেবে, সেই কিনা আজ ভক্ষকের ভূমিকায়!

গর্ভপাত অভিলাষিণীর মনোবেদনার গভীরে প্রবেশ করতে হবে এবং যে তীব্র কারণে, যে করুণ রঙীন পটভূমিকায় এমন একটা উগ্র বাসনা জাগে, সেই অবস্থার প্রতিকার, সেই ক্ষেত্রগুলির নির্বাসন ঘটিয়ে (চাকুরী, গৃহব্যবস্থা, গর্ভবতী রমণীর সুব্যবস্থা ইত্যাদি সামাজিক ও আর্থিক বিষয়গুলির উন্নতি সাধনে এটা সম্ভব) সহায়তা করতে হবে। আর তা যদি নাই পারি, আইনের বাঁধন খুলে দিতে হবে বৈকি। রক্ষক আইন কিনা ভক্ষক হবে এ কেমন কথা!

বৈধকরণের স্বপক্ষে সবচেয়ে বলবান যুক্তিটি এই, হাতুড়েদের অত্যাচার থেকে এবং অবৈধ গর্ভপাতের বিপদ-আপদের হাত থেকে নারীকে রক্ষা করা। এবং এই একটিমাত্র কারণই যথেষ্ট। কেননা বৈধ এবং অবৈধ গর্ভপাতে মৃত্যু-হারের পার্থক্য অনেক। প্রতি বৎসর ভারতে প্রায় চল্লিশ লক্ষ নারী গর্ভপাত করায়। এদের মধ্যে প্রায় দু লক্ষ নারী মৃত্যুমুখে ঢলে পড়ে (ডঃ এস. চন্দ্রশেখর)। পক্ষান্তরে হাঙ্গেরী এবং চেকোশ্লোভাকিয়া-য়, এই মৃত্যুহার প্রতি লক্ষে ছ জনেরও কম। শুধু তাই নয়, গর্ভনাশক প্রক্রিয়াসুলভ ক্ষয়ক্ষতি কমে আসবে, কম হবে ব্যাধিগ্রস্ততার হারও।

আইন পরিবর্তনের স্বপক্ষে আরও অনেক যুক্তি আছে। প্রথমেই উল্লেখের দাবি রাখে অবাঞ্ছিত সন্তান। এমন সন্তান যে ভাল হয় না, যথেষ্ট সামাজিক এবং মানসিক প্রমাণ আছে। ভুললে চলবে না, গর্ভঘাতিনীর গর্ভমাত্রই অবাঞ্ছিত হতে বাধ্য।

পুরাকালীন বিশ্বাস (সামাজিক) এবং ধর্মীয় সংস্কারকে ভিত্তি করে একদা যে আইন প্রণীত হয়েছিল, সেই একই আইন দিয়ে বর্তমান কালের যাবতীয় গর্ভ কি বিচার করা যায় ? যায় না বলেই প্রচলিত গর্ভপাত আইন কালবিরুদ্ধ। অর্থাৎ এযুগে খাপ খায় না, কারণ, সেই ধর্মীয় নিষ্ঠা নেই, নেই সেই সামাজিক ব্যবস্থা। পরিণতিস্বরূপ তাৎকালিক যৌননীতিগুলিও (বিবাহপূর্ব ব্রহ্মচর্য এবং বিবাহোত্তর একপরায়ণতা) ক্রমশঃ দূরে সরে যাচ্ছে। আর সেই শূন্য স্থান ভরাট হচ্ছে অবাঞ্ছিত গর্ভ দিয়ে। সেক্স সম্বন্ধে ধ্যান ধারণা বদলে গেছে, বদলে গেছে যুবকযুবতীদের আচরণ। বিয়ের আগে মেলামেশা এখন অনেক বেশী, এত বেশী যে সবারই চোখে পড়ে। কিন্তু কুমারী মাতা সম্বন্ধে আমাদের ধারণা যথা পূর্বং এবং এখনও আইন বলে, গর্ভনাশ নয় গর্ভরক্ষা কর, অর্থাৎ আরেকটি অবৈধ সন্তানের জন্ম হোক। কিন্তু কেন ? কেন একজন সারাজীবন প্রায়শ্চিত্ত করবে ?

স্বীকার করি, সামাজিক-আর্থিক স্বীকৃতি দিয়ে, উদাহরণস্বরূপ স্ক্যাণ্ডি-নেভিয়া-তে, সন্তানের অবৈধ কালিমা মুছে দেওয়া যায়। এও মানি যে, কুমারী মাতার প্রতি উদার মনোভাব, গর্ভাবস্থায় রক্ষণাবেক্ষণ ও অর্থ সাহায্য, গোপন প্রসবব্যবস্থা, অন্যত্র সন্তান পালনের বন্দোবস্ত ইত্যাদি উপায়ে, যেমনটি আছে গ্রেট ব্রিটেনে এবং অন্যান্য পাশ্চাত্ত্য দেশে, এজাতীয় সমস্যার আংশিক সমাধান সম্ভব। তবুও প্রশ্ন থেকে যায় এর চেয়েও ভাল নয় কি অনুতপ্তা রমণীকে গর্ভপাতের সুযোগ দেওয়া ? নাকি ক্ষণিক ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করবে সমগ্র জীবন ভরে। শেষে ভুলই কি বড় হবে ? জীবনের চেয়েও ? কে জানে !

ধর্ষণের বোবা কান্না, ইনসেষ্ট বা অজাচার-এর অনাসৃষ্টি যদি রূপ পায়, এবং দুষ্ট বংশগতি জাত গর্ভ যদি আলোর মুখ দেখে, সে সন্তান কি কোনদিন ভয়শূন্য চিত্ত আর সদা উচ্চ শির নিয়ে দাঁড়াতে পারবে ? মাতার প্রাণসংশয়ে গর্ভপাত সিদ্ধ, তা হলে এরাই বা নয় কেন ? প্রথমটির চেয়ে এগুলি কি কম জরুরী ?

নিছক সংখ্যানিয়ন্ত্রণের জন্যেও গর্ভপাতের প্রয়োজনীয়তা আছে, এতথ্যটুকু পৃথিবীর মুখে প্রথম ছুঁড়ে দেওয়ার স্পর্ধা দেখিয়েছে জাপান। সত্যি বলতে তিন চারটির অধিক সন্তানের মাতা গর্ভপাতে আগ্রহী হলে (অতি অল্প ব্যবধানে গর্ভের ক্ষেত্রেও) তাকে সহায়তাহস্ত প্রসারিত করাই রাষ্ট্রের কর্তব্য। আশা করা যায়, অন্ততঃ ডঃ এস. চন্দ্রশেখর-এর সুর সে কথাই শোনায়, ভারতীয় আইনে এরকম একটি ধারা সংযোজিত হবে : তিন চারটি সন্তানের মাতার

গর্ভপাত বৈধ রূপে গণ্য করা হবে যদি একই সঙ্গে বন্ধ্যাকরণ অপারেশন করা হয়।

গর্ভে যার অধিবাস, সেই ভ্রূণ মায়েরই অঙ্গ, দেহের অন্যান্য অংশে নারীর যেমন অখণ্ড অধিকার, তেমনি স্বাধিকার এখানেও। সুতরাং নারীই বিচার করবে, গর্ভনাশ বা গর্ভরক্ষা কোনটা তার কাছে প্রয়োজনীয়। জার্মানী এবং ইংল্যাণ্ডে একদা জাগ্রত নারী আন্দোলনের একটি প্রধান সূত্রের বয়ানটা এই রকমই ছিল। নারীই আপন গর্ভের নিয়ন্তা, এটা তাদের অধিকার। অনেক অধিকারই তো দিয়েছি, এটাই বা দেব না কেন? শুধু আমি কেন, পৃথিবীর অনেকেরই এরকম একটা ধারণা করতে আনন্দ লাগে। সম্প্রতিকালে নারীমুক্তি আন্দোলনের প্রবক্তরা, বিশেষ করে নারীশতবর্ষে, বলেন গর্ভপাত ব্যাপারটা একান্ত ব্যক্তিগত, এক রমণীর সঙ্গে এক ডাক্তারের ব্যাপার। গর্ভ রাখবে না ছুঁড়ে ফেলে দেবে সে নির্বাচনের অধিকার নারীমাত্রেরই আছে।

বৈধকরণের প্রশ্নে পৃথিবীব্যাপী বিতর্কের ঝড় উঠেছে। পৃথিবীর অনেক রাষ্ট্রই গর্ভপাতের কালিমা তুলে নিয়েছে, এবং বাদবাকী নিষিদ্ধ দেশসমূহে এটা আজ আর নিষিদ্ধ কথা নয়, সোচ্চার হয়ে উঠেছে লোকপরম্পরায়: কি চিকিৎসক, কি আইনজ্ঞ, কি বিচারক, কি গুণীজন সবাই অসন্তুষ্ট। অধিকাংশ লোকেরই ধারণা বর্তমান আইন যেমন অস্বস্তিকর, অস্পষ্ট তেমনি অকারণে জটিল ও নিষ্করুণ। এদের প্রার্থনা এটা আরও স্পষ্ট, আরও সহজ, আরও শিথিল হোক।

এবং আজ পর্যন্ত যতগুলি আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয়েছে প্রায় প্রত্যেকটিরই মর্মার্থ এই যে গর্ভপাত আইনের পরিবর্তন বাঞ্ছনীয়, পরিবর্তিত সমাজের দিকে লক্ষ্য রেখে আরও একটু মানবদরদী হোক, তা হলেই আইনে শিথিলতা আসবে।

প্রামাণ্য নজির হিসেবে শুধু তিনজনের উল্লেখ করব: ডাঃ হ্যাভলক এলিস, ডাঃ নরমান হেয়ার এবং ভারতের শান্তিলাল শাহ কমিটি (১৯৬৭)। এঁদের প্রত্যেকরই দৃষ্টিতে আইন পরিবর্তনের সারবত্তা স্বীকৃত।

পৃথিবীর জনমত নেওয়া হোক, সুধীজনের অনেকেই, এবং কিছু রাষ্ট্র, এবং অবাঞ্ছিত গর্ভসমস্যায় ক্লিষ্ট কিছু দম্পতি গর্ভপাত বৈধকরণের স্বপক্ষে হাত তুলবে। অনেকেই কিন্তু হাত তুলবে না, রাষ্ট্র, আইন, নীতিবাদী এবং ডাক্তার কেউ বাদ যায়নি, সবাই চড়া সুরে প্রতিবাদ জানিয়েছে, বিশেষ করে ধর্মীয় সংস্থা, যাজক, পুরোহিত এবং ধর্মভীরু ব্যক্তিরাই নিন্দা করেছে সবচেয়ে বেশী। বিশিষ্ট ব্যতিক্রম, শিণ্টো এবং বৌদ্ধ ধর্ম। প্রথমোক্ত ধর্মাবলম্বীদের বিশ্বাস, না জন্মালে ভ্রূণ মানুষ নয় আর দ্বিতীয়টিতে গর্ভপাতের বিরোধিতা নেই, হয়ত

একারণেই জাপানে গর্ভপাত বৈধকরণ এত সহজে হয়েছে এবং জাপানীরাও এ নিয়ে সরকারকে বিব্রত করেনি। বাদবাকী অন্যান্য সব ধর্মের সুরও সেই খ্রীষ্টধর্মের মতই, 'কাউকে হত্যা করবে না'[৩], বাইবেলীয় এই অনুজ্ঞাই চরম পথনির্দেশ দিয়েছে। এই ধর্মই আত্মার আবির্ভাবহেতু ভ্রূণকে মানুষ হিসেবে গণ্য করতে শিখিয়েছে, গর্ভপাত অতএব হত্যা করার মতই পাপকর্ম। অর্থাৎ কিনা গর্ভপাত বিষয়ক আইনের মধ্যে ধর্মীয় অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

দৃষ্টির স্বচ্ছতা নেই, প্রচলিত ভাবনার বাইরে পা বাড়াতে চায় না, এরাই অর্থাৎ মর‍্যালিষ্টরাই আঁৎকে উঠেছে সবচেয়ে বেশী। গর্ভ নামক শাস্তির ভয় না থাকলে দুর্নীতি বাড়বে: দুষ্ক্রিয়কারীরা উদ্দাম হবে, যৌন অনাচার (অবিবাহিতদের যৌন সংসর্গ, ব্যভিচার) প্রশ্রয় পাবে—এদের এই বক্তব্যে বিশেষ কোন যুক্তি কিন্তু নেই। অনেকটা সেই ডাইনামাইট বা বার্থ কন্ট্রোলের বিরুদ্ধযুক্তি আর কি! কিছু রমণীর কাছে স্খলনচিহ্ন মুছে ফেলার বড় হাতিয়ার হতে পারে, তাই বলে অন্য রমণীরা কি ভেসে যাবে? কারণ এটা তো ঠিক যে বিবাহিতা রমণীরাই অধিক গর্ভপাত করায়। হাত বাড়ালেই গর্ভপাত আছে, তাই হয়ত জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে ক্যাজুয়াল বা লঘু মনোভাব গড়ে উঠতে পারে, কিন্তু গর্ভপাতের পর অনেকেই যে জন্মনিয়ন্ত্রণে সিরিয়স বা নিয়মনিষ্ঠ হয়ে উঠে এটাও তো মিথ্যা নয়।

এই মাত্র উল্লেখ করা ধর্মীয় ধারণা এবং নীতিবিষয়ক ভাবনা সমাজ-জীবনের প্রতিটি স্তরেই প্রবেশ করেছে, জোয়ারের জলের মত। ফলে হয়েছে কি, গর্ভপাতকে কেউ সুনজরে দেখে না, রাষ্ট্র-নেতা, আইনজ্ঞ, ডাক্তার, সবাই এই দলে। রাষ্ট্র আর আইন নিষিদ্ধ করেছে, ঘোষণা করেছে ছুঁলেই শাস্তি পাবে। ডাক্তারী শাস্ত্রে গর্ভপাতের প্রয়োগক্ষেত্রগুলি ছক কাটা আছে, কিন্তু সেখানেও মানবতা-বিরোধী মনোভাব, সামাজিক আর্থিক ইত্যাদি ক্ষেত্রগুলিও উপেক্ষিত। ডাক্তারেও তাই গর্ভমুক্তিকামীকে ফিরিয়ে দেয়।

উগ্র দেশপ্রেমী এবং কট্টর জাতীয়তাবাদীরা আপত্তি জানিয়েছে: সৈনিক চাই, জন্মহার কমে যাচ্ছে, আরও মাত্রা চাই। সুতরাং গর্ভপাত সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ হোক। একটি দৃষ্টান্ত: রাশিয়া। ১৯২০-এ গর্ভপাতের দ্বার খুলে দিয়েছিল যে রাশিয়া, সেই রাশিয়াই কিনা ১৯৩৬-এ গর্ভপাত বন্ধ করে দেয় এবং ১৯৫৫ নভেম্বর পর্যন্ত নিষিদ্ধ ছিল। কারণটি খুব সম্ভবতঃ এখানেই।

৩। Thou shall not kill

বিরুদ্ধবাদীদের সবচেয়ে বড় যুক্তিটি এই: গর্ভপাত রোধ করার জন্যে জন্মনিয়ন্ত্রণই যথেষ্ট। আইন পরিবর্তনের কি প্রয়োজন? গর্ভপাতের বদলে কেউ যদি জন্মনিয়ন্ত্রণের মালা নেয়, এসমস্যার কিছুটা সমাধান সম্ভব। এতে যে অবাঞ্ছিত গর্ভসংখ্যা বিপুলভাবে হ্রাস পাবে তা নিশ্চিত, তথাপি জন্মনিয়ন্ত্রণই সব নয়। কেননা এমনও অনেক অস্বস্তিকর ক্ষেত্র মাঝে মধ্যে আবির্ভূত হবে যেখানে গর্ভপাত আইনের ধারাগুলি শিথিল করা ছাড়া উপায় নেই। এই ধর্ষণের কথাই ধরুন না কেন। জড়বুদ্ধি রমণীর গর্ভ আরেকটি উদাহরণ। তা ছাড়া এমন ঘটনারও অভাব নেই যেখানে জন্মরোধক দ্রব্যাদির সুযোগ নেই বা সুযোগ মেলে না। বিবাহিতা রমণীদের মত অবিবাহিতা রতি-অভ্যস্ত নয়, সংযমের বাঁধ হয়ত একদিন খসে যায়, কিংবা জবরদস্ত নায়কের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়, তখন, হা হতোস্মি, কোথায় জন্মনিয়ন্ত্রণ? কিংবা বিবাহের ছলনায় ভুলি সেই প্রবঞ্চিতা কুমারী, দেহে যার অনাগত জীবনের স্পন্দন, তার কি হবে? নিষ্ঠুর আইনের যূপকাষ্ঠে শহীদ হওয়া ছাড়া তার কি অন্য কোন গতি নেই? প্রসঙ্গত: বলি, পাশ্চাত্ত্য দেশগুলিতে, যেমন ইউরোপে আমেরিকায় জন্মনিয়ন্ত্রণের ক্রমবর্ধমান ব্যবহার এবং ব্যাপক প্রচার সত্ত্বেও গর্ভনাশের অভ্যাস কমা দূরে থাক, আতঙ্ক হয়ে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ শিক্ষা ও প্রাচুর্যের ঠেকা দিয়ে গর্ভপাত বন্ধ করা যায় না। এক কথায়, উদার নীতি ছাড়া সমাধান নেই।

বলা হয়েছে, গর্ভপাত হত্যা, অনাগত জীবনের বিরুদ্ধে হীন ষড়যন্ত্র। পাল্টা প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করে, সত্যই কি একটা জীবনকে হত্যা করা হচ্ছে? এ-জীবন যদি আলোর মুখ দেখে, সেই জীবনের জন্যে কত দুঃখ লাঞ্ছনা অপেক্ষা করছে সেটা কি কখন ভেবে দেখেছেন? পিতৃপরিচয়হীন সন্তান সমাজবিদ্বেষী হয়ে সমাজেরই বুকে ঘুরে ফিরে মরবে, পিতামাতার কাছে শুধু অনাদর কুড়ুবে, এভাবে একটি নিষ্পাপ জীবনকে সারা জীবন দগ্ধে দগ্ধে বেড়াতে হবে, এটা কি হত্যার চেয়ে কোন অংশে কম? একটি দম্পতিজীবন কুড়ে কুড়ে খেয়ে ফেলতে একটি অবাঞ্ছিত সন্তান যথেষ্ট, যার ফলে দম্পতির মানসিক শান্তি নষ্ট হবে এবং দৈহিক স্বাস্থ্য ভগ্ন হবে—এভাবে তিলে তিলে হত্যা করবে, এটা বুঝি কিছু নয়?

গর্ভে যার অধিবাস সেই অপরিণত মাংসপিণ্ড আপনাআপনি খসে গেলেও যার প্রাণ সংশয় অবধারিত, সেটাকে কেউ যদি দায়ে পড়ে খসিয়ে দেয়, তাকে হত্যা বললে বড় বেশী বলা হয়। এমন হত্যাকাণ্ড, যদি এটাকে হত্যাই বলি, সে

তো প্রতি দিনই অনুষ্ঠিত হচ্ছে, যেমন প্রাণিহত্যা, সামাজিক অব্যবস্থায় মানুষের মৃত্যু, কই তখন তো কেউ হত্যা হত্যা বলে খেদ করে না! পক্ষান্তরে অবৈধ-ভাবে গর্ভপাত করতে গিয়ে বৈধভাবে গর্ভনষ্টকারী অপেক্ষা দ্বিগুণসংখ্যক নারী মৃত্যুর শিকার হচ্ছে এটা যদি হত্যা না হয়, কোনটাকে হত্যা বলব বলুন?

আরেক দলের আপত্তি, বৈধতা না হয় মেনেই নিলাম, কিন্তু স্ত্রীরোগবিশেষজ্ঞ অত ডাক্তার কোথায়? গ্রামাঞ্চলে ডাক্তারের বড় অভাব, বিশেষজ্ঞ তো দূরের কথা! আর এত খরচই বা জোগাবে কে? পরন্তু গর্ভপাতন ক্রিয়া বিপজ্জনকও বটে। ডাক্তারকৃত হলেও।

সরকার যদি জনগণের স্বার্থ না দেখে কে দেখবে? খরচের ভয়ে পিছিয়ে গেলে চলবে কেন? আর ডাক্তারের অভাব নেই, শুধু ঢেঁড়া পিটিয়ে অনুমতি দিলেই হল। খরচ জোগাবে অবাঞ্ছিত গর্ভধারিণীরাই, এবং খরচও অনেক কমে আসবে, নিষিদ্ধতার বেড়ী খুলে দিলেই। গর্ভপাতকদের চড়া দাঁও কিছুকালের মধ্যেই কিংবদন্তীতে পৌঁছাবে।

গর্ভপাতন অপারেশন মোটেই কষ্টসাধ্য নয়, বিপজ্জনক তো নয়ই। যত কিছু বিপদ অসুন্দর পরিবেশে এবং অযোগ্য পাত্রে (অপারেশনকারক)। স্থান কাল পাত্র সবই যদি সুন্দর হয়, এ অপারেশন যেমন সহজ তেমনি নিরাপদ। প্রত্যহ অনুষ্ঠিত আর পাঁচটা অপারেশনের মতই নিরাপদ, স্থানটা যদি হয় হাসপাতালে কিংবা হাসপাতালের সুযোগ সুবিধা আছে এমন স্থানে, কালটা গর্ভের তিন মাসের মধ্যে এবং পাত্র ডিগ্রীধারী যোগ্য ডাক্তার। প্রসঙ্গতঃ বলে রাখা ভাল, ইউরোপে সম্প্রতি প্রবর্তিত 'এ্যাসপিরেশন এ্যাবর্সন' উপায়ের আশ্রয়ে এটা আরও সহজ এবং আরও নিরাপদ হয়ে উঠেছে। অজ্ঞান না করেই যন্ত্রযোগে চোষণপ্রভাবের ফলে জরায়ুমধ্যস্থ টিশুব বহিষ্করণ সম্ভব, পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সব শেষ।

আরেকটি বিরুদ্ধযুক্তি: গর্ভিণীর মৃত্যু এবং ব্যাধিগ্রস্ততা। বন্ধ্যাত্ব এবং মানসিক আঘাত। আর পুনঃপুনঃ গর্ভপাতের বাসনা।

আধুনিক বিজ্ঞানের পরশপাথর আছে, গর্ভপাতের ব্যাধিগ্রস্ততা তাই নেই বললেই চলে। তবুও মাঝে মধ্যে গর্ভিণীর মৃত্যু একেবারে অসম্ভব নয়, হাঙ্গেরী-তে ও চেকোশ্লোভাকিয়া-য় প্রতি লক্ষ গর্ভপাতে ছজন মারা যায়। কিন্তু এটাও ভুললে চলবে না যে, এক লক্ষ গর্ভিণীর মধ্যে গর্ভাবস্থায় এবং এবং প্রসবকালে এর চেয়েও অনেক বেশী মারা যায়। আশা করা যায়, 'সাকসান এ্যাবর্সন' পদ্ধতিতে এর চেয়েও কম হবে মৃত্যুহার।

আর বন্ধ্যাত্ব? নৈব নৈব চ। জাপানে গত দুই দশকে কয়েক কোটি গর্ভ বিনষ্ট করা হয়েছে কিন্তু বন্ধ্যাত্বের চিহ্নমাত্র পড়ে নেই।

গর্ভপাতের পর মানসিক আঘাত যথার্থই একটি সমস্যা। কিনসী রিপোর্টে দেখব, গর্ভপাতন শতকরা নজন রমণীর মনের দুয়ারে আঘাত হেনেছে, একদিকে বিবেকের দংশন অন্যদিকে অনন্যগতি অবস্থা, এদুয়ের আবেগ-ফলাফল হিসেবে। কিন্তু সমাজ, আইন, ধর্ম, সবই যদি অনুকূল হয়, যেমনটি আছে জাপানে, এবং তিন মাসের মধ্যেই অর্থাৎ ভ্রূণের অঙ্গ সঞ্চালনের পূর্বেই নিষ্পন্ন হয়, মনোরাজ্যে ঝড় ওঠে না। অবাঞ্ছিত গর্ভসমাগমে লজ্জা আর গর্ভনাশে অনুশোচনা স্বাভাবিক। এটাই যদি কখন বড় বেদনার মত বাজে বিরূপ মানস প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা প্রবল। উদাহরণস্বরূপ, জীবনে ব্যর্থতা হতাশা, পাপবোধের গ্লানি, পুরুষ সঙ্গীর প্রতি প্রতিহিংসা অথবা পুরুষ-বিদ্বেষ। কিন্তু যে দেশে বৈধ, তারা এসব ওজরে কান দেয় না, ছোট ছোট আঘাতের চেয়ে বড় বড় আঘাতই এদের কাছে বড়।

জন্মনিয়ন্ত্রণের পজিটিভ চেক হতে পারে কিন্তু নিবারণমূলক নয়, এহেতু গর্ভপাত আদর্শ নয়। এবং চিকিৎসার চেয়ে নিবারণ ভালো, এই সূত্র ধরে জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রচার শতগুণে শ্রেয়ঃ। তবুও গোপনে যে গর্ভপাত হয় তার কুফল অনেক, সেটা বোধের জন্যেই কয়েকটি রাষ্ট্র দ্বিতীয়-তৃতীয় গর্ভনাশবাসনাকে মর্যাদা দিয়েছে। পুনঃপুনঃ গর্ভপাত বাঞ্ছনীয় নয়, এবং এরূপ ভয়ঙ্কর বাসনা যাতে না জাগে তার জন্যে আমাদের সজাগ হতে হবে। আমরা জানি, অধিকাংশ গর্ভপাতের মূলে রয়েছে জন্মনিয়ন্ত্রণে অজ্ঞতা আর সমাজের দুঃশাসন আর আর্থিক দুরবস্থা। অতএব এরূপ দুঃখিত অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে গর্ভের অবাঞ্ছিত রূপটি ঘোচাতেই হবে। দ্বিতীয়তঃ চাই জন্মনিয়ন্ত্রণের ব্যাপক প্রচার, যাতে নির্ভরযোগ্য, প্রয়োগসরল, প্রাপ্তিসুলভ পদ্ধতি সকলের হাতে পৌছয়। তৃতীয়তঃ মনোবিদ্ ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে লুকিয়ে থাকা অসামাজিক প্রবৃত্তির কিংবা মানসিক অসুস্থতার প্রতিকার সাধন।

এবারে ভারতের দিকে চোখ ফেরান যাক, বহু যুগের পুরনো এবং প্রাচীন ব্রিটিশ আমলে রচিত ভারতীয় দণ্ডসংহিতার (পেনাল কোড) ৩১২ নং ধারায় দেখব, সদিচ্ছা নিয়ে কোন ডিগ্রীধারী ডাক্তার গর্ভপাত করতে পারেন এবং শুধুমাত্র গর্ভিণীর প্রাণরক্ষার্থেই এটা বৈধ। ইদানীং ভারত সরকার একটি নতুন আইন—মেডিক্যাল টার্মিনেশন অব প্রেগন্যান্সি এ্যাক্ট, ১৯৭১—প্রণয়ন করেছেন যার ফলে গর্ভপাতের আকাশ আরও একটু বড় হয়েছে। সদবুদ্ধি

প্রণোদিত হয়ে রেজিষ্টার্ড ডিগ্রীধারী ডাক্তার গর্ভপাত করতে পারে, নিম্নোক্ত প্রয়োগক্ষেত্রসমূহ যদি থাকে তবেই।

এক, থেরাপ্যুটিক ডাক্তারী কারণ। ব্যাধির প্রকোপে গর্ভিণীর প্রাণসংশয় দেখা দিতে পারে কিংবা গুরুতর স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা প্রবল। শুধু দৈহিক নয় মানসবিচারেও, অর্থাৎ গর্ভহেতু মাতার মানসিক স্বাস্থ্যের যথেষ্ট ক্ষতি হতে পারে এবংবিধ ক্ষেত্রেও।

দুই, ইউজেনিক অর্থাৎ সুপ্রজননবিদ্যাবিষয়ক যুক্তি। ভাইরাস ব্যাধি, এক্স-রে কিংবা ঔষধাদি প্রয়োগের ফলে গর্ভস্থ শিশু ত্রুটিযুক্ত, উদাহরণস্বরূপ বিকলাঙ্গ, জড়ধী হয়ে জন্মাবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে কিংবা এমনই প্রতিবন্ধী হয়ে জন্মাবে যে সারাজীবন পঙ্গু অসহায় অবস্থায় ভয়ঙ্করভাবে পরনির্ভর থাকবে।

তিন, হিউম্যানিটেরিয়ান অর্থাৎ মানবতাবোধে। গর্ভ যেথায় বলাৎকারের পরিণাম, সেথায় গর্ভপাত সিদ্ধ। কুমারী, সধবা, বিধবা প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই।

চার, সামাজিক কারণ। সামাজিক কারণ আবার দ্বিবিধ। এক, জন্মরোধক ব্যর্থতা। অর্থাৎ জন্মরোধক দ্রব্যাদির রক্ষাকবচ থাকা সত্ত্বেও গর্ভ ঘনিয়ে এসেছে এবং শুধুমাত্র বিবাহিতা রমণীর ক্ষেত্রেই। দুই, গর্ভিণীর পরিবেশগত অবস্থা। অর্থাৎ সমাজ-আর্থিক বিচারে গর্ভিণীর দুরবস্থা এতই চরম যে, গর্ভাবস্থায় কিংবা প্রসবকালে কিংবা সন্তানপালনের ঝক্কিঝামেলায় মাতার স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়বে অচিরেই।

১৯৭২, ১লা এপ্রিল থেকে এই আইন কার্যকরী হয়েছে। আইন মোতাবেক, ভারতের যে কোন সরকারী হাসপাতালে এই অপারেশন করান যায়। করান যায় সরকার অনুমোদিত স্থানেও। শেষোক্ত স্থলে, অর্থাৎ হাসপাতালের বাইরে, শুধু সরকার কর্তৃক সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত ডাক্তারগণই এই অপারেশনের আইনসম্মত অধিকারী। শুধু তাই নয়, একটা সময়সীমাও বেঁধে দেওয়া হয়েছে। পাঁচ মাস পর্যন্ত গর্ভপাত বৈধ। ১২ সপ্তাহ থেকে ২০ সপ্তাহের মধ্যে দুজন ডাক্তারের অনুমোদন চাই, ১২ সপ্তাহের মধ্যে একজন ডাক্তারের মতামতই যথেষ্ট।

১৯৭৫-এর অক্টোবরে স্থান ও পাত্র প্রসঙ্গে আইনটি সংশোধিত হয়েছে। এখন আর ডাক্তারকে অনুমোদনের জন্যে দরখাস্ত করতে হবে না, শুধু এব্যাপারে উপযুক্ত ট্রেনিং থাকলেই হল। অবশ্য, জেলার চিফ মেডিক্যাল অফিসার স্বাক্ষরিত ছাড়পত্র থাকা চাই বেসরকারী সংস্থা কিংবা প্রাইভেট ক্লিনিকের।

ডাক্তারী কারণে এবং ছাড় দেওয়া অন্যান্য কারণে গর্ভপাতের আকাশ প্রসারিত হয়েছে সত্য, কিন্তু অধিকাংশ রমণী যে কারণে গর্ভবিনাশ প্রত্যাশী

তার প্রায় প্রত্যেকটিই অস্বীকৃত। বর্তমান আইন অতি সীমিত দোষে দুষ্ট নয় আবার অতি উদারও নয় এরই মাঝামাঝি তবুও এটা যে খাটো মাপের কোন সন্দেহ নেই।

এখন স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠবে, আমাদের দেশে আইনটি তবে কি রূপ নেবে আর কোন মাপেরই বা হবে? এপ্রশ্নের জবাব রাখি: জাপানের মত ঢালাও না হোক, ১৯৩৮-এর সুইডেনের মত উদার মনোভাব চাই। এবং এতেও যদি মন না ওঠে, নিদেনপক্ষে ইংল্যাণ্ডের মত সামাজিক ছাড়পত্র দিতে হবে বৈকি!

ডাঃ হ্যাভলক এলিস-এর ধারণায় সভ্যতা এখনও সেই পর্যায়ে পৌঁছয়নি যেখানে গর্ভপাত ব্যাপারে নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা একটি প্রয়োজনীয় শর্তরূপে বিবেচিত। এঁর সঙ্গে সায় দিয়ে আমারও বলতে ইচ্ছা করে, অবাধে গর্ভপাত, যেমনটি আছে জাপানে, রাশিয়ায় এবং রাশিয়া প্রভাবিত দেশগুলিতে, আমাদের দেশে সইবে না। কারণ হিসেবে বলা যায় আমাদের সমাজ এখনও এতটা অগ্রসর হয়নি, বাসনামত গর্ভপাতের উপযোগী নয় আমাদের জনগণ, বড়ই অপব্যবহার পিয়াসী এইহেতু, এবং এমন একটা বৈপ্লবিক আইনের প্রতিক্রিয়ায় অনেকরই হৃদয়বৃত্তি হয়ত ব্যাহত হবে।

অবাধ নয়, সীমিত ছাড়পত্রই আমাদের প্রার্থনা। স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া দেশগুলির মত শুধু ডাক্তারী কারণ নয়, মানবিক, সামাজিক, আর্থিক এবং বংশগতি বিষয়ক ক্ষেত্রগুলি অবশ্যই বিবেচিত হবে। গর্ভিণীকে বাঁচাতে হবে, শুধু প্রাণে বাঁচান নয়, তার দৈহিক স্বাস্থ্য এবং মানসিক সুস্থতার প্রতি সমান যত্নশীল হতে হবে, যদি কখন চিড় খায় বা ভাঙ্গন ধরে, সেই সর্বনাশা গর্ভ যেন না আঁতুড়ে পৌঁছয়, তার আগেই কণ্ঠরোধ করতে হবে। এবং যে শিশু জন্মাবে তার গুণাগুণ অবশ্যই খতিয়ে দেখতে হবে, বিকৃত বিকলাঙ্গ শিশু কিংবা অপরিণত অসুস্থমানস মনোদুষ্ট শিশু নিয়ে শুধু পিতামাতা কেন সমাজও সদাসর্বদা বিব্রত হয়, এ-জাতীয় কুঁড়ির না ফোটাই ভাল।

এপর্যন্ত কোন মতদ্বৈততা নেই, সবাই সহায়তাহস্ত প্রসারিত করে দেবে। কিন্তু ডাক্তারী বহির্ভূত কারণে অর্থাৎ মানবিক কিংবা সামাজিক কিংবা আর্থিক ইত্যাদি কারণে যদি গর্ভপাতের প্রশ্ন জাগে, অনেকেই হাত গুটিয়ে নেবে বা নেয়। যত গোলযোগ এখানেই।

সোরগোলটা যতই বড় হোক, সমস্যা যতই থাক, এব্যাপারে উদার মনোভাব বিনা গতি নেই। সামাজিক এবং আর্থিক (কুমারী গর্ভ, প্রসবক্লান্ত রমণীর গর্ভ, অল্প ব্যবধানে গর্ভ, চাকুরীজীবি স্ত্রীর গর্ভ), বংশগতিবিষয়ক

(যেমন, নিষিদ্ধসম্পর্কীয় রতি বা ইনসেস্টজাত গর্ভ, উন্মাদ রোগিণীর গর্ভ, জড়বুদ্ধি রমণীর গর্ভ), মানবক (ষোল বছরের নীচে গর্ভ) ইত্যাদি কারণে গর্ভ, যদি অবাঞ্ছিত হয়, সেই রমণীর বাসনাপূরণে সমাজ বা রাষ্ট্রের কৃপণ হওয়াটা যেমন মানবতাবিরোধী তেমনি নির্মম।

এঅপারেশনের ভার অবশ্যই যোগ্য পাত্রে সমর্পিত হবে। এঅপারেশনে অধিকার শুধু ডিগ্রীধারী যোগ্য ডাক্তারেরই। অন্যজনে, যেমন রেজিস্টার্ড ডাক্তার (এরা পাশ করা ডিগ্রীযুক্ত নয়) বা নার্স, শাস্তি পাবে।

এবং ঋতুবন্ধের পর প্রথম তিন মাসের মধ্যেই অপারেশন হবে। এভাবে সময়সীমা বেঁধে দেওয়ার সার্থকতা দুটি, প্রথমতঃ অপারেশনগত বিপদাপদের সম্ভাবনা থাকে না বললেই চলে। স্ক্যাণ্ডিনেভিয়াতে তিন মাসের পরও এবং সাত মাস পর্যন্ত গর্ভপাতের অনুমতি দেওয়া হয়, ফলতঃ এদেশের মৃত্যুহার একটু বেশী, হাঙ্গেরী ও চেকোশ্লোভাকিয়া-র (এখানে তিন মাসের মধ্যেই নিয়ম) চেয়ে দশগুণ বেশী। দ্বিতীয়তঃ, মানসিক প্রতিক্রিয়ার অনুপস্থিতি। যুক্তি হিসেবে বলা হয়েছে ভ্রূণের অঙ্গসঞ্চালনের পর যে গর্ভনাশ সেটা প্রায়ই মনোরাজ্যে ঝঞ্ঝা এনে দেয়।

আমার ধারণা করতে ভাল লাগে, নির্ভরযোগ্য জন্মনিয়ন্ত্রণ অথবা বন্ধ্যাকরণ অপারেশন গর্ভপাতের অপরিহার্য শর্তরূপে গণ্য করা উচিত, অন্যথায় গর্ভপাতের বাসনাকে প্রশ্রয় না দেওয়াই ভাল। পুনরায় গর্ভ, পুনরায় গর্ভপাত, এই দুষ্ট চক্র জন্মলগ্নেই বিনাশ করতে হবে, কারণ, পুনঃপুনঃ গর্ভপাত ভাল নয়, এতে বিপদাপদ যেমন আছে তেমনি আছে মায়ের স্বাস্থ্যহানিও।

উপসংহার

(১) আইন করে গর্ভপাত বন্ধ রাখা যায় না, গোপন ছিদ্রপথে হবেই। অতীতে যে হয়েছে পৃথিবীর সমগ্র ইতিহাসই তার নজির। বর্তমানে হচ্ছে, এঘটনার দ্রষ্টা আমরা অনেকেই। এবং বলতে কোন দ্বিধা নেই, ভবিষ্যতেও হবে। গর্ভপাত অতএব এমন একটি ঘটনা যা সর্বজনীন এবং সর্বকালীন।

(২) শুধু জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রচারে কাজ হবে না। জলন্ত সাক্ষী ইউরোপ, আমেরিকা। সুতরাং আইন ঢেলে মেজে সাজাতে হবে।

(৩) আমাদের প্রার্থনা : গর্ভপাত নীতি আরেকটু উদার হোক। এ-প্রার্থনা মূলতঃ মায়েদের জন্যেই। তাদের প্রাণ, তাদের দেহ, তাদের মন, এ-সব রক্ষার জন্যেই। এপ্রয়োজন হাতুড়েদের খপ্পর থেকে মায়েদের রক্ষার

জন্যেই। এক কথায় গোপনে যে গর্ভপাত হয়, তার কুফল রোধের জন্যেই গর্ভপাত বৈধকরণের প্রয়োজন।

(৪) জাপানের মত ঢালাও না হোক, সুইডেনের মত সীমিত ছাড়পত্র চাই। এতেও যদি মন না ওঠে, নিদেনপক্ষে ইংল্যাণ্ডের মত ছাড়পত্র দিতে টালবাহানা কেন ?

(৫) গর্ভপাতের জন্যে প্রয়োজনীয় অপারেশন করবে শুধুমাত্র ডিগ্রীধারী যোগ্য ডাক্তারেই এবং তিন মাসের মধ্যেই। অন্য জনে শাস্তি পাবে। এবং অন্য সময়ে এটা নিষিদ্ধ হবে, বিশিষ্ট ব্যতিক্রম শুধু হাসপাতালের ক্ষেত্রে।

(৬) যে রমণী গর্ভপাতের জন্যে এসেছে তাকে কিংবা তার স্বামীকে অপারেশন করে বন্ধ্যা করে দিতে হবে কিংবা নির্ভরযোগ্য জন্মরোধক পদ্ধতির

(৭) যে কারণে মানুষের মনে গর্ভপাতের বাসনা জাগে সেটার উচ্ছেদ চাই। সামাজিক ও আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটিয়ে এবং গর্ভিণীর চরম সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান এবং প্রসবব্যবস্থার আমূল সংস্কারে এটা সম্ভব। অন্যথায় পুনরায় গর্ভপাত অভিলাষিণীর সমস্যা নির্জিত হবে না, রক্তবীজ মহাসুরের মতই ঘুরে ফিরে দেখা দেবে।

(৮) মানবতার যুক্তি যতদিন উপেক্ষিত থাকবে, সামাজিক এবং আর্থিক কারণে গর্ভপাতের ছাড়পত্র নামঞ্জুর হবে, ততদিন জন্মনিয়ন্ত্রণে আস্থা স্থাপন ছাড়া অন্য পথ তো দেখি না।

আস্থা বা অনাস্থা, যে কারণেই হোক না কেন, অবাঞ্ছিত গর্ভের মুখোমুখি হতে কতক্ষণ ? তখন বলব, উপায় যদি থাকে, এবারের মত এগর্ভ মেনে নিন। ভবিষ্যতে ১০০% গ্যারান্টিযুক্ত জন্মরোধক পদ্ধতির আশ্রয় নেবেন।

২০ / পিতৃপরিচয়হীন সন্তান

অনুরাগে ভর দিয়ে একটি পুরুষ আর একটি নারী হিয়ে হিয়া রাখতে পারে, ফলে এই নারীর কোল আলো করে সন্তান আসতে পারে। এখন এই পুরুষটি হল ঐ সন্তানের পিতা এবং এই নারী তার মা।

এবং এপিতৃত্ব যাতে না অস্বীকার করতে পারে তার জন্যেই 'বিবাহ' নামক সমাজব্যবস্থার প্রবর্তনা। পক্ষান্তরে ঐ নারীর গর্ভে পরপুরুষজাত সন্তান আসতে পারে, তাই না রমণীর সতীত্বব্যাপারে সমাজ এত সচেতন, নারীর স্খলন এবং অবৈধ সন্তানে এত রক্তচক্ষু, একনিষ্ঠতা বা একপরায়ণতার দাবি এত সোচ্চার।

নিজ জঠরে স্থিত গর্ভ কিংবা প্রসূত সন্তানকে নারী কোনদিনই অস্বীকার করতে পারে না, চাক্ষুষ প্রমাণকে উড়িয়ে দেওয়ার যে জো নেই! কিন্তু কে তার পিতা, যত গোলযোগ এখানেই। কেই বা তারস্বরে বলতে পারে এ-ব্যক্তিই তার পিতা? এবং এসন্তান যে অন্যপুরুষজাত নয় কী তার প্রমাণ? সত্যি বলতে, শক্ত কব্জির হাতে আঙুল উঁচিয়ে ধরার মত অভ্রান্ত, অব্যর্থ, সুনিশ্চিত প্রমাণ নেই। সত্যিকারের বিবাহিত পিতাই বেঁকে বসলে কত না কাঠ খড় পোড়াতে হয়, আর অবিবাহিত হলে তো কথাই নেই। যত সমস্যা এখানেই। এদুটি সমস্যার একটি সমাধান বিবাহ, আরেকটি সমাধান সতীত্ব।

ছক কাটা এদুই পথের বাইরে গেলেই ইংরেজীতে যাকে বলে 'ইল্লেজেটি-মেসি' সেই অবৈধতার আবির্ভাব, প্রধানতঃ বিবাহের পূর্বেই, কখন কখন ছায়া পড়ে বিবাহিত জীবনেও। প্রথমটি 'কানীন' গর্ভ, দ্বিতীয়টি 'গূঢ়োৎপন্ন'। আরেকটি প্রকারভেদ সম্ভব, 'সহোঢ়' গর্ভ।

কুমারী কন্যার গর্ভোৎপন্ন সন্তান দ্বাদশ পুত্রের একতম। আধুনিক সমাজে ৪% থেকে ১০% সন্তান এভাবে জাত, প্রাচীন মহাভারতের সমাজেও খুঁজে পাব, দৃষ্টান্ত, ব্যাসদেব, কর্ণ। সংস্কৃত ভাষায় এর নাম 'কানীন পুত্র', চলতি কথায় অবৈধ সন্তান (ইল্লেজেটিমেট, বাস্টার্ড)। আর কন্যাকে বলি কুমারী মাতা (আনওয়েড বা সিঙ্গল মাদার)। অনূঢ়ার সন্তানকে আদর করে প্রকৃতির পুত্র (ন্যাচারাল চাইল্ড) বা কামসুত (লাভ চাইল্ড) নামেও ডাকা হয়। আর

উদারচেতা মানুষেরা বলে বিবাহ বহির্ভূত সন্তান (বর্ন আউট অব ওয়েডলক), মানুষের মন থেকে অবৈধতার মসীচিহ্ন মুছে ফেলার এপ্রচেষ্টা সত্যই প্রশংসনীয়। আশ্চর্য, কন্যাকালের এপুত্রই কিনা জাতে উঠবে, যদি সন্তান প্রসবের পূর্বেই কন্যা বিবাহিতা হয়। আধুনিক যুগে কেউ কেউ হয়ত দেখে থাকবেন কানীন গর্ভ আলো দেখার পূর্বেই কন্যা বিবাহিতা। শতকরা প্রায় কুড়িটি ক্ষেত্রে কানীন গর্ভের পরিণতি : সহোঢ় পুত্র।

বিবাহিত জীবনেও অবৈধতার নিঃশব্দ পদসঞ্চার ঘটে, ভর্তৃগৃহে পরপুরুষ সংসর্গে লিপ্ত নায়িকার গর্ভ অসম্ভব নয়, চলতি কথায় এপুত্রের নাম জারজ সন্তান (অডাল্টেরাস, বাস্টার্ড), সংস্কৃতে গূঢ়োৎপন্ন পুত্র। প্রসঙ্গতঃ বলে রাখা ভাল, পূর্বোক্ত তিন প্রকার সন্তানই ভারতীয় সমাজে পরিচিত। সেই বৈদিক যুগ থেকেই। সাক্ষী, জাবালা, ব্যাসদেব, কর্ণ। এবং দ্বাদশ পুত্রের মধ্যে এতিনের অন্তর্ভুক্তি আরেকটি মস্ত প্রমাণ।

আমাদের কৃষ্টি ও সভ্যতার দাবি কেবলমাত্র আইনতঃ বিবাহিত নারীর কোলে সন্তান আসুক, যাতে যে কেউ যখন খুশি আঙ্গুল তুলে ধরতে পারবে সন্তানের পিতার প্রতি। এবং সেই পিতাকে বা তার আত্মীয়কুটুম্বকে ঐ সন্তানের লালন-পালনের জন্যে চাপ দিতে পারবে। হয়ত একারণেই পিতৃ-পরিচয়হীন সন্তান কিংবা কুমারী মাতার জন্যে কোন বন্দোবস্ত আমাদের সমাজে নেই, যা আছে সেটা শুধু চোখরাঙানি, একগাদা সামাজিক অনুশাসন আর শাস্তিদানের লম্বা তালিকা।

বলা যেতে পারে এজাতীয় দণ্ডবিধান এবং নিবারণমূলক সামাজিক ব্যবস্থা প্রায় সর্বজনীন। লিখিত ভাষা নেই এমন কয়েকটি আদিম সমাজে অবশ্য যে কোন অবস্থাতেই সন্তান আসতে পারে এবং সে সন্তান সদাই সুস্বাগতম্। এবং প্রাচীন যুগে, সন্তান যখন আর্থিক সম্পদরূপে গণ্য হত, বৈধ এবং অবৈধ সন্তানে কোন ভেদজ্ঞান ছিল না, অবৈধ সন্তানের মাতাকেও দুয়োরাণীর মত দিন গুজরান করতে হত না, এক কথায় সন্তান মাত্রই আনন্দ ও গর্বের বস্তু ছিল।

সন্তানের সেই আনন্দঘন রূপটি বর্তমানের শুষ্ক সভ্যতার মরুপথে হারিয়ে গেছে। বর্তমানে অবৈধ সন্তান ঘৃণ্য, আরও ঘৃণ্য কুমারী মাতা। বলা হয়েছে পরিবারের (অতএব সমাজেরও) শক্তি, সংহিতা, শুচিতা রক্ষার জন্যে ঘৃণা, উপেক্ষা, তুচ্ছতাচ্ছিল্যভাব ইত্যাদি বিরূপ মনোভাব প্রয়োজনীয়। কিন্তু সর্ব-শক্তিমান সেই পরিবার যে আজ ভাঙনের মুখে, পরিবারের অনেক ক্ষমতাই

রাষ্ট্রে সমর্পিত এবং যুগপরিবর্তনের (শিল্পীয়করণ, একক পরিবার, নগরকেন্দ্রিক সভ্যতা) সঙ্গে সঙ্গে অনেক ব্যবস্থাই যে তছনছ।

খ্রীষ্টীয় ধর্ম এবং পুরনো পৃথিবী উভয়েরই কাছে পাপ কিংবা অনাচার হিসেবে চিহ্নিত। অসম্মান, অপমান, দৈহিক নির্যাতন, প্রস্তর নিক্ষেপ, মৃত্যুদণ্ড প্রভৃতি শাস্তি বিধান—দেওয়ালের পর দেওয়াল গেঁথে এঅনাচার রোধ করতে চেয়েছে। ফলে নিগৃহীত হয়েছে অসহায় রমণীরা, পুরুষের শিকার হয়ে, পুরুষসৃষ্ট সমাজের বলি হয়ে। লুথারের আবির্ভাব অবৈধতাকে আরও নিন্দিত এবং আরও ঘৃণ্য করেছে, জার্মানীতে ১৯৫৮-এ কুমারী মাতার জন্যে অর্থদণ্ড বা শাস্তির বিধান ছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নতুন ভাবনার জলরাশির প্রবেশ: অনূঢ়া মাতার জন্যে আশ্রম আর অবৈধ শিশুর জন্যে নিকেতন প্রতিষ্ঠা। শেষে বিংশ শতাব্দীতে, বিশেষ করে বিগত তিন দশকে এভাবনা আরও সোচ্চার হয়ে উঠেছে, অনেক প্রাগ্রসর সভ্য দেশই করপুট প্রসারিত করে দিয়েছে সরল শিশু আর তার নির্দোষ মাতার জন্যে। এখন আর অবৈধ সন্তান মরা বেড়াল ছানার মত ডাস্টবিনে পড়ে থাকে না এবং অবোধ বালিকা মাতাও লজ্জায় মুখ ঢেকে অন্ধকারে হারিয়ে যায় না।

কত অবৈধ শিশু ভূমিষ্ঠ হচ্ছে এপ্রশ্নের সঠিক উত্তর হয়ত শুধু বিধাতারই জানা, আমাদের জানা নেই। ফ্রান্সে, জার্মানীতে, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়াতে, গ্রেটব্রিটেনে এবং আমেরিকায় খুবই ব্যাপক। মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে সমগ্র জীবিত সদ্যোজাত শিশুর মধ্যে শতকরা ৪ থেকে ৫ জন অবৈধ। ১৯৫৫-এ, সুইডেনে জীবিত নবজাতকদের শতকরা দশজন ছিল অবৈধ। ২০ বৎসর আগে নরওয়েতে অবৈধ শিশুর জন্মহার ছিল ৭%, বর্তমানে ৩·৫%। গ্রেটব্রিটেনে ২৯ হাজার থেকে ৩০ হাজার অবৈধ সন্তান জন্মায় প্রতি বৎসরে।

এই একই কাণ্ড আমেরিকায়। প্রতি বৎসরে অবৈধ মাতার সংখ্যা এক লক্ষ আশি হাজার, বাৎসরিক জন্মহারের ৪·৫% শিশু অবৈধ। গর্ভধারিণীদের অধিকাংশই কুমারী মাতা, অল্প কিছু বিবাহিতা এবং এর চেয়ে কিছু বেশী বিধবা এবং বিবাহ-বিচ্ছিন্নারা। অবৈধতা পল্লী অঞ্চলেই অধিক দৃষ্ট এবং অবৈধ মাতারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ন্যূনবিংশতিবর্ষ বয়স্কা।

আমেরিকার নিগ্রো সমাজে তিনজনের মধ্যে একজন অবৈধ এবং অধিকাংশ অবৈধ মাতারই বয়স কুড়ির নীচে। অনেক বেশী লাটিন আমেরিকায় এবং

'অনুষ্ঠানবর্জিত বিবাহ' চলন না থাকলে, এসংখ্যা কোথায় যে পৌঁছত তার ঠিক ঠিকানা নেই।

অধিকাংশ কুমারী মাতা সামাজিক ও আর্থিক বিচারে নিম্নস্থানীয়। নিগ্রো সমাজে এবং লাটিন আমেরিকায় অবৈধ শিশুর সংখ্যাবিপুলতাই আঙুল উঁচিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে সমাজ এবং অর্থনীতির প্রভাব কী সুদূরপ্রসারী হতে পারে।

দু দশক আগে এদের বয়স কুড়ির উপরেই ছিল, এখন কুড়ির নীচে হামেশাই দেখব। একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে সমগ্র কুমারী মাতার মধ্যে ১·৩% জনের বয়স দশ থেকে চোদ্দ। আমেরিকায় অবৈধতার হার ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাচ্ছে, ১৯৩৮-এ ছিল ৮৭,০০০, ১৯৪৯-এ ১৩৩,২০০, ১৯৫২-এ ১৭৬,০০০। পক্ষান্তরে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ায় অবৈধতার হার ক্রমশঃই হ্রাস পাচ্ছে, ২০ বৎসর আগে যা ছিল বর্তমানে তা অর্ধেক।

বিভিন্ন সমীক্ষায় কুমারী মাতার সংখ্যা ৩·৫% থেকে ৩০% এর মধ্যে, গড় হিসেবে বলা যেতে পারে শতকরা দশজন রমণী বিয়ের আগেই মা হয়। প্রাক্-বিবাহ মিলন আজ আর লজ্জাবতীর মত গোপন ঘটনা নয়, প্রকাশ্য দিবালোকে ডাকাতির মতই স্পষ্ট, উজ্জ্বল, ক্রমবর্ধমান। ডেনমার্কে (এবং স্ক্যাণ্ডিনেভিয়াতে) এটা সবচেয়ে বেশী, ৮০% নর-নারী এ-রসের রসিক, আমেরিকায় ৫০—৬০%, অষ্ট্রেলিয়ায় ৫২%, ইংল্যাণ্ডে ৪০%, এবং এদুই সীমার, অর্থাৎ ৪০% থেকে ৮০% এর মধ্যে ফ্রান্সে, জার্মানীতে, রাশিয়ায় ও সুইজারল্যাণ্ডে। এক কথায়, প্রাক্‌বিবাহ মিলনের হার বেড়ে গেছে প্রতিটি মহাদেশেই, বেড়েছে আমাদের দেশেও।

এবং সহবাসের আরেক পরিণতি যে গর্ভ, কে না জানে। তবু রক্ষে যে অনিয়মিত মিলন এবং অনুর্বরকালে (কারণ রতিবাসনায় জোয়ার-ভাটার দিনগুলি প্রায়শঃ অনুর্বর) মিলন, এদুই ঘটনা গর্ভহার কমিয়ে রেখেছে। অবৈধ প্রণয়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ সহজ কর্ম নয়, তবুও গর্ভ আসে না, কারণ অধিকাংশ মিলনই হঠাৎ আলোর ঝলকানি (ডিম্বস্ফোটনের দিনটি তাই ধরা পড়ে না)। অর্থাৎ নিয়মিতভাবে নয়, মাঝে মধ্যে হঠাৎ রতিভারে ভেঙ্গে পড়া। কখন শৃঙ্গারজাত প্রবল উত্তেজনার কাছে হঠাৎ সমর্পণ। কখন রমণীদেহে কামনার জোয়ার-ভাটা খেলা করে সেই আবেগের জোয়ারে ভেসে যাওয়া।

কাজে কাজেই, বিবাহপূর্বে রতিপ্রাপ্ত সমগ্র রমণীর মধ্যে মাত্র এক-পঞ্চমাংশ গর্ভবতী হয়। এই অবৈধ গর্ভের অনেক কুঁড়িই বিনষ্ট হয়, কিছু অবশ্য কালো গোলাপ হয়ে ফুটে ওঠে, অবৈধ মাতৃত্বের সৌরভ ছড়ায়। আমেরিকার একটি

সমীক্ষায়—কিনসী রিপোর্টে—দেখব, প্রায় চার কোটির মত নারী প্রাক্‌বিবাহ রতিরভসে মেতে ওঠে, এদের মধ্যে ২০% অর্থাৎ ৮০ লক্ষ রমণী গর্ভবতী হবে। এখন দেখা যাক, এদের কী গতি ?

অবৈধ সন্তান যার গর্ভে সেই রমণীর মধ্যে শতকরা উনিশ জন সৌভাগ্য-বতী, সন্তানের পিতার সঙ্গেই বিবাহ এসৌভাগ্যের সূচনা এনে দেয়। এবং এদের গর্ভ শতকরা পঁচাত্তরটি ক্ষেত্রে পূর্ণ প্রসবকাল পর্যন্ত টিকে থাকে অর্থাৎ জীবিত অবস্থায় জন্মে। বাদবাকী ৭% গর্ভ স্বতঃস্ফূর্তভাবে নষ্ট হয়ে যায় এবং ১৮% গর্ভ-পরিণতি স্বেচ্ছাকৃত বিনাশ।

বাকী ৮১% রমণীর, যাদের কাছে বিবাহ আঙুর ফল টক সমান, অধিকাংশই গর্ভনাশ অভিলাষিণী, আর না হয়েই বা উপায় কী! এরূপ গর্ভের শতকরা উননব্বইটি বিনষ্ট নয়, মাত্র ৬% প্রসবিত, আর ৫% আপনি ঝরে যায়।

পূর্বোক্ত তালিকা দুটিতে সামান্য দৃষ্টিপাতেই ধরা পড়বে, সহোঢ় গর্ভের দুই তৃতীয়াংশ আলোর মুখ দেখে আর অবৈধ গর্ভের মাত্র ৫%। এই অতিবিষম পার্থক্যই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে জনজীবনে অবৈধতার ভাবনা কী ভয়ঙ্কর!

কেন ?

কেমন করে একজন রমণী এভয়ঙ্কর ভাবনা কবলিত হয় তারই আলোচনা করা যাক। এপ্রসঙ্গে বুদ্ধিহীনতা, অজ্ঞতা, চরিত্রহীনতা, মাদকদ্রব্য গ্রহণের পরিণাম, পাশবিক অত্যাচার, পুরুষের প্রতারণা, স্বার্থপ্রণোদিত রমণীর কাণ্ড, নির্জ্ঞান মনের তাগিদ ইত্যাদি অনেক কথাই বলা হয়েছে। প্রায় সবাইকে বলতে দেখি এরা অর্থাৎ অবৈধ উপায়ে গর্ভবতীরা নাকি সাতিশয় কামবতী। দুষ্ট স্বভাবের ও দুর্নীতিপরায়ণ (ডেলিঙ্কোয়েন্ট)। এবং ইম্‌মর‍্যাল, খারাপ ঘরের মেয়ে কিংবা শিক্ষার (বিশেষ করে ধর্মীয় শিক্ষার) অভাব, এই হেতু ইম্‌মর‍্যাল। কেউ বলে, মনের দিক থেকে এরা অসুস্থ।

মোটামুটিভাবে, এই কারণাবলী তিন শ্রেণীর, জন্মগত আর পরিবেশগত আর মনোগত। এক, জন্মগত কারণ। জন্মলগ্নে যে বীজ বপিত হয়েছে অবৈধতা তারই বিষবৃক্ষ। খারাপ ঘরের মেয়েরা যে কুমারী মাতা হবে, এটা আর এমন আশ্চর্য কি! তবে সমস্যাটি এই যে এমতবাদ অনুযায়ী অবৈধ মাতাকে খুঁজতে গেলে গাঁ উজাড় হবে নিশ্চিত।

দুই, দুষ্ট পরিবেশ। দুষ্ট পরিবেশ বলতে বুঝি সঙ্গদোষ, অবসর বিনোদনের অসুন্দর উপায়, ঘরেতে নোংরা আবহাওয়া, অকালে যৌন অভিজ্ঞতা ইত্যাদি

ইত্যাদি। এজাতীয় এক বা একাধিক বিষয় অবৈধতার সঙ্গে জড়িয়ে আছে কিংবা অবৈধতার কারণ হিসেবে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত।

পরিবেশবাদীদের জন্মগত ত্রুটিতে বিশ্বাস নেই, যত আস্থা হতাশায় আর ব্যর্থতায় আর দুঃখবোধে, কারণ এরাই দুষ্ক্রিয়ার জন্যে দায়ী। এবং এদুষ্ক্রিয়াই দুর্নীতিকে, অতএব অতিযৌনতাকেও ডেকে আনে। অর্থাৎ কিনা দুষ্ক্রিয়া, দুর্নীতি এবং অতিযৌনতা অবৈধতার নিত্য সহচর। কিন্তু বাস্তবে ফিরে এসে দেখব, অবৈধ মাতারা নিশিদিন কামনা বাসনা তাড়িত নয়, মনোমাঝে দুষ্ক্রিয় প্রবণতা লুকিয়ে নেই, আর দুর্নীতির প্রতি আসক্তিও নেই কোন। প্রাক্‌বিবাহ এবং বিবাহোত্তর রতিবিহারে আনন্দিত হয় আর পাঁচজন রমণীর মতই; একজন গর্ভ নষ্ট করার ফিকির জানে এবং সেই জ্ঞানের পূর্ণ সুযোগ নিয়েছে, অন্যজনে অজ্ঞতাহেতু (কিংবা অন্য কোন কারণে) সেই সুযোগ নেওয়ার অবকাশ পায়নি, তফাৎ শুধু এখানেই।

তিন, মনোগত কারণ। অবৈধতার কারণ খুঁজতে গিয়ে মনোবিদ্‌রা কিন্তু মনের গভীরে ডুব দিয়েছে, নির্জ্ঞান মনের ইচ্ছাপূরণ মানিক খুঁজে পেয়েছে, দুষ্ক্রিয়া আর দুর্নীতি ছাঁটাই করেছে, জোর দিয়েছে মনোগত প্রেরণায়। এঁদের ধারণা করতে আনন্দ লাগে, মানসিক অসুস্থতার, উদাহরণস্বরূপ নিউরোসিস (বায়ুরোগ), সাইকোসিস (উন্মাদ রোগ), একটি চিহ্ন কিংবা অন্তর্নিহিত সমস্যার একটি সমাধান। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিই।

দয়িতজনের প্রতীক হয়ে বেঁচে থাকবে, অবৈধ জেনেও তাই মেনে নিয়েছে বা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। যে লোভী নির্লজ্জ পুরুষ তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে তারই ঔরসজাত সন্তান নারীর স্বাধিকারে আসবে এই প্রতিহিংসায়; কখনবা সন্তানকে শিখণ্ডী করে পুরুষকে প্রভাবিত করবে এই আশায়, সঙ্গীকে জব্দ করার জন্যে বা বাগে আনার জন্যে। গর্ভ নষ্ট করার উপায় এরা জানে, কিন্তু এতে সে একান্তই গররাজী, বরং এগর্ভ জিইয়ে রাখাই তার গোপন বাসনা, এরই আবেগফলাফল অবৈধ মাতৃত্ব।

কুমারী মাতার মধ্যে একটি দুটি অসুস্থমানস আছে নিশ্চয়ই, তাই বলে প্রত্যেকেই যে বায়ুরোগগ্রস্ত বা নিউরোটিক, প্রত্যেকেই যে মনের জ্বালায় অহরহ বহ্নিমান, ওটা সত্যের অপলাপ ছাড়া আর কিছুই নয়। অর্থাৎ অবৈধ সন্তান মাত্রই নির্জ্ঞান মনের ইচ্ছাপূরণ নয়। অর্থাৎ নির্জ্ঞান মনই একমাত্র উত্তর নয়; কেননা অবৈধতার কারণগুলির প্রায় সবই উপরে আছে, অত গভীরে ডুব দেওয়ার দরকার নেই এবং এগুলি খুবই সরল, কিছু বয়সের নেশা দোষ, কিছু

বা আর্থিক-সামাজিক স্তরের নিম্নতায় নিহিত। নিম্নোক্ত এক বা একাধিক কারণে অবৈধতার আবির্ভাব ঘটে :

অজ্ঞতা

সজ্ঞান বা নির্জ্ঞান কোন জগতেরই বাসনা নয়, শুধু অজ্ঞতার জন্যেও অবৈধতার শিকার হতে হয়। সত্যি কথা বলতে কি, এই অবৈধ মাতৃত্ব অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অজ্ঞতার অভিশাপ। এঅজ্ঞতা প্রধানতঃ জীবন ও যৌবনের, কখন জন্মরোধ বা গর্ভনাশ বিষয়ক।

অল্পশিক্ষা বা অশিক্ষা সত্যসত্যই ভয়ঙ্করী, বিশেষ করে জীবন ও যৌবন সম্বন্ধে। নিজের জীবন সম্পর্কিত কিংবা রতিবিষয়ক বাস্তব ঘটনার সঙ্গে পরিচয় নেই এদের। এদের জানা নেই যে গর্ভ মিলনেরই ফলাফল। জানে না, এরা প্রজননক্ষম যুবতী, সুতরাং রতিসুখমাত্রই গর্ভদোষে দুষ্ট, তা সে একবারই হোক, কি অল্পস্বল্প অঙ্গপ্রবেশযুক্ত রতিবিহার হোক, কি ভগসঙ্গম হোক। আর পূর্ণ মিলন হলে তো কথাই নেই। আশ্চর্য, তবু সত্য, কুমারী মাতার মধ্যে এমন অবোধ বালিকাও খুঁজে পাব, যাদের ধারণায় সন্তান আসে ঈশ্বর প্রেরিত হয়ে, আর এদেরই বা দোষ কী, ছেলেবেলা থেকে এটাই যে অহরহ শুনে আসছে।

যৌবনের উচ্ছলতায় অজ্ঞতাজনিত দোষগুলি আরও প্রকট হয়ে ওঠে। অবৈধতা এরই একটি পরিণতি। নিজ সংযম বা প্রত্যয় সম্বন্ধে অতি উচ্চ ধারণা থাকে বলেই হয়ত সঙ্গীর দৈহিক নিবিড়তায় বাধা দেয় না। কিন্তু একদিন নিজেই বেসামাল হয় রতিরভসে ভেসে যেতে পারে কিংবা অতি উত্তেজিত হিংস্র নায়কের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হতে পারে, তখন যে গর্ভ সম্ভব, সে কথাটা কেন ভুলে যাবে? একটি যুবক আর একটি যুবতী যদি নিভৃত নির্জনে মেলামেশা করতে চায়, করুক, কোন আপত্তি নেই, কিন্তু যৌবনের নেশায় বুঁদ হয়ে গর্ভ নামক কুমীরকে ডেকে আনার ভুলটি যেন না করে।

সুনিশ্চিত জন্মনিয়ন্ত্রণ যে দৈবায়ত্ত নয়, মানবায়ত্তই, একথা অনেকেই জানে না। কেউ ভাগ্যে বিশ্বাসী, ভাবে দুএকদিনের রতিবিহ্বলতায় কোন অঘটন ঘটবে না। কিংবা যত সব আজেবাজে পদ্ধতির শরণ নিয়ে ঠকে মরে।

আখেরে গর্ভ যদিই বা দানা বাঁধে, এগর্ভ সে রাখবে কোথায় এবং বর্জন-জাত সমস্যাবলীও কম নয়। কেননা গর্ভঘাতক ডাক্তারের সন্ধান পায় না অনেকেই, আবার যদি বা খবর মেলে তার নাগাল পায় না, সাতিশয় ব্যয়বহ-

লতার দরুন। পুরুষসঙ্গীই তার ধ্রুবতারা, সেই যদি ফিরিয়ে দেয় নিঃসম্বল নারীর গোকুলে যে গর্ভ বাড়বে তা নিশ্চিত। কখন পিছিয়ে যায় ধর্মীয় নিষেধের ডোরে চলচ্ছক্তি নেই বলে। কখন অপারেশন ভয়ে বা প্রাণভয়ে ভীত হয়ে।

অসতর্কতা

অবৈধতার আরেকটি মস্ত বড় কারণ অসতর্কতা বা অসাবধানতা। অজ্ঞতার পরেই এর স্থান কিংবা অজ্ঞতার সঙ্গে ব্র্যাকেটে প্রথম স্থানীয়। কয়েকটি অসতর্কতার নমুনা দিই: 'টেক এ চান্স' মনোভাবের বশবর্তী হয়ে দু একবার মিলন, জন্মরোধক পদ্ধতির অনিয়মিত প্রয়োগ।

জন্মরোধক সতর্কতার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সঙ্গের সঙ্গিনীকে শয্যাসঙ্গিনী করায় কিন্তু কাজের বেলায় কিছুই ব্যবহার করে না কিংবা এতই অধৈর্য হয়ে পড়ে যে সঙ্গিনীকে কিছু প্রয়োগ করার সুযোগ দেয় না, সত্যি বলতে অধিকাংশ পুরুষের দেখি কোন দায়িত্ববোধ নেই এব্যাপারে। শুধু পুরুষ নয়, নারীও সমানভাবে দোষী হতে পারে।

অসতর্ক নারীর কয়েকটি পরিচয়: আবেগপ্রবণতা (অর্থাৎ প্রবল কাম-বিদ্ধতায় তনুখানি এলিয়ে দেয়), ভাগ্যবিশ্বাসী (সন্তানজন্ম দৈবায়ত্ত ঘটনা), চরম আশাবাদী মনোভাব (জন্মরোধক সতর্কতা নেই, তবুও মিলিত)।

বুদ্ধিহীনতা

অবৈধ জননীর মধ্যে বুদ্ধিহীনা বা অল্পবুদ্ধি রমণীর সংখ্যা একটু বেশী। কে না জানে, হাবাগোবা উনমানস, জড়বুদ্ধি রমণীরা সহজেই প্রতারিত হয় এবং মিলনের ফলাফল যে গর্ভ, সে বিষয়েও তিলমাত্র সজাগ নয়, হয়ত একারণেই অবৈধ গর্ভভার বইতে হয় এদের অনেককেই। সুখের কথা, এমন নারীর জন্যে গর্ভপাত সিদ্ধ করা হয়েছে শান্তিলাল শাহ কমিটির রিপোর্টে।

অধিকাংশ কুমারী মাতারা কিন্তু এতটা বোকা নয়, পূর্বোক্ত রমণীদের চেয়েও বুদ্ধিমতী। তবে সমগ্র রমণীসমাজে দৃষ্ট আর পাঁচজনের চেয়ে অল্পবুদ্ধি। কারণ পুরুষের বিয়ের ধোঁকায় এরাই ভোলে, এরাই মজে পুরুষের ললিত কথায় বা রমণীয় প্রতিশ্রুতিতে।

মাদকদ্রব্য, ধর্ষণ ও অজাচার

কৈফিয়ৎ হিসেবে অবৈধ গর্ভবতীদের কেউ কেউ কবুল করেছে: সুরাপানে প্রমত্ত করিয়ে পুরুষ তাকে অপব্যবহার করেছে। প্রমত্ততা দূরে থাক, সামান্য সুরাপানের রঙীন নেশায় বিবেক নীতি ইত্যাদি মনের নিষেধ প্রভাবগুলি

লোপ পায়, তখন নারী যেমন অসহায় তেমনি অসতর্ক, অর্থাৎ সহজেই পুরুষের ফাঁদে পা দেয় আর দেহমিলনের প্রস্তাবে সহজেই রাজী হয়, কোন বাধা দেয় না। নারীর মতন পুরুষেরও আত্মসংযমের মুখোস খসে পড়ে, ফলে পুরুষ আরও হিংস্র, আরও আদিম হয়ে ওঠে, তখন সঙ্গিনীদেহ বলপূর্বক আস্বাদনে দ্বিধা করে না একটুও। এমন কি অজাচারও (ইনসেষ্ট) অবলীলাক্রমে অনুষ্ঠিত হয়।

তবুও বলি, ধর্ষণ কাহিনী অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একটি অজুহাতমাত্র। অনেক ক্ষেত্রে পুরো মত হয়ত দেয়নি, সত্য, কিন্তু বাধাও দেয়নি কোন কিংবা দীর্ঘ উপচার উপভোগের পর বাধা দিতে যখন চেয়েছে তখন আর নায়ককে নিরস্ত করা সম্ভব নয়।

স্বেচ্ছামূলক গর্ভ

ইচ্ছে করেই জন্মরোধক সতর্কতার ধারে কাছে ঘেঁসে না, গর্ভপাতের কলা-কৌশল জানা সত্ত্বেও সহস্র হস্ত দূরে থাকে, এমন ঘটনা স্বেচ্ছামূলক গর্ভেরই সুন্দর উদাহরণ।

গর্ভ সংবাদ রটিয়ে দিয়ে এরা চায় পুরুষকে বাগে আনতে কিংবা এভাবে বিয়ের জাল ছড়াতে চায়। এবং এপ্রচেষ্টা যদি ব্যর্থ হয়, অর্থাৎ জাল ছিঁড়ে শিকার যদি পালিয়ে যায়, এরূপ রমণীর কুমারী মাতা হওয়া ছাড়া গতি কী!

বাধ্যতামূলক গর্ভ

অবৈধ মাতৃত্বের আরেক নাম বাধ্যতামূলক গর্ভ। এটা কিন্তু নির্জ্ঞান মনেরই ইচ্ছাপূরণ। প্রসঙ্গতঃ বলে রাখি, মানসিক কারণে জাত গর্ভ অতি অল্প ক্ষেত্রেই দৃষ্ট।

নির্জ্ঞান মনের কোন একটি বাসনা দ্বারা পীড়িত হয়ে কোন কোন নিউ-রোটিক রমণী গর্ভবতী হয় এবং সে গর্ভ অবৈধ জেনেও জিইয়ে রেখে দেয়। বাসনাগুলি নানা বর্ণের: প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে শাস্তিবিধান, কখন শাসনকারী নির্মম পিতামাতার, সাধারণতঃ মাতার সুনাম কলঙ্কিত করতে চেয়েছে অবৈধতার কালি দিয়ে। জীবনের স্নেহ ভালবাসা বলতে কিছুই পায়নি, কুড়িয়েছে শুধু অনাদর, উপেক্ষা, সেই হতভাগিনী ভালবাসার জন্যে হন্যে হয়ে বেড়ায়, ভাল-বাসার এই কাঙালপনারই একটি প্রতীক অবৈধ গর্ভ। আবার মাতা বা ভগিনীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা প্রতিহিংসা তাকে চরিত্রহীন জীবনযাপনে বাধ্য করাতে পারে।

শিক্ষাগত অব্যবস্থা

গ্রেট ব্রিটেনের সিবিল নেভিল-রলফ (Sybil Neville-Rolfe) নামক মহীয়সী মহিলা কিন্তু পিতামাতা ও শিক্ষককেই দোষী করেছেন অনেক ক্ষেত্রেই। যত দোষ নন্দ ঘোষ, তেমনি যত নিন্দা যত গ্লানি সবই কিনা কুমারী মাতার শিরোপা, এমন একটা অসম অব্যবস্থার ঘোর প্রতিবাদ জানিয়েছেন ইনি। এঁর ধারণায়, বাল্যাবস্থায় আবেগ নিয়ন্ত্রণের শিক্ষা নেই, সেক্স ব্যাপারে পিতামাতার হাত ধরে এগিয়ে যাওয়া নেই বলেই কুমারী বালিকার আজ এই দুর্গতি। এবং শিক্ষানিকেতনগুলিও আত্মনিয়ন্ত্রণের জন্যে প্রয়োজনীয় শিক্ষা ব্যবস্থার নির্দেশ দেয় না এবং জীবন সম্বন্ধে সুস্থ মূল্যবোধ ও সুন্দর ধারণাগুলিও তুলে ধরে না, এও আরেকটি মস্ত বড় কারণ।

সমাধান

সভ্যতা দেবীর একহাতে যেমন বরাভয় মুদ্রা, অন্য হাতে তেমনি শাণিত খড়্গা। একদিকে সমাজ, কৃষ্টি ও সভ্যতা চায়, ইতরলৈঙ্গিক ভাবনারাজি প্রশ্রয় পাক, এমন একটা আবেগ গড়ে উঠুক। অন্য দিকে তার দাবি বিবাহপূর্বে স্খলন-পতন-ত্রুটি নয়, নিষ্কাম নিষ্পাপ থাকবে, এবং প্রাক্‌বিবাহ মাতৃত্ব নৈব নৈব চ। এবং আমাদের আইনও দাবি করে একবার গর্ভ দানা বাধলে নষ্ট করা অন্যায়, প্রসব পর্যন্ত ধরে রেখে দিতে হবে। ফলে হয়েছে কি, এক উভয়-সঙ্কটের মধ্য দিয়ে চলেছে বর্তমান যুগের যুবক-যুবতীরা।

তা ছাড়া আমরা এমন এক যুগে বাস করছি, ইচ্ছা থাকলেও যথাকালে বিবাহের উপায় নেই। সামাজিক-আর্থিক দুরবস্থায় বিবাহ বিলম্বিত বা অসম্ভব হয়ে উঠেছে। সমাজের নির্মম প্রত্যাশা, কঠোর অনুশাসন এবং জীবনের অস্থির তাগিদ আর কামনার অসহ্য পীড়ন—এদুয়ের সংঘাতে অনেকেই ছিটকে পড়ে। অনেকেরই পথ বেঁকে যায়। এরই পরিণতি প্রাক্‌বিবাহ সহবাস। ইউরোপ আমেরিকার দিকে তাকিয়ে দেখুন (২৯৩ পৃষ্ঠা) কী ভয়ঙ্কর গতিতে এটা ছড়িয়ে পড়েছে। ছড়িয়ে পড়েছে আমাদের দেশেও।

বিবাহপূর্বে নিষিদ্ধ ফলের এই যে আস্বাদন, এটা আর এখন দুর্লভ নয়, খুবই ব্যাপক। এতই ব্যাপক যে বলা যেতে পারে বর্তমান যুগধর্মেরই একটি চিহ্ন, বর্তমান কালচারের একটি অংশ। তাই যদি হয়, ব্রহ্মচর্যগাথা বা নীতিশতক প্রচারে কতটুকু লাভ? অরণ্যে রোদনের মতই বৃথা নয় কি? এর চেয়েও অনেক ভাল, যুবক-যুবতীকে জীবনের এবং যৌবনের তথ্যাবলী, বিশেষ করে গর্ভ নামক মন্থাল সাপকে কি করে পাশ কাটিয়ে যেতে হয়, সেই শিক্ষা দেওয়া।

প্রথমে সঙ্গের সঙ্গিনী, পরে অঙ্গের অঙ্গিনী, শেষে কুমারী মাতা। তাই যদি হয় কন্যা কেন রুখে দাঁড়াবে না? কিন্তু বিদ্রোহিনী হয়েও ভাগ্য জয়ের অধিকার তার নেই। কারণ, শিশুর জৈবিক পিতা যে কে সেটা নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করা সত্যই কঠিন কর্ম। অতএব আগেভাগেই সাবধান হওয়া ভাল নয় কি? বস্তুতঃ পাশ্চাত্যদেশে এত যে জন্মরোধক পদ্ধতির ছড়াছড়ি তার গোপন কথাটি এই অবৈধ সন্তান নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই লুকিয়ে আছে। জন্মরোধক সতর্কতার বিনিময়ে পিতৃপরিচয়হীন সন্তানের স্রোত রুদ্ধ হতে পারে নিশ্চয়ই, তবে অংশতঃ মাত্র। অর্থাৎ কিনা জন্মনিয়ন্ত্রণই সব নয়, গর্ভপাতকেও আইনের স্বীকৃতি দিতে হবে। সাবধানের যেমন মার নেই, মারেরও তেমনি সাবধান নেই। কারণ, সাবধানী রমণীরও পথ ভুল হতে পারে, যার পরিণতি অবৈধ গর্ভ, তখন? তখন, সর্বনাশে সমুৎপন্নে অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ, এই শাস্ত্রবচন অনুযায়ী গর্ভপাতের রুদ্ধ দুয়ার খুলে দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ নয় কি? যথার্থই পিতৃ-পরিচয়হীন সন্তান সমস্যার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমাধান গর্ভপাত বৈধকরণ এবং গর্ভপাত সংক্রান্ত আইনকানুন সহজ করে তোলা। পৃথিবীর অনেক রাষ্ট্রই তা করেছে।

তবুও সেই সহজ দেশে, গর্ভপাত যেখানে অনায়াসসাধ্য এবং সিদ্ধ, অবৈধতা দেখি কেন? এপ্রশ্নের একটি জবাব রাখি, গর্ভপাতের সীমিত স্বাধীনতায়, যেমন স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ায়, কিছু কিছু অবাঞ্ছিত গর্ভের পরিণতি অবৈধ সন্তান হতে বাধ্য। আরেকটি জবাব : গর্ভপাত বৈধকরণই শেষ কথা নয়, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্তন চাই, চাই সংস্কার, আন্দোলন। যে অবস্থার জন্যে এমনটি হচ্ছে তাদের বিলোপসাধন এবং জন্মনির্বিশেষে প্রতিটি সন্তানের জন্যে অনুকূল পরিবেশ রচনা অবশ্যই কাম্য। কেমন করে তা বলছি।

অবৈধ সন্তান, এমন এক শব্দ-সমাবেশ, যা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের মনে একটা আলোড়ন জাগে, তীব্র ঘৃণা থেকে তীব্র সহানুভূতি, সবই। পাপপুণ্য, নীতি-দুর্নীতি, ধর্ম-অধর্ম, অনাসৃষ্টি-রসাতল, সবই যেন এর অঙ্গে অঙ্গে জড়িয়ে আছে। সবাই তাই এহেন বিতর্কিত বিষয়টি এড়িয়ে যেতে চায়। এটা কিন্তু ঠিক নয়। শতাব্দী-প্রাচীন ঘৃণা যেমন আছে, তেমনি আছে আরও প্রাচীন স্বীকৃতি, সুপ্রাচীন মহাভারতীয় সমাজের কর্ণ, জাবালি তারই সাক্ষী। এমন কি কোন কোন আদিম সমাজে কুমারী মাতা নিন্দিত নয়, উদাহরণস্বরূপ, নাভাহো ইণ্ডিয়ানদের উল্লেখ করা যেতে পারে। তা হলে আধুনিক সমাজে আমরাই বা পিছিয়ে যাব কেন? প্রথমেই বলব, অবৈধ নামক বিশেষণটি লোপ পাক, দেখা

দিক 'বিবাহ বহির্ভূত সন্তান'। আমেরিকার কয়েকটি রাষ্ট্রে, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া-য় এখন আর একে অবৈধ সন্তান বলা হয় না, পরিবর্তে এরা নাম দিয়েছে 'বর্ন আউট অব ওয়েডলক'।

বিষধর সর্পকে বিষহীন করার মতই, অবৈধ গর্ভের কালিমা মুছে নিতে হবে। বৈধতা এবং অবৈধতার সকল ভেদ ঘুচে যাক, সকল দ্বন্দ্ব অবসান হোক, এই একটি কারণে যে, ফুলের চেয়েও সুন্দর যে শিশুটি প্রস্ফুটিত হল তার কি দোষ? সরল, নিষ্পাপ মুখখানি দেখে করুণা করতে কার না ইচ্ছে হয়, এই যে অনুভূতি সেটা কি বিষবাষ্পের মত শুকিয়ে যাবে, অবৈধ নামক শব্দটি শোনা মাত্রই? তাই তো বলি বৈধ সন্তানের মত সমস্ত সুখ-সুবিধা একেও দেওয়া হোক। ঘোষণা করা হোক, আইনানুগ পুত্রের মতই সম্পত্তিতে তার অধিকার, সমান এবং জন্মগত।

এব্যাপারে এবং অন্যান্য সামাজিক ব্যাপারে সবচেয়ে প্রাগ্রসর স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া দেশগুলির কথা বলি। প্রথমেই সুইডেন। পিতৃপরিচয়হীন সন্তানের যত্ন-আত্তি এবং শিক্ষা-দীক্ষা সবই পরিপূর্ণভাবে মাতায় সমর্পিত। আইনতঃ এদায়িত্ব মাতারই এবং একাকী মাতাকেই বহন করতে হবে। এবং অনুমিত পিতার সম্পত্তিতেও কোন দাবিদাওয়া নেই; যদি না বাগদানের পর গর্ভ আসে, যদি না পুরুষ তার ভালবাসার সন্তান পালনে আগ্রহ ঘোষণা করে। বাগদত্তা কন্যাজাত সন্তান পিতার পদবীগ্রহণে যেমন অধিকারী তেমনি পিতৃসম্পত্তিরও অংশভাক।

সুইডেনের পর ডেনমার্ক। পিতৃপরিচয়হীন সন্তান পালনের দায়িত্ব সর্বতোভাবে মাতারই। আর পিতৃপরিচয় যদি অজ্ঞাত না থাকে, মায়ের সঙ্গে পিতাকেও এভার বইতে হবে, যতদিন না সন্তান আঠারোতে পা দেয়। নরওয়ে-তে এই একই কাণ্ড। এক কথায়, এমন আধুনিক সমাজ বা রাষ্ট্রও অভাব নেই যেখানে অবৈধ সন্তানকেও বৈধ সন্তানের মতই সমান মর্যাদা ও অধিকার দেওয়া হয়েছে।

বিবাহ বিষয়ক সমস্যাও যে অবৈধতা বিজড়িত হতে পারে, অনুষ্ঠানবর্জিত বিবাহ (কমন ল ম্যারেজ) তারই একটি মস্ত বড় প্রমাণ। এবিবাহে কোন ক্রিয়াকাণ্ড নেই, ধর্মানুষ্ঠান ও পুরোহিতেরও প্রয়োজন নেই, নেই কোন রেজিস্টারে সই করা। শুধু একজন পুরুষ আর একজন নারীর সঙ্গে কিছুকাল একই শয্যায় বসবাস করেছে, এটাই এবিবাহের প্রাণভোমরা। মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকায় দারিদ্রদোষে ক্লিষ্ট বিবাহার্থী জনগণ, পাদরী বা ম্যারেজ অফিসারের দ্বারস্থ হতে পারে না। পক্ষান্তরে একত্রে বসবাসকারী মানবমিথুন যদি বিবাহ

মর্যাদা না পায়, অবৈধ সন্তান আর পরিত্যক্তা নারী আর অনাথ শিশু নিয়ে সমাজের সঙ্গে রাষ্ট্রও বিব্রত হবে। লাটিন আমেরিকায় এখনও তাই এবিধি স্বীকৃত।

লাটিন আমেরিকায় আছে, থাক সেখানে, কাজ নেই আমাদের দেশে। আমরা বিবাহ অনুষ্ঠান নিশ্চয়ই চাই। চাই না তার জাঁকজমক, আড়ম্বর। অর্থাৎ বিবাহানুষ্ঠানের অকারণ ব্যয়বহুলতা লোপ পাক এটাই আমাদের প্রার্থনা। আমাদের দেশের বিয়েতে পুরুষের খরচা আছে আর সে-খরচের জোগান দেয় কিনা কন্যাপক্ষ। তা ছাড়া অন্যান্য খরচাও আছে কন্যাপক্ষের। এসব ব্যয়ভার যদি কমান যায়, বিবাহিতা রমণীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে নিশ্চিত। আরও বৃদ্ধি পাবে যদি কোনমতে পণপ্রথাকে দ্বীপান্তরে পাঠান যায়। কিন্তু এতদিনের শিকড় কি কলমের এক খোঁচায় উপড়ে আসে ?

কিন্তু এঅঘটনও ঘটবে, যদি যুবসম্প্রদায় এই সংস্কারে অগ্রণী হয়। দেশের প্রতিটি সঙ্কটে প্রতিটি আন্দোলনে যুবসমাজই তো দক্ষিণনায়কের মত ঝাঁপিয়ে পড়েছে, তা হলে অস্বস্তিকর এই প্রথার বিরুদ্ধে কেন তারা নীরব রবে ? এদের নেতৃত্বে বিবাহজাত সমস্যা দূর হবে নিশ্চয়ই, সেই সঙ্গে অবৈধতার প্রশ্নে বিস্ফো-রণও ধীরে ধীরে কমে আসবে।

অল্পবয়স্কা কুমারীর প্রাক্‌বিবাহ সহবাসের অভিজ্ঞতা খুবই কম, কাজে কাজেই অল্পবয়সী কুমারী মাতার সংখ্যাও কম। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এটা বেড়েই চলে, অর্থাৎ অবৈধতা সমস্যা আর বিলম্বিত বিবাহ পরস্পর সম্পর্কিত। এর জন্যে যুবসমাজকে দোষারোপ করলে অন্যায় করা হবে, কারণ, আর্থিক নিরাপত্তার অভাবেই অধিকাংশ বিবাহ বিলম্বিত। এবং এব্যাপারে রাষ্ট্রের দায়িত্ব বড় বেশী। অর্থাৎ কিনা রাষ্ট্রকেও সজাগ হতে হবে দেশের সমৃদ্ধির জন্যে, এটাই জনগণের আর্থিক মানের উন্নতি ঘটাবে।

নিম্নতর সামাজিক স্তরে অধিকাংশ কুমারী মাতাকেই খুঁজে পাব এবং অনেকেরই ঘরে দারিদ্র্যের ভ্রূকুটি। এর অর্থ কিন্তু এই নয়, সামাজিক ও আর্থিক বিচারে উচ্চস্তরীয় রমণীরা অবৈধ সংসর্গে লিপ্ত হয় না। তবে, উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত ও সুন্দর পরিবেশে লালিত রমণীরা অতি অল্পক্ষেত্রেই গর্ভবতী হয়, কারণ জন্মরোধক পদ্ধতিগুলি এদের নখদর্পণে। আর যদিও বা গর্ভ আসে সেই দুঃসহ অবস্থার অবসান কি করে ঘটাতে হয় তাও এদের জানা। অতএব শিক্ষাভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণ অজ্ঞাত আর অর্থাভাবে গর্ভপাত অস্পৃশ্য, দারিদ্র্যদোষে গর্ভিণীযত্ন উপেক্ষিত, সন্তানপালন অবহেলিত, এমন ঘটনা যাতে না পুনরাবৃত্ত

হয় সেই উদ্দেশ্যে সজাগ হতে হবে। প্রথম দুটি পূর্বেই বলছি, শেষের দুটি বলব শেষে।

নিবারণমূলক ব্যবস্থা নিয়ে অনেক তর্ক ফেঁদেছি, যুক্তির জালও ছড়িয়েছি অনেক। এবার, গর্ভপাত নিষিদ্ধ দেশের মাটির দিকে একটু তাকান যাক। চোখ ফেরালেই, গর্ভপাত করাতে পারেনি এমন এক হতভাগিনীর মুখোমুখি হব অচিরেই। এবং এও দেখব যে একে ঘিরে নতুন করে আরও দুটি সমস্যা সৃষ্ট হয়েছে, গর্ভাবস্থায় যত্ন, প্রসবব্যবস্থা ইত্যাদি গর্ভিণী সমস্যা। প্রসবোত্তর-কালে জ্বলন্ত সমস্যার নায়িকা কন্যা নয়, কন্যাজাত সন্তানই। এখন একে একে এদুই সমস্যার আলোচনা করব।

গর্ভিণী যত্ন

অবৈধ-গর্ভধারিণীরা অন্ধকারে লুকিয়ে থাকতেই ভালবাসে, লজ্জায় ডাক্তার দেখায় না, ফলে অবশ্যকরণীয় প্রসবপূর্ব পরীক্ষা (এ্যান্টিনেটাল কেয়ার) বাদ পড়ে। বিবাহিতা মাতাদের মধ্যে মাত্র ৪% প্রসবপূর্ব পরীক্ষার মুখ দেখে না আর এরূপ কুমারী মাতার সংখ্যা ২৩%। আমেরিকার মত দেশে এই হাল, তা হলে আমাদের দেশের অবস্থাটা কি শোচনীয় তা কল্পনা করতেও ভয় হয়। কাজে কাজেই গর্ভিণীর আধিব্যাধি অধিক, আরও অধিক অবৈধ শিশুর মৃত্যুহার। তাই না প্রতিটি সভ্য দেশেই, উদাহরণস্বরূপ, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ায়, আমেরিকায়, গ্রেটব্রিটেন-এ, কুমারী মাতার উদ্দেশ্যে সমর্পিত সরকারী উদ্যোগ কিংবা বে-সরকারী প্রচেষ্টার অভাব নেই।

গর্ভবতী মায়েদের জন্যে অতি সুন্দর ব্যবস্থা রয়েছে, এবং গর্ভিণীমাত্রই, অতএব কুমারী মাতারাও, এই সুখসুবিধার অধিকারিণী। আধ লিটার দুধ পায়, মনোমত ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা করায়, গর্ভাবস্থায় যত্ন এবং গর্ভমোচন ব্যবস্থাও সুন্দর, এবং আশ্চর্য, সবই কিনা বিনামূল্যে। এমন কি আর্থিক ও আইনগত ব্যাপারেও সাহায্যহস্ত প্রসারিত করা হয়। নরওয়েতে সন্তান আদাটা সম্পূর্ণরূপে নিখরচার ব্যাপার অর্থাৎ খরচের খাতে কানা কড়িও পড়ে না। এই একই কাণ্ড সুইডেনে।

সরকারী উদ্যোগ আছে গ্রেটব্রিটেন ও আমেরিকায় এবং বেসরকারী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানও কম নেই, শরণাগত অবৈধ মাতাকে আশ্রয় দেওয়া, প্রয়োজন-বোধে আইনগত পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করা, হাসপাতালে কিংবা মেটার্নিটি হোমে প্রসবব্যবস্থার বন্দোবস্ত এবং সর্বোপরি প্রসূত সন্তানের দেখাশোনা সবই এদের কাজ।

আর আমাদের দেশে ? দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি, বিবাহিতা গর্ভবতী-দেরই এমন সুব্যবস্থা নেই তো কুমারী মাতার জন্যে ! তবুও বলি হাসপাতালে যেতে কোন দ্বিধা নেই। হাসপাতালের আইনে এমন কিছু নেই যে কর্তৃপক্ষরা কুমারী মাতার জন্যে দ্বার বন্ধ করে দেবেন। অর্থাৎ গর্ভাবস্থায় নিয়মিতভাবে, মাসে দুচারবার করে, হাসপাতালে যাবেন এবং হাসপাতালেই যাবেন প্রসবের জন্যে। তবে কিছু অস্বস্তিকর প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে এই যা, তখন গোবে-চারীর মত নতমুখী না থেকে চটপট জবাব দেবেন এবং আপনাকে কেউ তো আর দিব্যি দেয়নি যে হাসপাতালেও সদা সত্য কথা বলার নীতিটি মেনে চলতে হবে। সন্তানের পিতার যথার্থ নামটি দিতে পারেন কিংবা কল্পিত কোন নাম। তারপর সোজা চলে যাবেন কোন অনাথ আশ্রমে। সুখের কথা কোলকাতায় এজাতীয় প্রতিষ্ঠানের অভাব নেই।

সন্তানপালন

কে না বলবে, সন্তানপালনের দায়িত্ব জনক এবং জননী উভয়েরই। কিন্তু পিতা যেখানে অজ্ঞাত কিংবা পিতার হদিশ মিলছে না, সেখানে মাতারই এভার নেওয়া ছাড়া উপায় কী ! এবং সন্তান জন্মালেই এদায়িত্ব গর্ভধারিণীতে বর্তাবে।

পিতার সঙ্গে মাতাও নিরুদ্দেশে পাড়ি দিয়েছে, তখন শিশুর জন্যে করপুট প্রসারিত করে দেবে মেটারনিটি হোম, বোর্ডিং হোম, চাইল্ড-প্লেসমেণ্ট এজেন্সি ইত্যাদি গালভরা নামযুক্ত কোন অনাথ আশ্রম কিংবা সরকারী আশ্রয়শালা।

প্রসঙ্গতঃ বলে রাখা ভাল পিতার প্রতি আঙুল তুলে ধরলেই পিতৃত্ব প্রমাণিত হয় না। কারণ, মাত্র ৪৫% ক্ষেত্রে রক্ত পরীক্ষার সাহায্যে অনুমিত পিতার সত্যতা প্রমাণিত। এবং বিদেশীয় বিচারালয়ে পিতৃপরিচয় মীমাংসা সম্ভব ১০% কি ২৫% ক্ষেত্রে। এমন কি পিতা কবুল করলেও সন্তান বৈধ নয়, যদি না সন্তান প্রসবের পূর্বেই পিতামাতা বিবাহিত হয় কিংবা প্রসবোত্তর বিবাহে দত্তক পুত্র নেয়।

প্রসবের পূর্বেই দশজনের মধ্যে দুজন কুমারী মাতা (২০%) অনুমিত পিতাকে বিবাহ করে। কিন্তু প্রসবের পর এসংখ্যা যারপরনাই কমে আসে, তখন সন্তানের পিতার সঙ্গে বিবাহিত কুমারী মাতার সংখ্যা ২% মাত্র (শেষোক্ত ক্ষেত্রে অবশ্য দত্তকগ্রহণ বিনা সন্তানে বৈধতা জন্মে না)। তারপর সাত বৎসরের মধ্যে এদের অনেকেই (৭৬%) অন্য পুরুষের সঙ্গে বিবাহিত হয়। এবং কোন কোন মাতা তার কানীন পুত্রকে ঘরে ফিরিয়ে আনে এবং এপুত্রকে দত্তক নেয় তার স্বামী।

এসন্তান যেন বিবাহের আলম্বন, গর্ভস্থ সন্তানের পিতার সঙ্গে বিবাহের

আশাতেই এরা গর্ভনাশ করে না, পুত্রকে আঁকড়ে ধরে। কিন্তু মরীচিকার মত বিবাহস্বপ্ন মিলিয়ে যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, তখন কোলে পড়ে থাকে সন্তান, এরে লয়ে তার জিজ্ঞাসা, কী করি, কোথা যাই? এজিজ্ঞাসার কেউ জবাব রেখেছে সন্তানকে নিজের কোলে রেখে দিয়ে, হোক অবৈধ তবুও তো নিজের সন্তান, নিজেরই রক্তমাংস দিয়ে তিলে তিলে গড়ে ওঠা, এই মমত্ববোধই আত্মজ পুত্রকে কাছে টেনে রাখে, এবং এদের সংখ্যা খুব কম নয়, ২০% থেকে ২১%। কেউ রেখে আসে আত্মীয় সকাশে (১১%)। আর বাদবাকী সন্তানেরা (৬০-৬৯%) থাকে মায়ের পক্ষপুট থেকে দূরে, বহু দূরে, এদের ভবিষ্যৎ তাই এতিনের একটি—দত্তকগ্রহীতায় সমর্পণ কিংবা অনাথ আশ্রম কিংবা সরকারী আশ্রয়শালা।

দত্তক (এ্যাডপসন) গ্রহণ আইনানুগ কর্ম বিশেষ। এজাতীয় অনুষ্ঠানে মাতা চিরদিনের মত ভাসিয়ে দেয় নিজ সন্তানে অধিকার এবং দায়দায়িত্ব, সর্বস্বত্ব তখন দত্তকগ্রহীতায় বর্তায়। এপ্রসঙ্গে বলে রাখি, মঙ্গোল, হাবাগোবা, জলসঞ্চারহেতু স্ফীতমস্তিষ্ক শিশু, ক্রেটিন শিশু, অন্ধ, মূকবধির, বিকলাঙ্গ শিশুদের দত্তকযোগ্যতা নেই।

অনাথ আশ্রমে পালিত শিশুর স্বত্ব কখন মায়ের, তখন ব্যয়ভার বহন করতে হয় মাতাকেই। কখন অনাথ আশ্রমের, সঙ্গতিহীন নিরুপায় মাতার দান। এক্ষেত্রে অনাথ আশ্রমই শিশুর পিতামাতা এবং আশ্রমের বিধিমত লালিত পালিত হয়। সরকারী আশ্রমে সাধারণতঃ মাতৃপিতৃ পরিত্যক্ত সন্তানরাই ঠাঁই পায়। দাবিদার বলতে কেউ নেই, যেমন ডাষ্টবিনে কুড়িয়ে পাওয়া, এমন শিশুরাই এখানে আসে। আর আসে সেই অবৈধ সন্তানের দল যারা অন্ধ, মূকবধির, বিকলাঙ্গ।

উপসংহার

সমাজ ও দেশের পক্ষে অবৈধতা যেমন অশুভ তেমনি অহিতকর সন্তানের কাছেও। প্রথম অকল্যাণ ডেকে আনে অধিক শিশুর মৃত্যু ঘটিয়ে, যথার্থতঃ জন্মের পর প্রথম বৎসরে অবৈধ সন্তানের মৃত্যুহার বৈধ সন্তানের চেয়ে অনেক বেশী। দ্বিতীয় অহিতের মূলে রয়েছে পারিবারিক লালিত্যহীনতা আর সুখী গৃহকোণ ও জনিতৃযত্নের অভাব। বাঘ যেমন বনে সুন্দর, শিশুরাও তেমনি পরিবারে (ফ্যামিলিতে) সুখী। কাজে কাজেই মায়ের স্নেহ আর পিতার যত্ন দিয়ে ঘেরা সুন্দর সুখী ঘরোয়া পরিবেশ থেকে যারা বঞ্চিত তারা অসুখী হতে বাধ্য এবং এটাই এদের ক্ষতি করে সবচেয়ে বেশী। তৃতীয় অহিতকর কারণটি

নিহিত আছে অপরিচয়ের গ্লানিতে আর বেদনায়। বড় হয়ে যেদিন প্রথম বুঝতে শেখে পিতৃপরিচয় হেঁকে বলার মত নয়, সেদিন আরেক দফা ক্ষতির শুরু। পিতামাতা অবিবাহিত ছিল—আবিষ্কারের সে দিনটি যে কী ভয়ঙ্কর, কী ভীষণ হতাশার ও দুঃখের তা ভুক্তভোগীরাই জানে। তারপর যে ভয়ঙ্কর অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হয় তারই পরিণতিস্বরূপ পিতৃপরিচয়হীন বালক হীনতাবোধে আর ব্যর্থতায় ভেঙে পড়ে বা নিজেকে সসঙ্কোচে দূরে সরিয়ে রাখে। কিংবা সমাজের ঘৃণা, অনাদর, অপমানের বদলা দিতে চায় ঘোর সমাজবিদ্বেষী হয়ে, দুষ্ক্রিয়তার মধ্যে নিজেকে ছড়িয়ে দিয়ে।

অবৈধতা নাটকের শেষ এখানেই নয়। মাতাও আছে। সে কী চিরকালই কাব্যে উপেক্ষিতা থাকবে? তার দুঃখ, বেদনা নিয়ে কোন নাটক কি কোনদিন রচিত হবে না, কে জানে?

অবৈধ সন্তান বলতে সবাই আঙুল উঁচিয়ে ধরে মানবমিথুনের অসামাজিক ক্রিয়ার দিকে, আইনের দৃষ্টিতে সন্তানের অর্থনৈতিক দিকটাই বড়, কিন্তু এর বাস্তব দিকটার প্রতি কেন জানি না সবাই দেখি অন্ধ সাজে, কি আইন, কি জনগণ সবাই। বাস্তবতার দিকে চোখ রেখে কেউ যদি পথ চলতে চায়, এমন একটা অসহায় অবস্থার—অবৈধতার—প্রতিকার সাধনে তাকে সচেতন হতে হবে নিশ্চিত। আদর্শ সমাধানগুলি এই:

এক, জন্মনিয়ন্ত্রণের ব্যাপক প্রচার, বিবাহিত এবং অবিবাহিত উভয়ের জন্যেই। সম্প্রতি গ্রেট ব্রিটেনের ক্লিনিকগুলি কুমারীদের জন্যেও সহায়তা-হস্ত প্রসারিত করে দিয়েছে।

দুই, গর্ভপাত বৈধকরণ। কুমারী মাতার গর্ভপাত অনেক রাষ্ট্রেই সিদ্ধ।

তিন, অবৈধ গর্ভ যার দেহে তাকে দূরে সরিয়ে না দিয়ে কাছে টেনে নিতে হবে, হাসপাতালে সুখ-সুবিধা দিয়ে, আর্থিক সহযোগিতা দিয়ে, এবং শাস্তিমূলক ব্যবস্থা ও আইনগত দণ্ডবিধান যদি কিছু থাকে (কোন কোন রাষ্ট্রে, যেমন আমেরিকায়, ব্যভিচার, প্রাক্‌বিবাহ সহবাস দণ্ডনীয় অপরাধরূপে বিবেচিত) তার বিলুপ্তি ঘটিয়ে।

চার, অবৈধ শিশুর লালনপালন ব্যাপারে অনুমিত পিতার সাহায্যলাভের জন্যে আইন প্রণয়ন।

ছয়, অনুকূল জনমত গড়ে তুলতে হবে, প্রচার ও জনশিক্ষার মাধ্যমে, যার ফলে জনমত অকারণে চঞ্চল হবে না, কুমারী মাতাকে কেউ উপেক্ষা করবে না এবং অবৈধ সন্তানকে ঘৃণাও করবে না কেউ।

প্রসঙ্গতঃ বলে রাখা ভাল, এই আদর্শে কোন দেশ পৌঁছয়নি। তবুও বলি, অনেক দেশ অনেক এগিয়ে গেছে আর আমাদের দেশ সবার নীচে, সবার পিছে।

শুধু এটুকুই সান্ত্বনার যে প্রাচীন ভারতীয় সমাজে অবৈধতা কোনদিনই এত ঘৃণ্য ছিল না। তখন বুকভরা সাহস ছিল সত্যকে স্বীকার করার। দ্বাদশ পুত্রের অন্তর্ভুক্তি এরই মস্ত প্রমাণ। নিজ পুত্র সত্যকাম যে পিতৃপরিচয়হীন এ সত্য প্রকাশ করতে অকুণ্ঠিতা ছিলেন জাবালা। পিতা ও মাতা উভয়েই অবিবাহিত ছিলেন সেটা ঘোষণা করার মত বুকের পাটা ছিল ব্যাসদেবের। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কানীন পুত্রকে (কর্ণ) স্বীকৃতি দিতে কুন্তীর বুক কাঁপেনি, মুখও ফ্যাকাসে হয়নি।

তাই না আধুনিক যুবক-যুবতীদের কাছে আমার জিজ্ঞাসা, সত্যকাম-জননী জাবালার সেই সাহস আজ আর নেই কেন? নিজ জন্মবৃত্তান্ত অকপটে বলার দুঃসাহস কি শুধু ব্যাসদেবরই হবে?

আর যদি কিছুই না পারি, ডাস্টবিনের বিকল্প হিসেবে প্রতিটি হাসপাতালে দোলনা স্থাপন করতে দোষটা কোথায়? এটা হয়ত অক্ষম পুরুষের পলায়নী মনোবৃত্তির মত শোনাবে, তবুও বলি মন্দের ভাল। হাসপাতালের এই দোলনায় মায়েরা অসঙ্কোচে আসবে, অবাধ অধিকার থাকবে শিশুটিকে একটি চুম্বনে শুইয়ে রেখে চলে যাওয়ার, তারপর অন্য মায়েরা এসে ভার নেবে সেই নির্দোষ নিরপরাধ, অসহায় শিশুটির। যদিচ আমাদের লক্ষ্য হবে, সমগ্র সমাজেরই এজাতীয় দোলনায় রূপান্তর। অর্থাৎ সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্তনই আমাদের কাম্য। পুরনো পৃথিবীর সমাজব্যবস্থা আজও কি চলে? এখনও কি পুনর্বিচারের সময় আসেনি?

মানুষ মাত্রই ভুল করে, এবং জীবনের সেই ভুলকে পাপ বলে বিধান দেওয়া ভাল নয়। একে যদি পাপ বলি, এপাপ যে ব্যুমেরাং-এর মত সমাজকেই স্পর্শ করবে। কেননা এই পাপেরই জের টানতে গিয়ে স্বর্গীয় শিশুর ঠাঁই কিনা ডাষ্টবিনে, আর কুমারী মাতা গৃহচ্যুত কিংবা নিন্দিত। এমন পুরুষত্বহীন সমাজ শেষ কবে হবে, কে জানে!

নতুন পৃথিবীতে আমরা চাই সেই সমাজ, যেখানে অবৈধতা বলতে জনমত চঞ্চল হয় না, যেখানে প্রতিটি শিশুই মায়ের কোলে সুন্দর। অর্থাৎ মায়ের কোলে বৈধ এবং অবৈধ প্রতিটি শিশুরই অধিকার জন্মগত এবং সমান সমান। মাতা কলঙ্কের অন্ধকারে হারিয়ে যায় না, নিজ জীবনী বর্ণনায় সন্তান থাকে উচ্চশির এবং সর্বোপরি পিতা এগিয়ে আসে সন্তানের টানে। শুধু তখনই সম্ভব, অবৈধতা সমস্যার যথার্থ সমাধান। এসবই সম্ভব, যদি যুবসমাজ অগ্রণী হয়।

২১ / অপরাধী যৌনতা দিকে দিকে

এ ভঙ্গ বঙ্গদেশ সত্যিই রঙ্গে ভরা। নইলে কবির সেই প্রার্থনা—দাও ফিরে সেই অরণ্য—আজ এমন করে মূর্ত হয়ে উঠবে কেন! বস্তুতঃ অরণ্যের দিন-রাত্রির আস্বাদন আজ এই সভ্য গৌড়দেশেই, এমন কি এই কলকাতা শহরেই মিলবে। কিন্তু হায়, সেই সহজ সরল অনাড়ম্বর স্নিগ্ধ জীবনের চিহ্ন পড়েনি কোথাও। এসেছে শুধু ভয়ঙ্কর আতঙ্কিত দিনগুলি যাকে আরণ্যক সন্ত্রাস বা অরাজকতা বলাই ভাল।

জোর যার মুল্লুক তার। এআরণ্যক নীতি জীবনের প্রতিটি স্তরেই শিকড় ছড়িয়েছে। বর্তমানে অনিয়মই নিয়ম, নীতিহীনতাই নীতি এবং অস্বাভাবিক মৃত্যুই স্বাভাবিক। এসব অনাচার দেখে আজ আর কোন চঞ্চলতা জাগে না, কেমন যেন গা সওয়া হয়ে গেছে আমাদের, পাশ কাটিয়ে নীরবে চলে যাই, রুখে দাঁড়াবার সাহস দূরের কথা প্রতিবাদ করার ভাষাটুকুও ভুলে গেছি। আর যদি না দেখে থাকেন, যে কোন সংবাদপত্র চোখের সামনে বিছিয়ে দিন, দেখতে পাবেন অস্বাভাবিক মৃত্যু আজ আর সংবাদপত্রের শিরোনাম নয়। হনন, লুণ্ঠন, সংঘর্ষ একটি স্বাভাবিক ফিচারে পরিণত। এবং এও নিশ্চয়ই চোখ এড়াবে না, ছিনতাই রাহাজানির অবিশ্বাস্য ভয়ঙ্কর বৃদ্ধি, আশ্চর্য কাণ্ড, প্রকাশ্য দিবালোকে এবং পুলিশেরই নাকের ডগায়। এক কথায় মানুষের সেই আদিম প্রবৃত্তিগুলিই নগ্নভাবে পুনরাবৃত্ত হতে চলেছে : অপরাধপ্রবণতা নিদারুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, ভয়ঙ্করভাবে ব্যাপ্ত হয়েছে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে।

নীতি ও মূল্যবোধ সততই লুণ্ঠিত, লাঞ্ছিত, অনিশ্চয়তার কোলাহলে চতুর্দিক মুখরিত, বিশৃঙ্খলা আর অরাজকতার অস্বস্তিতে প্রায় প্রতিটি মানুষ দুঃখিত, সেই শিথিল বিপর্যস্ত সমাজ-জীবনে অপরাধপ্রবণতা চাগিয়ে ওঠার কথা ইতিহাস বলেছে, একবার নয়, বারবার। এবং এই অপরাধপ্রবণতারই একটি বিশেষ আবেগফলাফল যৌন অপরাধ ও যৌন অনাচার। জীবনকে নিয়েই যৌনতা, সুতরাং সমাজ-জীবনে অপরাধ প্রবৃত্তির বল্গাছুট অবস্থা, যৌনব্যাপারে অপরাধ প্রবণতা বা দুষ্ক্রিয়তা ডেকে আনবে বই কি।

এখন দেখা যাক যৌন অপরাধ বলতে কি বুঝি। 'সেক্স ক্রাইম' বা 'সেক্স

অফেন্স'—এর বাংলা প্রতিশব্দ যৌন অপরাধ এবং এটা হচ্ছে আইনতঃ নিষিদ্ধ এবং দণ্ডনীয় কামানুষ্ঠান। এবং এরূপ কামীজনকে বলা হয় যৌন অপরাধী (সেক্স অফেণ্ডার)। কাজে কাজেই যৌন অপরাধীমাত্রই যে নিষিদ্ধ কর্মের জন্যে কারারুদ্ধ বা দণ্ডপ্রাপ্ত দুর্জন এরূপ একটা ভয়ঙ্কর ছবি আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। কারণ, এ অপরাধে অপরাধীমাত্রই কারারুদ্ধ হয় না, দণ্ডপ্রাপ্তও না। সত্যি কথা বলতে কি, আমাদের এই সমাজেই অনেক অপরাধী ছড়িয়ে আছে, এদের অনেকেই সুস্থ স্বাভাবিক, এমন কি উচ্চমর্যাদাসম্পন্নও কেউ কেউ। আর বিশ্ববরেণ্য কিনসী-র কথা যদি মানতে হয় এবং এটা এতই প্রামাণ্য যে না মেনেও উপায় নেই, সমগ্র জন-সমাজের শতকরা পঁচানব্বই জন পুরুষ এবং উচ্চসংখ্যক নারী জীবনের কোন না কোন সময়ে যৌন অপরাধে রত ছিল।

মানুষে মানুষে অনন্ত ভেদ, সুতরাং যৌন অপরাধেও প্রকারভেদ অনেক। অর্থাৎ কিনা এজাতীয় অপরাধের ছবিটি সর্বত্রই এক নয়। কোথাও এ অপরাধ তুচ্ছ, সামান্যতম, ছবিটি বিবর্ণ সুরতম্লান, বিবাহিত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সীমিত থেকেও কোন কোন আচরণ, উদাহরণস্বরূপ, মুখমেহন, পায়ুমেহন, অপ্রাকৃত যৌন অপরাধরূপে চিহ্নিত। ছবিটি কোথাও রক্তগঙ্গা-তরঙ্গিনী, অপরাধও ততোধিক ভয়ঙ্কর, কামনার হিংস্র থাবায় ক্ষতবিক্ষত ধর্ষণ। এমন কি উভয়পক্ষ সম্মত, সানন্দে সুরতরত, তবুও কিনা বয়সের গণ্ডি এদের পায়ে বেড়ি পরাতে পারে (সাংবিধানিক বলাৎকার)। যতই চিত্রবিচিত্র হোক না কেন, যৌন অপরাধগুলি নিম্নোক্তভাবে শ্রেণীবিন্যস্ত করা যেতে পারে। আইনতঃ নিষিদ্ধ এবং দণ্ডনীয় যৌনাচারগুলি মোটামুটিভাবে এই :

এক, বলপূর্বক বাহ্য রত (সেক্সুয়্যাল এ্যাসল্ট)। নারীদেহে অবৈধ হস্ত-যোজনা। একেই সচরাচর বলা হয় শ্লীলতাহানি। রত দ্বিবিধ। আভ্যন্তর রত অর্থাৎ যথার্থ সহবাস। এবং বাহ্য রত, অর্থাৎ সুরতব্যাপার বাদ দিয়ে অন্যান্য কামাচার। দৃষ্টান্ত, গায়ে হাত বুলান, গাল টিপে দেওয়া, হঠাৎ প্রবল-বেগে আক্রমণ তারপর চুম্বন কিংবা আলিঙ্গন। এরূপ রতানুষ্ঠানে নারীকে বাধ্য করান হয় আকস্মিকতার বিহ্বলতায়, বলপ্রয়োগে কিংবা ভয় দেখিয়ে।

দুই, বলপূর্বক আভ্যন্তর রত। ইংরেজীতে একেই বলা হয় 'রেপ'। একে সভ্যদেশমাত্রই চিহ্নিত করেছে গুরুতর অপরাধরূপে এবং এ অপরাধের মূল কথাটি হল বিনা সম্মতিতে স্ত্রী ভিন্ন অন্য নারীসম্ভোগ। সাধারণতঃ পশুর মতই বল দ্বারা আস্বাদিত, কখন প্রাণভয় দেখিয়ে, পিস্তল-ছোরার ডগায় রেখে। আইনের

বিচারে অঙ্গপ্রবেশ না করিয়েও বলাৎকার সম্ভব, শুধু পুরুষাঙ্গ ভগদেশ স্পর্শ করলেই হল। কোথাও বা চাতুরীছলনাশ্রিত মিলনও এ-পর্যায়ভুক্ত হয়েছে।

তিন, অপ্রকৃত বলাৎকার। যথার্থতঃ নয়, আইনতঃ বলেই এটা অপ্রকৃত। যৌনব্যাপারে সম্মতিদানের বয়সের—অর্থাৎ ১৬ থেকে ১৮ বৎসরের—নীচে কুমারীর সঙ্গে রতিযুক্ত পুরুষ আইনতঃ অপরাধী, সাংবিধানিক বলাৎকার (ষ্ট্যাচুইটরি রেপ) এই অপরাধে। যদিচ বল দ্বারা করণ নেই, নেই কোন ভীতিপ্রদর্শন এবং সম্মতি আছে ষোল আনা, তবুও।

চার, অজাচার। নিষিদ্ধ সম্পর্কীয় রতি। নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত আত্মীয়-স্বজনের, দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে ভ্রাতা-ভগিনীর, কাকা-ভাইঝির, কামানুষ্ঠান প্রায় প্রতিটি সভ্যদেশেই নিষিদ্ধ।

পাঁচ, প্রদর্শনমূলক যৌনাচার। মনোবিদের কাছে যেটা বিলসনকাম, আইনের দৃষ্টিতে সেটাই অশোভন আচরণ (ইনডিসেন্ট এক্সপোজার) রূপে দণ্ডনীয়। যেমন, বালক-বালিকাকে বয়স্ক পুরুষের গোপনাঙ্গ প্রদর্শন। অথবা প্রকাশ্যে (পার্কে) পাণিমেহন।

ছয়, কতিপয় কামবিকৃতি যেমন সমকামিতা, পশুমৈথুন, পায়ুমৈথুন ইত্যাদি কামানুষ্ঠান প্রজননবিহীন এবং লালসাময়, হয়ত একারণেই 'অস্বভাবী রত'-র কালিমা দেখেছে শাস্ত্রকারগণ এবং এখানেই ক্ষান্ত হয়নি অপ্রাকৃত যৌন অপরাধ (আনন্যাচারাল অফেন্স) রূপে লাঞ্ছিত করেছে, প্রণয়ন করেছে দণ্ডনীতি। এমন কি সুখী দম্পতি বা প্রণয়াসক্ত নর-নারীর মধ্যে সীমিত থেকেও, কোন কোন কেলিবিলাস যেমন গোপনাঙ্গে মুখপ্রদান (মুখমেহন) বা পায়ুদেশে অঙ্গসংযোগ, এজাতীয় অপরাধরূপে গণ্য।

সাত, ব্যভিচার (অডাল্টেরি)। দুই সম্মত ব্যক্তির রতিলীলাও অবৈধ হবে, এর মধ্যে একজন যদি তৃতীয় ব্যক্তির সঙ্গে বিবাহিত হয়। অর্থাৎ স্ত্রীকে (কিংবা স্বামীকে) বাদ দিয়ে অন্য নারীর (বা পুরুষের) সঙ্গে সুরতপ্রবৃত্ত হওয়া শুধু যে লোকচক্ষে নিন্দনীয় তা নয়, আইনতঃ দণ্ডার্হও বটে। অতএব বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্যে একটি সর্বতোগ্রাহ্য যুক্তিও বটে।

আট, প্রাক্‌বিবাহ সহবাস (ফর্নিকেসন)। দুই অবিবাহিত ব্যক্তির সুরতসুখ সম্ভোগও নিষিদ্ধ, খ্রীষ্টীয় জগতে অত্যন্ত গর্হিত।

নয়, বেশ্যাবৃত্তি বিষয়ক প্রতিটি প্রসঙ্গই আইনতঃ দণ্ডনীয়। এপাপ ব্যবসায়ের মূল নায়িকা, দেহোপজীবিনী, দ্বিতীয়তঃ নিয়োগকারক (যেমন, বাড়ীউলি) তৃতীয়তঃ, যারা পুরুষকে বেশ্যাগমনে প্ররোচিত করে বা সন্ধান

দেয় সেই দালাল শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিরা (পিম্পিং, প্যাণ্ডারিং)—সকলেই অপরাধী।

দশ, বিবিধ অনাচার। একাধিক বিবাহ (বাইগ্যামি) অবশ্য মুস্লিমদের ক্ষেত্রে চারটির বেশী না হলে প্রযোজ্য নয়। অশ্লীলতা (অবসিনিটি), যেমন অশ্লীল প্রস্তাব রাখা, অশ্লীল ভাষায় কথা বলা। নারীহরণ (এ্যাবডাকসান)। প্রেমাস্পদের সঙ্গে গোপনে পলায়ন (ইলোপমেন্ট)। বিবাহ (কিংবা চাকুরী) নামক ছলনার আশ্রয়ে মিলন (সিডাকসন)। হত্যাকাম (সেক্স মার্ডার)। শিশুকামিতা, যেমন বালমেহন। যোল পেরোয়নি এমন বালিকার সঙ্গে রতিরসরঙ্গ—মুখরত, ভগদেশে অঙ্গুলিকর্ম, বক্ষোদেশে বা উরুমধ্যে অঙ্গসংযোগ, চুম্বনালিঙ্গনাদি বাহ্য রত। ঈক্ষণকামিতা, বসনকাম ইত্যাদি কামবিকৃতি।

উপরিউক্ত অপরাধে অপরাধীরা সবাই যে সাধারণ, বৈশিষ্ট্যবর্জিত তা নয়, জনারণ্যের ভীড় থেকেও এদেরকে চিনে নেওয়া যায়। অর্থাৎ অধিকাংশ যৌন অপরাধীদেরই কয়েকটি সাধারণ (কমন) বৈশিষ্ট্য আছে। এবৈশিষ্ট্য আলোচনার পূর্বে প্রচলিত কয়েকটি ভুল ধারণা তুলে ধরতে চাই :

যৌন অপরাধ, বিশেষ করে অপরাধীদের সম্বন্ধে অনেক ঘটনা বা কিংবদন্তী ছড়িয়ে আছে। এরই একটি এই যে, লোকমাত্রই ধরে নেয়, এরা নাকি ভয়ঙ্কর : কামান্ধ, দুর্জন কিংবা খুনী। অপরাধপ্রবণতা এদের মজ্জাগত, আবেগবিহ্বলতা ভীষণ, কামতাড়না ভয়ঙ্কর, আক্রমণমূলক প্রবৃত্তিও দুর্দান্ত। কিন্তু বাস্তবের অভিজ্ঞতা এতে সায় দেবে না। একটু আধটু বিকৃত (কামজ কিংবা মানস) হলেও হতে পারে, তাই বলে এরা ভয়ঙ্কর জীব না, কামপিশাচও না। সত্যি কথা বলতে কি, অধিকাংশ অপরাধীই ফণাহীন নির্বিষ সাপের মতই ক্ষতিহীন।

দ্বিতীয়তঃ, যৌন অপরাধ এবং কামবিকৃতি এক নয়। অর্থাৎ যৌন অপরাধীমাত্রই কামবিকৃত নয়। এবং কামবিকৃত হলেই যৌন অপরাধী হতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিই। এই সাংবিধানিক বলাৎকারের কথাই ধরা যাক না কেন। আইনতঃ এরা অপরাধী হতে পারে কিন্তু কামতঃ এরা বিকৃত নয়, সুস্থ ও স্বাভাবিক। আবার ধর্ষকাম-মর্ষকাম প্রভৃতি কামবিকৃতির ক্ষেত্রে সঙ্গী বা সঙ্গিনী দ্বারা দয়িতজন পিষ্ট ক্লিষ্ট ব্যথাজর্জরিত তবুও কিনা অপরাধের ছায়া পড়ে না।

তৃতীয়তঃ, অনেকেরই মনে হতে পারে, এবং এটা খুব অন্যায় নয়, এরা ইতর অভদ্র কিংবা অধঃপতিত, নীচু জগতের বাসিন্দা, হয়ত একারণে এরা অপরাধ করে। না, এটা ঠিক নয়। যৌন অপরাধের জন্যে এদের শোচনীয়

অক্ষমতা, মনোগত দীনতা ক্ষুদ্রতা (যেমন অপরিণত বুদ্ধি বা ব্যক্তিত্ব), প্রচণ্ড মানসবিক্ষোভই দায়ী। অথবা মানসলৈঙ্গিক আহ্বানে সাড়া দিয়েছে মাত্র, কিন্তু এসাড়া দেওয়াটাই (যেমন, নিঃসঙ্গ দুই অসহায় পুরুষের রতিযুক্ত হওয়া) যে নির্মমভাবে নিষিদ্ধ, রূঢ়ভাবে নিন্দিত, অন্যায়ভাবে শৃঙ্খলিত।

চতুর্থতঃ, এরা নাকি প্রবলভাবে ইন্দ্রিয়পরায়ণ, যৌন আবেগে তাই বাঁধ দিতে পারে না, সুযোগ পেলেই শিকারীর মত ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু অনেক অপরাধীরই যৌনতা স্বাভাবিক। এবং এদের যৌনতা দুর্দান্ত নয়, অতিবড় কামী তো নয়ই। বরং এদের রতিভুবন অত্যন্ত খাটো মাপের, শত শত বাধা আর নিষেধের ডোরে বাঁধা। এবং সাতিশয় আবেগপ্রবণও না।

এবারে সাধারণ বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গ। শুনে হয়ত চমক লাগবে, তবুও এটা সত্য যে, যৌন অপরাধীরা সুস্থ এবং স্বাভাবিক হতে পারে, না কামবিকৃত, না মনোরোগগ্রস্ত। কখন কামবিকৃত, যেমন সমলৈঙ্গিক কামিতার সতত অভিলাষ। কখন মনোদুষ্ট, উন্মাদরোগগ্রস্ত (সাইকোটিক) কিংবা বায়ুরোগগ্রস্ত (নিউ-রোটিক)। কখন উভয়তঃ দুষ্ট, যেমন কামবিকৃত তেমনি মনোবিকৃত। কখন বা মনের দিক থেকে ত্রুটিযুক্ত, দৃষ্টান্ত, সংযমের অভাব (মাদকদ্রব্য, মৃগিরোগ), আক্রমণমূলক প্রবৃত্তির প্রবলতা, বাধ্যতামূলক কোন দুর্বার আবেগ।

অধিকাংশই নবযুবা (টিন এজার) কিংবা সোমত্ত যুবক। বয়স ১৭ থেকে ১৯-এর মধ্যে, কিংবা দ্বি-দশকের প্রথম দিকে। ৫০-৬০% অবিবাহিত। অল্প-সংখ্যক (২০%) অপরাধী বলপ্রয়োগ করে বা ভয় দেখায়।

অধিকাংশ জনই (৯১%) মানসত্তার দিক থেকে অপরিণত। দুর্বল ব্যক্তিত্ব অনেকেরই (৬৮%)। শৈশবে প্রায়ই স্নেহবঞ্চিত (৪৫%)। অপরের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন কেউ কেউ (৩০%)। শতকরা ৪৪ জনের বুদ্ধি সাধারণ মানের চেয়ে নীচু, বাদবাকীরা স্বাভাবিক, এমন কি এরই মধ্যে কেউ কেউ উচ্চবুদ্ধিসম্পন্নও।

কোন কোন গবেষকের ধারণায়, অপরাধীদের সামাজিক পটভূমিকা প্রায়শঃ অসুন্দর : অল্প শিক্ষা, আর্থিক দুরবস্থা, নিম্ন পর্যায়ের সামাজিক অবস্থা, অতীত জীবন (শৈশবকাল) এবং বর্তমান জীবন (পারিবারিক) দুঃখময়।

পুনঃপুনঃ দণ্ডিত অর্থাৎ দাগী অপরাধীরা মনের দিক থেকে যে ত্রুটিযুক্ত বা দুষ্ট তাতে কোন সন্দেহ নেই। কখন অপরিণত, দুর্বল। কখন চঞ্চলচিত্ত, সদাই অশান্ত, বিক্ষুব্ধ। নইলে যৌন অপরাধের প্রেরণা বার বার ফিরে আসবে কেন?

যৌন অপরাধীদের অনেকেই কঠোর শাস্তি বা লম্বা কারাদণ্ড ভোগ করে।

সামাজিক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা তো রয়েছেই, মাঝে মধ্যে ইট পাটকেল, প্রহার, বেত্রাঘাত প্রভৃতি দৈহিক শাস্তিও যে না জোটে তা নয়। এশাস্তির জন্যে দায়ী সেই রক্ষণশীল মনোভাব : এরা ভয়ঙ্কর, দুর্দান্ত, ঘৃণ্য অতএব কঠোর শাস্তিই এদের পাপের যথোচিত পুরস্কার। কিংবা দণ্ডভোগই এদের শোধন করে দেবে এই আশা নিয়েই এরা কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয় (অণ্ডচ্ছেদ কিংবা বন্ধ্যকরণ অপারেশনও এর সঙ্গে যুক্ত হয় কখন কখন)। এআশা ছলনা বলাই ভাল কারণ কিনসী রিপোর্টে দেখব, দণ্ডপ্রাপ্ত ১৩০০ জন অপরাধীর মধ্যে অতি অল্প কয়েকজনের আচরণধারা পরিবর্তিত।

অশিষ্টের দমন অবশ্যই কাম্য। কিন্তু যৌন দুর্জনদের দমন বলতে যদি বুঝি লাঠি দিয়ে শাসন তবে সবই ভস্মে ঘি ঢালার মতই বিফল হতে বাধ্য। এদের জন্যে চাই শোধন এবং এই উদ্দেশ্যে সর্বাগ্রেই প্রয়োজনীয় উদার মনোভাব এবং আধুনিক মনোচিকিৎসা। প্রথমেই এদেরকে কোল দিতে হবে স্বাভাবিক মানুষরূপে। বুঝতে হবে শুধু হঠকারিতার জন্যেই কিংবা বেপরোয়া দুঃসাহসী বলেই মাঝে মধ্যে বিপদের জালে জড়িয়ে পড়ে, নইলে এদের কোন দোষ নেই। কিংবা বিপর্যস্ত সমাজ-জীবনের শিকার। কিংবা গভীরভাবে বিক্ষুব্ধ, যৌন অপরাধ এরই প্রকাশফল। সুতরাং শিক্ষা দিয়ে, জীবনদর্শনের ধারা বদলে দিয়ে (ভয়, শত্রুতাভাব, হীনতাবোধ ইত্যাদি ভেঙ্গে দিয়ে) এদেরকে সুস্থ করে তুলতে হবে। আর মনোদুষ্ট এবং কামবিকৃতদের জন্যে মনোচিকিৎসারও সুযোগ দিতে হবে।

এখানেই শেষ নয়। সাধারণ যৌন শিক্ষা সমাজের প্রতিটি স্তরে ছড়িয়ে দিতে হবে। সাজাতে হবে আইনবিধিও, যুগোপযোগী ছাঁচে ফেলে। এবং সমাজ-জীবনে এমন একটা অনুকূল পরিবেশ রচনার জন্যে চেষ্টিতকায় হতে হবে যার ছায়ায় ছায়ায় সযত্নে লালিত হবে এক উদার প্রশস্ত যৌননীতি (পারিমিসি-ভনেস উইথ এ্যাফেকসন)। কেননা, উদার যৌননীতির জন্যে ভুবনবিদিত যে ডেনমার্ক, সেই দেশে যৌন অপরাধের ঘটনমাত্রা তুলনামূলকভাবে অনেক অনেক কম।

এবারে মূল প্রসঙ্গে ফিরি। বর্তমান যুবসমাজে যৌন অনাচার যে কোন চক্ষুষ্মান ব্যক্তিরই চোখে পড়বে। এসব আগেও ছিল, এখন একটু বেশী মাত্রায় দৃষ্টিকটু হয়ে উঠেছে, একটু ব্যাপক হারে ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। শুধু অশিক্ষিত নয়, শিক্ষিত মহলেও। শুধু শহরে নয়, গ্রামেও। এতদিন ছিল কলেজের আঙিনায়, এখন দেখি স্কুলের প্রাঙ্গণেও। এক কথায়, বঙ্গময় ছড়িয়ে পড়েছে

এবং প্রায় সমগ্র যুবসমাজই যেন অসহ্য যৌনতার ভারে অস্থির, এখনই ফেটে পড়বার উপক্রম। বিচার-আচার বলে কিছু নেই, আবেগ এসেছে, দাও, বাঁধ খুলে দাও, এদের নীতি অনেকটা 'যৌন সর্বস্ববাদ'-এর সঙ্গে তুলনীয় লক্ষ্য যার যেন তেন প্রকারেণ তৃপ্তিলাভ। ফলস্বরূপ, সমকামিতা, প্রাক্‌বিবাহ সহবাস, বিবাহেত্তর সহবাস বহুদৃষ্ট, এমন কি গোপনে পলায়ন, ছলনামিশ্রিত মিলনও। অবাধ মেলামেশার সুযোগের অপব্যবহার, হৈ হুল্লোড় থেকে বেলেল্লাপনা, যৌন স্বাধীনতার নামে যৌন অনাচার, পার্টির নামে অবাধ ইন্দ্রিয়চরিতার্থতা, মাদক-দ্রব্যে আসক্তি—এসবেরই আবেগফলাফল রতিপ্রমত্ততা। ইদানীং, শুধু রতি-প্রমত্ততা নয়, যৌনতার নামে বজ্জাতিও বৃদ্ধি পেয়েছে ভীষণ। যৌন অনাচারে মত্ততা এখন আর পূর্বের মত দুর্লভ নয়। কাগজে কাগজে ঘটনা যে রটেছে সেটা যেমন সত্য তেমনি সত্য আমার আপনার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও। বল-পূর্বক বাহু রত সাম্প্রতিককালের একটি বিশেষ ঘটনা। পাড়ায় পাড়ায় যারা মস্তানরূপে খ্যাত এখন আর তারা শুধু টিটকারী মন্তব্য করেই ক্ষান্ত নয়, এরা চায় আরও এ্যাডভেঞ্চার, একটা কিছু করে নিজেদের বাহাদুরি দেখাতে চায়, এরা তাই নারীদেহে হস্তযোজনার জন্যে লালায়িত এবং ক্লৈব্য সমাজও তাকে সেই সুযোগ দিয়েছে। দুটি সত্য ঘটনা বলি। প্রথম ঘটনাটি স্থূল হস্তাবলেপের, নির্জন দুপুরে কোন কিশোরী ট্রামের জন্যে প্রতীক্ষারতা, সেই নির্জনতার সুযোগে তিনজন নবযুবার অনায়াস হস্তযোজনা, কিশোরীর প্রতিবাদ সত্বেও। আরেকটি ঘটনা, প্রকাশ্য জনবহুল রাস্তায় চার যুবকের দল থেকে একজনার মোটর গাড়ীতে আরোহিনীর চিবুক গাল ধরে মেকী আদর! এমন কিছু কিছু ঘটনার সাক্ষী হয়ত আপনারা অনেকেই। আর সংবাদপত্রের কল্যাণে, নারীহরণ ও ধর্ষণের কাহিনী প্রায় প্রত্যহই যে আপনার দৃষ্টি কেড়ে নিচ্ছে তা নয়।

কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, কতিপয় সমাজবিরোধী কিংবা পি-ডি এ্যাক্ট-এ শৃঙ্খলিত কিছু দুর্জনের মুক্তিলাভ, এসব অনাচারে মদত দিয়েছে। ছেলে ভুলানো এই যুক্তি দিয়ে সাম্প্রতিককালের বহুদৃষ্ট যৌন অপরাধপ্রবণতার ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। এঅনাচার সর্বত্রই অনুষ্ঠিত এবং সমাজেও ব্যাপকভাবে প্রসারিত, কারণটি তাই আরও ব্যাপক হতে বাধ্য। নেতি নেতি করে খুঁজতে গিয়ে দেখব বিপর্যস্ত সমাজ-জীবনই অপরাধী।

কে না জানে, মানুষের যৌনতা দুষ্ট খাদে প্রবাহিত হবে সমাজ-জীবন যদি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে, যেমনটি হয়েছিল পতনোন্মুখ রোমক সাম্রাজ্যের শেষের সেই ভয়ঙ্কর দিনগুলিতে কিংবা শেষ মুঘল সম্রাট বাদশা খানের রাজত্বকালে।

উপসংহারে বলি, প্রাপ্তবয়স্কতা, সম্মতি আর গোপনীয়তা, এতিনটি শর্ত পূরিত হলে যে কোন যৌনতায় স্বাধীনতা মানুষমাত্রেরই মৌলিক অধিকার। অর্থাৎ উভয়পক্ষ প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থমস্তিষ্ক, সম্মত এবং গোপনে (অর্থাৎ প্রকাশ্যে নয়) সানন্দে সুরতরত, এবং শঠতা কপটতা প্রলোভন প্রবঞ্চনা বলপ্রয়োগ প্রভৃতি কোন অন্যায়ের আশ্রয় নেই, তখন সমাজ, নীতি আইন কারুরই বলার কিছু নেই। শুধু সন্তানহীনতা থাকা চাই এবং অবশ্যই অনুরাগে ভর দিয়ে চলা চাই।

কিন্তু বল দ্বারা করণ? ভীতিপ্রদর্শনে বিবশ করা যৌনতার সুশীতল আস্বাদন? নাবালকত্ব বা মনোগত অসুস্থতার সুযোগ নিয়ে কলুষিত কামনার উপভোগ? অন্যায়ভাবে রতিযুক্ত হওয়া কিংবা প্রকাশ্যে নির্লজ্জ যৌনাচার? নৈব নৈব চ। অবশ্যই দণ্ডনীয় এসবক্ষেত্রে সমাজ ও আইনের দৃঢ় হস্তক্ষেপ যেমন কাম্য তেমনি কাম্য বিলম্বরহিত পুলিশী সক্রিয়তা। এর চেয়ে আরও কাম্য রাজনৈতিক নিশ্চয়তা আর সুস্থ সবল সুন্দর সমাজ-জীবন। এই প্রার্থনার উত্তরে বলি: সাধারণ শিক্ষা ও নতুন জীবনদর্শন ছড়িয়ে পড়ুক দিকে দিকে। আষ্টেপৃষ্ঠে শৃঙ্খলিত যৌন নীতি আরও একটু শিথিল, আরও একটু উদার হোক। পরিবর্তিত হোক আইনবিধিও, যুগোপযোগী ছাঁচে ফেলে। সর্বোপরি, অপরাধীদের জন্যে মনোচিকিৎসার প্রতি অধিক যত্নশীল হোক আমাদের এই রাষ্ট্র। দৈহিক নির্যাতন ও কারাদণ্ড অপেক্ষাও অধিক।

পঞ্চম পর্ব

সভ্যতা, ধর্ম ও যৌনতা

২২ / সভ্যতার আয়নায় ঃ যৌনতা এবং সমকামিতা

সভ্যতা হচ্ছে সিসমোগ্রাফ, সভ্যতার পরতে পরতে মানব-যৌনতার প্রতিটি স্পন্দন তাই থরে থরে সাজান। কাজে কাজেই দুটি পুরুষ কিংবা দুটি নারীর কামলীলা, যাকে আমরা বলি সমরতি বা সমকামিতা, ইংরেজীতে হোমোসেক্সু-য়্যালিটি, সভ্যতার আয়নায় প্রতিফলিত হতে বাধ্য, যদিচ সে ছবি—কামী-যুগলের মুখছবি—প্রায়ান্ধকারে কখন অস্পষ্ট, কখন ক্ষুদে সূর্যর মতই উজ্জ্বল।

প্রাণ থাকলেই, প্রাণের বিস্তার—সঙ্কোচন আর প্রসারণ। মানুষ থাকলেই তেমনি যৌনতার বিকাশ। এবং ছয়টি অশ্ববাহিত যৌনতার একটি অশ্ব: সমকামিতা (অন্যগুলি হচ্ছে: পাণিমেহন, সুপ্তিস্খলন, নর ও নারীর ইতর-কামিতা, রতিবিহীন উপচার, পশুমৈথুন)। কাজে কাজেই মানুষের অস্তিত্ব সমকামিতা দিয়ে জড়ান। যদিচ তৃপ্তির এপথ বেঁকে গেছে প্রচলিত ধারণার পথের থেকে, তবুও এটা ফেলনা নয়, উড়িয়ে দেওয়ার মতও না। নর এবং নারী উভয়েরই জীবনে সমরতি-র আসনটি পাতা, প্রথম কামোন্মেষের দিনটি থেকেই। আর মানব নিয়েই সভ্যতা, সুতরাং সভ্যতার সেই আদি যুগে, এমন কি সেই কৃষ্ণযুগে অর্থাৎ প্রাগৈতিহাসিক কালেও, প্রণয়াসক্ত দুটি পুরুষ বা নারীর দেখা পাব।

ব্যাপারটা সত্যই তাই। পিছন ফিরে সভ্যতার যত দূরেই তাকাই না কেন, অতি প্রাচীন প্রাচ্য সভ্যতায়, ইজিপ্ট সভ্যতায়, সুমেরীয় ও এসিরীয় সভ্যতায়, গ্রীকো-রোমান সভ্যতায়, সমরতি-র চিহ্ন ছড়ান রয়েছে। আভাস মিলেছে পুরাতন প্রস্তর যুগেও। সুতরাং, এটুকু নিশ্চয়ই বলা যেতে পারে, সমকামিতা মনুষ্য জাতির মতই পুরনো। প্রসঙ্গত: উল্লেখ করি, মহাকবি গ্যেটে-র সেই স্মরণীয় উক্তিটি: পুরুষের ভালবাসা মানবেতিহাসের মতই প্রাচীন। শুধু কবি-প্রয়োগ নয়, ক্লিফোর্ড এলেন, রেনে গাঁইও, ফোর্ড ও বিচ, কিনসী প্রমুখ বিশ্বখ্যাত সুধীজনেরাও সায় দিয়েছেন এর প্রাচীনত্বের মহিমায়।

মনে হতে পারে, সমরতি বুঝি সভ্যতার কৃত্রিম আবহাওয়ায় সযত্নে লালিত, আদিবাসীদের সরল স্বাধীন জীবনে এসবের অত্যাচার নেই। না, আদিম-জগতেও অনুপ্রবিষ্ট, একমাত্র কারণ এই যে তারাও মানুষ এবং এই একই

যৌনতার বশীভূত। আদিম সমকামিতার বিশদ বিবরণ আছে ই. ওয়েষ্টারমার্ক প্রণীত 'দি ওরিজিন এ্যাণ্ড ডেভলেপমেণ্ট অব মর‍্যাল আইডিয়াস' এবং সি. এস. ফোর্ড ও এফ. এ. বিচ রচিত 'প্যাটার্নস অব সেক্সুয়াল বিহেভিয়ার', এদুটি গ্রন্থে। এমন কি আদিম মহিলারাও সমরতি অভিলাষিণী হতে পারে, বিশিষ্ট উদাহরণ, 'মোহেভ ইণ্ডিয়ানস'। আশ্চর্য, প্রাণিজগতেও ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সমকামিতার প্রামাণ্য এবং উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত (১৯৪ পৃষ্ঠা দেখুন)।

প্রতিটি স্তন্যপায়ী প্রাণীর রক্তে খেলা করে একটি মৌল শারীরবৃত্তীয় ধর্ম : যৌন উদ্দীপনার পাত্র সমলৈঙ্গিক বা ভিন্নলৈঙ্গিক যাই হোক না কেন, সেটা যদি হয় সমর্থ উদ্দীপনা, যে কোন স্তন্যপায়ী প্রাণী সাড়া দেবে, রতিরাগে উত্তপ্ত হবে। অতএব শর্তহীন মানুষও। অনেক মানুষেরই বয়ঃসন্ধিকালে ঠিক এমনটিই ঘটে। তারপর নিজ অভিজ্ঞতার সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধে, মোকাবিলা হয় সামাজিক রীতিনীতির কঠিন পাঞ্জার সঙ্গে, এরই আবেগফলাফল হিসেবে মানুষ তাড়িত হয় একটা নির্দিষ্ট পথে। অর্থাৎ কিনা প্রতিটি মানুষের মধ্যেই সমকামিতা বিষয়ক প্রবণতা লুকিয়ে আছে, সমাজের কঠোরতা, আইনের রক্তচক্ষু, লোক-নিন্দার ভয়াবহতার জন্যে এটা ব্যাপক নয়।

প্রাণিজগৎ এবং আদিম জগতের ঘটনারাজি এবং যৌন উদ্দীপনার ধর্ম, এসবই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে, সমকামিতা হচ্ছে 'বেসিক ম্যামা-লিয়ন ক্যাপাসিটি' (ফোর্ড ও বিচ) এবং এমন একটি সামর্থ্যের প্রকাশচিহ্ন যা মানুষমাত্রেরই অন্তর্গত (কিনসী রিপোর্ট)। তাই না ইতিহাসের প্রথম উষায়, মানব-যৌনতায় সমকামিতার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আর ইতিহাসের বর্তমান কালে এটা তো আরও গুরুত্বপূর্ণ, ভয়ঙ্কর সমস্যাপ্রদ হয়ে উঠেছে। একটি প্রামাণ্য নজির : ১৯২ এবং ১৯৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত কিনসী রিপোর্ট।

অতএব, অত্যুক্তি না করেও বলা যায়, সমকামিতা হচ্ছে সর্বকালের ঘটনা। যৌনতার একটি স্রোত যা প্রতিটি দেশেই চিরবহতা। প্রাণিজগতের পটভূমিকা, আদিমজগতে আশ্চর্যসুন্দর উপস্থিতি, যৌনউদ্দীপনার শারীরবৃত্তীয় ধর্ম, প্রাচীন মানবেতিহাসের ধারা, বিশেষ করে গ্রীসে-রোমে স্বাভাবিক প্রকাশ এবং বর্তমান যুগের উল্লেখযোগ্য ব্যাপকতা, এসবই ফিরে ফিরে এই একই কথা বলছে।

দেশকালসন্ততিভেদে সমকামিতা আছে এবং থাকবেও। চিরবহতা নদীর মতই। কিন্তু সর্বত্রই সমানভাবে কল্লোলিনী নয়। অর্থাৎ সমকামিতার প্রতি সমাজের মনোভাব এবং সভ্যতার ধারণা প্রতিটি যুগেই এক নয়। কখন উদার, ক্ষমাশীল, যেমন প্রাচীন সভ্যতা। কখন বিচলিত, অসহিষ্ণু, কেবলি কঠোর,

যেমন খ্রীষ্টীয় সভ্যতা, মধ্যযুগীয় ইউরোপ। কখন নির্বিকার, কতিপয় আদিম ও সভ্য সমাজ।

সমকামিতা এবং প্রজননবিহীন অন্যান্য যৌনতার প্রতি মানুষের মনোভাব কখন স্থাণু নয়, ক্রমপরিবর্তমান। সভ্যতা যখন রং বদলায়, এজাতীয় ধ্যানধারণাও মোড় নেয়। তা হলে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, যৌন আচরণের নীতি দিয়ে সমাজকে চেনা যায়, অতএব সভ্যতাকেও, যেমন চেনা যায় গোঁফ দেখে শিকারীকেও। কারণ যে কোন ভৌগলিক পরিবেশে যে কোন সমাজের রীতিনীতি অতীত ও বর্তমানের যৌনতানিয়ন্ত্রণের ধারা দিয়ে প্রভাবিত। দুটি প্রাচীন সভ্যতার নজির দিই, তা হলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

প্রথমে বলি প্রাচীন হিব্রু বা ইহুদী সভ্যতা। খ্রীষ্ট জন্মেরও কয়েক শতাব্দী পূর্বের ঘটনা। প্রাচীন ইহুদীরা তখন ছিল মুষ্টিমেয় এবং চতুর্দিকে বৈরভাবাপন্ন জাতি দ্বারা পরিবেষ্টিত। অগণিত শত্রুর আক্রমণ থেকে বাঁচতে হলে লোকবল চাই, আর সুখের কথা এদের জমিও ছিল আশ্চর্য-উর্বর। তাই না তাদের মন্ত্র ছিল 'বি ফ্রুটফুল এ্যাণ্ড মাল্টিপ্লাই'। অর্থাৎ কিনা প্রজননমূলক রতিভাবনায় স্বাগত জানাত এবং বিপরীতধর্মী যৌনতা সর্বথা পরিত্যাজ্য ছিল।

এই একই কারণে সমাজের বিধান ছিল প্রত্যেকেই কৃতদার হবে এবং সযতনে প্রয়াসী হবে ফললাভের জন্যে। কাজে কাজেই নিষিদ্ধ হল জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রত্যক্ষ উপায়গুলি—খণ্ডিত সুরত আর গর্ভপাত আর শিশু হত্যা। রুদ্ধ বা কণ্টকিত হল অপ্রত্যক্ষ পথগুলিও, যেমন বিবাহিতজনের পরপুরুষ বা পরনারী গমন (অডাল্টেরি), বেশ্যাগমন, পাণিমেহন, সমকামিতা, পশুমৈথুন। এবং এই একই রং লেগেছে প্রাক্‌বিবাহ যৌনজীবনে : কুমারীত্বের বা পুরুষের সতীত্বের জয়গানে, এবং পাণিমেহন, প্রাক্‌বিবাহ সহবাস (ফর্নিকেসন) ইত্যাদি প্রতিটি যৌনতার তীব্র নিন্দায়। এক কথায়, প্রজননবিহীন যৌনতামাত্রই ছিল নিন্দিত, নিষিদ্ধ এবং দণ্ডার্হ।

খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দী থেকেই ইহুদী সমাজে সমকামিতা ঘৃণ্য, ধিক্কৃত। ঘৃণা কুড়িয়েছে দুটি কারণে। ক্ষুদ্রজাতির বাঁচার দৃঢ়তার মধ্যেই প্রথম কারণটি নিহিত। সংখ্যায় ভয়ঙ্কর অল্প এবং চতুষ্পার্শ্বস্থ শত্রুরা অগণন, তখন কে না বলবে সংখ্যাবৃদ্ধি অবশ্যকর্তব্য। সুতরাং গর্ভসহায়ক নয় এমন প্রতিটি যৌন আচরণ পাপ (আনন্যাচারাল সিন) দ্বারা চিহ্নিত অতএব নিষিদ্ধ হতে বাধ্য। দ্বিতীয় কারণটি হল : জাতীয়তার তরঙ্গ, বিদেশী সভ্যতায় ঘৃণা। কোন কোন পণ্ডিতের ধারণায় পাপবোধ বা ক্রাইমবোধের চেয়ে পৌত্তলিকতার ভয়টাই

বেশী। কেননা চতুষ্পার্শ্বস্থিত বিদেশীদের মধ্যে মূর্তিপূজা এবং সমকামিতা দুইই বহুদৃষ্ট ছিল। তাই বিধর্মীয় (প্যাগান) অভ্যাস, ক্যানান (Canaan) বা ক্যালডিয়া (Chaldea) দেশীয় প্রথা হিসেবে সমকামিতা নিন্দিত। আবার, অন্য কেউ বলেছেন, জাতীয়তার তরঙ্গে শত্রুভাবাপন্ন প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের উদ্দেশ্যে তাদের আচার প্রথা বর্জন, অনেকটা স্বদেশী আন্দোলনের মত, ইংরেজ বয়কট করার মত।

পুরাতন বাইবেলে (ওল্ড টেষ্টামেণ্ট) দেখব পুরুষের সঙ্গে পুরুষের শয়ন নৈব নৈব চ। 'লেভেটিকাস'-এ সব চেয়ে ঘৃণ্য এবং হীনতম পাপাচার রূপে চিত্রিত। পুরাতন বাইবেলে 'সডোমি' শব্দটি প্রায়শঃ উল্লেখিত, পুরুষের সমকামিতা অর্থে ব্যবহৃত এই শব্দটি এসেছে, বাইবেলোক্ত সডোম নগর থেকে, কারণ এই নগরে (এবং 'গোমোরা' শহরেও) পরিব্যাপ্ত ছিল এঅভ্যাস এবং এই কদাচারের জন্যেই শহর দুটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে 'আব্রাহাম' কালে।

কিন্তু, বড়ই আশ্চর্য, এমনও একদিন ছিল যখন সমকামিতার নামে ইহুদীরা এত প্রবলভাবে শিউরে উঠত না। খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দী পূর্বের ইহুদী সমাজে অপ্রজনার্থে কামচিন্তার চলন ছিল, চলন ছিল সমকামিতারও। কারণ হিসেবে বলতে পারি, আদিতম ইহুদী সংহিতা 'ডুটরোনমি'-তে সমকামিতার উল্লেখ নেই, আছে পরবর্তীকালের 'লেভেটিকাস'-এ। দ্বিতীয়তঃ, পুরুষ-বেশ্যাত্ব একদা ইহুদী ধর্মেরও অঙ্গ ছিল। স্ত্রী দেবদাসীর মতই পুরুষ দেবদাস ইহুদী মন্দিরে শোভা পেত, এরা খ্যাত ছিল খাদেশ (Kadesh) নামে। একদা এদের আস্তানা ছিল জেরুজালেম মন্দিরে, 'বুক অব কিংস'-ই এঘটনার বড় সাক্ষী। অতএব জার্মানীতে, গ্রেটব্রিটেনে, ইউরোপে, আমেরিকায় (এবং ভারতেও) পুরুষ বেশ্যার কথা শুনে স্তম্ভিত হওয়ার অবকাশ কোথায়?

এবারে গ্রীসীয় সভ্যতার কথা। গ্রীকরাও ইহুদীদের মত সমান বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন ছিল। গ্রীকদের কাছে প্রজাবৃদ্ধি ছিল ভয়ঙ্কর, কারণ একদিকে জমি পাহাড়ী ও অনুর্বর, অন্যদিকে প্রতি বর্গমাইলে বহুতর গ্রীক। এভয়ঙ্কর সমস্যার মোকাবিলা করতে গিয়ে সংখ্যাভারে ম্রিয়মান গ্রীকরা সৃষ্টি করল এমন এক সমাজব্যবস্থা, যেখানে প্রজননবিহীন যৌনতা উপেক্ষিতা নয়, চিরআদরের বিবাহ-বহির্ভূত সহবাস এবং সমকামিতা তাই অনুমোদিত। এবং বেশ্যাবৃত্তি অমর্যাদার নয়, 'হেটারা' তারই সাক্ষ্য দিচ্ছে।

ফুলের যেমন সুরভি, গ্রীক সভ্যতার তেমনি সমকামিতা। এসুরভি ছড়িয়েছে গ্রীক জীবনে, গ্রীক সাহিত্যে, গ্রীক ধর্মে, সর্বত্রই। নির্দ্বিধায় বলা

যেতে পারে সমকামিতা ছিল গ্রীক সভ্যতার অঙ্গের অঙ্গিনী, সঙ্গের সঙ্গিনী।

সত্য সত্যই প্রাচীন গ্রীস ছিল সমকামিতার পীঠস্থান। তখন সমকামিতা ছিল সকল ভালবাসার মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সকল যৌনতার মধ্যে বলিষ্ঠ, তাই সকল মানুষই এর অনুরাগী ছিল। বস্তুতঃ এমন সর্বজনীন ব্যাপকতা, এত তীব্র অনুরাগ ইতিহাসে খুঁজে পাবে নাকো কেউ।

প্রশ্ন জাগবে কেন এই অভূতপূর্ব ব্যাপকতা, আর অন্ধ ভালবাসার গোপন কথাটিই বা কী? প্রিয়তার কারণগুলি খুঁজতে গিয়ে প্রথমেই চোখে পড়বে মুক্ত যৌনতা। স্বাধীন যৌনতায় বিশ্বাসী গ্রীকদের রতিভাবনা যেমন বলিষ্ঠ এবং সুন্দর তেমনি পূর্ণ এবং সুস্থ। এখানে অবদমনের বা অপ্রকাশের বেদনা নেই, সমাদর আছে সেই সমগ্র যৌনতার, রূপটি যার ঐশ্বর্যশালিনী, রোমান্টিক এবং বৈচিত্র্যময়। আধুনিক যুগের স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ানদের সঙ্গে প্রাচীন গ্রীকরাও যৌন স্বাধীনতার প্রবক্তা হিসেবে চিরকাল খ্যাত হবে।

গ্রীকদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য: সৌন্দর্যপ্রীতি, বিশেষ করে সুন্দর দেহ প্রতিমার, আর নগ্ন দেহ সুষমার আরতি, যা ছড়িয়ে আছে কালজয়ী অসংখ্য ভাস্কর্যে। কিন্তু নারীর দেহমাধুরী নয়, পুরুষদেহই এদের রূপাদর্শ। এভিন্নতার জন্যে পুরুষ ও নারীর মধ্যে বিষম পার্থক্যই (ওয়েষ্টারমার্ক) দায়ী। দায়ী তাৎকালিক ধ্যান ধারণাও। প্রাচীন গ্রীকদের ধারণায় পুরুষ সৃষ্ট হয়েছে নর ও নারী উভয়েরই সমাবেশে এবং এই পুরুষ নারীর চেয়ে অধিকতর প্রাণবন্ত, সুন্দর এবং সত্য। সমকামিতা অতএব বিকৃত নয়, অস্বভাবিতার নামগন্ধ নেই, পাপও না, বরং যৌনতা বিকাশের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম, এবং পুরুষের প্রতি পুরুষের ভালবাসা সকল ভালবাসার সেরা। কাজেই গ্রীক সাহিত্যিক, শিল্পী, দার্শনিক, রাজনীতিক এবং অন্যান্য গ্রীকবাসী, খ্যাত অখ্যাত সবাই দেখি সুন্দর যুবকের প্রণয়ভিক্ষার্থী।

হয়ত একারণেই গ্রীকরমণীদ্বয়ের প্রণয়কথা অল্প খ্যাত। তবুও বলতে সঙ্কোচ নেই, স্ত্রী-সমকামিতা বোধক যে শব্দটি—লেসবিয়ানিজম—অমর হয়ে আছে সেটা এক গ্রীক রমণীরই অবদান (১৮৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

গ্রীক জীবন প্রবলভাবে আচ্ছন্ন বলেই তার ছায়া পড়েছে সমাজব্যবস্থায়, আইনে, ধর্মে ও সাহিত্যে। সৈন্যবাহিনী প্রতিষ্ঠায়, বিশেষ করে স্পার্টানদের সমরচর্চায় সমকামিতার ভূমিকাটি ছিল বিশিষ্ট। 'সলোন'-কৃত আইন ব্যবস্থায় পুরুষের প্রতি পুরুষের ভালবাসা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকৃত। এভালবাসা, আশ্চর্য কাণ্ড, দেবদেবীদেরও স্পর্শ করেছে, সমকামিতার লীলাখেলায় মুগ্ধ কয়েকজন:

অ্যাপোলো, পোসিডন, হেরাক্লস, গানিমিড।

সমরতির মহিমা কীর্তিত হয়েছে গ্রীক সাহিত্যেও[১], অংশ নিয়েছেন প্রায় প্রতিটি গ্রীক মনীষীই। প্লেটোর 'সিম্পোসিয়াম' গ্রন্থে ডায়োটিমা-র মুখে পুরুষ প্রণয়কথার অবিরাম প্রশস্তি। অনুরূপ সুরে অনুরণিত সাফো-র কবিতা, এসকাইলাস এবং সাফোক্লিস-এর নাট্য, প্লুটার্ক এবং সক্রেটিস-এর রচনাবলী। এপ্রসঙ্গে স্মরণ করিয়ে দিই ইউরিপিডিস রচিত সেই বাক্যটি: যুবকের স্পর্শ কী যাদুই না জানে!

এবারে তাকানো যাক অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতার দিকে। সাড়ে চার হাজার বছর আগে, সমকামিতার সঙ্গে পরিচয় ছিল ইজিপ্টবাসীদেরও। এরূপ ভালবাসা উৎসর্গ করেছিল তাদের দুই দেবতার (হোমা ও সেট) নামে। প্রখ্যাত ব্যাবিলনীয় সভ্যতায় পুরুষ-বেশ্যাত্বের নজির আছে আর হাম্মুরাবি সংহিতায় নিষিদ্ধ ছিল না। হিটাইট (Hittite) সংহিতায় সমরতি দণ্ডার্হ ছিল শুধু নিষিদ্ধ সম্পর্কের মধ্যে।

সুপ্রাচীন এসিরীয় সভ্যতায় এবং প্রাচীন চীন জাপানেও সমরতি ছিল। Tsin-pi-mei নামক বইটিতে চৈনিক সমকামিতার খবর মিলবে। ওয়েষ্টার-মার্ক-এর মতে একদা প্রাচীন চীনে এর চলন ছিল খুবই, এমন কি বিশেষ আস্তানাও ছিল পুরুষ বেশ্যাদের জন্যে। জাপানে এরাই খ্যাত ছিল পুরুষ গেইসা নামে, উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এদের বিলুপ্তি ঘটে। অর্থাৎ কিনা সম-কামিতার প্রসার ছিল জাপানেও এবং অতি প্রাচীন কাল থেকেই।

হিন্দুসুলভ নীতির কারুকার্য ভারতীয় সভ্যতারও বৈশিষ্ট্য পুত্রার্থে যৌনতা এখানে স্বীকৃত, বাদবাকী অন্য সব প্রকাশ পাপ, গর্হিত। সমকামিতা সম্মানিত নয় কোথাও, সর্বত্রই নিন্দিত, নিষিদ্ধ এবং কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত। যদিচ মানুষের উভলিঙ্গবিষয়ক দ্বৈত সত্তা ভারতীয় সভ্যতায় নতুন কথা নয়, তবুও। প্রমাণ হিসেবে, ধর্মশাস্ত্র (মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ), স্মৃতিশাস্ত্র (মনু-সংহিতা), আয়ুর্বেদগ্রন্থ (শুশ্রুত, চরক) এবং অন্যান্য শাস্ত্রের (কৌটিল্য) উল্লেখ করতে পারি। দ্বিতীয়তঃ ভারতীয় সংহিতায় কঠোর দণ্ডবিধানই

১। আশ্চর্য বৈপরীত্য হিন্দু সাহিত্যে। এখানে শুধুই ইতরকামিতা, নারীর প্রতি পুরুষের ভালবাসাই সুন্দর। পরবর্তীকালের খ্রীষ্টীয় জগতের সাহিত্যকর্মেও তাই। অবশ্য আধুনিককালের কতিপয় সাহিত্যিক সমকামিতাকেই সাহিত্যের উপাদান করেছেন।

একটি বড় সাক্ষ্য যে প্রাচীন ভারতীয় সমাজে সমকামিতা নামক ব্যাপারটি অজ্ঞাতকুলশীল ছিল না।

সমকামিতা (এবং পশুমৈথুন), এমন কি স্ত্রী-সমকামিতারও প্রাচীনতম উল্লেখ বোধ করি মহাভারতেই। চরকসংহিতামতে এটা প্রকৃতি-বিরোধী অর্থাৎ প্রজননবিহীন যৌনতা নিষিদ্ধ। মনুর বিধান কিন্তু অতীব কঠোর: অর্থদণ্ড, বেত্রাঘাত এবং নারীর অঙ্গুলিচ্ছেদ। দুই নারীর মিলনে অস্থিহীন ভ্রূণ জন্মের কথা বলেছেন সুশ্রুত।

সাতিশয় প্রাচীন সভ্যতারাজি এবং গ্রীসীয় সভ্যতা ব্যতিরেকে আরও একটি সুমহান সভ্যতা উদারহস্ত প্রসারিত করেছে: রোমক সভ্যতা। প্রাচীন গ্রীসের মতো রোমেও অনুমোদিত ছিল সমকামিতা এবং পুরুষের কামজীবনে এটা স্বাভাবিক, অনিবার্য ঘটনারূপেই গণ্য হত। আদর দিত শুধু সাধারণ নাগরিক নয়, খ্যাত অনেক সুধীজনও, চিহ্ন তার পড়ে আছে রোমক সাহিত্যেও (পেট্রনিয়স ও ভার্জিল), এন্টনিয়স-এর সঙ্গে হাড্রিয়ান-এর প্রণয়গাথাই সর্বাধিক খ্যাত। সঙ্গী ছিল অনেক রোমক সম্রাটেরও, জুলিয়স সীজর, অগষ্টাস, টাই-বেরিয়াস, কালিগুলা, ক্লডিয়স। কিন্তু গ্রীসীয় সেই স্নিগ্ধমাধুরী বা আদর্শ কোনটাই খুঁজে পাব না রোমক সমকামিতায়। এখানে এর ছবিটি নগ্ন লাল-সারই, তৃপ্তির একটা স্থূল উপায় মাত্র।

রোমক সভ্যতার পর এল সর্বস্বাপহারক খ্রীষ্টীয় সভ্যতা। এটাই দস্যুর মত গ্রাস করেছে যৌনতার ঐশ্বর্য বলতে যা কিছু ছিল সবই, সেই সঙ্গে সমকামিতার মাধুরীও। এব্যাপারে খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর ইহুদীরাই প্রেরণাদাতা, যার ফলে ইহুদী জগতের প্রজনার্থে কামচিন্তা নতুন করে আসর জাঁকিয়ে বসল যা ছিল দেহের আরতি, অনাবিল বাসনা (লাষ্ট অব বডি) সেটাই বিকৃত হল পাপরতিতে, কলুষিত দেহ-পঙ্কে (সিন অব ফ্লেস)। ছাড় পেল শুধু বিবাহিত সহবাস, তাও কিনা পুত্রার্থে। খ্রীষ্টীয় সভ্যতা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এজাতীয় যৌন ভাবনা ছড়িয়ে পড়ল বিশ্বময়।

মধ্যপ্রাচ্যে, গ্রীসে এবং রোমে সমকামিতা প্রাচুর্যে আতঙ্কিত নবীন খ্রীষ্টীয় সন্ন্যাসীরা প্রথমেই জেহাদ জানাল এই অভ্যাসের বিরুদ্ধে। শুধু ধর্মীয় পাপ নয়, আইনবিরুদ্ধ এবং শাস্তিযোগ্য করেও সমকামিতার গায়ে একটা দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর তুলে দিয়েছে।

একে পাপ তায় ক্ষতিকর, ঘৃণ্য, দণ্ডার্হ, এধারণায় তমসাচ্ছন্ন ছিল সমগ্র মধ্যযুগ। রেঁনেসাস-এর পর আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠল, বুদ্ধিজীবী ও

শিল্পীদের সমকামিতা অনুরাগে। সমকামিতা স্পৃষ্ট কালজয়ী কয়েকজন শিল্পীর নাম: লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি, মাইকেল এঞ্জেলো, র‍্যাফেল। তারপর পেলাম নেপোলিয়ন সংহিতা, পাপের লম্বা ফর্দ থেকে সমকামিতার নিষ্কৃতিলাভ। অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ধারণায় প্রথম আঘাত হানলেন বীরশ্রেষ্ঠ নেপোলিয়ন-ই। সমকামিতা ব্যাপারে ফ্রান্সের এউদারতা সত্যই বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে, যদিচ ফরাসী রাজতন্ত্রে একদা সমকামীকে পুড়িয়ে মারা হত।

পরিবর্তিত আইনের অর্থ মানবমনও পরিবর্তিত। মানুষ আবার একে গ্রহণ করতে শিখেছে। কিন্তু সমাজ প্রতিকূল, রাষ্ট্রও বাম। ফলতঃ মানুষের ক্ষোভ এবং এই ক্ষোভ ধূমায়িত হতে হতে একদিন ফেটে পড়ল, উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ তাই আন্দোলিত। একদিকে সমকামীরাই তাদের হয়ে মুখ খুলল: উলরিখ নামে একজন সমকামীর নিজেকে মহান এক প্রেমের উদ্গাতা হিসেবে চিৎকার ঘোষণা এবং আইনানুগ অনুমোদনের জন্যে প্রচার। অন্যদিকে যথার্থ বিজ্ঞানসম্মত গবেষণার শুরু, বিশেষ করে জার্মানীতে। এব্যাপারে জর্মানীকেই পথিকৃৎ বলা যেতে পারে, কারণ জার্মানীতেই প্রথম আন্দোলন তরঙ্গায়িত হয়ে ওঠে: সমকামিতার হয়ে বিপুল প্রচার, পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণা এবং সমকামীদের জন্যে সামাজিক ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠা সবই। ১৮৮৬-এ ক্রাফট-এবিং-এর 'সাইকোপ্যাথিয়া সেক্সুয়্যালিস' গ্রন্থ, ১৮৯১-এ এ্যালবার্ট মোল-এর 'কনট্র্যারি সেক্সুয়্যাল ফিলিং' গ্রন্থ প্রকাশ এবং ১৮৯৭-এ ম্যাগনাস হির্শফেল্ড কর্তৃক সমকামিতা বিষয়ক গবেষণার জন্যে একটি সংস্থা স্থাপন—সবই ঘটেছে জার্মানীতে।

সমকামিতার ইতিহাসে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র: ম্যাগনাস হির্শফেল্ড। যৌনতার প্রতিটি বিভাগেই বহুমুখী প্রতিভা ছড়িয়ে দিয়েছেন, তবুও সমকামীদের প্রতি অপরিসীম মমত্ববোধই বোধ করি সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য ছিল। এঁর ধারণা করতে আনন্দ হত, সমকামিতার জন্যে দণ্ডবিধান লাঞ্ছনা ঘোর অমানবিক, মানুষের প্রতি মানুষের বর্বর নিষ্ঠুরতা। তাই না তিনি সমকামিতার বিরুদ্ধে লড়াই করে গেছেন আমৃত্যু, ১৮৯৬-এ এযুদ্ধ শুরু। প্রচার করেছেন, আন্দোলন করেছেন, বক্তৃতা দিয়েছেন এবং গবেষণাও করেছেন অনেক। বিংশ শতাব্দীতে এঁর সঙ্গে আরও অনেকে যোগ দিয়েছেন, ১৯০১-এ হ্যাভলক এলিস (যৌন বিশ্বকোষ), ১৯০৫-এ সিগমুণ্ড ফ্রয়েড (যৌনতায় তিনটি অবদান), ১৯০৫-এ অগষ্টাস ফোরেল (যৌন জিজ্ঞাসা), ১৯০৬-এ এ. ওয়েষ্টারমার্ক (নীতির বিকাশ প্রসঙ্গে), ১৯০৮-এ ই. কার্পেন্টার (মধ্যবর্তী লিঙ্গ)।

তারপর অনেকেই সহায়তা-হস্ত প্রসারিত করেছেন, বুদ্ধিজীবী, মনোবিজ্ঞানী এবং রাষ্ট্র একে একে সকলেই হাত মিলিয়েছেন। হেঁকে বলেছেন সুধীজন, প্রাচীন ধর্মীয় আইন দিয়ে সমকামিতার বিচার যেমন ক্রূর তেমনি হাস্যকর। কারণ, কঠোরতার পিছনে অজ্ঞ আদিম সংস্কারের ছাপই শুধু আছে, কোন যুক্তি নেই (বারট্রাণ্ড রাসেল, ১৯২৯)। স্বাধীন চিন্তার জন্যে বিশ্বখ্যাত ফরাসী রেনে গাঁইও-র ঘোষণা : ইচ্ছামত যে কোন কামপাত্রের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের অধিকার মানুষমাত্রেরই একটি মৌল স্বাধীনতা। অতএব সমকামিতা বিষয়ক প্রেম স্বাভাবিক, বৈধ এবং সঙ্গত। এবং এর জন্যে সমকামীর পীড়ন, নিন্দা মামলা, কোনটাই গ্রাহ্য নয় (১৯২৯)।

বুদ্ধিজীবীদের পিছনে আছেন মনোবিজ্ঞানীরা। ফ্রয়েডপন্থীরা এবং অন্যান্য মনোবিদ্‌গণ স্পষ্ট করেই দেখিয়েছেন সমকামীরা আর পাঁচজন মানুষের মতই। এরা দৈত্যসম দুষ্ট ব্যক্তি নয়, বিকৃত নয়, সমাজের প্রয়োজনীয় ব্যক্তিই। দেখা-দেখি কতিপয় রাষ্ট্রের মতটা বদলে গেছে, বদলে গেছে পথটাও। ১৯১১-এ হল্যাণ্ডে এবং ১৯৩৩-এ ডেনমার্কে সমকামিতা ব্যাপারে কঠোরতা হ্রাস পেয়েছে।

সবশেষে পেলাম কিনসী রিপোর্ট, ১৯৪৮-এ। সমকামিতা বিষয়ক ভাবনায় (এবং অন্যান্য যৌন ভাবনায়) চরম আঘাত হেনেছেন এঁরাই। আজ আর সমকামিতা চুপি চুপি কথা কয় না, 'সমকামিতা' উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে মানবমন এখন আর উদ্বেলিত হয় না, পরিবর্তিত এমনোভাবের জন্যে এ্যালফ্রেড কিনসী এবং তার সহকর্মীগণ চিরস্মরণীয়। প্রথমেই এঁরা দেখিয়েছেন সমকামিতা কত ব্যাপক, পুরুষ ও রমণী উভয় সমাজেরই একটা বড় অংশ সমকামিতায় লিপ্ত, কেউ কম, কেউ বেশী এবং মাত্রাভেদে এদেরকে ছয় শ্রেণীতে সাজিয়েছেন (১৯০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। এবং এই ব্যাপকতাই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে সমকামিতা দুর্লভ নয়, অস্বভাবী বা অপ্রাকৃতও নয়। এবং নিউরোসিস (বায়ুরোগ) বা সাইকোসিসও (মনোরোগ) না। অবশ্য সমকামিতা রাগে আরক্ত কতিপয় মানুষ যে মনোরোগে দুষ্ট তাতে কোন ভুল নেই।

সবশেষে কিনসী এই প্রশ্ন ছুঁড়েছেন, অভিযুক্ত সমকামীর বিচারের ভার যার হাতে সেই বিচারকের (এবং সমাজেরও) প্রতি : এই হতভাগ্য বোকা (ধরা পড়েছে সেই হেতু) মানুষটিকে শাস্তি যদি দিতেই হয় সেই শহরের অন্যান্য পুরুষরাও, কম করেও শতকরা চল্লিশ জন, এই একই দোষে অপরাধী রূপে গণ্য হবে না কেন ? অর্থাৎ কিনা আমাদের বর্তমান আইন ঢেলে সাজাতে হবে। অতি কঠোর আমেরিকা মহাদেশে এখন এই অচল অবস্থার রাজত্ব।

ভাবতবর্ষে, এবং এশীয় অন্যান্য দেশে, এবং অন্যত্র সমকামিতা আজও নিষিদ্ধ কথা এবং দণ্ডনীয়।

তবে ফ্রান্সে, ইটালিতে, বেলজিয়ামে, হল্যাণ্ডে, ডেনমার্কে সমকামিতা আর আর পাঁচটা যৌনতার মতই স্বাধীন এবং একটা মানবিক ধারণা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অর্থাৎ 'প্রাপ্তবয়স্কতা, সম্মতি, গোপনীয়তা', এতিনটি শর্ত পূরিত হলেই হস্তক্ষেপ করবে না কেউ। সম্প্রতি গ্রেট ব্রিটেনও, ১৯৬৭-এর নভেম্বর থেকে, সমকামিতার অবৈধ কালিমা তুলে নিয়েছে, যার ফলে ব্রিটিশ সমকামীরা প্রাপ্তবয়স্ক এবং সম্মত শালীনতা বজায় রেখে স্বাধিকার প্রমত্ত হতে পারে।

এখনই দ্বিধা জাগবে, এই উদারতা কি ঠিক? না উদারতার নামে বজ্জাতি! দ্বিধাগ্রস্তকে কিংবা প্রশ্নকারীকে পাল্টা প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করে: যৌনব্যাপারে শালীনতার গণ্ডি ডিঙিয়ে যাওয়া (যেমন প্রকাশ্যে কোন স্থানে) নেই, সমাজের নিরাপত্তা বা শৃঙ্খলা অক্ষুণ্ণ, অন্য কোন ব্যক্তি বা তার স্বাধীনতা আহত নয়, কোন অবাঞ্ছিত গর্ভ ঘটেনি, বল প্রয়োগ বা অন্য কোন ভয় দেখিয়ে সঙ্গীকে বশে আনা নেই, শঠতা, কপটতা, ছলনার আশ্রয়ে যৌনসম্মতি আদায়ের ঘটনা অনুপস্থিত, বিবাহ সম্পর্ক অটুট থাকে কিংবা বিবাহের পথে বাধা সৃষ্টি নেই, তখন কী কারুর কিছু বলার আছে? না, নেই। কারণ অনুরক্ত এবং সম্মত দুটি মানুষের মধ্যে গোপনে যাই ঘটুক না কেন সেটা তাদেরই একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। তা ছাড়া যৌন স্বাধীনতা প্রত্যেক মানুষেরই একটি মৌল অধিকার। এব্যাপারে সমাজ, রাষ্ট্র, পুলিশ, বা অন্য কোন প্রাণী কারুরই বলার কিছু নেই। এবং যৌনতার এই সাধারণ নিয়মগুলি সমকামিতার ক্ষেত্রেও সমান দৃঢ়তার সঙ্গে প্রযোজ্য।

উপসংহার

সভ্যতার আয়নায় এটাই চোখে পড়বে যে, মানবেতিহাসের পাতাগুলি ইতরকামিতা আর সমকামিতার কান্না হাসির দোল দোলানো। শুধু বর্তমান পাশ্চাত্য কিংবা এশীয় সভ্যতা নয়, সেই আদিম মানব সভ্যতা থেকেই। তবে এটাও ঠিক যে অধিকাংশ সভ্যতা সমকামিতা গ্রহণ করেছে যত তার চেয়েও অধিক গ্রহণ করেছে ইতরকামিতাকে। বস্তুতঃ এমন কোন মনুষ্য সমাজ বা প্রাণিজগতের সন্ধান মিলবে না যেখানে ইতরকামিতা সর্বাধিক অনুষ্ঠিত যৌনতা নয়।

তথাপি, এটুকু বলতে কোন দ্বিধা নেই নেই যে সমগ্র মনুষ্য সমাজে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সমকামিতার চিহ্ন। ইতরকামিতার সঙ্গে তুলনামূলক বিচারে

সংখ্যায় এটা অল্প হতে পারে কিন্তু গুরুত্ব আদৌ লঘু নয়। কারণ একটা বড় অংশ সমকামিতায় লিপ্ত হয়েছে জীবনের কোন না কোন দুর্বল মুহূর্তে।

তা ছাড়া সমকামিতা প্রতিটি মানুষকেই স্পর্শ করবে, কখন শৈশবকামিতার একটি অনিবার্য অধ্যায় হিসেবে। কখন যৌবন প্রাবল্যে নিজেকেই জড়িয়ে পড়তে হবে, কখনবা সন্তানের সমস্যারূপে পিতামাতাকে মোকাবিলা করতে হয়।

তাই না প্রশ্ন, কেন নাহি দিবে অধিকার? এপ্রশ্ন সমাজের কাছে। আইনের কাছে। এবং ইতরকামী নর-নারীর কাছে।

সমকামীরাও মানুষ। কাজেই নিখিল নীল বিশ্বে ওরাও বুক ভরে নিঃশ্বাস নিতে পারে, প্রবেশ করতে পারে নিষিদ্ধ অথচ ঐশ্বর্যময় প্রেমের রাজত্বে, আস্বাদন করতে পারে প্রেমের বিচিত্র ঐশ্বর্য।

২৩ / ধর্ম আর সুনীতি : যৌনতায় দুটি ছায়া

মানুষের জীবনে বহুবিধ প্রভাবের ছায়া পড়েছে, ধর্ম এদেরই একটি আর কে না জানে, এই জীবন নামক নাটকে যৌনতা একটি প্রধান কুশীলব।

ইদানীং যে যৌনজীবন বয়ে চলেছে অশান্ত, তার মধ্যেও অনেকগুলি ধারা লীন হয়ে আছে এবং এদের একটি যে ধর্ম তা নিশ্চিত। শুধু যে অন্যতম তা নয়, অনন্যও বটে, কারণ এটাই সব চেয়ে বেগবতী, ক্ষুরধার, খরস্রোতা। সত্যি কথা বলতে কি, মানুষের জীবনে সর্বত্রই, বিশেষ করে যৌনতার সঙ্গে মিশে আছে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এমন কোন ঘটনা আছে কি যেখানে ধর্মের ছায়া পড়েনি ? বিবাহানুষ্ঠান নয় অন্যান্য নববিধ কর্মেও এবং প্রতিটি সংস্কারে ধর্মীয় অনুষঙ্গ জড়িয়ে আছে, এটাই বোধ করি সব চেয়ে বড় প্রমাণ।

আরেকটি নজির, সামাজিক প্রথারই ক্রমশ: রূপান্তর : ধর্মীয় উপদেশ আর সুনীতি। এককালে যেটা ছিল পাঁচজনের অভ্যাস সেটাই পরে হয় ধর্মের অঙ্গ। এথ্‌নোগ্রাফি-র শিক্ষাও তো এই, একদা যেটা ছিল প্রথা সেটাই ফসিল হয়ে দেখা দেয় ধর্মরূপে। পুরাকালে ধর্ম আর কমিউনিটি আর সমাজভাবনা সবই কিনা এক ছিল। তখন কমিউনিটির সংহতি ও প্রসারের জন্যে, সমাজের শৃঙ্খলা ও সমৃদ্ধির জন্যে ধর্ম ছিল অপরিহার্য। তখন সমাজ ছিল কৃষিপ্রধান, শত্রুভয়ও কম ছিল না, সুতরাং গোষ্ঠী:তে লোকের প্রয়োজন প্রচুর। তাৎকালিক সমাজভাবনা তাই বিধান দিল সংখ্যা হোক অগণিত, ফলে বহুবিবাহ হল অনুমোদিত আর জন্মনিয়ন্ত্রণ নিষিদ্ধ। কিছুকাল পরে, যখন ধর্মীয় সম্প্রদায় জাঁকিয়ে বসল, ধর্মই হল প্রধান অস্ত্র, পূর্বোক্ত নীতিগুলি জোরদার করার জন্যে। এভাবে সমাজ-জীবনের প্রতিটি স্তরে, অতএব মানবকামিতার মধ্যেও, ধর্মের খাদ আছে, এবং এটা এমনই ওতপ্রোত যে নতুন কিছুকে স্বাগত জানাতে এই ধর্মীয় মনোভাবই প্রবল অন্তরায় হয়ে ওঠে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত : বিংশ শতাব্দীর বিস্ময়কর অবদান সেবনীয় ঔষধযোগে জন্মনিয়ন্ত্রণ, কিন্তু ক্যাথলিকরা এটা মেনে নেয়নি। ভারতীয় জনগণের ধারণা করতে আনন্দ লাগে, জন্মনিয়ন্ত্রণ আর ঈশ্বরের প্রতি বিরুদ্ধাচরণ একই। ডিভোর্স বিলটি যখন ভারতে এসেছিল, তখন দেখেছিলাম ভারতীয় ললনারাই প্রতিবাদমুখর। তেমনি ভারতীয় মুস্লিম

সমাজে বহুবিবাহরোধের প্রস্তাব যদি বা শোনা যায়, ধর্মীয় জেহাদ বা অসন্তোষের ভয়ে সেটা কবরস্থ হয় প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই।

যৌনব্যাপারে ধর্মের প্রভাব যে কি বিপুল, কত সুদূরপ্রসারী হতে পারে তার অজস্র উদাহরণ ছড়িয়ে আছে কিনসী রিপোর্টে। একটা উদাহরণ দিই। নর-নারী উভয়ের ক্ষেত্রেই, ধর্মীয় আস্থা ভেদে কামানুষ্ঠানে ভাটা লাগে, কখন জোয়ার। কাম নামক নদী যে খাদেই বয়ে যাক না কেন, ধর্মে মতি নেই বা অল্পস্বল্প প্রভাবিত সেই পুরুষ বা রমণীর দেহে যৌনতার তরঙ্গ অনেক উত্তাল, স্রোত অনেক বেশী, বিবাহিত সুরত বাদ দিলে প্রায় প্রতিটি কামানুষ্ঠানের সংখ্যা ধর্মপ্রাণ নর-নারী অপেক্ষা অনেক বেশী।

ধর্মশাস্ত্র ঘাঁটলেও আরেকটি প্রমাণ পাব। প্রমাণ পাব ইতিহাসেও, মর‍্যালিটির ইতিহাসে, বিশেষ করে ওয়েষ্টারমার্ক, লেকী, ম্যাক্স হোডান রচিত ইতিহাসে। কারণ পুরনো পৃথিবীতে ধর্ম প্রতিটি ব্যাপারেই নাক গলিয়েছে। কয়েকটি প্রধান প্রধান ধর্ম নিয়ে আলোচনা করা যাক। প্রথমে হিন্দুধর্মের কথা বলি। হিন্দুদের সংহিতা বা স্মৃতিশাস্ত্রের পাতা উল্টালেই দেখব: বীর্য ধারণের প্রশস্তি আর ব্রহ্মচর্যর জয়গান আর বিবাহবিষয়ক একগাদা ফর্দ (সম্বন্ধ-নির্ণয় যেমন, বর্ণ-গোত্র-অসপিণ্ড বিচার; বয়ঃক্রম যেমন, গৌরীদান; বিবাহ অনুষ্ঠান ইত্যাদি), বিবাহসিদ্ধতার জন্যে সেটা না মেনে উপায় নেই। দেখব, বিবাহ ব্যতিরেকে কামনার প্রকাশ শুধু যে নিষিদ্ধ তা নয়, পাপাচার, অধর্ম, অতএব দণ্ডার্হ কর্মও বটে। নানাবিধ নিষেধের প্রাচীরও দেখব মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, দৃষ্টান্ত, দিবামৈথুন আয়ুঃক্ষয়কারক, শুধু পুত্রার্থেই মিলন, ঋতুমতী নারীগমন নিষিদ্ধ, বিবাহবন্ধন অবিচ্ছেদ্য, ইত্যাদি ইত্যাদি।

যৌনব্যাপারে খ্রীষ্টধর্মের প্রসঙ্গ বড়ই বিচিত্র, আরও বিচিত্র হিন্দুধর্মীয় নিষিদ্ধতা এবং বৈধতার সঙ্গে বহুল সাদৃশ্য, হয়ত ধর্ম দুটি ব্রহ্মচর্যভিত্তিক বলেই এই মিল। খ্রীষ্টধর্মের প্রাচীনতম শাখা, ক্যাথলিক ধর্মে সেক্সবিষয়ক ইতিকর্তব্যগুলি বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে, বিশেষ করে বিবাহিত জীবন ব্যাপারে। সেই অলোকসুন্দর ঋষি সন্ত পল-এর আমল থেকেই বর্জনমূলক নীতির আমদানি হয়েছে, ব্রহ্মচর্যপালন তাই পুণ্যকর্ম এবং পুণ্যবান পুরুষ মাত্রই (যেমন খ্রীষ্টীয় সন্ন্যাসী বা সন্ন্যাসিনী) তাই আজীবন ব্রহ্মচারী। এই ধর্মমতে যৌবনজ্বালায় দগ্ধ হওয়ার চেয়ে, অর্থাৎ ফর্নিকেসন-জাত অনুশোচনা অপেক্ষা বিবাহ অনেক ভাল এবং সেই বিবাহে সন্তানলাভই ধ্রুব আদর্শ। সুতরাং জন্মরোধক দ্রব্যাদি (অবশ্য ব্রহ্মচর্য আর সেফ পিরিয়ড বাদ দিয়ে) নৈব নৈব চ। বিবাহ বিধির

বিধান অতএব কোন শক্তিমানের পক্ষেই সেই বন্ধন ছিন্ন করা সম্ভব নয়। আরেকটি প্রধান শাখায় আছে প্রটেষ্ট্যান্ট ধর্মাবলম্বীরা, এদের ধারণায় জন্মনিয়ন্ত্রণ অনাচার নয়, বিবাহ যে ধর্মীয় সংস্কার তাও নয়, সুতরাং নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্ভব। প্রাক্‌বিবাহ নারীসংসর্গে (ফর্নিকেসন) কিংবা বিবাহোত্তর পরদারগমনে (অডাল্টেরি) এদের মনোভাব সেই সনাতনপন্থীদের মতই রক্ষণশীল, অর্থাৎ স্ত্রী-সম্পত্তি রক্ষায় সদাসতর্ক, যদিচ ব্রহ্মচর্যপালনে ততটা মনোযোগী নয় অর্থাৎ পাণিমেহন বা সুপ্তিস্খলনে এদের মনোভাব উদার, আধুনিক।

প্রসঙ্গতঃ বলে রাখা ভাল, বাইবেলে যে দশটি ঐতিহাসিক বিধান আছে তার মধ্যে দুটি যৌননীতিবিষয়ক। সপ্তম শাস্ত্রীয় নির্দেশ: কদাচ ব্যভিচারে প্রমত্ত হবে না[১]। দশমটির সারবস্তু এই, প্রতিবেশীর স্ত্রী অর্থাৎ পরস্ত্রীতে লোভ করবে না, আচরণ বিধিটা হবে পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ[২]। অতএব খ্রীষ্টীয় ধারণায় (এবং ইহুদীদেরও) বিবাহশয্যার বাইরে কামনার আসনটি পাতা হলেই সেটা হবে ঘোর দুর্নীতি, দারুণ অধর্ম, ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার মহাপাপ। খ্রীষ্টীয় যৌননীতি, যদি এক কথায় বলতে হয়, বলব অডাল্টেরি আর ফর্নিকেসন রোধ করাই এর মুখ্য উদ্দেশ্য।

কোরান এবং শরিয়তও উঁকি দিয়েছে মুস্লিম অন্দরমহলে। এরই পরিণতি, লিঙ্গত্বক্‌ছেদন বাধ্যতামূলক এবং নিয়মিতভাবে যৌনকেশ কর্তন অবশ্যকর্তব্য। বহুবিবাহ প্রথাটি নিন্দনীয় নয় এবং এব্যাপারে ধর্মই সবচেয়ে বড় প্ররোচক। শরিয়তের সংবিধান অনুযায়ী বিপরীত বিহারে নারীর অধিকার নেই, না থাক, বিপৎকালে দেনমোহর পাওয়ার এবং প্রয়োজনবোধে তালাক দেওয়ার অধিকার তো আছে, এবং সেই প্রাচীন যুগ থেকেই। কারণ মুস্লিমবিবাহ ধর্মবিহিত সংস্কার নয়, একটা চুক্তিমাত্র, ফলে তালাক দেওয়ার অধিকারী নর-নারী উভয়েই। হিন্দুদের মতই, শোণিতক্ষয়কালে মুস্লিম নারী অগম্যা। রমজানের উপবাসকালে অর্থাৎ দিবাভাগে কামনার স্পর্শ দিয়ে নিজেকে বা সঙ্গিনীকে কলুষিত করা নিষিদ্ধ।

সামাজিক (যেমন, জবাই করা মাংস খাওয়া) কিংবা যৌন (যেমন, লিঙ্গত্বক্‌ছেদন) ব্যাপারে মুসলমানদের সঙ্গে ইহুদীদের মিল আছে, একদা এই দুই ধর্মের প্রাণভোমরা একই কৌটায় বন্দী ছিল, হয়ত এই কারণে। ঋতুবন্ধের

১। Thou shalt not commit adultery.

২। Thou shalt not covet thy neighbour's wife.

পরই নয়, তার আরও সাত দিন পরে ইহুদী নারী স্বামী সন্দর্শনের অধিকারিণী। নগ্নতার প্রকাশ এবং দর্শন, দুইই নিষিদ্ধ, এরা তাই ঘন যামিনীর অন্ধকারে মিলিত হয়। এবং মিলনশেষে (এমন কি সুপ্তিস্খলনের পরও) বীর্যের স্বাক্ষর ধুয়ে মুছে শুচিশুভ্র হওয়াই নিয়ম।

নিখিল নীল এই আকাশের নীচে, হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, ইহুদী কেন, আরও অনেক ধর্মীয় সম্প্রদায় আছে, এবং প্রতিটি সম্প্রদায়ের মধ্যেই যৌনতা-বিষয়ক একটা নীতি, যাকে ইংরেজীতে বলি 'সেক্স মর্যালিটি' গড়ে উঠেছে, এবং ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এই নীতিগুলি, আশ্চর্য কথা, একটি বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত করা যায়। খুঁটিনাটি বিচারে সামান্য ভেদ হয়ত চোখে পড়বে, কিন্তু চোখে পড়বে না মূল কাঠামোর গরমিল, এটা প্রায় অভিন্ন, কারণ, প্রায় প্রতিটি ধর্মেই 'যৌন দর্শন'-এর সার কথাটি হল প্রজনন। অতএব প্রজননস্পর্শরহিত কামানুষ্ঠান যে ধর্মতঃ অন্যায় বা পাপরূপে চিহ্নিত হবে সেটা খুব আশ্চর্য নয়, এমন কি প্রজননবিহীন কামনাও পাপচিত্ততারই প্রকাশক। এই একই কারণে পাণিমেহন নিন্দিত এবং সমকামিতা ও তির্যকমেহন দণ্ডার্হ। এখানেই শেষ নয়, বিবাহ ব্যতিরেকে ও বিবাহশয্যার বাইরে যৌনতার প্রকাশ নিষিদ্ধ। বিবাহকালে অক্ষতযোনিতায় সীমাহীন গুরুত্ব আরোপিত, বিবাহোত্তর সতীত্ব সর্বপ্রযত্নে রক্ষা করা অবশ্যকর্তব্যবিশেষ, শুধু নারীর নয়, পুরুষেরও। প্রাক্‌বিবাহ সঙ্গম (ফর্নিকেসন) তাই গর্হিত, দোষাবহ এবং অধর্মীয় আর বিবাহোত্তর ব্যভিচার (অডাল্টেরি) অধর্মাচরণ, অপকর্ম এবং সম্পত্তিনাশের মতই দুঃখিত ঘটনা। পরদ্রব্যে হস্তক্ষেপকারী বা আত্মসাৎকারী, সমাজে নিন্দিত, ঘৃণার্হ, শাস্তির যোগ্য, তেমনি অনধিকার যৌন অনুষ্ঠানও অবৈধ, দণ্ডার্হ। আর ধর্মীয় দৃষ্টিতে এটা হচ্ছে ঈশ্বরের ক্রোধ বা বিরক্তির কারণ, অতএব এটা যে পাপ, সেটা বোধ করি না বলে দিলেও চলে।

এইমাত্র তুলে ধরা খণ্ড খণ্ড চিত্রগুলি সংযোজিত করলে যে সমগ্র ছবিটি চোখের উপর ভেসে উঠবে সেটা এই যে, কেমন করে ধর্ম একটা আদিম প্রবল রিপুকে বশে আনতে চেয়েছে, নখদন্তহীন করে ভয়াবহতার হ্রস্বসাধনে সচেষ্ট হয়েছে। এই গেল ধর্মের একদিক। অন্যদিকে এই ধর্মই যৌনতাকে আরও ভয়ঙ্কর, আরও হিংস্র করেছে, দূরে থাক সুশীতল আস্বাদন বা মুক্তির ছাড়পত্র, আরও উদ্দীপ্ত করেছে। ধর্মের বেড়াজাল দিয়ে মানুষকে জোর করে বুভুক্ষু রেখেছে, আর কে না বলবে বুভুক্ষু মানুষের আহার্য দ্রব্যই দিবারাত্রির কাব্য, এভাবে সুন্দর যৌনতাকে একটা কুৎসিত অবসেসনে অর্থাৎ আবেশজ ক্রিয়ায়

পরিণত করেছে। কদর্যতার ইতিহাস যদি এখানেই শেষ হত, সুখী হতাম। দুঃখের বিষয়, ধর্মের নামে বঙ্গজাতির পঙ্কিল অধ্যায় আরও গড়িয়ে গেছে। ধর্মকে শিখণ্ডী করে ইন্দ্রিয়চরিতার্থতা, সৃষ্টিছাড়া কামাচার, ছদ্মবেশে ভোগবিলাস, বিকৃত উপায়ে কামতৃপ্তি, বিকৃত বাসনার নিদর্শন প্রতিটি ধর্মেই ছড়িয়ে আছে, একটু চোখ মেলে খুঁজে পেতে নিতে হবে এই যা। এই হিন্দুধর্মের কথা ভাবা যাক না কেন, গুরুপ্রসাদী-র ছদ্মবেশে কুমারী সম্ভোগের দুর্লভ অধিকার, বিন্দু-সাধন-এর রঙচঙে নামাবলী গায়ে চড়িয়ে সন্তানবিহীন নিরঙ্কুশ সুরতানন্দ চোখে পড়বে। চোখে পড়বে আজীবন ব্রহ্মচর্যপালন, লৌহশলাকা দিয়ে লিঙ্গবেধ, পিঠবাণ, চড়কবাণ। শেষোক্ত ধর্মকৃত্যগুলি ধর্ষমর্ষকাম-এর সুন্দর উদাহরণ হয়ে বেঁচে থাকবে।

শুধু হিন্দুধর্মে নয়, খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের মধ্যেও যত্রতত্র দেখতে পাব যৌনবর্জন বা উপরতি, সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ রেখে যোগাসনে অভ্যস্ত হওয়ার আদর্শ। এই প্রসঙ্গে ব্রহ্মচর্যর কৃচ্ছ্রসাধনে ক্লিষ্ট ধর্মযাজকদের, এবং যাজিকাদেরও, ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতার উপায় হিসেবে Succubus এবং Incubus নামক অজুহাত দুটি, (ঘুমঘোরে শয়তানরূপী নারী কিংবা নরের সঙ্গে সহবাস) স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। আবার চিরকৌমার্যব্রতপালনে সুবিধা হবে এই ভেবে অণ্ডচ্ছেদন করে যৌনকামনার নির্বাণপ্রচেষ্টা বিস্ময়কর হলেও সত্য। সাক্ষী ইউরোপের স্কোপসি (Skopts) সম্প্রদায়ের এবং ইজিপ্টের কপ্ট (Coptics) সম্প্রদায়ের ধর্মভীরু পুরুষগণ।

যৌনপরিহার বিনা মুক্তি নেই, অতএব রতিবিহার সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ, এমন একটা চরম শর্ত যে কোন ধর্মমতের প্রধানতম বক্তব্য হতে পারে, এবং সেই ধর্মমতে আমেরিকার ছ হাজার নরনারী একদা নাম লিখিয়েছিল এটা ভাবতেও বিস্ময় লাগে। এই ধর্মমত ১৭৩৬-এ ভূমিষ্ঠ, জননীর নাম এ্যান লী। এই রমণীর দৃষ্টিতে রতিবিহার হীনতম পাপাচার ছাড়া আর কিছুই নয়, তাই তার সন্তান-দেরও রতিব্যাপারে অপাপবিদ্ধ থাকাই নিয়ম। পৃথিবীতে চরম যৌনবিরোধী-রূপে খ্যাত, এই শেকার (Shaker) সম্প্রদায় এখনও টিকে আছে, বর্তমানে এদের সংখ্যা প্রায় পাঁচ শ, এরা পণ করেছে জীবনটা এভাবেই কাটিয়ে দেবে কোন রতিমাধুরী উপভোগ না করেই। পক্ষান্তরে রতিপরায়ণতার পৃষ্ঠপোষক হিসেবে ধর্ম, এমন চিত্রও চোখের লেন্সে ধরা পড়বে, আমেরিকায়[৩]। তন্ত্রে

৩। ১৮৭৬-এ লুপ্ত 'ওনিডা' সম্প্রদায়ের বীর্যপাতবিহীন সুরত, এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

মর্মন (Mormon) সম্প্রদায়ে বহুবিবাহ প্রোৎসাহিত, ধর্মরক্ষার জন্যে একাধিক পত্নী অবশ্য গ্রহণীয়।

ভাবাবেগ নয়, যুক্তির জাল ছড়িয়ে অপক্ষপাত হৃদয়ে, এবং পূর্ব আলোচিত তথ্যগুলির প্রতি চোখ রেখে, ধর্ম আর যৌনতার আলোচনায় রত হলেই দুটি সত্য ভাস্বর হয়ে দেখা দেবে। প্রথমেই চোখে পড়বে, মানবকামিতা ধর্মকে পাশ কাটিয়ে যেতে পারেনি, আচ্ছন্ন হয়েছে, যৌনতার ভুবনমনমোহিনী রূপটিও তাই ধর্ম-ছায়া দিয়ে ঢাকা। যে যৌনপ্রবৃত্তি স্বতঃস্ফূর্ত, যার প্রকাশ সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম, তার ধর্মনাশ করেছে এই ধর্মই। ভদ্র, শোভন ও সংযত করতে গিয়ে তার স্বতঃস্ফূর্ততা নাশ করেছে, সোনার খাঁচায় বন্দী যৌনতার সেই পুলকিত মাধুরী নেই, সেই স্বাতন্ত্র্যও কোথায় ভেসে গেছে, কে জানে।

দেশকালসন্ততিভেদে প্রকাশিত দ্বিতীয় সত্যটি এই যে, যৌনব্যাপারে একটা নীতি আছে। এটা কিন্তু প্রকৃত যৌননীতি নয় কারণ এই নীতির একদিকে রয়েছে যৌননিগ্রহের জয়ধ্বনি, অন্যদিকে অর্থ নৈতিক খবরদারি। ব্যাপারটা খুলেই বলি। তোতাপাখির কাছে বুলি পড়ার মত যুগ যুগ ধরে ধর্ম মানুষকে শুনিয়েছে, যৌনতা হচ্ছে পাপ। শুনতে শুনতে ধর্মভীরু মানুষের মনেপ্রাণে কথাটা গেঁথে গেছে। ফলে একটা তপশ্চর্যাপূর্ণ ব্রহ্মচর্যমূলক নীতি, এ্যাসেটিক মর‍্যালিটি, যার সার কথাটি হল যৌনপরিহার, জন্ম নিয়েছে। এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ইকনমিক মর‍্যালিটি, অর্থবিষয়ক নীতি। গবাদি পশু রক্ষণাবেক্ষণ কিংবা আর্থিক সম্পদ পরিচালনা ব্যাপারে যে বিষয়বুদ্ধি সজাগ থাকে, সেই ভাবনা, আশ্চর্য কাণ্ড, যৌনব্যাপারেও সমানভাবে কার্যকরী। এবং এভাবে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়নিগ্রহ আর বিষয়বুদ্ধির অবৈধ যোগসাজসে যেটা সৃষ্ট হয়েছে সেটাই কিনা আমাদের বর্তমান যৌননীতি।

কামনার নিবৃত্তি ষড়বিধ উপায়ে সম্ভব। পাণিমেহন, সুপ্তিস্খলন, রতিবিহীন উপচার, বিবাহিত সুরত, সমকামিতা আর পশুমেহন। বিবাহিত সুরত ব্যতিরেকে সঙ্গপরশযুক্ত হয়ে রতিলাভের কোন পথেই কুসুম ছড়ানো নেই। পাণিমেহন অতিশয় নিন্দিত। বাকী রইল সুপ্তিস্খলন, যদিও প্রজননের নামগন্ধ এতে নেই তথাপি ধর্মীয় কোন নিষেধ চোখে পড়ে না। অবশ্য অপবিত্র হওয়ার, অতএব স্খলনোত্তর স্নানপর্বের কথা উল্লিখিত হয়েছে কোন কোন ধর্মশাস্ত্রে। এই হল সেই সনাতন নীতি, যার গভীরে লুকিয়ে আছে যৌন পরিহার আর বিষয়বুদ্ধি।

এইমাত্র উল্লেখ করা নীতিগুলি কিন্তু আমাদের সমাজে সর্বত্রই সমানভাবে

প্রযোজ্য নয়, এবং পুরুষের বেলায় যেটা লীলাখেলা সেটাই কিনা নারীর পাপ। পুরুষের কাছে কুসুমশিথিল হয়েও নারীর ক্ষেত্রে বজ্রকঠোর, এমন যে নীতি সেটা দ্বিচারিণী, অতএব কৃত্রিম, (সিউডো মর‍্যালিটি) হতে বাধ্য, ইংরেজী ভাষায় একেই বলি 'ডাবল্ ষ্ট্যাণ্ডার্ড অব মর‍্যালিটি', বাংলায় বলব দোরোখা নীতি।

পুরুষের পক্ষে গোপনে অনৈতিক হওয়াটা খুবই সহজ, কারণ, গর্ভ নামক শাস্তি বা প্রায়শ্চিত্ত বলতে কিছুই নেই, আর পা বাড়ালেই তো গণিকাপল্লী। সত্যি বলতে, অবৈধ উপায়ে লালসাতৃপ্তিতে পুরুষের অধিকার বা স্বাধীনতা দেখি আবহমানকালের, বিবাহের সময় পুরুষের চারিত্রিক অখণ্ডতা প্রত্যাশিত নয়, এমন কি বিবাহের পরও স্খলন-পতন-ত্রুটি যদি বা কিছু ঘটে সেটাও কিনা সহনীয়। আর নারীর? সবই বিপরীত, পতনের প্রতিটি পথ কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত আর তিলমাত্র স্খলনেব জন্যে রয়েছে একচক্ষু অসহিষ্ণু সমাজে আকাশ-জোড়া নিন্দা, রক্তচক্ষু আইনের কঠোর বিধান, আর ধর্মীয় জুজুবুড়ি (ধর্মচ্যুতি হেতু পাপ, শাস্তি ইত্যাদি) তো আছেই। এক কথায় সেই অর্থবিষয়ক নীতি, সেই যৌন পরিহার সবই বেছে বেছে শুধু নারীর জন্যেই নির্দিষ্ট। কিন্তু কেন? কেন এই একপেশে নীতি?

প্রচলিত যৌননীতির একটি প্রধান উদ্দেশ্য: নারীর সতীত্ব রক্ষা। এবং এরই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি, দোরোখা নীতি। পূর্বোক্ত সনাতন নীতিরই একটি অঙ্গ বা 'করোলারি' রূপে চিহ্নিত, কারণ, নারীর সতীত্ব রক্ষায় সমাজকে নিয়োজিত করতে গিয়েই দোরোখা নীতির স্বাতন্ত্র্যগৌরবকে স্বীকার করতে হয়েছে, এবং সেই সমাজ নিঃসন্দেহে পিতৃপ্রধান। সন্তান যে পিতারই এবং সেই স্বত্ব কায়েম রাখার জন্যেই নারী সম্বন্ধে পুরুষশাসিত সমাজ এত সজাগ এবং এটা আরও জোরদার করার জন্যে ধর্মের আশ্রয় নিয়েছে, আমদানি করেছে কতকগুলি নীতি যা শুধু স্ত্রীর জন্যেই নির্দিষ্ট। অর্থাৎ পিতৃত্ব ব্যাপারে সন্দেহাতীত ভাবে নিশ্চিত থাকার জন্যেই বিবাহপূর্ব নারীর অক্ষতযোনিতা এত প্রয়োজনীয়, বিবাহোত্তর সতীত্ব এত অপরিহার্য। এখন আমরা নিশ্চয়ই হেঁকে বলতে পারি, পিতৃত্ব স্বীকরণ এবং প্রজনন মার্কা বিবাহিত সুরত, এদুটি ঘটনাই যৌননীতির উৎস হিসেবে বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে।

কিন্তু, তে হি নো দিবসা গতাঃ। সেই মানুষ কোথায়, যে মানুষ আকাশের দিকে তাকিয়ে ঈশ্বরের রোষবহ্নি দেখতে পেত? সেই ধর্মীয় বিশ্বাস বা নিষ্ঠা কোনটাই পূর্বের মত নেই, ভাঙ্গন ধরেছে, নৈতিকতায় ভাটার খবর তাই

সবখানে। আর সেই সমাজও তো নেই! শহরকেন্দ্রিক সভ্যতা আর শিল্পীয়-করণের প্রাচুর্য আর একান্নবর্তী পরিবার ভেঙ্গে গিয়ে একক পৃথগন্ন পরিবারের বাহুল্য দিয়ে বর্তমান সমাজ চিহ্নিত। আর নারী, এবং এটাই সবচেয়ে বড় কথা, সেই অন্ধকার রাজ্যে নেই, সে আজ জাগ্রত। আলোকপ্রাপ্ত, শিক্ষিত এবং আর্থিক স্বাধীনতাপ্রাপ্ত, এসবেরই সমষ্টিগত প্রভাবে বর্তমান যুগের ভাবনা মোড় নিয়েছে, প্রাচীন ভাবনাগুলি একে একে বিদায় নিচ্ছে। ফলে সেক্সে পাপবোধ করে না আজকের অনেক মানুষই, বিশ্বাস করে বিবাহিত সুরত শুধু পুত্রার্থে নয়, আনন্দার্থেও, সেক্স শুধু সৃজনী নয়, অবকাশরঙ্গিনীও বটে, আর কজনাই বা বলবে অবিবাহিত ব্যক্তির রতিলাভ পাপাচার বিশেষ? তা ছাড়া আধুনিক জন্মনিয়ন্ত্রণও রতিজনকভাবে সাফল্যপ্রদ হয়ে উঠেছে, সুতরাং গর্ভবতী না হয়েও কুমারী পুরুষসঙ্গ পেতে পারে এবং অন্যাসক্তা বিবাহিতা নারীর গর্ভে শুধু স্বামীরই সন্তান আসবে।

কে না জানে যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজব্যবস্থা পালটে যায়। এবং সেই পরিবর্তিত সমাজব্যবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে গিয়ে মানুষের মূল্যবোধ আর জীবনদর্শনও বদলে যায়, তারই স্বাক্ষর রয়েছে বিংশ শতাব্দীর ষাট-সত্তর দশকের অস্থিরতায়। এই যুগ যন্ত্রণারই বহিঃপ্রকাশ যৌন স্বাধীনতায়, পরিণতিস্বরূপ দেখা দিয়েছে যৌন আচরণের দুটি নতুন নীতি, অনুরাগভরে দেহমিলন আর বিনা অনুরাগে দেহমিলন।

অনুরাগভরে নয়, শুধু দেহের টানে কাছাকাছি এসে চলে যাওয়ারই আরেক নাম 'পারমিসিভনেস উইদাউট এ্যাফেকসন' নীতি। এ যেন বিপরীতগামী দুই জাহাজের চন্দ্রস্নাত কোন এক রাত্রে সুয়েজ খালে নোঙ্গর করা। কাব্যা-লোকের এই চিত্রটির মতই মোহময়, তবুও নীতি হিসেবে ঝাঁঝালো, উগ্র, চরম। এতই চরম যে, কোন সভ্য সমাজই প্রকাশ্যে অনুমতিদাতা নয়, যদিচ পলিনেসীয় স্বাধীনতায় আস্বাদিত এবং আফ্রিকার অরণ্য সভ্যতায় এটা নতুন নয়। আশ্চর্য কাণ্ড, সভ্য সমাজেও কেউ কেউ প্রোৎসাহিত করেছেন: কোন কোন কামাতুর-হৃদয়ে অনুরাগবিহীন অথচ ইচ্ছুক নর-নারীর রতি স্বাধীনতার স্বপ্ন সযত্নে লালিত হতে পারে কিংবা কোন বোহেমিয়ান সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় 'ফ্রী লভ' নাম দিয়ে এমন একটা নীতি ছড়িয়ে পড়তে পারে, এবং ছড়িয়েছেও, দৃষ্টান্ত, নিউ ইয়র্কস্থিত গ্রীণউইচ পল্লী। চরম গণতান্ত্রিক সমাজে ব্যক্তি স্বাধীনতার অনন্ত পরিচয় হিসেবে দাবি হয়ত আছে, কিন্তু অনুরাগবিহীন কামসম্ভোগে এমন একটা ছবি ভেসে ওঠে, যাকে রতিলালসার স্থূল, নগ্ন, কদর্য পরিচয়,

সুতরাং শশুবৃত্তি বলাই ভাল। অতএব এমন একটা নৈতিক বিধান বর্তমানের জন্যে নয়, অন্তত: হৃদয় দিয়ে গড়া মানুষের জন্যে নয়।

নব-পর্যায়ের আরেকটি ধারণা অনুরাগজড়িত, দেহমিলন সম্পর্কিত নীতিটি তাই 'পারমিসিভনেস উইথ এ্যাফেকসন' নামে খ্যাত। প্রণয়াসক্ত দুটি নর-নারীর বিবাহপূর্বে, বিশেষ করে বাগ্‌দানকালে, রতি-স্বাধীনতা অনেক সমাজেই পৃষ্ঠপোষিত: পলিনেসীয় এবং আফ্রিকার আদিম আকাশে এর গন্ধ পাব বহু যুগের ওপার হতে। সহিষ্ণু সভ্য সমাজের শীর্ষে রয়েছে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার দেশগুলি, সুইডেন, নরওয়ে, ডেনমার্ক। পাশ্চাত্য জগতের অন্যান্য প্রান্তেও, যেমন ইউরোপ-আমেরিকায়, প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে, প্রমাণ রয়েছে ১৩ থেকে ১৯ বছরের কিশোর-কিশোরীর মধ্যে রতিবাহিত ব্যাধির বিহ্বলদায়ক প্রাচুর্যে এবং বিবাহপূর্বে প্রায় প্রতিটি দম্পতিরই রতিঅভিজ্ঞতার আশ্চর্যজনক ছড়াছড়িতে। আমাদের এই ভারতবর্ষে তথা বাংলাদেশেও এমন একটা নীতি, অর্থাৎ নিষিদ্ধ ফলাস্বাদনের অভিলাষ, ছড়িয়ে পড়ছে এবং সদ্য: প্রবিষ্ট এই ধারাটি চক্ষুষ্মান ব্যক্তিমাত্রেরই নজরে পড়বে।

আর অনুরাগে ভর দিয়ে দুটি প্রাণ যদি পাশাপাশি আসে, হিয়ে হিয়া রাখতে চায়, ধর্ম, সমাজ বা রাষ্ট্রের তাতে কি এসে যায়! সন্তান যদি না আসে, শঠতা, কপটতা, প্রলোভন, প্রবঞ্চনা কিংবা বলপ্রয়োগ প্রভৃতি কোন কিছু অধর্মের আশ্রয় না নেওয়া হয়, এবং উভয়েই যদি প্রাপ্তবয়স্ক ও সুস্থমস্তিষ্ক হয়, কারুর কি কিছু বলার আছে? সম্ভবত: না, কি ধর্মের, কি সমাজের, কি রাষ্ট্রের কারুরই নেই।

কিছু বলার বা কিছু করার সুযোগ তখনই পাবে, যদি কেউ বিবাহের মিথ্যা শপথ দিয়ে, কিংবা চাকুরী বা অন্য কোন আশার ছলনায় ভুলিয়ে নারীর সর্বনাশ করে। অথবা সর্বস্বান্ত সন্তানসম্ভবা নারীকে পথে বসিয়ে পালিয়ে যায়। আর যে কামানুষ্ঠানের পিছনে বলপ্রয়োগের মত পাশবিকতা কার্যকরী রয়েছে সেখানে তো নিশ্চয়ই। এক কথায়, কামের নামে বজ্জাতি কোনকালেই সহনীয় নয়, এমন একটা কর্ম সমাজ ও ধর্ম, নীতি ও আইন, প্রত্যেকের কাছেই অপকর্মরূপে গণ্য হতে বাধ্য। এবং কে না বলবে এর জন্যে কামপরায়ণ ব্যক্তি দণ্ডিত হোক। কিন্তু বলপ্রয়োগ নেই, আছে শুধু রাগ আর অনুরাগ, আশার ছলনা নেই, এমন কি গর্ভও না, তখন কেউ যদি হেঁকে বলে এটা যেমন অসামাজিক তেমনি বে-আইনী অতএব তুমি শাস্তিযোগ্য, এমন কি দণ্ডবিধান করতেও প্রাগ্রসর, খেদের অবিধি থাকবে না।

কেউ যেন না আমাকে ভুল বোঝেন, যথার্থ নীতির নামে, নবনীতির দোহাই পেড়ে, অবাধ ইন্দ্রিয়চরিতার্থতা, যার আরেক নাম স্বেচ্ছাচারিতা, তারই জয়গান করছি। যৌনব্যাপারে সংযম ও শালীনতা নিশ্চয়ই থাকবে, যেমন আছে জীবনের আর প্রতিটি ব্যাপারে। তবে এটাও ভুললে চলবে না যে, সংযমের নামে কৃচ্ছ্রব্রতসাধন বা ইন্দ্রিয়নিগ্রহ নয় এবং শালীনতার নামে শুচিবায়ুগ্রস্ততা নিশ্চয়ই বাঞ্ছনীয় নয়।

এতকাল ধরে আমরা যে নীতির মুখোমুখি হয়েছি তার সঙ্গে তপশ্চর্যাপূর্ণ নীতির আর সম্পত্তিবিষয়ক নীতির কোন ভেদ নাই। এনীতি আর্থিক জগতে খাটে, বর্তমান সমাজে নয়, কারণ, স্ত্রীকে সম্পত্তিরূপে বোধ করতে নারীরাই আপত্তি জানিয়েছে। ফলে কঠোর নীতির রক্তাক্ত দিনগুলি চলে গেছে, দাসত্ব-মোচনের দিন এসেছে, পরিণতিস্বরূপ এক নতুন নীতির ডাক পড়েছে, এর বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণগুলি এই :

এক, যৌনব্যাপারে কোন সংস্কার থাকবে না, থাকবে না কোন দুর্বলতা, ঐতিহ্য তথা ধর্মের প্রতি। বিজ্ঞানের নতুন অবদানগুলির, যেমন জন্মরোধ, কথাও ভুলবে না, পরিবর্তিত সমাজে খাপ খাইয়ে চলার মত শিথিলতা বা প্রসারণশীলতা সম্পন্ন হবে—অর্থাৎ ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, আইন, প্রতিটি দৃষ্টিকোণ থেকেই সঙ্গত মনে হবে, এমন একটা নীতির প্রতি হস্তপ্রসারিত করাই শোভন।

দুই, অনেক নারীরই, এবং আমাদেরও, বাসনা : দোরোখা নীতি বন্ধ হোক। বর্তমান যুগের অনেক নারীই বিবাহপূর্বে স্বামীর যৌনস্পর্শরহিত অবস্থা যাচাই করে নিতে চায়। কিংবা হেঁকে বলতে চায়, পুরুষ যদি ইন্দ্রিয়ের দ্বার উন্মুক্ত করে রাখে, নারী কি দোষ করল! দাবি জানিয়েছে : নারীর মত পুরুষও কেন কলঙ্কিত হবে না? পুরুষের সমান সুযোগ নারীরও ভোগ্য হবে না কেন? এসব প্রশ্নের সদুত্তর মিলবে না, অতএব একক নীতি চাই, যা উভয়ের ক্ষেত্রেই সমানভাবে কঠোর কিংবা সমানভাবে শিথিল।

তিন, সেক্সের একটা নীতি থাকবেই। কিন্তু ভিত্তি যার পাপবোধে অর্থাৎ সংযমে এবং প্রকাশ যার লিঙ্গভেদে ভিন্ন, সেই কৃত্রিম নীতি কখনই নয়। শুধু যে দ্বিচারিণীত্ব ঘুচিয়ে নবজন্ম লাভ করবে তা নয়, যথার্থও হতে হবে যৌন-নীতিকে। যথার্থ নীতির গোপন কথাটি হল, সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত যৌনপ্রবৃত্তিকে পাথর চাপা দেওয়া নয়, তাকে সুন্দর প্রকাশের পথে নিয়ে যাওয়া, অমল আলোর পানে পৌঁছে দেওয়া। অতএব হৃদয়ের ডাক শুনে কেউ যদি এগিয়ে

চলে, সে কখনই ইম্‌মর‍্যাল নয়, প্রাণের আবেগে উভয়ে যদি কাছাকাছি আসে তারা কখনই অপরাধী নয়। তবে বেবল্লা প্রমত্ততা কখনই নয়, সঙ্গী বা সঙ্গিনীর কোন অনিষ্ট করা চলবে না এবং কামানুষ্ঠানের প্রত্যক্ষ পরিণতি যেন তৃতীয় ব্যক্তির, বিশেষ করে সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্ষতির কারণ না হয়। তখন যে সম্পত্তির আঁশটে গন্ধ থাকবে না এবং সংযমের গৈরিক বসনও খসে পড়বে তা বলাই বাহুল্য।

চার, নবনীতির দুই কুশীলব, দায়িত্বশীল পুরুষ আর দায়িত্বসচেতন নারী। সমাজ নয়, আইন নয়, রাষ্ট্রও না। যদি হ্যাভলক এলিসকে প্রশ্ন করা যায় ব্যক্তিগত দায়িত্বটা কি, তিনি বলবেন, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আর নৈতিক দায়িত্ব বলতে যা বোঝায় ঠিক তাই। সুখের কথা এই যে দায়িত্ববান ব্যক্তি-মাত্রই এদুটি গুণেব অধিকারী, নিজ কার্যের জন্যে যেমন জবাবদিহি করতে প্রস্তুত তেমনি প্রায়শ্চিত্ত করতেও পেছপা নয়। অর্থাৎ যৌনব্যাপারে ভুক্ত-ভোগীদের অখণ্ড স্বাধীনতা যেমন থাকবে তেমনি থাকবে অসীম দায়িত্ব। এই ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধই নবনীতির আরেকটি প্রধান শর্ত।

পাঁচ, যথার্থ যৌননীতির প্রাণভোমরা হচ্ছে পবিত্রতা, শুচিস্নিগ্ধতা। কোন কলুষতা, কোন অন্যায় স্পর্শ করবে না, অনুষ্ঠাতাকে নয়, কামপাত্রকেও না।

জিজ্ঞাসা হয়ত জাগবে, পুরাতনকে বিদায় না দিয়ে রাজতন্ত্রে বসিয়ে রাখা কি যায় না? যায়, তবে অশিক্ষা আর কুশিক্ষায় দেশটাকে ভরিয়ে দিতে হবে, মানুষকে করতে হবে আরও ধর্মভীরু, আরও সংস্কারে বিশ্বাসী, এবং নারীকে সেই অন্ধকার রাজ্যে নির্বাসিত করতে হবে যেখানে নিরক্ষরতাই আনন্দ, আর্থিক স্বাধীনতায় ঔদাসীন্য বা অনাগ্রহই হচ্ছে ধর্ম, পদানত থেকে পুরুষের সেবা করাই নারীর স্বপ্ন। কিন্তু সেই প্রাচীন পৃথিবীতে, ইচ্ছে থাকলেও, ফিরে যাওয়া যায় না, ঘড়ির কাঁটা পিছনের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার মতই এটা হাস্যকর। এর চেয়ে অনেক ভাল নয় কি নতুন পৃথিবীতে নতুনদের সঙ্গে আপস করা? এরই ফলশ্রুতি: নবনীতি।

নবনীতির স্বপক্ষে চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই রায় দেবেন। সেই বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই প্রকাশ্যে ধ্বনিত হয়েছে এমন দুই দিক্‌পালের কণ্ঠে যাঁদের নাম পৃথিবী থেকে কোনদিনই মুছে যাবে না, এঁদের একজন দুঃসাহসী ডাঃ হ্যাভলক এলিস, অন্যজন মনীষী বারট্রাণ্ড রাসেল। তাৎকালিক সমর্থনকারীদের মধ্যে ছিলেন, বিচারক বেন লিণ্ডসে, যৌনবিদ্‌ ডাঃ অগষ্টাস ফোরেল, ডাঃ নরমান হেয়ার। তারপর সমর্থনসূচক বৈপ্লবিক গ্রন্থ পেয়েছি, রেনে গাঁইও প্রণীত 'সেক্স এথিকস',

শেষে যুগান্তকারী কিনসী রিপোর্টে সমর্থন করার মত দৃঢ় প্রত্যয়। সবশেষে আমি বলি সাম্প্রতিককালের অশান্ত যৌনজীবন আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে কি এটাই দেখিয়ে দিচ্ছে না, একটা পরিবর্তন চাই। অতএব, সহনশীল নীতির অনুরাগাত্মক কামানুষ্ঠানের স্বপক্ষে ভোট দেওয়াই বুদ্ধিগ্রাহ্য নয় কি? নবনীতির সবই যে কুসুমাস্তীর্ণ তা নয়, কিছু কিছু অসুবিধাও আছে বৈকি, তবুও বলব সময়ের সঙ্গে খাপ খাইয়ে যুগের সঙ্গে তাল রেখে ঋজুভাবে দাঁড়িয়ে থাকাই মানুষের ধর্ম, উটপাখির মত মুখ গুঁজে নয়।

উপসংহারে বলব, আমাদের সামনে রয়েছে দুটি পথ: হয় পুরাতনী শপথ, না হয় নবনীতির দীক্ষা। কিন্তু যে পথেই হাঁটা শুরু করি না কেন বিপদ যেমন আছে বাধাও তেমনি কম নেই। এখন আর পুরনো পৃথিবীতে যাওয়া সম্ভব নয়, পক্ষান্তরে নতুন পৃথিবীতে পুরনো কালাকানুনও চলে না। পরিবর্তিত অবস্থাজন্য কিছু পরিবর্তন চাই, চাই কিছু শিথিলতা। এটাই হল নবনীতির স্বপক্ষে সবচেয়ে জোরালো যুক্তি।

আমি যদি আপনাকে জিগ্যেস করি—আচ্ছা, আপনি কার ছেলে বলুন তো? আপনি হয়ত অসন্তুষ্ট হয়ে বলবেন, আমি শ্রী অমুকের ছেলে। তার পর আমি যদি বলি—আপনি যে শ্রী অমুকের সন্তান তার কোন সঠিক প্রমাণ দিতে পারেন? এবার আপনি বলবেন—এ কেমন কথা? এরকম তো কখন শুনিনি, আমি যে শ্রী অমুকের সন্তান তাই তো জানি। তার প্রমাণও আপনার কাছে হাজির করতে হবে নাকি, আপনি তো দেখছি মশাই সাংঘাতিক লোক! আপনি কিনা আমার জন্ম সম্বন্ধে সন্দিহান হচ্ছেন!

সন্তানের পিতৃত্ব নির্ণয়ঃ একাল ও সেকাল

তা আপনি যাই ভাবুন না কেন, আপনি যে আপনার পিতার সন্তান তার কোন অভ্রান্ত প্রমাণ হাজির করতে পারেন না বা পারবেনও না।* কেননা এর কোন নিশ্চয় প্রমাণ নেই, আছে শুধু কতকগুলি বিশ্বাস, কতকগুলি অনুষ্ঠান, কতকগুলি নীতি—যার জোরে আপনি বলতে পাবেন আপনি পিতার সন্তান। কিন্তু আপনি উচ্চকণ্ঠে পৃথিবীকে জানিয়ে দিতে পারেন যে আপনি মায়ের সন্তান। কেননা মাকে সন্তান ধারণ করতে হয় ন মাস, সন্তান জন্ম দিতে হয়। তার জন্যে কোন প্রমাণের দরকার নেই। কিন্তু পুরুষকে পিতৃত্ব দাবি করবার জন্যে অনেক কিছু করতে হয়েছে।

এমন এক যুগ ছিল যখন সন্তানের জন্মদানে পুরুষের কতখানি কৃতিত্ব তা পুরুষই জানত না। তখনকার দিনে সন্তানের সর্বেসর্বা মায়েরাই ছিল। সে-যুগ ছিল মাতৃ-প্রধান যুগ। সে-সময়ে লোকেরা বিশ্বাস করত কোন পারলৌকিক বা আধিভৌতিক প্রভাবে সন্তান মায়ের গর্ভে আসে। তার পর

* মাতার ও সন্তানের রক্ত পরীক্ষার সাহায্যে অর্থাৎ রক্তের এ-বি-ও, এম-এন-এস এবং আর-এইচ শ্রেণীবিভাগ দ্বারা পিতার রক্তটি কেমন হবে তা গড়ে ৫০% ক্ষেত্রে জানা যায়। কিন্তু সন্তানের জৈবিক পিতা ও সন্তানের মাতার স্বামী যে ভিন্ন নয় তার কোন নিশ্চিত প্রমাণ নেই। একারণে রক্ত পরীক্ষার সাহায্যে সন্তানের পিতৃত্ব নিশ্চয়ভাবে প্রমাণ করা সম্ভব নয়।

মাকে সেই সন্তান জন্ম দিতে হত বলে সন্তান মায়েরই ছিল। পুরুষ ভুলক্রমেও কোন দাবি তুলত না সন্তানের জন্যে।

ক্রমে পিতৃ-প্রধান যুগ এল। সমাজে পুরুষ সর্বেসর্বা হল, পুরুষ জানতে পারল সন্তান উৎপাদনে পুরুষের কৃতিত্ব অনেকটা আছে। তখন থেকেই পুরুষের মাথা ব্যথা শুরু হল কেমন করে পিতৃত্বের দাবি কায়েম করা যায়। সে ভেবে ভেবে বার করল বিবাহ প্রথা। একটি পুরুষ আর একটি নারী কোন এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মিলিত হতে লাগল, এই বিবাহ প্রথা অনুযায়ী। প্রথার পিছনে পুরুষদের যুক্তি হল যে, এই বিবাহিত পুরুষ ও নারীর যে সন্তান হবে তা তাদেরই। অর্থাৎ ঐ পুরুষ এই সন্তানের পিতা। কিছুকাল তাদের মাথা ব্যথা কমল। কিন্তু পরে তারা দেখল এর আরও অনেক গলদ আছে: ঐ বিবাহিতা নারী যে শুধু ঐ পুরুষকেই দেহদান করে বা করবে তার নিশ্চয়তাই বা কই? এখন অন্য পুরুষকে দেহদান করে যদি সন্তান হয় সে সন্তানের পিতা কে? তা হলে আমার সন্তান যে আমারই তার স্থিরতা কই? সমাজের পুরুষেরা সভা ডাকল। ঘন ঘন মাথা নেড়ে তারা ঠিক করল কতকগুলি সমাজ-নীতি যা সমাজের প্রত্যেক পুরুষ ও নারীকে মানতে হবে। এই সমাজ-ব্যবস্থার ফলে দোরোখা নীতির উদ্ভব হয়েছে। একই সমাজে থেকে পুরুষের জন্যে এক নীতি, নারীর জন্যে আরেক। এজাতীয় বৈষম্যমূলক নীতিগুলিই বর্তমানে 'ডাব্‌ল ষ্ট্যাণ্ডার্ড অব মর‍্যালিটি' বা 'দোরোখা নীতি' রূপে পরিচিত।

দোরোখা নীতি

তারা বিশেষ করে বেঁধে দিল কতকগুলি আইন-কানুন নারীর জন্যে। নারীর জন্যে হল চীনার লৌহবলয়। আর পুরুষের জন্যে হল উদার শিথিলতা বা আইনের ফাঁক (সেজন্যে পুরুষের বেলায় আইন থাকা ও না থাকা দুই-ই সমান)। চিরকালের সমাজ-শাস্ত্রকারগণের এই একই রূপ। আমি জোর গলায় বলতে পারি এসময় সমাজব্যবস্থা নারীর হাতে থাকলে পুরুষেরও ঠিক এই অবস্থা হত।

তাই পুরুষ নারীকে বলল—তুমি বাপু এই বাড়ীর ঘেরাটোপের মধ্যে থাক। সূর্যের বা পরপুরুষের মুখ দেখলে তোমার দেহ গলে যাবে। পর-পুরুষের সঙ্গে কথা কওয়া এমন কি স্বপ্নেও দেখা হবে না।

পুরুষ নারীকে শেখাল—পতি হচ্ছে পরম গুরু। পতির সেবা তোমার ধর্ম। স্বামী যা বলবে বিনা বাক্যব্যয়ে তাই করবে। অমান্য করা মহাপাপ। তোমাদের

স্বকীয় কোন যৌন সত্তা নেই। তোমাদের দেহে যৌন কামনা আনাগোনা করে না। যৌন চেতনা যদি আসে মুখ ফুটে বলবে না, বুক ফেটে গেলেও। স্বামী যখন তোমায় শয্যাপ্রান্তে আহ্বান করবে, তখনই তোমাদের যৌন অনুভূতি জাগবে।

নারী সবই মেনে নিল। কেননা না মানার সব পথই যে বাঁধা। পুরুষের এমই প্রতাপ ছিল।

পুরুষ সব চেয়ে বেশী বাহাদুরি করল নারীর স্খলনের উপর ধর্মজনিত পাপ আরোপ করে আর এই সব স্খলনের জন্যে গুরুতর শাস্তি বিধান করে। পুরুষ নারীকে ভয় দেখাল স্বামী ছাড়া অন্য পুরুষকে দেহদান পাপ ও নরকগমন সমান। পুরুষ নারীর বিন্দুমাত্র স্খলনের জন্যে নানাবিধ শাস্তি স্থিরীকৃত করল। লাঞ্ছনা, সমাজ থেকে বহিষ্করণ, নির্বাসন, এমন কি মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত দেওয়া হত নারীর স্খলনের জন্যে।

একে নারী অতিরিক্ত মাত্রায় ধর্মভীরু, তার উপর এই সব শাস্তির বহর দেখে নারী হয়ে উঠল পুরুষের হাতে পোষ-মানা পাখী। শেখানো পাখীর মত পুরুষের এইসব বুলি সে অন্য নারী বা ঘরের অন্যান্য মেয়েদের শেখাতে লাগল। ফলে স্বামী ছাড়া পরপুরুষে দেহদান উঠেই গেল। পুরুষ বিয়ে করে এটুকু নিশ্চিত হল যে স্ত্রী তাকে ছাড়া অন্য কাকেও দেহদান করবে না। তা হলে তার স্ত্রীর গর্ভে যে সন্তান হবে তা যে তারই সে সম্বন্ধে সমস্ত ভাবনা দূর হল। পুরুষ জোর গলায় বলতে পারল যে এ-সন্তান তারই। তখন থেকে পুরুষের ভাবনা দূর হল। আর সেদিন থেকে নারীর স্বাধীনতা গেল, স্বকীয় সত্তা লোপ পেল। তখন থেকেই পুরুষসৃষ্ট নীতি নারীর পায়ে জড়িয়ে আছে যার ঝনঝনানি এখনও শুনতে পাই। এসব ক্রমবিবর্তনের কথা ছেড়ে আগের আলোচনায় আসা যাক।

বিবাহ প্রথার সার কথা

আগেই বলেছি, আপনি যে আপনার পিতার সন্তান তা বলতে পারেন কতকগুলি বিশ্বাস আর একটি অনুষ্ঠানের জন্যে। এই অনুষ্ঠানটি হচ্ছে সমাজ বা আইন অনুমোদিত বিবাহ। সিভিল ম্যারেজ বা কোন ধর্ম অনুযায়ী বিবাহ হল এই পিতৃত্বকে স্বীকার করে নেওয়া। পুরোহিত বা ধর্মযাজক ও উপস্থিত নিমন্ত্রিত লোকেরা অর্থাৎ সমাজ ও সমাজের লোকেরা সেদিন (অজ্ঞাতসারেই) মেনে নেয় যে, এই পুরুষ আজ থেকে এই নারীর স্বামী হল।

আর এই নারীর যে সন্তান হবে তার পিতা এই পুরুষই। আর এই সঙ্গে সঙ্গে সমাজ বোঝে বা সমাজের লোকেরা বিশ্বাস করে যে স্বামী ছাড়া অন্য পুরুষকে এই বিবাহিতা নারী দেহদান করবে না। সেজন্যে সমাজ নিশ্চিন্ত মনে বিশ্বাস করে নেয় এই বিবাহের ফলে যে সন্তান হবে তার পিতা এই পুরুষই। এজন্যে সমাজ বিশেষ করে নারীর স্খলনের প্রতি এত রক্তচক্ষু। এজন্যেই নারীর এতটুকু স্খলন সহজে ছেড়ে দিতে রাজী নয়।

অতএব আপনার বলাটা কতকগুলি বিশ্বাসের নির্ভরাধীন। সেগুলি এই :

এক, আপনার পিতামাতা কোন একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিবাহিত।

দুই, সমাজ স্বীকার করে নিয়েছে যে, তারা বিবাহিত।

তিন, সমাজ মেনে নিয়েছে যে, ভাবী সন্তানের পিতা এই বিবাহিত পুরুষ।

চার, সমাজ সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করে নিয়েছে এই বিবাহিতা নারী কেবলমাত্র তার স্বামীকেই দেহদান করবে।

উপরিউক্তগুলির মধ্যে সবচেয়ে শেষেরটি—দৈহিক মিলন কেবলমাত্র স্বামী স্ত্রীর মধ্যে আবদ্ধ থাকা—বেশী দামী।

যেহেতু এর কোন প্রমাণ নেই, যেহেতু এটা শুধু দাঁড়িয়ে আছে একটি বিশ্বাসের উপর, সেহেতু আপনি যাকে পিতা বলে ডাকেন সে যে আপনার পিতা তাব কোনই সুদৃঢ় ভিত্তি নেই। এখন আপনি সত্যই যে আপনার পিতার সন্তান সে কথা জোর গলায় বলতে পারেন কি ?

বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় দোরোখা নীতির প্রভাব

(১) কুভাদ প্রথা—এই প্রথা এখনও আফ্রিকার কোন কোন অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায়। এই প্রথা অনুযায়ী সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার দু একদিন পরে সন্তানের পিতা আঁতুড় ঘরে আশ্রয় নেয়, মাকে সরিয়ে দিয়ে। পিতা সন্তানকে দুধ খাওয়ায় ও লালনপালন করে। এমনি করেই পিতৃত্বকে প্রতিষ্ঠা করিয়ে নেয়।

(২) নারীর প্রতি অবিচার—পুরুষের স্খলন, স্খলন নয় বরং গৌরব। নারীর পান থেকে চুন খসলে হুলস্থুল। পুরুষ অবাধে যা খুশি করবে, বেশ্যা বা অন্য নারীতে আসক্ত হলে পুরুষের বিন্দুমাত্র ক্ষতি হয় না—সে যে-পুরুষ সে-পুরুষই থাকে। নারী উত্তেজনাবশে সামান্যতম ভুল, বিন্দুমাত্র ত্রুটি করলে কোন রেহাই নেই। তার জন্যে নারীকে সহ্য করতে হয় অনেক লাঞ্ছনা। কলঙ্কের ডালি নিয়ে বাজারে হয়ত দেহ বিক্রির কাজও করতে হয়।

কেন? পুরুষের যদি কিছু না হয়, নারীর বেলায় এত কিছু হবে কেন? রুচি-বৈচিত্র্যের জন্যেই হোক বা যে কারণেই হোক, পুরুষ অন্য নারীর পিছনে ছুটলে, অপরে সে নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামায় না। আর নারীর সামান্য কিছু ভুলেই, অপরে এত হৈ হৈ করে কেন? তার সঠিক জবাব হল এই পিতৃত্বের স্বীকরণ ব্যাপার।

(৩) সাধারণতঃ বিবাহিত পুরুষ তার স্ত্রীর কাছে অন্ততঃ এটুকু দাবি নিশ্চয়ই করে যে স্ত্রী সর্বান্তঃকরণে সতী হবে। কিন্তু নিজেরা যে কতদূর সতী তা একবার ভেবেই দেখে না। নিজেদের বেলায় বেপরোয়া স্বাধীনতা। অন্য নারীগমনে তাদের একটুকুও বাধে না। ফলে বহু সংসারে অশান্তি ঘনিয়ে আসে। পুরষ যদি তার স্ত্রীর কাছে সতীত্ব দাবি করতে পারে, স্ত্রীই বা স্বামীর কাছে ঠিক এই জিনিসটা দাবি করতে পারবে না কেন?

(৪) পুরুষরা নিজেদের সুবিধার জন্যে নারীকে বয়ঃসন্ধিকাল থেকেই এমন এক অদ্ভুত পরিবেশের মধ্যে টেনে নিয়ে যায়, যার মূলসূত্রই হল চুপচুপ নীতি। নারী যখনই বয়স্কা হয়, পুরুষদের সঙ্গে মেলামেশার হাজারো রকমের গণ্ডি বেঁধে দেয় বাড়ীর অভিভাবকরা। বিবাহিতা নারীর বেলাতেও ঠিক তাই। যেখানেই নিষেধ থাকে, সেদিকে লোকে আগে ছোটে। তাই এই গণ্ডি পার হবার কৌতূহলও অনেক নারীরই থাকে। ফলে দুর্নীতি আরও বেড়ে চলেছে।

(৫) পুরুষ উত্তেজিত হলেই স্ত্রীকে আহ্বান করে। আর উত্তেজনার উপশম ঠিক মত না হলে অন্যত্র যায়। কিছুই হয় না, গায়ে কোন আঁচড়ই লাগে না। নারীই বা চুপ করে মুখ বুঁজে থাকবে কেন? স্বামীকে আহ্বান করে উত্তেজনার উপশম নিশ্চয়ই করবে, পুরুষের মত। আর স্বামী যদি অক্ষম হয় সন্তুষ্ট করতে, অপর পুরুষের কাছে যাবেই বা না কেন? আর তাই যদি করে বসে কোন দুঃসাহসী নারী, এত হৈ চৈ কেন?

(৬) এমন অনেক দম্পতি আছে যারা বিবাহ না করেও একত্রিত থাকে। তারা যদি সত্যি সত্যিই খাঁটি থাকে অর্থাৎ দৈহিক মিলন শুধু তাদের মধ্যেই আবদ্ধ থাকলেও, এসন্তানকে সমাজ বা আইন মেনে নেবে না—এমনই সমাজ! ফলে অনেকক্ষেত্রে এরা গর্ভপাত বা শিশু হত্যার আশ্রয় নিয়ে থাকে।

(৭) নারীকে স্খলনের জন্যে ঘর থেকে বেরিয়ে যেত হয়। সমাজ তাকে আশ্রয় দিতে রাজী নয়। কিন্তু বাইরে এই সমাজের লোকেরাই ঐ নারীকে নির্বিবাদে প্রশ্রয় দেয়। এমনই স্মৃতিশাস্ত্রকারগণের চৈতন্য!

নববিধান

কালের চাকা ঘুরে গেছে। বর্তমানে নারী বুঝতে পেরেছে সমাজে তাদের কতখানি দাম। দেখতে শিখেছে পুরুষ জাতির নিষ্ঠুর রূপ। জানতে পেরেছে সমাজে তাদের জন্যে আলাদা করে নিয়ম কানুন। দোরোখা নীতি যে নারীর কাছে অপমানজনক তা আজ নারী বেশ হৃদয়ঙ্গম করেছে। তাই আজ এত নারী জাগরণের ঢেউ, তাই তারা দাবি করছে পুরুষের সঙ্গে সমানাধিকার।

পুরুষকে একটু উদার হতে হবে। নিজেদের একটু সুযোগ সুবিধা নারীদের দিতে হবে। এতকাল পুরুষ যে শিথিলতা ও স্বাধীনতা ভোগ করে এসেছে তার কথা ভেবে, নারীর ভুল ত্রুটি কিছু সহ্য করতে হবে। আর তাতে যদি পুরুষের পৌরুষে বাধে, সমাজ-ব্যবস্থা পাল্টে ফেলতে হবে। এমন এক সমাজ গড়তে হবে, যেখানে—পুরুষ ও নারীর জন্যে এক নীতি। নারীও পুরুষের মত সর্ব বিষয়ে সমানাধিকার পাবে। নারীর প্রতি অবিচার হবে না এক বিন্দুও।

সারাংশ

(১) পুরুষদের পিতৃত্ব-দাবি স্বীকরণের জন্যে এই দোরোখা নীতিকে জন্ম নিতে হয়েছে।

(২) বিবাহ প্রথা কেমন করে সভ্যতার বুকে নেমে এল সে সম্বন্ধে অনেক মতবাদ আছে। একটি হল যৌন মতবাদ, এটি এই প্রবন্ধে ব্যক্ত করেছি।

(৩) নারীদের এত অপমানকর পরিবেশের মধ্যে কেন বাস করতে হয় তা জানিয়েছি। নারীদের দুর্দশার মূলে রয়েছে এই দোরোখা নীতি। পুরুষপ্রধান সমাজের হাত থেকে এই নীতি বেরিয়েছে বলেই নারীদের এত দুর্গতি।

(৪) দোরোখা নীতির বিরুদ্ধে অভিযান চালাবার জন্যে নারীকে সচেষ্ট করেছি। পুরুষ যেমন নারীর কাছ থেকে সতীত্ব দাবি করে, নারীরও পুরুষের কাছ থেকে তদনুরূপ দাবি করাটা যে কোনমতেই অন্যায় নয় তা বুঝিয়েছি।

(৫) পুরুষকে আরেকটু উদার ও আরেকটু সহৃদয় হবার জন্যে অনুরোধ করেছি। নারীর দোষ ত্রুটি লঘুচিত্তে বিচার করতে হবে। আর যদি না পারে, পুরুষকেই ভাঙতে হবে পুরুষের হাতে গড়া সমাজ।

(৬) সমাজবিদ্যা কোবিদগণকে ও স্মৃতিশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের (অর্থাৎ পুরুষদের) এক নতুন সমাজ গড়বার জন্যে সচেতন করেছি। নারীরা এমন কি অপরাধ

করেছে যার জন্যে এমন শাস্তি ? আর পুরুষেরা কি এমন সৎকার্য করেছে যার জন্যে তাদের সাত খুন মাফ ?

(৭) সব শেষে, আপনাদের একটা অপ্রিয় সত্য জানিয়েছি। আমি যে আমার পিতার সন্তান এর কোন প্রমাণই নেই। শুধু এ-কথাটা বলতে পারছি কতকগুলি বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানের জোরে। শুধু আমার বলে নয়, আপনাদের সকলেরই। আপনি যে আপনার পিতার সন্তান তার যে প্রমাণ নেই সে কথাটা বোঝাতে গিয়ে এমন সব কথার আলোচনা করতে হয়েছে যা আপনাদের কানে বেসুরো লাগবে। কিন্তু আপনি যদি একটু স্থিরমস্তিষ্কে ভাবেন, আমার কথার সারবত্তাটা বুঝতে পারবেন। আর এই প্রমাণ না থাকাটাই দোরোখা নীতির জাজ্জ্বল্য প্রমাণ।

(৮) এই প্রবন্ধে আপনাদের অনেকের হয়ত ধারণা হতে পারে যে আমি নারীদের মধ্যে বহুমুখকামিতার পক্ষপাতী। তা মোটেই নয়। আমার মূল বক্তব্য হচ্ছে নারীদের মধ্যে যে মাত্রায় একনিষ্ঠতা বা একমুখকামিতা আছে ঠিক সেই মাত্রা পুরুষের মধ্যেও চালু হোক। তা হলেই তো সব বিতর্কের অবসান ঘটে।